মহামোহ

প্রতিভা রায়

ভাষান্তর

ভারতী নন্দী

প্রভা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

পুরবাক

অহল্যা কোনও চরিত্র নয় একটি প্রতীক। প্রতীকের যখন বিশ্লেষণ হয়, তখন তা পরিণত হয় চরিত্রে। চরিত্র উন্মোচিত হলে দেখা যায় প্রতীকের মধ্যে লুকায়িত অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

বৈদিক সাহিত্যে অহল্যার উন্মেষ। অহল্যা সৌন্দর্যের প্রতীক, ইন্দ্র ভোগের প্রতীক, গৌতম অহং-এর প্রতীক এবং রাম ত্যাগ ও ভাবের প্রতীক। সৌন্দর্য শুধু দর্শনীয় নয়, অনুভবেরও। সৌন্দর্যের শুধু স্থূলরূপ নয়—সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। সৌন্দর্যের তত্ত্ব না বুঝলে সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যগ্রাহী উভয়ই সৌন্দর্যের খণ্ডরূপ অবলোকন করে। সৌন্দর্য মোহ সৃষ্টি করে আবার মোহ ভঙ্গও করে। ইন্দ্র মোহসৃষ্টি করে থাকলে রাম অহল্যার মোহভঙ্গ করেন। মোহ এবং মোহভঙ্গের মধ্যে আত্মমুগ্ধা অহল্যা নিজেই হয়েছে মোহেব কারণ আবার নিজেই মোহের শিকার। ইন্দ্রমোহ অহল্যাকে পাপের দিকে প্রেরিত করেছিল, রামভাব প্রেরিত করেছিল মোক্ষেব দিকে। পাপ থেকে মোক্ষে উত্তরণের পথে গৌতম এক দণ্ডধারী শাসক মাত্র। অহল্যার প্রেমাকাঙ্খা বামাকাঙ্খায পরিণত হওয়াটাই অহল্যার তপস্যা ও মোক্ষ। অহল্যাব তপস্যা পথে বাম সিদ্ধি হলেও ইন্দ্র এবং গৌতম কেউই গৌণ নয়। গৌতমের স্থূল দৃষ্টিতে অহল্যা পতিতা---রামেব দিব্যদৃষ্টিতে অহল্যা পবিত্র। পাপ ও পুণ্যের মধ্যে সমাজ নির্মিত অভেদ্য দুর্গ বামের বিচার বাণে চূর্ণ হয়ে গেছে—"পাপ থেকে মোক্ষপথের রাস্তা দুর্গম হতে পারে, রুদ্ধ নয়। ভোগবাদ হল পতন এবং আধ্যাত্মবাদ হল উত্থান।" অহল্যা উপাখ্যানের এটাই তাৎপর্য সব যুগে মানুষের মধ্যে অহল্যা, ইন্দ্র এবং গৌতম আছেন এবং কোটিতে একজন রাম। রাম সাধাবণ না হওয়ায় ঐশ্বরীয়। সমাজের স্থূল দৃষ্টিতে অহল্যা অসতী আবার রামের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অহল্যা সতী। তাই পুরাণের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চনারীর মধ্যে অহল্যা অগ্রগণ্যা।

"অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী মন্দোদরী তথা
পঞ্চকন্যা স্মরেনিত্যং মহাপাতক নাশনম্।"

কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে—রামের স্পর্শে অহল্যা শাপমুক্ত হল কিন্তু কলঙ্ক তো গেল না? ইন্দ্রের স্পর্শে অহল্যর পতন—রামের স্পর্শেই অহল্যার মুক্তি—কথাটা কি এত সহজ এবং সরল? বেদের ওঁকার ধ্বনিতে লালিতা ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যা সাধারণ নারী নয় ব্রহ্মার প্রভাবে সে বেদমতী। গৌতম পত্নী অহল্যা স্বামীর পদমর্যাদার গৌরবে একজন সম্মানীয়া বৈদিক নারী। অথচ দেহবাদী ইন্দ্রের স্পর্শমাত্রেই গমন করলেন পাপের পথে। অহল্যার মতো নারীর পক্ষে পাপ করাও সহজ নয়। তাই মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অহল্যার পতন ও উত্থানের বিশ্লেষণ করা উচিত। বহু জটিল মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে নারী হোক বা পুরুষ পাপ করে থাকে। তাই অহল্যার পতন শুধু দেহভোগ থেকে সৃষ্ট বলা যায় না। মোক্ষের জন্য যেমন বহু সাধনার প্রয়োজন, পাপের জন্যও বহু অভাববোধ, যন্ত্রণা মানসিক সংঘাত, প্রতিবাদ ও তদ্‌জনিত বিষাদ ও দ্বন্দ্ব দায়ি। মোক্ষের মতো পাপও কম সাধনা সাপেক্ষ নয়। তাই পাপকে উপেক্ষা কেন?

বহু বেদজ্ঞ মণীষী অহল্যা ইন্দ্র এবং গৌতমের প্রতীকাত্মক অর্থ করেছেন। কখনও অহল্যা হয়েছেন উষা, ইন্দ্র হয়েছেন মেঘ। উষাব কপালে মেঘের কালিমা লেপন করে ইন্দ্র হয়েছেন অহল্যাভোগী। বহু বিদ্বান অহল্যাকে হল্য না হওয়া অকর্ষিত ভূমি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বর্ষাদান করে ইন্দ্রদেব অহল্যাকে ফলপ্রসূ, উর্বরা ও পূর্ণগর্ভা করেছেন। এখানে গৌতম ইন্দ্রকৃপাপ্রার্থী একজন কৃষিজীবি আর্য। স্বামী দয়ানন্দ অহল্যাকে রাত্রি, ইন্দ্রকে সূর্য ও গৌতমকে চন্দ্রমার রূপ দিয়েছেন। এখানে রাত্রি এবং চন্দ্রমাব মধ্যে পতিপত্নীর সম্পর্ক থাকায় সূর্য রাত্রি ও চন্দ্রমার বিচ্ছেদকর্তা।

বাল্মিকী রচিত পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য বামায়ণে পুরুষোত্তম রামের আবির্ভাব। রামচরিত্র মানুষ থেকে ঈশ্বরত্বে উত্তরণের জন্য বামায়ণে রামের যশ, কীর্তি, বীরত্ব, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, প্রেম, সংযম, ন্যায়-বিচাব ও বিবেকের কাহিনী বর্ণিত। রামের উত্তরণের পথে অহল্যা উদ্ধার আখ্যান রামের অলৌকিক বিচার ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় দেয়। বেদে ইন্দ্রের প্রতি "অহল্যাজার" শব্দকে ভিত্তি করে রামায়ণে অহল্যা, ইন্দ্র, গৌতম উপাখ্যানেব জন্ম হতে পারে। মহাভারতেও অহল্যা ইন্দ্র উপাখ্যানের সূচনা পাওয়া যায়। বেদেব দুর্বোধ্য তত্ত্বকে সার্বজনীন করার জন্য পুরাণের সৃষ্টি। সেই সূত্রে বেদের প্রতীকাত্মক অহল্যা রামায়ণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ইত্যাদিতে চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মাপুত্রী অলৌকিক সৌন্দর্যময়ী অহল্যা এই কলঙ্কিত কাহিনীব নাযিকা হয়েছে।

বাল্মিকীর রামায়ণে বাম ঈশ্বব নয়, মানব। ঋষির অভিশাপে অহল্যা এখানে শিলায় পরিণত হয়নি কিংবা রামের চরণস্পর্শে শিলা থেকে নবজন্মও লাভ করেনি। এখানে গৌতম ইন্দ্রকে সহস্রযোনি হওয়ার অভিশাপও দেননি। বাল্মিকীর রামায়ণে অহল্যার অভিশাপ এইরকম—"অনাহারে, বায়ুভক্ষণ করে লোক-লোচনের অন্তরালে থেকে ভস্মশায়িনী হয়ে দীর্ঘ তপস্যা করে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, তাহলেই রামের আগমন হবে এবং শাপমোচন হবে।" তাই প্রায়শ্চিত্তের ফলে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানই অহল্যার মুক্তির কাবণ রাম রমণীয়ভাবের মর্তরূপ হওয়ায় অহল্যার শাপমুক্তি নিমিত্ত মাত্র। এখানে রাম বাইরে নয়, তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ অহল্যার অন্তরেই বিরাজিত। রাম অহল্যার আত্মার আবিষ্কার। বাল্মিকীর এই বর্ণনা অত্যন্ত যথার্থ ও মানবিক। রামায়ণের বালকাণ্ডে অহল্যা প্রসঙ্গে বাল্মিকী বলেছেন—কামভাবের বশবর্তী হয়ে অহল্যা সজ্ঞানে ইন্দ্র সমর্পিতা হয়েছে। ইহা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। কিন্তু উত্তরকাণ্ড ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষার রামায়ণে অহল্যার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে স্নানের ঘাট থেকে ফিরে এসে অসময়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে অহল্যাকে সম্ভোগ করেছেন। তাই অহল্যা সজ্ঞানে ইন্দ্র সমর্পিতা নয়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহা বিশ্বাস্য নয়। স্বামী ও পরপুরুষকে ছদ্মবেশে চেনার ক্ষমতা মূঢ়া নারীরও আছে। অহল্যা তো বেদমতী এবং বুদ্ধিমতী নারী। বাল্মিকীর মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিতেব ক্ষেত্রে একটি আখ্যানকে দু'জায়গায় দু'ভাবে বর্ণনা করার বিভ্রান্তি আদৌ গ্রহণীয় নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শবাদী পুরোধাগণ কর্তৃক উত্তরকাণ্ডের অহল্যাংশ সম্ভবত বিক্ষিপ্ত।

বাল্মিকীর পরে অনেক সংস্কৃত রামায়ণ, তামিল ভাষার কম্ব রামায়ণ, বাংলার কৃত্তিবাস

রামায়ণ, হিন্দির আধ্যাত্ম রামায়ণ, তুলসীদাস কৃত রামচরিতমানস এবং নেপালি ভাষায় ভানুদেব রামায়ণ ইত্যাদিতে অহল্যা উদ্ধারের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। কিন্তু সব জায়গায় অহল্যার আখ্যান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত এবং যথার্থধর্মী নয়। অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত ও সিদ্ধি গৌণ, রামের মহানুভবতাই মুখ্য। যুগে যুগে নারীর পাপকর্তা, শাপ ও মোক্ষের কর্তা একেকজন ইন্দ্র, গৌতম ও রাম—অর্থাৎ পুরুষ। নারী যেন শুধু অন্নময় পিণ্ড। পুরুষ স্পর্শ করলে সেই পিণ্ড পঙ্কিল হয়ে যায়। পাষাণ হয়ে যায় আবার পাষাণ থেকে নবযৌবন লাভ করে। নারীর উত্তরণ নারী নিজে নয় যেন পুরুষের। অহল্যার বিষয়ে মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। বাল্মিকীর অহল্যা উপাখ্যানে শব্দ সংকোচন যুগ যুগ ধরে অহল্যাকে শুধুমাত্র দেহমুগ্ধা নারী করে রেখেছে, রামের পবিত্রস্পর্শে যে প্রাতঃস্মরণীয়া হয়েছে। অহল্যার জন্য অধিক ব্যাখ্যার অবকাশ কোথায়?

"মহামোহ" উপন্যাস এইসব প্রশ্নের উত্তর নয়, প্রতিক্রিয়া। উপন্যাস রচনার পরেও অহল্যা বেশিরভাগ অনুক্তা রয়ে গেছেন। সেটাই সব লেখকের অপূর্ণতা। অহল্যা যদি নিজের কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে তিনি কি বলতেন? সুখ না দুঃখ, পাপ না পুণ্য নরক না মোক্ষ? জীবন শুধু পাপ বা শুধু তপস্যা নয়। মোক্ষের অর্থ মানুষ থেকে দেবতা নয় বা মর্তলোক থেকে স্বর্গলোকে যাত্রা নয়। এইরকম মোক্ষ স্বার্থপরতা। পাপ, তাপ, তপস্যা ও মোক্ষই জীবন এবং মর্তভূমি হল এইসব কিছুর সাধন ক্ষেত্র। তাই অহল্যা স্বর্গারোহন করেন নি। তিনি মর্তনারী, মর্তেই তাঁর সাধনা এবং সিদ্ধি।

"মহামোহ"র অহল্যা বৈদিক নয়, ব্রহ্মার মানসপুত্রী নয়—সে ঈশ্বরের কলাকৃতি—চিরন্তন মানবী। বৈদিককাল থেকে অনন্তকালে তাঁর যাত্রা। তিনি অতীতে ছিলেন —ব আছেন—ভবিষ্যতে থাকবেন। মোক্ষ অহল্যার নিয়তি নয়। সংঘর্ষই তাঁর নিয়তি। ললাট থেকে কলঙ্ক লুপ্ত হয়নি। তাই অহল্যা দেবী নয়। অহল্যা হলেন মানবীয় ক্রান্তি। ক্রান্তির পথে শ্রান্তি কোথায়? অহল্যার সংঘর্ষ শুধু নারীর সংঘর্ষ নয়—ন্যায্য অধিকারের জন্য মানুষের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের পথে বেদ পুরাণ একাকার। কখনও দাসীপুত্র সত্যকামের মানবিক অধিকারের জন্য সংঘর্ষ, আবার কখনও সাধ্বী অপালার সমাজের সংকীর্ণ বিচারের বিপক্ষে সংঘর্ষ। তাই সময় এখানে সময়াতীত। তাই প্রতীকাত্মক চরিত্রগুলি এখানে কালক্রম অনুসরণ করেননি। মূল্যবোধ ও তত্ত্ব অনুসরণ করেছেন। এখানে চরিত্রগুলি বেদ ও পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে নেমে এসেছেন সাম্প্রতিক জীবনভূমিতে।

এখনও জাতিভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক বিদ্বেষ ও তদ্‌জনিত উৎপীড়ন, রক্তপাত ও সংঘর্ষ চলছে। এখনও অহল্যাদের বলি হয় পুরুষের অহং ও অভীষ্ট যজ্ঞে। এখনও ইন্দ্রেরা অহল্যার বিনিময়ে অভীষ্ট সিদ্ধি করেন। তাই অহল্যা কোন যুগের? বৈদিক, পৌরাণিক না সাম্প্রতিক?

কাল নির্বিশেষে "মহামোহ" হল ইন্দ্র, গৌতম এবং অহল্যার মোহ এবং মোহভঙ্গের আখ্যান—ভ্রান্তি ও উৎক্রান্তির উপাখ্যান।

প্রতিভা রায়

ভাষান্তর ঃ **ভারতী নন্দী**

পাপ

হে আমার অন্তরঙ্গ পাপ। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ তুমি কখনও কারও বিশ্বাসভঙ্গ কর না। বিপদের সময় সবাই আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল। আমার পুণ্য, আমার খ্যাতি, আমার সৌন্দর্য, আমার সঙ্গীত, আমার তপস্যা, আমার আত্মীয় স্বজন, সখী-সহচরী এমনকি আমার স্বামীও আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। অবশেষে আমার ধমনীর রক্ত, মাংস, হৃদয় এবং আমার আত্মার কোমলতম, পবিত্রতম, নিঃস্বার্থ স্পন্দন—আমার গর্ভজাত সন্তান আমার কোল শূন্য করে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মরণকালে জীবন জীব-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো আমার প্রিয়জনেরাও আমার থেকে অর্ন্তহিত হয়ে গেল। ভূ, ভুবঃ, ও স্বঃ ত্রিলোক প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণের মুখ-নিঃসৃত আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলার মতো মহর্ষির হৃদয় নিঃসৃত ক্রোধাগ্নিতে আমার ত্রিলোক, আমার ত্রিসত্তা দেহ, মন ও আত্মা জ্বলতে থাকে। প্রলয়কালীন অগ্নিতাপে ব্যাকুল হয়ে মুনীশ্বরগণ স্বর্গলোক থেকে মর্তলোকে চলে যাওয়ার মতো আমার পাপের তাপে ক্রোধিত হয়ে মুনিশ্বরগন আশ্রম পরিত্যাগ করে হিমালয়ের তুষারবৃত শৃঙ্গের আড়ালে চলে গেলেন এবং আমার মুখ দর্শনের পাপ থেকে বিরত হয়ে তপস্যা শুরু করে দিলেন। আমার চেতনা ও আমার থেকে দূরে চলে যাওয়ার মতো মনে হল। কিন্তু হে আমার চিরবিশ্বস্ত বিদগ্ধ পাপ তুই দগ্ধ শরীরের অবশ্যসম্ভাবী দাগের মতো আমার সমস্ত সত্তায় একাকার হয়ে রইলি। প্রলয় কালে প্রবল হাওয়ায় সপ্তসিন্ধু উত্তাল হয়ে ত্রিলোক নিমজ্জিত হয়। সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে ভগবান যোগনিদ্রায় চক্ষ মুদ্রিত করে শয়ন করেন এবং মুনি ঋষিরা সহস্রকণ্ঠে তাঁর স্তুতিগান করেন। ঠিক সেই রকম আমার কলঙ্কের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে আমার হৃদয়ের সপ্তসিন্ধু উত্তাল হয়ে ওঠে ও আমার চেতনাকে নিমজ্জিত করে। সেই অস্থির চিত্ত তরঙ্গের মধ্যে আমার বিবেক বুদ্ধি অবসন্ন হয়ে গেল। কিন্তু আমার অবচেতন মনের বাসনা আমার পাপের স্তুতিগান করতে পশ্চাদপদ হয়নি।

কালের অমোঘ নিয়মে বেদগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ুও শেষ হয় এবং সেই নিয়মে পুণ্যের পরমায়ু ও শেষ হয়ে যায় কিন্তু পাপের পরমায়ু শেষ হয় না। পুণ্য করার জন্য কত দৃঢ় সংকল্প করতে হয় কিন্তু পাপ ও দুঃখ বিনা চেষ্টায় পাওয়া যায়।

প্রত্যেক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনুবংশী রাজা, সপ্তর্ষি, দেবতা ইন্দ্র ও গন্ধর্ব ইত্যাদি নিজ নিজ অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু মানুষ নিজের পাপ জন্মান্তরে ভোগ করে। তাই আমার পাপ

আমি ব্যতীত আর কেউ ভোগ করল না। পুণ্য এবং খ্যাতির অংশীদের হওযার জন্য সবাই এগিয়ে আসে কিন্তু পাপ ও কলঙ্কের অংশীদার কেউ হয় না। এমনকি পাপী ও পাপের ফল ভোগ করতে চায় না। তাই হে আমার অকপট পাপ একমাত্র তুই-ই আমার নিজের। আজ এই পরিত্যক্ত অরণ্যে তুই আর আমি মুখোমুখি। কিন্তু সত্যি বলছি, তোকে পাপের মতো কদাকার দেখাচ্ছে না। অন্তরাত্মার মতো অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছে। বাস্তবিক এই নির্জন অরণ্যে আমরা দুজনে কত নিকটতম হয়ে গেছি। আমার পাপ এবং আমার অন্তরাত্মা দুজনে দুজনের কাছে কত নিকটতম হয়ে উঠেছি। আমার পাপ এবং অন্তরাত্মা দুজনে দুজনের কাছে কত নিঃসঙ্কোচে অকপটে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।

শুনেছি পাপ প্রকাশ করলে ক্ষয় হয়। পাপ কি সত্যি ক্ষয় হয়? পাপ তো তার নিজের জায়গায় অবিচল থাকে । হয়তো পাপের ওপর পুণ্যের তুলি টেনে দিলে পুণ্যের রং এর ভিতরে পাপ কিছুদিনের জন্য চাপা পড়ে যায়। জীবনে কিন্তু একটা পাপ সহস্র পুণ্যকে পদানত করে। নিঃসঙ্কোচে নিজেকে প্রকট করে। হয়তো পাপী আর পাপ করে না, কিন্তু পূর্ব পাপের কলঙ্ক থেকে তার মুক্তি নেই। মহাকাল যে সবকিছুই নষ্ট করতে সমর্থ সেও পাপ এবং কলঙ্কের স্মৃতিকে কেন নষ্ট করতে পারে না, সেটাই আমাকে বিমূঢ় করে।

সংসারে প্রত্যেক পাপ ব্যক্তিগত। মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত পাপ করে থাকে। কিন্তু সাধারণ বিচারে তার দন্ডবিধান হয়ে যায়। আমার পাপ-ও একান্ত ব্যক্তিগত। আমার পরিস্থিতি নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র। আমি কেন এইরকম পাপ করলাম। এই পাপের প্রেরণা কার? আমার পাপ কি সত্যিই আকস্মিক। পৃথিবীতে কোনও আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। তাই আমার এই পাপও আকস্মিক নয়। এই পাপের পূর্বাপর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গেলে ষষ্ঠবেদ লেখা হয়ে যাবে কিন্তু তা ষষ্ঠবেদের মর্যাদা পাবে না-কারণ আমি পিতামহ ব্রহ্মা নই। কিন্তু কেউ কি আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করল? দরদি হৃদয় নিয়ে কে জিজ্ঞাসা করেছে "তোর পাপ এত বিশাল যে সেখানে চোদ্দ ভূবন ও আরও বেশি লোকের পুণ্য ডুবে যেত। কিন্তু তোর পাপকে ভূ, ভূবঃ ও স্বঃ-এইরকম তিনভাগে বিভক্ত করে আমাদের মধ্যে বিতরণ করে দে। কারণ এই তিনলোকই জীবের ভোগস্থান। আমরা সবাই এই ভোগস্থানের বাসিন্দা হওয়ার দরুণ তোর পাপের আমরাও অংশীদার। পাপ আকস্মিক নয়। এই পাপের কার্য-কারণ তুই একা নয়, আমরা সবাই -অর্থাৎ এই সমাজ । এই সমাজ ব্যবস্থা তোর পাপের প্রেরক। তাই সে ও এই পাপের অংশীদার।"

কেউতো এভাবে আশ্বাস দিল না। আমার আকাশব্যাপী পাপকে দেখে পুণ্যও স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হল, পৃথিবীর আর কোনও পুণ্য এই পাপের পদচিহ্নকে আমার যাত্রাপথ থেকে মুছে দিতে পারবে না। বিষয়গুণের রূপান্তর-ই কালের আকার কিন্তু কাল নিজে নির্বিশেষ অনাদি এবং অনন্ত। আমার শাপমুক্তি হলেও হতে পারে কিন্তু এই অনন্ত পাপ থেকে আমার মুক্তি হবে কি? অভিশাপের কাল নির্দিষ্ট—কিন্তু পাপের কাল তো নির্বিশেষ। যেমন আমার পাপ নিজেই মহাকাল। কালকে নিমিত্ত করে সৃষ্টিকর্তা লীলাছলে স্বয়ং

নিজেকেই সৃষ্টিরূপে প্রকট করার মতো ইন্দ্রিয় বাসনা ও কামনাকে নিমিত্ত করে মানুষ পাপকেই প্রকট করে চলেছে। মন দুর্বল হয়ে গেলে বাসনা বলীয়ান হতে বাধ্য। শুনেছি, ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্ত থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, হৃদয় থেকে কাম, ভ্রুলতা থেকে ক্রোধ, নিম্নওষ্ঠ থেকে লোভ, মুখ থেকে বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী ও পায়ু থেকে পাপের আশ্রয় নিরুত্ত (অসত্য) উৎপন্ন হয়।

আবার শুনেছি ব্রহ্মার দেহ ও মন থেকে সারাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তার থেকে অজ্ঞানেব পাঁচটি বৃত্তি সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা। তমঃ, মোহ, মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ব্রহ্মারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা এই সমস্ত পাপ এবং পাপময় পৃথিবী সৃষ্টি করলেন কেন? যিনি পাপময় পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তার পাপ হল না---যে ওই পাপময় পৃথিবীর বিবশতা ভোগ করল, পাপ তারই।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে বহুবচন। কখনও সাধু কখনও অসাধু। যখন সে সাধু, তখন সে ভাবে এরকম সাধুতার দৃষ্টান্ত আর নেই—সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধু। যখন সে অসাধু তখন সে ভাবে—এরকম অসাধু, এরকম পাপী, পৃথিবীতে অনেক আছেন। হয়তো সবাই অল্পবিস্তর অসাধু পাপী, তাব থেকে বড় পাপীও আছেন, সেতো ক্ষুদ্র পাপী। বলতে গেলে সাধুতার সে বেশ নিকটতম-পুণ্যের পাশাপাশি। আমিও সেই-বকম ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাব পাপ জগতে বিরল নয়। এক স্বাভাবিক পাপ। হয়তো পাপটি ক্ষুদ্র। যে পাপে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি ধূলি ধূসরিত হয়নি। এই পাপে আমি ব্যতীত একটি ক্ষুদ্র জীবও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই পাপের পিছনে যে প্রেরণা উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেই কথা বিচাব কবলে আমি এই শাস্তি পেতাম না। পাপেব অন্তরালে জ্বলে থাকা পুণ্যের দীপশিখা পাপেব ছায়ায় কাউকেই দেখা যায় না। তাই 'পাপ' সর্বদা দণ্ডনীয়। পাপের ছায়াই যদি এত গভীর--এত ভয়ঙ্কব, তাহলে পাপের বিকটতার তুলনা সম্ভব নয়।

মৃত্যুহীন জীবন যেমন অসম্ভব, পাপহীন জীবনও অসম্ভব। প্রদীপের সলতে দগ্ধ হয়েই তার আয়ুকাল উপভোগ করে ও তার জন্মের উদ্দেশ্য সফল হয়। যদি আমি জীবন চাই তবে প্রতি মুহূর্তে কোনও অজুহাতে আমাকে মরতে হবে—আলোকেব জন্মের জন্য অন্তরীক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ হবেই হবে। তাই পুণ্যের মহিমায় দীক্ষিতা হওযার আবশ্যকতা থাকে—পুণ্য ব্যতীত জীবন হতে পারে কিন্তু পাপ ব্যতীত জীবন কোথায়? ইচ্ছা করলে সকলেই পুণ্য করতে পারবে কিন্তু পাপ করতে পারবে না। পাপ করার জন্য মনে যে দৃঢ়তা এবং দুঃসাহস দরকার সেটা সবাইর থাকে না। মানুষ সুখের আশাতেই পাপ করে কিন্তু ফলস্বরূপ দুঃখই ভোগ করে। পাপের ডানায় দুঃখ ও অন্তর্দাহ যে বসে থাকে, সে কথা পাপ করার আগে কার বা অজানা ?

সুনাম ও দুর্নামের মধ্যে সুনাম-ই কাম্য, কিন্তু সৎকার্য করে যদি দুর্নাম মেলে তাহলে দুর্নাম-ই কাম্য। কিন্তু আমি যে কাজ করেছি সেটা সৎকাজ বলে কে বলবে? পাপের উদ্দেশ্য যত মহৎ-ই হোক পাপ পাপ-ই। যেটা আমার জন্য সত্য সেটা জগতের জন্য অসত্য। তাই আমি মহাপাপ করেছি।

মনে প্রশ্ন উঠলেই জীবনীশক্তি ঠিক পথে চলছে বলে ধরে নিতে হবে। আজ আমার মনে অনেক প্রশ্ন উঠছে। প্রেম কি অসৎ? করুণা কি কলঙ্ক? পরোপকার কি ঘৃণ্য? বাৎসল্য কি দুর্বলতা? কিন্তু আমার এই প্রশ্ন শুনে জগৎ হাসবে। বলবে ভোগলিপ্সা কি প্রেম! ভোগ এর মধ্যে আবার করুণা এবং পরোপকারের প্রশ্ন কোথায়?

আমি যদি বলি—শুধু ভোগবাসনা নয়, আমার পাপের পিছনে ছিল আরও জটীল মনস্তত্ত্ব, হতে পারে নিঃস্বার্থ প্রেম? অনন্ত করুণা মিশ্রিত পরোপকার—ত্যাগ উৎসর্গ, প্রতিবাদ এবং প্রতিঘাত! এখানে প্রেমের পরিণতি নিন্দা, কারণ এখানে প্রেম সম্মানীয় নয়। এখানে প্রেমে ভয়। কারণ প্রেমের শক্তি কত এবং প্রেম কত নির্ভয় করে তা জানার চেষ্টা আমরা কোনও দিন করিনি। প্রেম এখানে যন্ত্রণা কারণ প্রেমের অর্থ এখানে কামনা বাসনা। প্রেমে এখানে হতাশা। কারণ আমাদের প্রেমে অজস্র প্রত্যাশা। প্রেম এখানে ঘৃণ্য কারণ প্রেম এখানে নিষ্কলুষ নয়। এখানে প্রেম আনে ব্যর্থতা কারণ প্রেমে হারজিতের অপবপক্ষটি আছে; কিন্তু আমি পাপের গুণগান করতে করতে প্রেমের কাছে কি করে পৌঁছে গেলাম? পাপ এবং প্রেম কি এত নিকটতম—এত অন্তরঙ্গ-হাতের তালুর দু'দিকের মতো।

নিজের "পাপ" এর বিচার করার সময় নিজের কাছে 'পাপ' এর বহু অংশ দৃশ্য হয না। চোখের একটা বড় দোষ যে, সে নিজেকে দেখতে পায় না। নিজের শরীরেব কিছু অংশ সারাজীবন নিজের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়। মানুষ নিজের জীবনের অনেক সময় ও মুহূর্তকে দেখতে পায় না। অথচ সেই সময়টা তার ভিতরেই প্রবাহিত হয়েছে। সে প্রবাহিত হয়েছে সেই সময় আয়ুর কিছু অংশের ওপারে। কত ভোর—মাহেন্দ্র মুহূর্ত নিশার্দ্ধ জাগ্রত থেকেও মানুষের অদেখা রয়ে যায়। সেইরকম কিছু কিছু 'পাপ' সচেতন থেকেও দেখা যায় না। সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও কত ছোট বড় পাপ ঘটে যায়। ঠিক সেইরকম সেই বিশাল পাপটি সংঘটিত হয়ে গেল আমার জীবনে। বাস্তবে আমি কি সেই পাপের প্রতিরোধ কারিনি। বিরোধ করতে চেয়েও বিবশ হয়ে গেলাম সেই অতি আকাঙ্খিত প্রিয়তম পাপের নিবিড় স্পর্শে।

পুণ্যের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই তাই বিনা দ্বিধায় পুণ্য সংগঠিত হয়; কিন্তু বিনা দ্বিধায় ক্ষুদ্র পাপটিও সংগঠিত হয় না। দ্বন্ধের অবসান হতে না হতেই আমার পাপ আমাকে গ্রাস করল। দ্বন্দ্বের অবসান হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করার ধৈর্য পাপের কোথায়? পাপীর বা এত মনোবল কোথায়? বেদ এর বাণীর প্রথম স্ফুরণ, প্রথম শব্দ 'অগ্নি'র মতো আমার জীবনের প্রথম পাপ অগ্নিতে পরিবর্তিত হয়ে আমার জীবন ও মৃত্যুকেও দগ্ধ করে দিল। এখন আমি জীবিত না মৃত?

জীবিত থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণায় আমি জর্জরিতা। মৃতবৎ পড়ে থেকে জীবনের সমস্ত জ্বালায় আমি দগ্ধিভূতা। কি বিচিত্র আমার বর্তমান এবং প্রারব্ধ।

একদিকে যজ্ঞ ও ত্যাগ অপরদিকে পরিগ্রহ ও লোভ-এটাই জীবন। জীবনে এই দুটির মহত্ত্ব অস্বীকার করা যাবে না। পাপ-শূন্য জীবন নিষ্কলঙ্ক হতে পারে কিন্তু পরিপূর্ণ নয়। ক্ষণিকের জন্য পাপ জীবনের শূন্যতাকে দূর করে দিতে পারে, কিন্তু জীবনকে কি পরিপূর্ণ

করে? কারও জীবন কি কখনও পরিপূর্ণ হয়? কিন্তু আজ এত বছর পরে আমি আমার পাপের হিসাব করছি কেন? যখন নিন্দা, অপমান ও কলঙ্কের ঘূর্ণিঝড়ে ম্রিয়মান হয়ে সেই পরিত্যক্ত অরণ্যে আত্মগোপন করে জড়বৎ পড়েছিলাম। তখন পাপই ছিল আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু। আমার সেই অন্তরঙ্গ পাপই আমার হাত ধরে আমাকে ভোগ-জীবন থেকে ভাব-জীবনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। আমার পাপই আমার অহঙ্কারের ওপর কঠিন আঘাত হেনে সাবধান করেছিল—"সৌন্দর্য শুধু দৈহিক নয় সৌন্দর্য মানসিক ও আত্মিক। সৌন্দর্য পার্থিব নয় অপার্থিব। প্রকৃতপক্ষে যদি তুই সৌন্দর্যের আধার, তাহলে তোর অন্তরকে তুই সুন্দরতম কর—রমণীয় কর তোব প্রিয় পৃথিবীকে।" এই সংসারে অন্তরাত্মার থেকে অন্তরতম আর কে আছে—যার কাছে তুমি তোমার স্বপ্ন, তোমার দুঃখ, পরাজয়, পাপ, অপরাধ, অভিমান ও ব্যর্থতাকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারবে। যদি সেইরকম কেউ থাকে তাহলে সে তোমার বাইরে তোমার অন্তরে তোমার অতীত ও ভবিষ্যতে তোমার জীবন ও মৃত্যুতে তোমার সাথে সর্বদা উপস্থিত। তিনি হলেন অদৃশ্য, অব্যক্ত, অনন্ত অন্তর্যামী। কে-জানে কখন সেই জ্যোতির্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়ের আবির্ভাব হবে আমার অন্তরে—কখন উঠবে সেই চিরআকাঙ্খিত মহাসূর্য—কে জানে? আমার পাপের সাফাই দেওয়ার জন্য আমি আজ আমাব অতীতের কথা ব্যাখ্যা করছি না। তার ফলে আমার "পাপ"-এর অবমাননা হবে। আমি আমার পাপের অপমান বা অবমাননা করতে চাই না। আমার পাপের প্রগাঢ় অন্তরঙ্গ-তাকে আমি অকপটভাবে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। কারণ এই জগৎ পাছে আমাকে ভুল বুঝুক কিন্তু আমাব পাপকে ভুল না বুঝুক।

জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমার জীবনে কত যে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে, তা আমি কখনও কাউকে বলার সুযোগ পাইনি। আমার জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা, যৌবন প্রাপ্তি, বিবাহ, দাম্পত্য এবং অবশেষে প্রেম ও পাপ সবকিছুই ছিল এক একটি ব্যতিক্রম। কিভাবে কেটেছে আমার নিঃসঙ্গ বাল্য, কৈশোর, দাম্পত্যজীবন—পুনরায় এত বছর কিভাবে অতিবাহিত করলাম সমাজ পরিত্যক্ত একাকী জীবন—গভীর অরণ্যে একাকিনী কিভাবে বেঁচে ছিলাম—কখনও কাউকে বলিনি। এমনকি শাপমুক্তির পর আমার মহর্ষি স্বামী একবারও জিজ্ঞাসা করেননি—"সুকুমারী! এত দুঃখ আর এত বড় কলঙ্ক এবং এই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কি করে বেঁচে ছিলে এতদিন? বলবে কি একদিনেব অনুভব এবং অনুভূতি·····?

একবারও কি তিনি এ বিষয়ে ভাবেননি? যেন আমার পরিত্যক্ত জীবনের সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। যেন সেই পাপের দিনগুলি আমার জীবনের অংশ নয়। সে কথা শুনলেও যেন আমার তপঃনিষ্ঠ স্বামীর পাপ হবে। সত্যি হয়তো এতবড় ঘটনা ঘটেনি। কঠোর তপস্যার ফলে আমার শরীর শীর্ণ হলেও সৌন্দর্য অম্লান রয়েছে। মনে হচ্ছে আমার যৌবন চিরন্তন। তাই আমার ভিতরটাও সেইরকম অটুট রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। বাহ্যরূপ ব্যতীত আমার যেন একটা মনোরাজ্য নেই। যদিবা আমার মনোরাজ্য আছে, কিন্তু আমি যেন সে রাজ্যের অধিশ্বরী নই। তাই মনের কথা বলার অধিকারও আমার নেই। আমার

মনের খবর কে কবে রেখেছিল যে, আজ রাখবে? নারীর আবার মন কি? যদিও তা থাকে, তাহলে তার অধিকারী তো পুরুষ—তার পিতা কিংবা স্বামী, অভিভাবক! সম্ভবত সেইজন্যই অভিশাপ দেওয়ার সময় স্বামী বলেছিলেন—"তুই পাথরের মতো জড়বৎ পড়ে থাকবি, সকলের চোখে অদৃশ্য হয়ে থাকবি। তুই বায়ুভক্ষণ করবি।" কেউ কি জড়বৎ থাকতে পারে? জীবন্ত দেহ কি পাথরে পরিণত হয়? বায়ু ভক্ষণ করে কেউ কি বাঁচতে পারে?

তাহলে? তবে কি গৌতম চেয়েছিলেন অহল্যার মৃত্যু হোক? হ্যাঁ, সেটাই সত্য। সরাসরি হত্যা করলে নারী হত্যার দোষে দোষী হতেন। নরহত্যা পাপ—নারী হত্যা হয়তো মহাপাপ। ত্যাগ, উৎসর্গ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে নারীকে দেবীর আসনে বসিয়েছে এই সমাজ। নারীকে সমাজ তার কাজে ব্যবহার করে লাভ করার একি এক সুচিন্তিত ব্যবস্থা? এই সমাজটি কে? নিশ্চয়ই গৌতমের মতো তর্কনিষ্ঠ দার্শনিক, সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ। নারীকে হত্যা করলে মহাপাপ—জীবন্ত শোষণ করলে পাপ নয়—শোষিতা, লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা হওয়ার মাধ্যমে নারীর সহিষ্ণুতা, বিনম্রতা ও মহত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাই সমাজ নারীকে নির্যাতিত করে মানবী থেকে দেবীতে পরিণত করে। আজ অহল্যাও দেবী। যদি গৌতম এবং তাঁর ঋষি-সমাজ অহল্যাকে বিপর্যয় এবং মৃত্যুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে না যেতেন তাহলে অহল্যার মহত্ত্ব কিভাবে প্রতিপাদিত হত? হে পুণ্যের প্রতিনিধিগণ! অহল্যাকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাদের শতকোটি প্রণাম।

আজ আমি আমার আত্মলিপি পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ্, বিদ্বান এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিদের জন্য লিখছি না। ভবিষ্যতের নারী সমাজের জন্যও লিখছি না; লিখছি আমারই মতো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমাজ পরিত্যক্ত, পাপগ্রস্ত, শোষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষদের জন্য, যাঁরা সমাজের সেবা করেন; সমাজের যাবতীয় নোংরা আবর্জনা নির্বিকারভাবে নিজের হাতে পরিষ্কার করে সমাজকে নির্মল করে। অথচ তাদেরই সমাজ বলে শূদ্র। আবার যারা নিজের জন্মগত অধিকার এবং নিজের জন্মভূমি পর্যন্ত অপরকে ভোগ করতে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় নেয় সমাজ তাদের বলে অনার্য—পৃথিবীর বনসম্পদ ও জলসম্পদ রক্ষার শপথ যে নিয়েছিল সমাজ তাকে বলে রাক্ষস।

পৃথিবীর চরম যন্ত্রণায় শরীরের প্রতিটি জীবকোষকে বিদীর্ণ ও রক্তাক্ত করে মরণের দ্বারদেশে থেকে জীবনের উন্মেষ ঘটায় এবং মানবজাতিকে জন্ম দেয়—সমাজ তাকেই বলে অবলা, দুর্বলা, নরকের দ্বার! তার জন্য আবার সমাজের নীতি নিয়ম ও অধিক কঠোর এবং বহুসময়ে অমানবিক।

পাপের জন্মদাতা পরমাত্মা নয়—মানুষের গড়া এই সমাজ অর্থাৎ মানুষ। সমাজের আবশ্যকতা অনুযায়ী পাপ পুণ্যের সংজ্ঞাও বদলে যায়। সতীত্বের সংজ্ঞা বদলে যায় সমাজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে।

আমার এই আত্মকথন তাঁদের জন্য যারা শুধু শোনেন, দেখেন, সহ্য করেন অথচ মুখ

খোলেন না। নিজেকে প্রকাশ করেন না। অন্যায় করেন না কিন্তু অন্যায় ও অবিচার মাথা পেতে মুখ বুজে সহ্য করেন। অন্যায় করা পাপ এবং অন্যায়কে মুখ বুজে প্রশ্রয় দেওয়াও পাপ। পাপের বিচিত্র রূপরেখা ফুটিয়ে তোলাই আমার আত্মকথনের মূলস্বর। পতিত কে? পতনের মধ্যে অন্যকে যে ঠেলে দেয় না যে অসহায়ভাবে অন্যের দ্বারা পতিত হয়ে পতনের গহ্বরে পড়ে যায়! এই পৃথিবীর অসহায় পতিত ও পাপীদের নিজের পাপ ও অসহায়তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমার এই সত্য পাঠ এক বিনম্র আহ্বান।

আত্মকথা লিখতে মনস্থ করে সম্ভবত আমি এক অনুচিত কার্যে ব্রতী হয়েছি। গুণীজনেরা আত্মকথা লিখে নিজের যশ এবং পুণ্যের প্রচার করেন না, কিংবা পাপীরা আত্মকথায় সব পাপ প্রকাশ করতে পারে না। নিজের মহানতা নিজে প্রকাশ করা যতটা অসৌজন্যমূলক ততটাই অপ্রিয় নিজের পাপ নিজে প্রকট করা। আত্মপ্রশংসা এবং আত্মনিন্দা উভয়ই মৃত্যুসম। আমার পূর্বে কেউ কখনও আত্মজীবনী লিখে নিজের চরিত্রচর্চা করেছেন এমন ইতিহাস নেই। আমি এক পরম্পরা বিরোধী এবং আত্মবিরোধী কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি। সম্ভবত এটি পৃথিবীর প্রথম আত্মজীবনী হিসাবে বিবেচিত হবে। আত্মজীবনী লিখতে আমি বাধ্য হতাম না, যদি মহর্ষি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা না করতেন। সীতার দুইপুত্র লব ও কুশ আশ্রম থেকে আশ্রমে রামায়ণ গান করে বাল্মিকীর রচনাকে জনপ্রিয় করেছে। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন রামায়ণের জনপ্রিয়তা থাকবে বলে ঋষি এবং বেদজ্ঞরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। তাই আমার আত্মজীবনী কে-ই বা পড়বে কে প্রচার করবে— এবং কে-ই বা শ্রবণ করবে?

তবুও আমি আত্মজীবনী লেখা থেকে বিরত হব না। আদি কবি বাল্মিকীর রামায়ণের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য বা আমার কাব্য প্রতিভা দেখাবার জন্য আমি আত্মজীবনী লিখছি না, কিংবা সতী সীতার প্রতি ঈর্ষা পরায়না হয়ে আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য আমার চরিত্রচর্চা করতে বসিনি। বৈদিক নারী হয়ে নিজের জীবনের না বলা, না শোনা গোপন কথাগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করতে আমার কুণ্ঠা নেই। কারণ একথা না বললে জগতবাসীর কাছে আমার পাপ চিরদিন অব্যক্ত থেকে যাবে। বাল্মিকী রচিত রামায়ণ থেকে আমার সম্বন্ধে যতটুকু জানবে তাতে দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে আমার পাপ অত্যন্ত কদাকার দেখাবে। সেই কদাকার পাপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। মিথ্যা পাপের চেয়েও কদাকার। অর্ধসত্য-মিথ্যার চেয়েও কদাকার, তাই সত্যভাষণই আমার লক্ষ্য। আদিকবি বাল্মিকী আমার কথা মোটে না লিখলেও আমি বিন্দুমাত্র অভিযোগ করতাম না। কেই-বা চায় যে তার কলঙ্ক যুগ-যুগ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক? যদি আদিকবি আমার বিষয়ে উত্থাপন না করতেন, তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের পূতচরিত্রের মহানতা প্রতিপাদন করতে একচুল বাকি থেকে যেত, অবশ্য বাল্মিকী সত্যঘটনা লিখতে পারতেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এত সংক্ষিপ্ত সূচনা দিয়েছেন যার ফলে আমার পাপ এবং দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়েছে। সত্যদ্রষ্টা মহর্ষি বাল্মিকী এইরকম পক্ষপাতিত্ব করলেন কেন?

বোধহয় এইজন্যই যে, বাল্মিকী কেবলমাত্র সত্যদ্রষ্টা নন। তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও। তিনি

জানতেন যে, সীতার চরিত্রের মহানতা পড়ার পর আমার চরিত্র পাঠকের অত্যন্ত ঘৃণ্যবোধ হবে। হয়তো কালজয়ী, রামকাব্যের পবিত্র পৃষ্ঠাকে আমার পাপ কলঙ্কিত করবে। শুধু সেটুকুই নয় পাছে ভবিষ্যতের নারী সীতাকে অনুসরণ না করে আমাকে অনুসরণ করে, সেটাই সম্ভবত স্রষ্টাকে শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ করেছিল। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে চোখের সামনে রেখেই হয়তো কবি উত্তরকাণ্ডে আমার চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন এবং শব্দ সংকোচন করেছেন। সত্যদ্রষ্টা কবি আমার সম্পর্কে সত্যদর্শন করার চেষ্টা না করে আমার সম্পর্কে কেন সংক্ষেপ নীতি ধারণ করতে বাধ্য হলেন, সে কথা আমি কি করে বলব? তাঁকেও আমি দোষ দিই না। আমি তো তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিনি অবশ্য তাঁর সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে। আমার জীবনের সেই বহু চর্চিত ঘটনা ঘটার অনেক পরে এবং আমি শাপমুক্ত হওয়ার পর। তাই আমার পূর্বজন্ম সম্পর্কে তিনি লোকমুখে যা শুনেছেন তাই লিখেছেন। হ্যাঁ আমি মনে করি, সেটা ছিল আমার পূর্বজন্ম। একটা জীবনে মানুষ কতবার জন্ম নেয়, কতবার মৃত্যুবরণ করে—এ সম্পর্কে অন্য কারও অভিজ্ঞতা থাক বা না থাক আমার আছে। মহর্ষি বাল্মিকীরও একই জন্মে পুনর্জন্মের অনুভূতি আছে। তিনিও মহাপাপের মুখোমুখি হয়েছেন।

আর একটা কথা, আমার স্বামী মহর্ষি এবং বাল্মিকীও মহর্ষি! তাই সত্য জানলেও সতীর্থ মহর্ষি আমার স্বামীর সুনাম এবং সম্মান রক্ষার জন্য উত্তরকাণ্ডে লিখলেন যে আমার সাথে কপটতা হয়েছে, স্ব-ইচ্ছায় আমি পরপুরুষকে দেহদান করিনি। ভ্রমবশত পরপুরুষকে স্বামী মনে করে এইরকম করেছি। ইহা সত্যের অপলাপ হতে পারে কিন্তু বাল্মিকীর মহানুভবতার এক নিদর্শন। ইহা আমার মহর্ষি স্বামীর পক্ষে আনন্দদায়ক হতে পারে কিন্তু আমার কাছে নয়। কারণ সত্য স্বীকার করার জন্মগত গুণ আমি আমার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি।

বাল্মিকীর আমার চরিত্র কল্পনার উপরে ছেড়ে দেওয়ার পিছনে আরও একটি কারণও থাকতে পারে।

দশরথ পুত্র রঘুকুল তিলক শ্রীরামের অয়ন বা অভিযান সম্বন্ধে লেখার জন্য ব্রহ্মার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে বাল্মিকী "রামায়ণ" রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ রাম ও সীতার চরিত্রের বিশদ্ বর্ণনা ও মহিমা কীর্তন ছিল বাল্মিকীর উদ্দেশ্য। তা না-হলে চরিত্র চিত্রণে সিদ্ধহস্ত বাল্মিকী উর্মিলা, মাণ্ডবী, সূর্পনখা, সুগ্রীব, বালী, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির চরিত্রকে অবহেলা করতেন না। উর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি এবং আরও অনেক চরিত্র সীতার ঔজ্জ্বল্যের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরা সীতার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। বাল্মিকী তাঁদের সুখ দুঃখের পরোয়া করেন নি। অবশ্য একটি মহাকাব্যে প্রতিটি চরিত্রকে প্রাঞ্জলভাবে চিত্রিত করা সম্ভব নয়। তা করলে চব্বিশ হাজার শ্লোকের পরিবর্তে রামায়ণ চব্বিশ কোটি শ্লোকে সম্পূর্ণ হত। শুধু নায়ক নায়িকাদের জয়গান করাই মহাকাব্যের রীতি। আর একটি কারণ হচ্ছে লেখকের নিজস্ব অনুভূতি, অকপট কল্পনা, শ্রদ্ধা কাব্যে রূপায়িত হয়। জনকনন্দিনী সীতা যোগপ্রিয় পতি পরমপ্রেমিক পত্নীগত প্রাণ শ্রীরামের দ্বারা নির্বাসিতা হয়ে পিতৃতুল্য মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে

আশ্রয় লাভ করেন। মিথিলা নরেশ মহর্ষি জনকও বাল্মিকীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাল্মিকীর আশীর্বাদধন্যা জানকী দুইপুত্রের জননী হলেন। বাল্মিকীর তত্ত্বাবধানে বালকদ্বয় শিক্ষালাভ করে। বহু বছর ধরে বাল্মিকীর সহিত সীতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও ভাবের আদান প্রদান বাল্মিকীকে জানকীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সংবেদনশীল করে তোলে। জানকীও নিজের জীবনের করুণ কাহিনী প্রাঞ্জলভাবে মহর্ষি বাল্মিকীর কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। বাল্মিকীই সেই সময় ছিলেন জানকীর পিতা বন্ধু, সখা, সহায়ক ও অভয়দাতা। সীতার নির্বাসনকালের মধ্যেই বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেছেন এবং বন্ধু কন্যার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য লব-কুশকে রামায়ণ শিখিয়ে তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। সেই দৃষ্টিতে রামকাব্যে রাম-সীতার জয়গান করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আমি বাল্মিকীর কে যে তিনি আমার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে আমার ভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করবেন? আমার সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক অনুভূতির অভাবই আমার চরিত্রের রেখাচিত্রটি শুধুমাত্র অঙ্কন করেছে।

কেউ যেন একথা না ভাবেন যে আমি বাল্মিকীকে দোষারোপ করছি। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য..... ঋষ্যশৃঙ্গ..... ইত্যাদি মহর্ষিদের মধ্যে দু'জন মহর্ষির প্রতি বাল্যকাল থেকেই আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুভব করেছি। তাঁরা হলেন মহর্ষি বাল্মিকী এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র। তার কারণ এঁরা পাপের, ঘোর অরণ্যের মধ্যে একান্ত নিঃসঙ্গ পথ অতিক্রম করে পুণ্য অবং সিদ্ধির সুরভিত পবিত্র উদ্যানে উপনীত হয়েছেন। এরা দুজনেই সিদ্ধ পুরুষ। এঁরা পাপের সাথে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। কে জানে পাপের প্রতি আমার এই অহেতুক আকর্ষণ কি জন্য? আমি একা না মানুষ মাত্রেই, পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো, পাপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করি, তা আমি কি করে বলব?

সারা পৃথিবী যাঁকে আজ মহর্ষি বলে, কাল তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর পাপ-ই তাঁকে জ্ঞানালোক প্রাপ্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। শুনেছি একদা মহর্ষি বাল্মিকী ছিলেন মহাপাপী। মহাপাপী থেকে মহর্ষিতে পরিণত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। চ্যবন ঋষির পুত্র রত্নাকর পরবর্তীকালে হন মহর্ষি বাল্মিকী—পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য রামকাব্যের রচয়িতা। এক পাখির ব্যথায় যে বল্মিকীর করুণা বিগলিত হৃদয় থেকে অভিশাপের ধারা শ্লোকরূপে পৃথিবীকে মন্দ্রিত করে সেই নাকি ছিল একদিন নৃশংস দস্যু। নরসংহার ও চৌর্যবৃত্তির দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরবর্তীকালে তপস্যার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি হলেন মহর্ষি ও কবি। বাল্মিকী সম্পর্কে এইরকম এক অপপ্রচার কে কবে শুরু করেছিল আমি জানি না, কিন্তু এই অপপ্রচার সহস্রমুখে প্রচারিত হয়ে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়েছে। এ সম্পর্কে বাল্মিকীও নীরব। নিজের অতীত সম্পর্কে কুৎসা শুনেও তিনি প্রতিবাদ করেন না। কিংবা রামকাব্যের শুরুতে নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও লেখেন নি।

সম্ভবত তাঁর কবি প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু পরশ্রীকাতর ব্যক্তি এরূপ কুৎসা রটনা করেছে। অপরের নামে কুৎসা ও অন্যের অতীত সম্পর্কে আলোচনায় মানুষ যত সময় ব্যয়

করে, তার কিঞ্চিৎ অংশ যদি অপরের 'স্ব'কে চিনে অন্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করত তাহলে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হত। আমিও সেই মানুষদের মধ্যে একজন। তাই নিজের পাপের জয়গান করার পূর্বেই পৃথিবীকে তার পাপের তালিকা চেয়ে বসেছি। হে আমার পরম বিশ্বস্ত পাপ! আমি আমার চরিত্রচর্চা করার পূর্বে তোমার জয়গান করতে চাই। পাপ তুমি কত মহান। নিজে কালিমার মধ্যে নিন্দিত জীবন অতিবাহিত করে পাপীকে পুণ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত কর।

যদি চ্যবন ঋষির পুত্র রত্নাকর পাপের পথে না গিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন তাহলে তিনি মহর্ষি বাল্মিকীতে পরিণত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অগাধ বিশ্বস্ততায় রামায়ণ রচনা করতেন কি না কে জানে?

হে পাপ! পৃথিবীকে রামকাব্যের দাতা হলে তুমি! তাই আমি তোমার জয়গান করছি। আমি জানি বাল্মিকীর অতীত সম্পর্কীয় প্রচারে সত্যতা না থাকতে পারে। কিন্তু কথাটা সত্য হলেও ক্ষতি কি? বরং তা বাল্মিকীর মহানতাকেই প্রতিপাদন করছে। যদি মহর্ষি বাল্মিকী আত্মজীবনী লিখতেন, তাহলে তিনি নিজের পাপ পুণ্যকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মহান এবং বিনয়ী হওয়ায় আত্মকথা লিখে নিজের মহানতার বিজ্ঞাপন না দিয়ে লিখেছেন রামকাব্য। আমি তাঁর মতো মহান নই। তাই আমি আত্মকথা লিখতে বসেছি। এর আগে কেন জানি না বাল্মিকীর পাপ মনে পড়ছে।

আমার পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং বিশ্ব পর্যটক পৃথিবী বিখ্যাত সাংবাদিক আমার ভাই দেবর্ষি নারদ একদিন ঋষি বেশ ধারণ করে চ্যবন ঋষির আশ্রমে যান। কে জানে সত্যি কি মিথ্যা, ঋষি চ্যবনের পুত্র রত্নাকর নাকি সহজ উপায়ে সংসার পোষণ করার জন্য চুরি ডাকাতি করতেন। ক্রুরতা, হিংসা, স্বার্থপরতা রত্নাকরের ব্যক্তিত্বকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিল। অর্থলাভের জন্য নরহত্যা করতেও পিছপা হতেন না।

সেদিন অরণ্যের মধ্যে রত্নাকর কোনও পথচারীর সন্ধান পাননি। বৃক্ষশাখায় বসে পথিকের অপেক্ষায় বহু সময় কেটে যায়। আজ কি বাড়ির সবাই অনাহারে থাকবে? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভ্রাতা-ভগিনীর জন্য আজ তিনি পরমাত্মাকেও হত্যা বা লুণ্ঠন করতে দ্বিধা করবেন না।

দূর থেকে দু'জন ঋষিকে আসতে দেখে রত্নাকর গাছ থেকে নেমে ওদের আসার রাস্তায় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। সম্মুখে চলেছেন ঋষি বেশধারী প্রজাপিতা বেদগার্ভ ব্রহ্মা। এবং পশ্চাতে তাঁর শরীরের ছায়াসম আমার ভাই ব্রহ্মচারী নারদ। কালবিলম্ব না করে রত্নাকর লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ব্রহ্মার মস্তকে তীব্র আঘাত করেন। দস্যুর কপটতার চেয়ে সৃষ্টিকর্তার মায়া শক্তিশালী হওয়ায় আঘাতে ব্রহ্মার কোনও ক্ষতি হয়নি। যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর মৃত্যুকর্তা রত্নাকর হবেন কি করে?

ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা রত্নাকরকে প্রশ্ন করেন "কে তুই পাপিষ্ঠ! বিনা দোষে নিরীহ পথচারীদের জীবননাশ করার হীনবৃত্তি কেনই বা গ্রহণ করেছিস?

রত্নাকর নিজের কর্ম সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন সেইরকম স্পষ্টবক্তাও ছিলেন—

তিনি উত্তর দিলেন—"শরীর রক্ষা জীব-ধর্ম, সংসার-পালন করা মানব-ধর্ম। তাই শরীর রক্ষা এবং সংসার পালনের জন্য এই বৃত্তিকে হীন বা নিন্দনীয় বলার তুমি কে? বর্তমান আমি তোমাদের দু'জনকে হত্যা করে তোমাদের সমস্ত ধনদ্রব্য অপহরণ করে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করব।" এই বলে রত্নাকর পুনর্বার অস্ত্র উত্তোলন করলে সৌম্যদর্শন, মিষ্টভাষী, চিত্তবিনোদক নারদ মধুব স্বরে বললেন—"হে যুবক! আমাদের হত্যা করে তোমার কিছু লাভ হবে না, কারণ আমরা নির্ধন সন্ন্যাসী। তা সত্ত্বেও যদি তুমি আমাদের হত্যা করতে চাও, তাহলে আমাদের কথা আগে শোন। তারপর তোমার বিবেক যদি বলে তখন তুমি আমাদের হত্যা করবে।"

রত্নাকরের নিষ্ঠুর উত্তর—"তোমার মতো বহু ঋষিকে আমি হত্যা করেছি। তোমার কাছে যতটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট, আজ এখনও পর্যন্ত কোনও নরহত্যা করিনি, কিছু উপার্জনও হয়নি। তাই বৃথা পাণ্ডিত্য না দেখিয়ে মরার জন্য প্রস্তুত হও।"

বেদজ্ঞ নারদ শান্তস্বরে বলেন—"হে গৃহস্থ যুবক! পত্নীর সাথে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তুমি গৃহাভিমুখী হও এবং গৃহযজ্ঞ প্রজ্জ্বলিত কর। পিতা চ্যবন ঋষির যোগ্য পুত্র হও। তোমার পত্নী তোমার সুখ দুঃখের অংশীদার হন। কিন্তু একবার তুমি গিয়ে তোমার পত্নী ও সন্তানদের জিজ্ঞাসা কর যে, তারা তোমার উপার্জিত অর্থের অংশীদার হলেও তোমার পাপের অংশীদার হবেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তর শোনার পর তুমি আমাদের হত্যা করলে আমাদের ঋষি সুলভ কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে ভেবে আমরা শান্তিতে তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করব।"

রত্নাকর বিরক্ত হয়ে বলেন—"আমি পাপ পুণ্য কিছু জানি না। এতদিন আমি নরহত্যা ও হিংসাকাণ্ড দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছি। এটা যদি পাপ হত, তাহলে আমার পথরোধ করত, শক্তিরোধ হত। কিন্তু প্রতিদিন আমি নির্বিঘ্নে এবং স্বচ্ছন্দে দস্যুবৃত্তি নির্বাহ করে চলেছি, আমার কোনও ক্ষতিও হয়নি। আমার আত্মীয়স্বজন আমার উপার্জিত অর্থের জন্য আমাকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে।"

বেদগর্ভ ব্রহ্মা গম্ভীর প্রশান্ত স্বরে বলেন—"হে বিভ্রান্ত গৃহস্থ এযাবৎ তুম দুষ্ট পাপের অধীনস্থ হয়ে রয়েছ। কুৎসিৎ পাপের সেবা করে তোমার মধ্যে যে শক্তি জাত হয়েছে, তাহা তোমার অন্তরের মানব শক্তিকে হত্যা করে দানবশক্তিকে জাগরিত করেছে। তাই তুমি পাপকে পাপ বলে চিনতে পারছ না। পাপ অগ্নিসম, কখনও পথরোধ করে না, বরং লেলিহান শিখা প্রসার করে জীবকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে পরিশেষে তার সকল মানবিক গুণগুলিকে একমুঠো ভষ্মে পরিণত করে। বর্তমান তোমার ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু মনে রেখ চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসদুপায়ে তুমি যে অর্থ উপার্জন করছ তা অর্থ নয় "পাপ"। ধন অর্জন করেও যে তৃপ্ত নয় সে ধনবান নয়। ধন অর্জন করলেও তুমি নির্ধন। অজ্ঞান ও অবিদ্যার প্রভাবে তুমি মোহগ্রস্ত। যাও, স্ত্রী এবং আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করো যে তোমার দুষ্কৃতির সাহায্যে উপার্জিত অর্থ তাঁরা বিনা দ্বন্দ্বে ভোগ করলেও উক্ত দুষ্কর্মের জন্য তোমার সাথে নরক ভোগের জন্য তাঁরা প্রস্তুত কি না?"

"ওহে ঋষি! আমি তো বলবান আমার কেন নরকবাস হবে? তোমাদের নরকবাস হোক, কারণ তোমরা বলহীন ভিক্ষুক। শুধুমাত্র বেদের শ্লোক মুখস্থ করে বৃথা পাণ্ডিত্য দেখানো দুর্বল লোকেদের কাজ। অযথা আমার সময় নষ্ট করো না।

রত্নাকর পুনর্বার অস্ত্র উদ্যত করার সময়ে ব্রহ্মার বেদোচ্চারণজনিত তেজে সে দুর্বল ও ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিক হিংস্র হয়ে পুনরায় অস্ত্র উত্তোলন করলে তাহা হস্তচ্যুত হয়।

দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতময় সুরে বলেন—"যুবক! হিংসা এবং রক্তপাত শক্তির পরিচায়ক নয়। উপরন্তু দুর্বলতার পরিচায়ক। ক্ষমা এবং প্রেম বলবানের লক্ষণ। তুমি যেরূপ অসদাচরণ করছ, তাতে আমার পিতা ক্রোধান্বিত হয়ে তোমাকে ভষ্ম করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি বলবান হওয়ায় ক্ষমাশীল এবং প্রশান্ত। তিনি তোমাকে ক্ষমা করেছেন। এখন যাও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে এসো তিনি তোমার পাপের ভাগী হবেন কিনা! আমরা সত্যবদ্ধ হলাম যে, তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করব। ঋষি নির্ধন হতে পারে কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হয় না। আমাদের বিশ্বাস কর এবং সত্যের সন্ধানে যাও। তাহলেই তোমার পাপ পুণ্যের উপলব্ধি হবে।"

ঋষিদ্বয়ের কিছু অলৌকিক শক্তি আছে—একথা রত্নাকরের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং ঋষিদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে গৃহে যান।

সূর্য মধ্যগগন অতিক্রম করেছে। রত্নাকরকে শূন্য হাতে গৃহে ফিবতে দেখে তাঁর প্রাণপ্রিয়া পত্নী ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি বা কি করবেন? ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও বিরক্ত করছে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন—"আজ কি রোজগার করলে? অমি কখন খাদ্য প্রস্তুত করব? আজ ঘরে কিছু নেই জেনেও তুমি কি করে খালি হাতে এলে?" স্ত্রীর অভিযোগে রত্নাকর বিচলিত হলেন না। দৈনন্দিন সাংসারিক অভিযোগ কোনও নতুন কথা নয়। উপার্জন স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ামাত্রই স্ত্রীর ক্ষোভ প্রেমে পরিণত হয়ে যাবে। রান্নাবান্না করে যত্নসহকারে রত্নাকরকে পরিবেশন করবে। ঋষিদের প্রভাবে হয়তো রত্নাকরের চিত্ত স্থির ছিল। অবিচলিত কণ্ঠে তিনি বলেন—"আজ দু'জন ঋষিকে হত্যা করলে কিছু উপার্জন হবে। কিন্তু ঋষি হত্যা মহাপাপ বলে তাঁরা বললেন। অবশ্য এর পূর্বে আমি বহু ঋষিকে হত্যা করেছি। তার মানে বহু পাপ অর্জন করেছি। এত পাপ আমি একা ভোগ করব কেন? আমার অর্থে যদি তোমরা সকলে অংশীদার, তাহলে আমার পাপের অংশও তোমাদের নেওয়ার কথা। যদি এতে সম্মত হও তাহলে এখনই ঋষিদের হত্যা করে তাদের সর্বস্ব এনে তোমাকে দেব। এইকথা জিজ্ঞাসা করার জন্য এখানে এলাম।"

স্ত্রী আশ্চর্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হলেন। ভাবলেন স্বামীর মতিভ্রম হয়েছে, না হলে নির্বোধের মতো একথা জিজ্ঞাসা করতেন না। একথা কে না জানে যে পাপ যার যার নিজের। রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—"আজ সকালবেলায় খালি পেটে কিছু নেশা করেছ নাকি? পাঁচ বছরের অবোধ শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেও সে বলে দেবে মানুষ নিজের কর্মফল ভোগ করে। পাপার্জিত অর্থ ভাগ করে নেওয়া যাবে, কিন্তু পাপ ভাগ করা

যাবে না। আমি ইচ্ছা করলেও তোমার পাপের ফল ভোগ করতে পারব না। কেনই বা ভোগ করব? আমি তো কখনও নরহত্যা করিনি, দস্যুবৃত্তি করিনি। তাহলে আমার কেন পাপ হবে?

স্ত্রীর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন রত্নাকর। পরক্ষণেই ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—'আমি মানুষ মেরেছি সত্যি, কিন্তু কার জন্য মেরেছি? তোমাদের ভরণপোষণের জন্য। তাই তুমিও আমার পাপের ভাগী হতে বাধ্য। যদি তুমি এতে সম্মত না হও, তাহলে আমি আজ থেকে আর নরহত্যা করব না। তারপর তোমরা কিভাবে বাঁচবে সে কথা তুমি জান।' ক্ষুব্ধ হলেন পত্নী। বলেন—"আজ সেই ঋষিদ্বয় তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। যে পরিবারের সৃষ্টিকর্তা, সে পরিবারের পালনকর্তাও। যদি তুমি তোমার কর্তব্য না কর, তাহলে পরিবারের বিনাশজনিত পাপের ভাগী তুমিই হবে। তাই কিভাবে তুমি পরিবারের ভরণপোষণ করবে সেটা তোমার ওপরেই নির্ভর করে। ডান হাতের পাপ বাম হাত নেয় না। একথা কি তুমি জান না? যদি তুমি ডান হাত আগুনের মধ্যে দাও, তোমার বাম হাত দগ্ধ হবে কি? ব্যথিত রত্নাকর একে একে পুত্রকন্যাদের একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সকলের এই উত্তর—' পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার। তুমি কিভাবে অর্থ উপার্জন করবে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। নরহত্যা করার সময়ে তোমার হৃদয়ই নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। তাই পাপ ও পাপের পরিণাম উভয়ই তোমার একান্ত নিজস্ব। তোমার পাপার্জিত অর্থ আমাদের পেটে খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু পাপ তোমার সঞ্চয়ে রয়েছে। পাপার্জিত অর্থ ব্যয় হয়ে যায়, কিন্তু পাপ ব্যয় হয় না।"।

ভয়ে, দুঃখে বিস্ময়ে কাতর রত্নাকর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সন্তানদের প্রশ্ন করেন—"কিন্তু, আমি তোমাদের ভালোবাসি, তোমাদের সুখে রাখার জন্য আমার পাপ বৃদ্ধি হয়েছে। সেই পাপের সামান্য কিছুও তোমরা নেবে না?"

"না-না—তা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে উপার্জনের অন্য উপায় থাকা সত্ত্বেও তুমি এই নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন করেছ কেন? তাতে আমরা অংশীদার হব কেন? জান, তোমার কর্মের জন্য আমরাও সমাজে নিন্দিত, লাঞ্ছিত! সন্তানের ভরণপোষণ পিতার ধর্ম। অসদুপায়ে যদি তুমি পিতৃধর্ম পালন কর, সে অধর্ম তোমার। তার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ইচ্ছা করলেও তোমার পাপের ফল আমরা ভোগ করব না।" ভয়ে ম্রিয়মান রত্নাকর পুনর্বার স্ত্রীকে প্রশ্ন করে—"তুমি আমার সহধর্মিনী। আমার ধর্ম যদি তোমার, আমার অধর্ম এবং পাপও তোমার হওয়ার কথা। তুমি আমার পাপভাগিনী হবে কি না?"

"নিজ নিজ মৃত্যুসম পাপও একান্ত নিজস্ব। আমি কি তোমার মৃত্যুতে ভাগীদার হতে পারব। শরীরের ক্ষতের মতো কর্ম যার পাপ তার। একের শরীরের ক্ষত অপরকে কষ্ট দিতে দেখছে কি? তুমি আহত রক্তাক্ত হয়ে ফিরলে শরীরের কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হয়। আমি সহধর্মিনী হলেও তোমার শরীরের কষ্টভোগ করি না। আজ উপার্জন না করে এসব বাচালতা করছ কেন?" স্ত্রী নিষ্ঠুরভাবে সত্য প্রকাশ করেন। রত্নাকরের কাছে স্ত্রীর মুখ আর সুন্দর লাগল না—মনে হল ভয়ঙ্কর কুৎসিত। সন্তানদেরও নিষ্পাপ মনে হল না—তারা যেন

স্বার্থপর। রত্নাকর ভয়ে কাতর। মনে ভাবেন—সংসারে সব মানুষ বড় একা। ফিরে এসে বেদগর্ভ আদিদেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। জোড়হস্তে অনুনয় করেন—"হে পুণ্যাত্মা, তুমি যেই হও দয়া করে আমাকে বল, কোন উপায় অবলম্বন করলে মানুষকে তীব্র যাতনাপূর্ণ নরকে যেতে হবে না। নবকবাস ছাড়া পাপীর কি অন্য গতি নেই?"

সর্ববেদময় স্বরূপ, মস্ত জীবজগতের মধ্যে বর্ষিয়ান ব্রহ্মা প্রশান্তকণ্ঠে বললেন—"রত্নাকর! ইহলোকে মানুষ যে সকল পাপ করে, যদি ইহলোকেই তার প্রায়শ্চিত্ত না করে বা পাপকর্ম থেকে বিরত না হয় তাহলে মৃত্যুর পর তাকে বিভীষিকাময় নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।"

রত্নাকর পুনর্বার অনুনয় করেন—"হে মহাশয়! দয়া করে প্রায়শ্চিত্ত এবং পাপ নিবৃত্তির পথ আমাকে বলে দিন।"

করুণা বিগলিত কণ্ঠে ব্রহ্মা উপদেশ দেন—"রত্নাকর! শুধুমাত্র পাপকর্ম থেকে নিবৃত্তি হলেও প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কারণ মানুষের মন এমন বাসনাযুক্ত যে একটি পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে সে আর একটি পাপে লিপ্ত হয়। জীবমাত্রেই ভুল করে। পাপ না করে কে আছে? যে পাপ করে না সে মানুষ নয় দেবতা। কিন্তু পাপ করে যে পশ্চাতাপ করে না সে মানুষ নয় দানব। পাপ করে যে অপরাধ স্বীকার করে—প্রায়শ্চিত্ত করে এবং পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার প্রয়াস করে, সে-ই প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য। আমি অত্যন্ত খুশি যে তুমি একজন স্বাভাবিক মানুষ। তাই অপরাধ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করার ইচ্ছা করলেই পাপক্ষয় হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তার হৃদয়ে পাপবাসনা প্রজ্জ্বলিত থাকে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে পাপ বাসনা নষ্ট হয় না।"

রত্নাকর নিরাশ হয়ে বিবশকণ্ঠে বলেন—"হে প্রভু! আমি তো মহামূর্খ। এ জন্মে আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ কি সম্ভব হবে? অর্থাৎ আমাকে নরকভোগ করতেই হবে।" এই বলে সরল শিশুর মতো রত্নাকর কাঁদতে থাকে।

মধুর স্বরে তাকে সান্ত্বনা দেন মহর্ষি নারদ—"রত্নাকর! জ্ঞানলাভ জাতি, ধর্ম, বয়স, স্ত্রী, পুরুষ, রাজা-প্রজা, দেবতা, দানব ইত্যাদি বাধা বন্ধন মানে না। যে ব্যক্তি শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করে জনকল্যাণকর কাজে ব্রতী হয়, সে ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে পাপ বাসনা থেকে মুক্ত হয়। মন বাসনামুক্ত হওয়াই তো তত্ত্বজ্ঞান! তপস্যা, ব্রহ্মাচর্য, ইন্দ্রিয়দমন, স্থিরমতি, দান, সত্য, অন্তরের পবিত্রতা, যম (অহিংসা) ও নিয়ম (জপ) ইত্যাদি সাধনা করার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অতীতের সকল পাপকে বিনষ্ট করতে সে সমর্থ হতে পারে। কিন্তু ভগবৎ বিশ্বাস ব্যতীত একার্য সম্ভব হয় না। তাই ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ মার্গ।"

"সেই পথ অনুসরণ করব প্রভু। কারণ সংসারের গতি দেখে বিষয় বাসনার প্রতি আমার মনে বিরাগ জন্মেছে।" রত্নাকর একথা বলামাত্রেই নারদ পরিহাসছলে বলেন—"কিন্তু

ভক্তিমার্গও এত সরল ও সুগম নয়। এই পথে অনেক শত্রু তোমাকে বাধা দেবে। সেই শত্রুদের জয় করাও সহজসাধ্য নয়।

রত্নাকর দৃঢ়স্বরে বলেন—"যে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করেছে তার শত্রু কোথা থেকে আসবে? আত্মীয় স্বজনেরাই শত্রুতে পরিণত হয় স্বার্থহানি হলে। হে মহাত্মা! আজ আমার কোনও বন্ধু তথা শত্রুও নেই। আমি আজ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।"

আদিদেব ব্রহ্মা হাসতে হাসতে বলেন—"এটা তোমার অজ্ঞানতাই প্রকাশ করছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল পরমাত্মাই হচ্ছেন নিঃসঙ্গ এবং বন্ধু-শত্রু শূন্য। মানুষমাত্রেই বন্ধু তথা শত্রু পরিবেষ্টিত। মানুষের একমাত্র বন্ধু পরমেশ্বর। তিনি কখনও কোনও পরিস্থিতিতে শত্রুতে পরিণত হন না। যখন মানুষের ভাগ্য প্রতিকূল হয়, তখন মানুষ পরমাত্মাকে শত্রু মনে করে। তা হল ভ্রম। পরমাত্মা যখন যা করেন প্রাণীর মঙ্গলের জন্যই করেন। মানুষ সে কথা বুঝতে পারে না বলে অশেষ কষ্ট ভোগ করে। তাই রত্নাকর, তুমি বন্ধুহীন বা শত্রুহীন নও।"

"আমার শত্রু কে? আমি তো সংসারসহ তাদের ত্যাগ করেছি। সুতরাং তারা আমার কি ক্ষতি করতে পারে? রত্নাকরের দম্ভোক্তিতে নারদ হেসে ওঠেন। পরিহাস ভরা কণ্ঠে বলেন—"তোমার শত্রু তোমার নিজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে; তারা প্রতিমুহূর্তে তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান মার্গ ও ধর্মমার্গ হতে বিচ্যুত করা জন্য ক্রিয়াশীল। তাই তুমি নিজেই নিজের শত্রু। বহিঃশত্রুকে পরাজিত করা সহজ। কিন্তু নিজের অন্তরের শত্রুকে পরাজিত করা সহজসাধ্য নয়। তাই আত্মজ্ঞান লাভ হলে অন্তরস্থ শত্রু পরাজিত হয় ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ. মাৎসর্য—এই ছয়টি রিপু হল মানুষের প্রধান শত্রু। এদের দমন করতে পারলে মানুষ দুঃখমুক্ত তথা শাপমুক্ত হতে পারে। এ পর্যন্ত তুমি যত পাপ করেছ, তা তোমার পুত্রকন্যা ও পত্নীর প্ররোচনায় করনি, করেছ তোমার অন্তরস্থ ষড়রিপুর প্ররোচনায়, তাই প্রত্যেক পাপ যেমন ব্যক্তিগত প্রতিটি পুণ্যও ব্যক্তিগত। তুমি অকারণেই তোমার সন্তান ও পত্নীর বিরুদ্ধে মনে বিদ্বেষভাব পোষণ করছ। একবার নিজের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রকৃত শত্রুকে চিনতে পারবে এবং ঈশ্বরের মহিমায় পাপমুক্ত হবে।" রত্নাকর নিজের অন্তরে না তাকিয়ে ব্রহ্মার দিকে তাকালেন। কাতরকণ্ঠে অনুনয় করেন—"আমি মহা অজ্ঞানী, ঈশ্বরের নাম জানি না। মহিমা বুঝব কিভাবে? দয়া করে ঈশ্বরের মহিমা বুঝিয়ে আমাকে পাপমুক্ত করুন।"

লোকপাল ব্রহ্মা নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে বললেন—"বৎস! স্বয়ং ব্রহ্মা নিজের যোগসিদ্ধ চেতনা সত্ত্বেও একহাজার দিব্যবর্ষ তপস্যা করে ঈশ্বরের মহিমা জানতে পারেন নি। ঈশ্বরের মায়াশক্তি অনন্ত। এই মায়াশক্তিই সংসারীদের মনে মোহ সৃষ্টি করে। সেই মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে মুক্তস্বরূপ আত্মাও বন্ধন প্রাপ্ত হয়। মোহ-ই সমস্ত ক্লেশের কারণ। যখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরমাত্মার কাছে অবস্থান করে, তার সমস্ত ক্লেশ দূর হয়। তুমি নদীতে স্নান করে এস। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কিভাবে ঈশ্বরের নাম জপ করতে হয়।"

কালবিলম্ব না করে রত্নাকর দ্রুতগতিতে নদীর দিকে যান। যে তীরে নদী শুষ্ক মনে হচ্ছে, সেই তীরের নিকটে পৌঁছে নদী শুষ্কপ্রায় দেখে ফিরে এলেন। ব্রহ্মাকে বললেন—"মহাভাগ! নদী, জল শূন্য হয়ে গেল। পরম করুণাময় ব্রহ্মা জানতে পারলেন যে রত্নাকর হলেন ত্রি-জগতের সবচেয়ে বড় পাপী। তাঁর নিজের পাপই তাঁর চিত্তকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাই পূর্ণগর্ভা নদীও তার শূন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক।

দয়াপরবশ হয়ে রত্নাকরের কানে মহামন্ত্র দান করে আদেশ দিলেন—"তুমি এইখানে বসে মহামন্ত্র জপ কর। আমরা পুনরায় আসা পর্যন্ত ঈশ্বর ব্যতীত ধ্যান যেন অন্যত্র তিরোহিত না হয়।"

কায়মনোবাক্যে জগতের কল্যাণ কামনা করে হিংসারহিত চিত্তে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগলেন রত্নাকর। ব্রহ্মা এবং নারদ ব্রহ্মালোকে চলে যাওয়ার পর একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে রত্নাকরের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। শরীর থেকেও তিনি দেহাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। তাঁর শরীর নিশ্চল হয়ে থাকার জন্য তাঁকে ঘিরে উইপোকা বাসা বাঁধে। ধীরে ধীরে উইঢিপি তাঁর শরীর গ্রাস করে, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ চেতনা দৃঢ় ও অটুট থাকে। উইঢিপি ক্রমশ তাঁর মাথা ছড়িয়ে উঁচু হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে শুধুমাত্র উইঢিপিটাই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তার মধ্য থেকে মহামন্ত্র ধ্বনিত হয়। উইঢিপির ওপর নানা প্রকার লতাগুল্ম ঢেকে যাওয়ার জন্য রত্নাকরের অস্তিত্ব পথচারীদের চোখে পড়ে না। ব্রহ্মা রত্নাকরকে যে মহামন্ত্র শিখিয়েছিলেন রত্নাকর তা উচ্চারণ করতে পারেননি। তবে তিনি বুঝেছিলেন যে, সেই মহামন্ত্র হল জগত-কল্যাণকারী ঈশ্বরের কাছে, নিজের জন্য নয় জগতবাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা। তিনি নিজের ভাষায় নিষ্কপট হৃদয়ে প্রেমমন্ত্র জপ করতে থাকেন—"জয় জগৎ, জয় প্রেম, জয় করুণা।"

এর মধ্যে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জগতের কল্যাণ কামনায় উইঢিপির মধ্যে রত্নাকরের যৌবন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাঁর হৃদয়ের হিংসা, ক্রোধ, ক্রুরতা, স্বার্থপরতা লোপ পেয়েছিল। নিজের ওপর গড়ে ওঠা উইঢিপিতে গজিয়ে ওঠা গাছপালারও তিনি প্রতিরোধ করেননি। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে স্বীকার করে পবিত্র চিত্তে ধ্যানস্থ ছিলেন। তাঁর শরীরের ওপর কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ ইত্যাদি বিচরণ করলেও তিনি কারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। তিনি বিনম্র চিত্তে জগতকল্যাণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন এবং ক্রমশ পাপ মুক্ত হচ্ছিলেন।

ব্রহ্মার এক মুহূর্ত সমান পার্থিব জগতের অনেকবছর পর রত্নাকরের স্মৃতি পুনরায় ব্রহ্মাকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে আনে। রত্নাকর পরিস্থিতির চাপে দস্যুবৃত্তি করলেও তিনি ছিলেন নিষ্কপট। তাই ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করে রত্নাকর সেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে মহামন্ত্র জপ করতে থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা রত্নাকরকে খুঁজে খুঁজে নিরাশ, রত্নাকর কি তাহলে পুনরায় দস্যুবৃত্তি শুরু করেছেন। তবে সে মহাধূর্ত!

ব্রহ্মা ইতঃস্তত বিচরণ করতে থাকেন। হঠাৎ একটি উইঢিপি দেখতে পান সেখানে তাঁর

দৃষ্টিগোচর হয় এক বিচিত্র দৃশ্য। উইঢিপির ওপর কীট-পতঙ্গ, পাখির ছানা, সরীসৃপ একত্রে অবস্থান করছে। এটা কিভাবে সম্ভব? সরীসৃপও এখানে অহিংস ও শান্তিপ্রিয় মনে হচ্ছে। ব্রহ্মার মনে পড়ল এইখানেই তিনি রত্নাকরকে নাম-জপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উইঢিপির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করার সময় উইঢিপির গায়ে দুটি গর্ত তাঁর চোখে পড়ে, তিনি দেখেন গর্তের মধ্যে দুটি উজ্জ্বল মণি জ্বলজ্বল করছে, তাহলে কি বিষধর সাপ! কিন্তু গর্তের ভিতর থেকে সাপের ফোঁস-ফোঁস শব্দের পরিবর্তে মনোমুগ্ধকারী মন্ত্রধ্বনি বাঁশীর সুরের মতো গুঞ্জরিত হচ্ছিল। রত্নাকর এইমাত্র চোখ খুলে তাকিয়েছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ গুণরাশিতে বিভূষিত রত্নাকরের চোখের জ্যোতি ফণীরাজের মণির মতো গর্তের ভিতর আলোকিত করেছে। দস্যু রত্নাকর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মহর্ষি বাল্মিকীতে পরিণত হয়েছে। বল্মীক দ্বারা তাঁর পূর্ব পাপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে পুণ্যের পত্রপুষ্পে তার ব্যক্তিত্ব সজ্জিত হয়েছিল। মন্ত্রোচ্চারণের মতো পবিত্রস্বরে ব্রহ্মা সম্বোধন করলেন—"ওঠো মহর্ষি বাল্মিকী! তোমার পাপ মোচন হয়েছে, তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছ, আজ থেকে তুমি মহর্ষি বাল্মিকী রূপে পরিচিত হবে, কারণ বল্মীক থেকে তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। পাপের পুঁজি বিনিয়োগ করে তুমি পুণ্যের ফল লাভ করেছ। এই উত্তরণ জগতে অনন্য, তুমি ঋষিকুলের অগ্রগণ্য।"

নিজেকে গোপন না রেখে ব্রহ্মা বাল্মিকীর নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন এবং বারংবার আশীর্বাদ করে হংসাকার ব্যোমযানে চেপে আকাশপথে ব্রহ্মালোকে ফিরে গেলেন। উইঢিপির ভিতর থেকে শ্মশ্রুজটা সম্বলিত দিব্যতেজযুক্ত বাল্মিকী বেরিয়ে এলেন। তমসা নদীর তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জগতের কল্যাণের জন্য সর্বদা বিশ্বস্রষ্টার নাম জপ করতে লাগলেন বাল্মিকী।

বাল্মিকীর অতীত সম্পর্কে এইরকম একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হয়। পিতা ব্রহ্মা এবং ভাই নারদকে একবার এইকথার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে দু'জনেই স্মিত হেসে নীরব রইলেন। ভাই-এর কাছে জিদ্ করায় ভাই বলেছিলেন—"প্রত্যেক মানুষ সাধারণ আবার অসাধারণ। মহান ব্যক্তিদের অতীতের সাথে এইরকম কলঙ্কিত কাহিনী অল্পবিস্তর যুক্ত করা হয়। তা সত্য হতে পারে—মিথ্যাও হতে পারে। কিংবা সামান্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি কালিমা-কলুষ থেকে উত্থিত হয়ে মহান হলে তার মহানতা অধিক প্রকট হবে বলে সম্ভবত এইরকম করা হয়। তাই এরকম কাহিনী সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে তার জয়গানই করা হয়। মানুষ যেকোনও পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। সেইজন্যই সম্ভবত বাল্মিকীর অতীতের সাথে এইরকম পাপের সংযোগ করা হয়েছে। যাই হোক কারও পাপের হিসাব না করে পুণ্যের জয়গান করলে নিজেরই লাভ হয়। যে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে, তার পাপের চর্চা করলে তার ক্ষতি হয় না—বরং যে চর্চা করে তারই ক্ষতি। অবশ্য একথা সত্যি যে, বাল্মিকী প্রথমে বেদ বিরোধী ছিলেন। নিজের জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বেদের মহিমাকে হেয় জ্ঞান করতেন। তাই বেদবিশ্বাসী মুনিগণ

তাঁকে দাস বা দস্যু আখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বেদপ্রেমী হওয়ায় সেই মুনিগণ তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দেন। দাস বা দস্যু নামে অভিহিত মানবগোষ্ঠী দস্যুবৃত্তি করার জন্য 'দস্যু' নামে অভিহিত হয়নি। বেদ বিরোধীদের মুনি-ঋষিরা ঐ নামে সম্বোধন করতেন ও পরবর্তীকালে এর ভুল অর্থ করা হয়। তাই দস্যু রত্নাকর হয় তো দস্যুবৃত্তি নাও করে থাকতে পারেন। যাইহোক, বাল্মিকীর অতীত যদি তোকে এইভাবে আলোড়িত করছে, এতে অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে, পাপের মুখোমুখি হয়ে উচিত জবাব দেওয়ার মনোবল তুই বাল্মিকীর জীবনগাথা থেকে পেয়েছিস। প্রত্যেক মানুষ এক একজন রত্নাকর এবং প্রত্যেক রত্নাকরের মধ্যে বাল্মিকী সন্ত্রস্তভাবে থাকে—নিজে নিজেকে চিনতে পারে না। সেই চেনার দৃষ্টি পেয়ে গেলেই প্রত্যেক মানুষের বাল্মিকীতে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। এমনকি তোর ভিতেরও একটি বাল্মিকী আছে।"

"কিন্তু আমি তো রত্নাকর নয়"—চকিত প্রশ্ন আমার। "রত্নাকরও জন্ম থেকে রত্নাকর ছিল না। পরিস্থিতির চাপে সে রত্নাকর হয়ে থাকবে।" রহস্যময়ভাবে হেসে বললেন ভাই! যেন আমার আগত পাপকে তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন।

সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি সকালে পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে। পৃথিবী দেখে গত রাত্রের না ফোটা কুঁড়িটি আজ অধর মেলে হাসছে। একটি একটি করে পাপড়ি মেলার কৃচ্ছ্রসাধনা কেউ দেখে না। সিদ্ধি ও সুখ সূর্যালোকের মতো সবাই দেখতে পায়। কিন্তু সেই সুখের পিছনে থা⋯ যন্ত্রণা ও সিদ্ধির পিছনে থাকা সাধনার আভাসটুকু জগৎ জানে আসল স্বরূপ জগৎ জানে না। জানে সে-ই, যে একটা একটা পাপড়ি মেলার কৃচ্ছ্রসাধনা করেছে, রাত্রের অন্ধকারকে বহন করে প্রভাতের দিকে এগিয়েছে।

রত্নাকর মহর্ষি বাল্মিকীতে পরিণত হলেন। ব্রহ্মার একটা মুহূর্ত ব্রহ্মার জন্য কিছু নয়, কিন্তু দস্যু রত্নাকরের মতো একজন বেদবিরোধী মর্তের মানুষের জন্য সেটা ছিল বহু বর্ষব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনা, সমগ্র জীবন ও যৌবনের পূর্ণাহূতি। যাতনা, যন্ত্রণা, নিন্দা, কুৎসা, নিরাশা, হতাশা, নিঃসঙ্গতা প্রকৃতির প্রতিকূলতা এবং নিজ ইন্দ্রিয়সকলের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলশ্রুতি রত্নাকরের সিদ্ধিলাভ। সে কথা রত্নাকর ব্যতীত আর কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। যদি রত্নাকর তাঁর আত্মজীবনী লিখতেন জগৎ স্তব্ধ হয়ে যেত সাধনা ও তপস্যার পরাকাষ্ঠা দেখে। আমিও সে কথা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারব না, কারণ একজনের অনুভব ও অনুভূতিকে আর একজনের পক্ষে সাকার করা সম্ভব নয়। যদিও কিছু পরিমাণে সম্ভব হয়, তা শুধু মহর্ষি বাল্মিকীর মতো প্রতিভাবান কাব্যকারের পক্ষে সম্ভব। আমিও তুচ্ছ মানুষ! কাব্যকার হওয়ার দৈবকৃপাও আমি লাভ করিনি। যা পেয়েছেন মহর্ষি বাল্মিকী। বাল্মিকীর আলোচিত অতীতে যদি কিছু সত্য থাকে তাহলে তাঁর নিষ্ঠ ও সাধনার জন্য আমি তাঁকে শতকোটি প্রণাম জানাচ্ছি। অথচ তাঁর সাধনার প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা থেকে বিরত হচ্ছি। বাল্মিকীর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যা শুনেছি, তাই লিখছি।

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে গঙ্গা-তমসার সঙ্গমস্থলের নিকট আশ্রম স্থাপন করে। অবশিষ্ট তপস্বী জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন বাল্মিকী।

স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া, তমসা, যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল হতে দশ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সিরসার নিকট গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। পুণ্যসলিলা যমুনা নদীর দক্ষিণ পূর্ব এবং তমসা নদীর মধ্যবর্তী চিত্রকূট পর্বতমালা রাষ্ট্ররঞ্জক মহর্ষি বল্মিকীর অত্যন্ত প্রিয়স্থান। জীবনের বহুসময় তিনি চিত্রকূট পর্বতের ঘন অরণ্যের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন।

তমসা নদীর উৎপত্তিস্থলের পঞ্চদশ ক্রোশ পরিধির মধ্যে নর্মদা,শোন, মন্দাকিনী, মহানদী ইত্যাদি পবিত্র নদীসমূহ বাল্মিকীর আশ্রম এবং চিত্রকূট পর্বতমালার পাদভূমিকে চিরসবুজ করেছে।

বাল্মিকীর শিষ্য মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে। যমুনা নদী পার হয়ে তমসা তীরে বাল্মিকীর আশ্রমে যাওয়া অত্যন্ত সহজ। কারণ জলপথে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম থেকে তমসা-গঙ্গার সঙ্গমস্থল সিরসা মাত্র দশ ক্রোশ দূরত্বে।

অনতিদূরে গঙ্গানদী প্রবাহিত হলেও প্রতিদিন ভোরে তমসা নদীতে স্নান করে প্রকৃতির মনোরম শোভায় তিনি হারিয়ে যেতেন। গঙ্গানদীর সঙ্গম এবং তমসা নদীর সঙ্গমস্থলের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বাল্মিকীর আশ্রম নানাবিধ বৃক্ষলতা, ফল, পুষ্প, শোভিত কানন বলে দূর থেকে মনে হত। গঙ্গা, যমুনা, তমসা, নর্মদা, শোন, মহানদী ইত্যাদি চিত্রকূট পর্বতশ্রেণী এবং অন্যান্য শৈলরাজি স্বচ্ছ প্রস্রবণ, পর্বতের পাদদেশে গভীর অরণ্য এবং তার মধ্যে শাল, শিশু, অর্জুন, কদম, বট, অশ্বত্থ, অশোক, আম, জাম, আমলকি, চাঁপা, চন্দনসহ অসংখ্য অনামিকা ফল-ফুল ও বৃক্ষলতা আশ্রমকে আলিঙ্গন করে নিজে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে ঋষিদের শ্যামল সৌন্দর্য ও শীতলছায়া দান করে তাঁদের সাত্ত্বিক আনন্দ প্রদান করত।

বৃক্ষের সাথে কেবল লতা নয়, বৃক্ষও নিরভিমান হয়ে বৃক্ষের সাথে শাখা প্রশাখা জড়িয়ে সুহৃৎসুলভ আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ার ভ্রম সৃষ্টি করত।

বাল্মিকী, ভরদ্বাজ এবং অন্যান্য মুনিকুমারদের কণ্ঠনিঃসৃত প্রণব ওঁকার ধ্বনিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অরণ্যের হিংস্র পশুরাও শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাঘ, সিংহ, ভালুক, বরাহ, হরিণ, শৃগাল, নকুল, ছাগল, মেষ ইত্যাদি পশু এবং হাঁস, সারস, ক্রৌঞ্চ, কুক্কুট, পানকৌড়ি, শুকসারী, শকুন, ময়ূর, কপোত এই পক্ষীসকল অরণ্যে একত্রে বন্ধুসম নির্ভয়ে বিচরণ করত। হিংস্র পশুরা হিংসা ভুলে হৃষ্টচিত্তে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত। অবিরাম পরমাত্মার পবিত্র নাম গানে সমগ্র পরিবেশে এক মঙ্গলময় বাতাবরণ সৃষ্টি করত। প্রতিদিন প্রত্যূষে সূর্যদেব তমসা নদীর জলে স্নান করে পৃথিবীর তমসা নাশ করতেন। প্রতি সন্ধ্যায় গোধূলির আবিরে চিত্রকূট পর্বতমালা ও তমসার জলে লিখে দিত শান্তি-মৈত্রীর আলেখ্য। মনে হত, বাল্মিকীর আশ্রমে ষড়ঋতু একই সঙ্গে বিরাজ করছে। ঋতুগণ যেন সেই পবিত্র বনভূমিকে ত্যাগ করে যেতে নারাজ। সেই নৈসর্গিক পরিবেশে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করে দিব্যজ্ঞান লাভ করার পর মহর্ষি বাল্মিকী জগতের কল্যাণে নিজ শক্তিকে নিয়োজিত করার জন্য অন্তরের মধ্যে কোনো রহস্যময় সত্তার নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন।

প্রেম ও করুণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যার হৃদয় প্রেমময়, তার হৃদয় নিশ্চয় করুণায় আর্দ্র হয়। প্রেম এবং করুণা মানুষকে সামান্য থেকে অসামান্য করে। প্রেম দেয় আনন্দ। করুণা থেকে সৃষ্টি হয় অপার্থিব শোক। শোকের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের কেউ নেই। আবার শোকের চেয়ে বড় বন্ধুও কেউ নেই, শোক মানুষকে শক্তিহীন করে, আবার শোকমুক্তির চেষ্টা এনে দেয় রচনাত্মক শক্তি—হে প্রেম! তোমার জয় হোক। হে করুণা তোমাকে জানাই প্রণাম।

প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু। তমসার স্বচ্ছ জলরাশি দেখে বাল্মিকীর ভাবনা চন্দ্রোদয়ের মতো উন্মুক্ত হচ্ছে। হৃদয়কে শান্ত করার পূর্বে তিনি তমসার জলে স্নান করার সিদ্ধান্ত নেন। তমসার তীরবর্তী ঘন অরণ্যের শোভা অবর্ণনীয়। স্নানের পূর্বে অরণ্যের শ্যামল সুষমার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গেলেন বাল্মিকী। সেইসময় জিতেন্দ্রিয় মুনি দেখেন এক ক্রৌঞ্চ মিথুন প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে সঙ্গমরত। পক্ষী-যুগলের পবিত্র প্রেমলীলা ঋষির প্রাণে নির্মল আনন্দ সৃষ্টি করে। কি বিচিত্র ও আনন্দময় সৃষ্টিলীলা! কাম-বাসনা এবং ইন্দ্রিয়সুখ জীবের বন্ধনের কারণ, আবার ইন্দ্রিয়সুখ ব্যতীত সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। প্রেমহীন কাম পাশবিক আনন্দ দেয়, কিন্তু প্রেমপাশে আবদ্ধ প্রেমী-যুগলের কামক্রীড়া সৃষ্টিচক্রের মধুর মূর্চ্ছনা তুলে স্বর্গীয় আনন্দে দুটি শরীর, মন এবং আত্মাকে একাকার করে দেয়। সঙ্গমরত ক্রৌঞ্চ মিথুনের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পবিত্র উদ্দেশ্যকে বাল্মিকী যখন প্রণাম জানাচ্ছিলেন অকস্মাৎ এক অজানা ব্যাধের শরাঘাতে পুরুষ পক্ষীটি আহত হয়ে প্রেমিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পরমুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করে। কামবিচ্যুত প্রেমিক ক্রৌঞ্চের মৃত শরীরের দিকে তাকিয়ে অসহায়া বিরহিনী প্রেয়সী ক্রৌঞ্চী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকে। প্রেমের আনন্দ পরিণত হয় করুণ বিরহে। মহামুনি বাল্মিকীর প্রেম-বিহ্বল হৃদয় সহসা করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। ক্রৌঞ্চীর শোক তাঁর হৃদয়কে শোকাভিভূত করে। শোকচ্ছাসে করুণা বিগলিত হৃদয় থেকে অনায়াসে উচ্চারিত হয়—

"মাঃ নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম গমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যদ্ ক্রৌঞ্চ মিথুনা দেকমবধাঃ কাম বিমোহিতং।"

নিজমুখে উচ্চারিত শব্দসমূহের অর্থ করে নিজে বিস্মিত এবং স্তব্ধ হলেন বাল্মিকী।

"রে নিষাদ এই কামমোহিত ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে পুরুষ পক্ষীটিকে হত্যা করে তুই যে অপরাধ করেছিস, তার শাস্তিস্বরূপ আজ থেকে তুই কোথাও কোনও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবি না।"

নিষ্ঠুর ব্যাধের সেই অন্যায় কাজে বাল্মিকী এতই শোকাবিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি নিজের অজ্ঞাতেই ব্যাধকে অভিশাপ দেন। অথচ ব্যাধ বাল্মিকীর কোনও ক্ষতি করেনি সে তার নিজের কাজই করেছে। তাহলে বাল্মিকী কেন এত ব্যথিত হলেন? ক্রৌঞ্চ মিথুন কি আশ্রমের পোষা পাখি ছিল, না বাল্মিকীর বিশেষ প্রিয়ভাজন ছিল? না তাও নয়

আকাশ, বিশাল অরণ্যে সম্পর্কবিহীন দু'টি বিহঙ্গ। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করল। এতে বাল্মিকীর শোক সৃষ্টি হল কেন?

তাহলে করুনা কি শোকের জন্মদাত্রী এবং শোক শ্লোকের জন্মদাত্রী!

শোকাভিভূত বাল্মিকী সারাদিন সেই শ্লোকগুলি উচ্চারণ করতে থাকেন। তমসার স্বচ্ছ শীতল জলে স্নান করেও তাঁর শোক প্রশমিত হল না! তাঁর চোখের সামনে বারংবার ভেসে ওঠে কামমোহিত সঙ্গমরত ক্রৌঞ্চ মিথুন এবং পুরুষ ক্রৌঞ্চের রক্তাক্ত শরীর ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ক্রৌঞ্চীর মর্মস্পর্শী বিলাপ। সেইসময় শিষ্য ভরদ্বাজও বাল্মিকীর মুখ নিঃসৃত শব্দসমূহ কণ্ঠস্থ করে চমৎকৃত হন। তখনই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মাকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন বাল্মিকী। বেদোচ্চারণ করার পরিবর্তে পুনর্বার নিষাদের প্রতি উদ্দিষ্ট অভিশাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করতে থাকেন। পরমুহূর্তেই প্রকৃতিস্থ হয়ে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—"বেদপতি! আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার বন্দনা করার পরিবর্তে আমি একি উচ্চারণ করছি। কামমোহিত এক ক্রৌঞ্চের হত্যা এবং ক্রৌঞ্চীর বিলাপে শোকাভিভূত হয়ে আমার মুখ থেকে ছন্দোবদ্ধ সমান অক্ষর-বিশিষ্ঠ এই শব্দসমূহ নির্গত হয়েছে ব্যাধের প্রতি অভিশাপ স্বরূপ। সেইসময় থেকে আমার হৃদয় শোকাবিহ্বল অবস্থায় রয়েছে এবং বারংবার আমি সেই শব্দাবলী আবৃত্তি করছি। ব্যাধের নিষ্ঠুরতা অযথা হিংসাকাণ্ড, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, পক্ষীযুগলের প্রেম, সঙ্গম, বিরহ এবং বিলাপ সবকিছু একাকার হয়ে আমার চিত্তকে আন্দোলিত করছে। বুঝতে পারছি না এইরকম হওয়ার কারণ কি? আপনি বেদময় আত্মা, সর্বজ্ঞ হওয়ায় এই রহস্য আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

বেদপতি ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বাল্মিকীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"হে মহামুনি পৃথিবীতে তুমি প্রথম ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা করেছ। এরজন্য তুমি মহাকবি হিসাবে জগতে খ্যাতিলাভ করবে।"

"শোকঃ শ্লোক ত্বমাশমৎ" অন্যের দুঃখে কবি প্রাণের কোমল সংবেদনা থেকে যে শোকের জন্ম, তার পরিপ্রকাশই পৃথিবীর প্রথম ছন্দ—অনুষ্টুপ। তুমি তার স্রষ্টা। বাগদেবী সরস্বতী তোমার প্রতি প্রসন্না হয়েছেন। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদও রয়েছে। নারদের কাছে শোনা রামচরিত এই শ্লোকে রচনা কর। রামের জীবনে যা ঘটেছে, তা তুমি জান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তাও তুমি কালক্রমে জানতে পারবে এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র অনুভূতির বর্ণনার দ্বারা উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। অনুভূতির সাথে সহানুভূতির সংযোগেই সৃষ্টি হবে আদি মহাকাব্য। তোমার হৃদয় সহানুভূতিশীল, তাই রামচরিত হৃদয়স্পর্শী হবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে জনপ্রিয় হবে।

যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন রামায়ণ গাথা পৃথিবীতে প্রচারিত হবে এবং ভবিষ্যত কবিদের মাধ্যমে যুগোপযোগী নব-নব সাহিত্য সৃষ্টি হবে। বিশাল বৃক্ষকে যেমন লতা আশ্রয় করে থাকে তেমনই রামায়ণের বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে পৃথিবীর সাহিত্যসেবীগণ যুগে-যুগে

সারস্বত ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবেন। আমার এই কথা কখনও মিথ্যা হবে না। যতদিন রামায়ণ থাকবে জগতে তোমার কীর্তি অম্লান থাকবে। বিধিদত্ত এই শ্লোক থেকে বিশ্বকল্যাণের জন্য রামের অভিযানকাব্য রামায়ণ রচনা কর। তোমার বিশ্বপ্রীতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সংবেদনশীল অহঙ্কারশূন্য হৃদয় জীব জগতের প্রতি দয়া ও করুণা, ভগবৎ বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ততা নিশ্চয়ই তোমাকে বিশাল রামকাব্য রচনায় সফলকাম করবে। এ আমার আশীর্বাদ এবং ভবিষ্যৎবাণী।"

এই কথা বলে ব্রহ্মা ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন এবং মহর্ষি বাল্মিকী আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মার কথায় তাঁর আত্মবিশ্বাস জাগরিত হয়। নিজের শক্তি প্রতিভা সম্পর্কে তিনি সচেতন হন। তিনি অনুভব করেন শক্তির অনুচিত প্রয়োগ-ই পাপ। এতদিন তিনি তাঁর শক্তির যথার্থ বিনিয়োগ করেননি। বেদজ্ঞান থেকে দূরে থাকা এবং আত্মজ্ঞানরহিত জীবনযাপন করাই দস্যুবৃত্তি। আজ পর্যন্ত তিনি তাই করেছেন। শুধু চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম জপ করে নিষ্কাম হয়ে বসে থাকলে জগতের কল্যাণ হয় না। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলেও সেগুলিকে সঠিক পথে পরিচালিত না করে মানুষ নিজের অজান্তেই পাপ করে। জ্ঞান মার্গে ভেদ হল পাপ। প্রকৃত জ্ঞানী অদ্বৈতভাবে স্থির থাকেন। তিনি নিজের মধ্যে শুদ্ধ আত্মাকে দেখেন অপরের মধ্যেও তাই দেখেন। তিনি অপরের মধ্যে স্বয়ং ও স্বয়ং-এর মধ্যে সমগ্র দেখেন। জ্ঞানী পুরুষ জগৎকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। তাই তাঁর কাছে ছলনা নেই। জগতের দুঃখকে অনুভব করে তিনি প্রতিকারের রাস্তা খোঁজেন। নিজের ও অন্যের স্বার্থের মধ্যে তিনি তফাৎ দেখেন না। হয়তো এই অদ্বৈত ভাবনার ফলস্বরূপ ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে শোকাতুর হয়ে নিজের অজান্তেই তিনি শ্লোক রচনা করেন। ভক্তিমার্গে লক্ষ্যস্থলের বিচ্যুতি হল পাপ। ভক্তের লক্ষ্যস্থল পরমেশ্বর প্রভু।

কিন্তু প্রভুর নিকট পৌঁছাতে হলে জীব এবং মানবের হৃদয়ে পৌঁছাতে হবে। কারণ সেখানেই প্রভুর আবাস। বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে শুধুমাত্র যজ্ঞ করে এবং জগৎবাসীর সুখ দুঃখ-এর প্রতি নজর না দিলে সেই যজ্ঞের শেষ ফলস্বরূপ শুধু ধোঁয়া শূন্যে মিলিয়ে যাবে, পরমাত্মা লাভ হবে না। সংসার থেকে দূরে থেকে এটাই উপলব্ধি করেছেন বাল্মিকী। কর্মপথে নিজের ধর্ম ভুলে যাওয়াই পাপ। ধর্ম কি?

হৃদয়ে পরমাত্মাকে ধারণ করে মানব জাতির রক্ষা করা ও পৃথিবীতে জীব ও মানবের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কাজ করা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম। ধর্ম মানুষকে সংযুক্ত করে। তিনি প্রকৃত ধার্মিক, যিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপটিকে একভাবে বিচার না করে বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিচার করেন। নির্বিকার, নিরাকার নির্গুণ, নিরাধার পরমাত্মাকে বিকার-আকার যুক্ত ও গুণাধার যুক্ত করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাটাই অধর্ম।

অনুকূল পরিবেশে বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে মহাদ্রুমে পরিণত হওয়ার মতো বেদপতি ব্রহ্মার নিকট নিজ প্রতিভার প্রশংসা শুনে আদিকবি বাল্মিকী রামায়ণ রচনার সিদ্ধান্ত নেন।

পূর্বদিকে মুখ করে কুশাসনে বসে তিনি রাম ও সীতাকে স্মরণ করলেন। কিন্তু কেন কেজানে মনে একাগ্রতা এল না। তিনি একটাও শ্লোক রচনা করতে পারলে না। সেইসময় গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া মুনি কুমারেরা ব্যস্ত এবং বিচলিত হয়ে বাল্মিকীর কাছে এসে বলে— "মহাভাগ, গঙ্গার তীরে এক সুলক্ষণা, সুন্দরী রমণীকে বিলাপ করতে দেখলাম। বোধহয় তিনি অন্তসত্ত্বাও। মনে হয়, তিনি কোনও অভিশপ্তা কিন্নরী কিংবা দেবী। ভীষণ বিপদে পড়ে তিনি আপনার আশ্রম সংলগ্ন উপবনে এসে পৌঁছেছেন। সেই সাধ্বী রমণী নিশ্চয় নিজের সুরক্ষার জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনি তাঁকে দেখলে নিশ্চয় বুঝতে পারবেন তিনি কোনো মহাপুরুষের পত্নী। তাঁকে আশ্রমে নিয়ে এসে তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।"

শঙ্কিত বাল্মিকীর মনে হল, সেই ক্রন্দনরতা নারী জনক-দুহিতা সীতা নয় তো? বাল্মিকীর মনে এই রকম আশঙ্কার কারণ আছে। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ এক সুসজ্জিত শিবিকায় অশোকবন থেকে সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট নিয়ে গেলেন। বহু রাক্ষস ও বানর তখন যুদ্ধভূমিতে রামচন্দ্রের জয়গান করছিল। সীতার আগমন সংবাদ শুনে সকলেই রামসীতার মিলন দৃশ্য দেখার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় সীতা অত্যন্ত লজ্জিত হন। একথা লক্ষ্য করে রুচিশীল বিভীষণ বানর ও রাক্ষসদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কঞ্চুকীদের নির্দেশ দেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র প্রতিবাদ করে বলেন—"যে বানরেরা এতদিন আমার সাথে আছেন এবং যে রাক্ষসেরা আমার কাছে পরাজিত হয়েও আমার জয়গান করছে, তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বর্তমান সীতা আর অসূর্যমপশ্যা নারী নয়। নারীর আবরণ পর্দা বা প্রাচীর নয় কিংবা আভূষণ বস্ত্র অলংকার নয়। নারীর প্রকৃত আবরণ ও আভূষণ হল তার সম্ভ্রম ও চরিত্র। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্র, স্বজন বিয়োগ, রাষ্ট্রবিপ্লব, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং স্বয়ম্বর সভায় বিনা পরদায় সর্বসমক্ষে নারীর উপস্থিতি দোষণীয় নয়। আজ লঙ্কাপতি রাবণের মৃত্যু হওয়ায় সীতার পক্ষে এক শোকাবহ দিন। এতদিন তিনি রাবণের আতিথ্যলাভ করেছিলেন। শুনেছি রাবণ তাঁকে যত্নসহকারে সৌন্দর্যময় অশোক বাটিকায় রেখেছিলেন। রাবণ আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করলেও সীতাকে মিষ্টবাক্য বলতেন। তাই রাবণের বিয়োগে সীতার দুঃখী হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া এটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে বিনা পরদায় সর্বসমক্ষে উপস্থিত হওয়া কোনও প্রথাবিরোধী কাজ নয়।

এছাড়া যাঁর মুক্তির জন্য আমার প্রিয় বানর বন্ধুবর্গ এত কষ্ট সহ্য করেছেন এবং রাক্ষসেরা তাঁদের প্রিয়জন ও রাজাকে হারিয়েছেন, সেই নারীকে দেখার অধিকার তাদের আছে। যে সৌন্দর্য রাবণ-নিধন ও লঙ্কাপুরী ধ্বংসের কারণ, সেই সৌন্দর্য অব-লোকনের অধিকার সকলের থাকা উচিত নয় কি? তাই তুমি তাঁদের সীতাদর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত করো না।" রামের শ্লেষাত্মক বাক্যে লক্ষ্ণণ, সুগ্রীব, হনুমান অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং লজ্জায় সীতা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছেন। রামের সম্মুখে এসে স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টিনত করে অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করলেও তিনি অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না। দীর্ঘদিন বিরহের পর স্বামী এইরকম কটূক্তি কেন করছেন সীতা বুঝতে পারেন না। সীতাকে দেখে কোনও

রকম ভাবাবেগের প্রকাশ না করে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শীতলস্বরে রামচন্দ্র বলেন—"বর্তমান আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। রঘুকুলনন্দন হিসাবে পরস্ত্রী হরণকারী রাবণের নিধন করা আমার নৈতিক কর্তব্য ছিল। ঐরকম হীনব্যক্তির পাপকর্মের প্রতিশোধ নেওয়া পুরষোচিত কাজ। পুরুষকার দ্বারা যা আমার পক্ষে সম্ভব তাই করেছি। তুমি যদি ভেবে থাক শুধু তোমার জন্য আমি এই ভীষণ সংগ্রাম করেছি, সমুদ্রলঙ্ঘন করে অসাধ্যসাধন করেছি তাহলে সেটা তোমার ভ্রম। আমার পুরুষকার ও বিখ্যাত ইক্ষাকু বংশের মর্যাদাকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য এইরকম বিপদজ্জনক কাজ করেছি।"

স্তব্ধ হয়ে সীতা রামের কথা শুনছিলেন। তিনি যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন। পুনরায় রাম বলেন—"সীতা! তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জন্মেছে। রাবণ তোমাকে কোলে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই কামাতুর রাক্ষস তোমাকে স্পর্শ করেছে, পর-পুরুষের গৃহে তুমি এতদিন বাস করেছ; তাই আমি কি করে তোমাকে গ্রহণ করব? যদিও আমি তোমাকে গ্রহণ করি লোকে আমাকে কামুক আখ্যা দেবে। ইন্দ্রিয় সকল আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশিষ্ঠ জীবন আমি পত্নী-বিনা স্থিরচিত্তে রাজ্যশাসন করতে পারব। বর্তমান তুমি মুক্ত। তোমার যেখানে ইচ্ছ যেতে পার। যদি অযোধ্যায় থাকতে চাও তাহলে ভরত কিংবা লক্ষ্মণের কাছে থাকতে পার। যদি লঙ্কায় থাকতে চাও তাহলে পুণ্যবান বিভীষণকে গ্রহণ করতে পার। অথবা উদ্যান-শোভিত কিষ্কিন্ধায় যদি থাকতে চাও তাহলে বন্ধু সুগ্রীব তো আছেন। তাই মনস্থির করে যা করার তাই কর। তোমার কাছে আমার প্রয়োজন নেই।"

প্রিয়তম রামের মুখে এই রকম কুৎসিৎ কথা শুনে সীতা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বলেন। রামকে প্রণাম করে চিতায় প্রবেশ করার সময়ে বৈদেহী সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন যে রাম ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হননি, অগ্নিদেব তাঁকে নিশ্চয় রক্ষা করবেন। এই কথা বলে তিনি আগুনে ঝাঁপ দেন এবং দৈবকৃপা স্বরূপ অন্তরীক্ষ বৃষ্টির মাধ্যমে অশ্রুমোচন এবং অগ্নি নির্বাপিত করে। দেবতা ও মুনি ঋষিগণ সীতার জয়গান করেন। সেইসময় প্রজাপতি ব্রহ্মা সীতার শুদ্ধতা সম্পর্কে রামকে নিঃসন্দিহান করেন। তখন রাম নিজের মত ও কণ্ঠস্বর পরিশিলিত করে বলেন—"প্রিয়ে! আমি জানি তুমি পবিত্র, কিন্তু তোমার পবিত্রতা সম্পর্কে অন্যের সংশয় দূর করার জন্যই এইরকম [illegible] বাক্য প্রয়োগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি।"

সীতাকে গ্রহণ করে রাম অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং কোমল হৃদয় জানকী স্বামীর মধুর বচনে সব দুঃখ ভুলে গেলেন। অন্যান্য ঋষিদের মুখে এই ঘটনা শুনে বাল্মিকী সেদিন শঙ্কিত হয়েছিলেন কারণ জনমত কাতর রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীর সন্দেহমোচনের জন্য পুনরায় সীতাকে পরিত্যাগ করতে পারেন। প্রজাগণ সীতা সম্পর্কে এই রকম কোনও প্রশ্ন তুলবে না বলে কে বলতে পারে? দিব্যদ্রষ্টা বাল্মিকীর আশঙ্কাই সত্য। শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তমা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং সুহৃৎ জনকের কন্যা জানকী নিরাশ্রয়ভাবে ক্রন্দন করছিলেন। প্রজানুরঞ্জনের জন্য তাঁকে রামচন্দ্র পরিত্যাগ করেছেন বারংবার এই কথা উল্লেখ করে

বিলাপের মাধ্যমে তিনি নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। সীতা এতই শোকাভিভূতা যে তিনি বাল্মিকীকে চিনতে পারেননি। নিষ্ঠুর ভাগ্য প্রেমীযুগলকে বিচ্ছিন্ন করেছে। রাজকন্যা রাজবধূ রাজরাণী সীতা অযোধ্যার ভবিষ্যৎ রাজাকে গর্ভে নিয়ে ঘোর অরণ্যে অসহায়ভাবে রোদন করছেন। বাল্মিকী আপন দুঃখ গোপন রেখে সীতাকে স্বান্ত্বনা দেন "মা জানকী দ্যিবদৃষ্টিতে আমি তোমার আগমনের সংবাদ জানতে পেরেছি। আমার অনুমান, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ দেন তোমাকে আমার আশ্রমের নিকটে ছেড়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ পরমজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্র জানেন এর দ্বারা তুমি ও তোমার গর্ভস্থ সন্তান সুরক্ষিত থাকবে। তোমার শ্বশুর মহারাজ দশরথ এবং পিতা রাজর্ষি জনক আমার পরম মিত্র। আমি তোমার এবং রামের জন্ম ও বিবাহের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বনবাসকালে চিত্রকূটে অবস্থানের সময় তুমি, রাম ও লক্ষ্মণ আমার আশ্রমে এসেছিলে, এই আশ্রমের পরিবেশ তোমার খুব ভালো লেগেছে বলে তুমি বলেছিলে। তুমি আমার কন্যাসমা। সুখপ্রসবের উদ্দেশ্যে শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে এসেছ মনে করে তুমি আমার আশ্রমে আনন্দে থাক।"

মুনিকন্যারা সীতাকে অভ্যর্থনা জানায়। এত দুঃখের মধ্যেও মহর্ষি বাল্মিকীর স্নেহভরা কথায় সতী-সীতা আনন্দিত হন। মনে হয় তিনি যেন পিতৃগৃহে এসেছেন। বিনা দ্বিধায় মুনিকন্যাদের সাথে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করেন। সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শোকাভিভূত চিত্তে তিনি অনুভব করেন তাঁর আশ্রমে সীতার উপস্থিতি বিধি নির্দেশিত এবং এর পশ্চাতে পরমআত্মার মহান উদ্দেশ্যে নিহিত আছে। রামায়ণ রচনার ক্ষেত্রে সীতা-ই বাল্মিকীর প্রেরণার উৎস।

আশ্রমে সীতার অবস্থানকালের মধ্যেই চব্বিশ হাজার শ্লোক সম্বলিত সপ্তকাণ্ডে রামায়ণ সমাপ্ত করেন বাল্মিকী। প্রথম শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে এবং মহাকাব্যের বেশিরভাগ অংশ রচনা হয়ে গেলেও উপজাতি বংশস্থ, পুষ্পিতাশ্রী, মালিনী ইত্যাদি ছন্দেও কতকগুলি শ্লোকরচনা করে মহাকাব্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেন।

রামায়ণের সকল চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র এবং মনো মুগ্ধকারী চরিত্র সীতার। কবি হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা দিয়ে সীতা চরিত্র চিত্রিত করেছেন কবি। এতে কোনও রকম অস্বাভিবকতা নেই। চরিত্রের সাথে রচয়িতার অন্তরঙ্গতার ওপরেই চরিত্র চিত্রণের গভীরতা ও সফলতা নির্ভর করে।

অনুভূতির সাহায্যে রামায়ণ মহাকাব্য লিখেছেন মহামুনি বাল্মিকী। শৃঙ্গার, করুণ হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীর ইত্যাদি সমস্ত রসে রঞ্জিত করলেও মূলত করুণরসের নির্যাসেই হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে এই রচনা। কারণ বিরহিনী সীতার হৃদয়ের কারুণ্যই বাল্মিকীর প্রেরণা।

সীতার পুত্রদ্বয় লব ও কুশ বাল্যবস্থায়েই বাল্মিকীর নিকট রামায়ণ গান শুনতে শুনতে রামায়ণের চব্বিশ হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ করে। দ্রুত, মধ্য বিলম্বিত ইত্যাদি মর্মস্পর্শী সুর ও লয়ে বালকেরা নিজ পিতামাতার জীবনের পবিত্র করুণ গাথা স্বইচ্ছায় গাইতে থাকে। যে রামায়ণ

গান শুনত তার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠত। একদিন লব-কুশের কোমল কণ্ঠে রামায়ণ গান শুনে আমি অশ্রুসম্বরণ করতে পারিনি। বারংবার তাদের কাছে রামায়ণ শুনেছি। যতবার শুনলাম নিজের সম্বন্ধে নিজে ততই সন্দিহান হয়ে উঠলাম। আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডে মহর্ষি আমার সম্পর্কে যেরকম দ্বিরুক্তি করেছেন, তাতে যে কোন অভিজ্ঞ লোকের মনেও সংশয় সৃষ্টি হবে। তাছাড়া আমার জীবনে যা ঘটেছে সেটা আমি ছাড়া আর কে জানে?

দিব্যদৃষ্টি সত্ত্বেও মহর্ষি বাল্মিকী যদি সমস্ত ঘটনা দেখতে না পারেন তাহলে অন্যেরা কিভাবে দেখবে? ফলস্বরূপ, ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে যে যা খুশী ভাববে এবং ভবিষ্যতের নারীরাও বিভ্রান্ত হবে। তাই উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই আমি আমার জীবনী লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রথমেই বলেছি, আমার এই আত্মকথন শ্রুতিশাস্ত্র হিসাবে গণ্য হবে না বা ষষ্ঠবেদের আখ্যা লাভ করবে না। কারণ ইহা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত নয় বা বেদজ্ঞ ব্যাসদেব বাল্মিকী ইত্যাদিদের দ্বারা রচিত নয়। বেদ মানব হৃদয়কে অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত করে। বেদ জ্ঞানার্থক। আমি বলছি না, আমার এই আত্মলিপি জ্ঞানমূলক, ইহা অনুভব ও ভাবমূলক। উপরন্তু বেদের নির্মাতা পুরুষ—তিনি হতে পারেন বিরাট পুরুষ বা পরমেশ্বর অথবা ব্রহ্মা কিন্তু আমি পুরুষ নই—আমি ইড়া—আমি সুমধুর বাণীদ্বারা প্রশংসনীয়া, আমি রত্না, আমি সুরম্যা, আমি যজ্ঞে হবনযোগ্যা হব্যা।

আমি আহুতি—কাম্যা, কমনীয়া স্বাহা, আমি সুখদায়িনী চন্দ্রা। প্রদীপের মতো নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করে সকলকে আলোকিত করি, আমি জ্যোতা। আমি পরম্পরা রক্ষাকারিণী, কূল উদ্ভাসিনী, অখণ্ডনীয়া, পৃথিবীরূপা অদিতি। আমি কীর্তিমান সন্তান প্রসবিনী, যশস্বিনী বিশ্রুতি, আমি শুদ্ধ সুমধুর ভাষিণী, কম্রকণ্ঠী সরস্বতী। সন্তানের গর্ভধারিণী, আমি মহাপাপ করলেও আমি অবধ্যা, অহন্যা, অঘ্ন্যা ওঃ কত নাম আমার। কত প্রশংসা। কত বিশেষণ! আমি মানব সমাজের নির্মাত্রী একথা বেদস্বীকৃত, কিন্তু আমি বেদ-নির্মাত্রী নই। তাই আমার এই "আত্মবাণী"কে ষষ্ঠবেদের আখ্যা দেওয়ার প্রশ্ন-ই বা উঠছে কোথায়? বৈদিক যুগে আমার জন্ম তাই আমার এই জীবনকাব্যকে ভুলবশত কেউ "ষষ্ঠবেদ"-এর আখ্যা দিক এইরকম ধৃষ্টতা বা দুরাভিলাষও আমার নেই। আমি জানি আমার এই আত্মকাহিনীকে পবিত্র গ্রন্থ হিসাবেও পৃথিবী গ্রহণ করবে না। এই গ্রন্থের আলোচনাও হবে না। কেউ এর পাতাও ওল্টাবে কিনা সন্দেহ! যদিও বা তা হয় শেষ পর্যন্ত পড়বে কি না কে জানে? যদি কোনও সহৃদয় পাঠক পড়ে? আমার জীবন ও জীবনীর কি মূল্যায়ণ করবে, তার জন্য আমার চিন্তাও নেই। পাঠকের নিন্দা, প্রশংসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা উভয়ের জন্য-ই আমি আমার হৃদয় আঁচল পেতে দিয়েছে। যদি কেউ শ্রদ্ধার অম্লান ফুলটি আমার আঁচলে উপহার নাও দেয় তাহলে অবাঞ্ছিত মলিন ফুলটা নিশ্চয় কোথাও থেকে অকাতরে ঝরে পড়বে—এটা আমার মন বলছে। আমি জানি বনস্পতিতে ভরা আমার এই পৃথিবী মানুষের জন্য এত অনুদার নয়, যত অনুদার মানুষ মানুষের জন্য।

ক্রান্তদর্শী, আত্মদর্শী, ঋষির হৃদয়ে সর্বপ্রথম ঝঙ্কৃত হয়েছিল "অগ্নি মিলে পুরোহিতং" আজ আমিও সেই প্রথম মন্ত্রে ভাবনায় মন্ত্রিত করছি আমার বাণীকে "হে অগ্রণী, হে বিশ্বচেতনা, অমার পথ প্রদর্শক হও, আমাকে চিন্ময় কর—আমাকে সত্যম্বদা কর।"

বেদমন্ত্রের ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা তিনি মন্ত্রস্রষ্টা নন। মন্ত্র নিত্য ঋষি অনিত্য। মন্ত্রের উদ্বোধক ঋষি দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত ঘটিত, অঘটিত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারতেন এবং যা দেখতেন সেটাই লিপিবদ্ধ করতেন। আমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকা নয়, কিন্তু তপস্যার মাধ্যমে আমি অলৌকিক শক্তি লাভ করেছি। অনুচ্চারিত শব্দও আমি শুনতে পারি। অবশ্য শব্দ অক্ষর। সেটা সবসময়ই থাকে। কিন্তু সবাই শুনতে পায় না। পূর্ব সংস্কারের মাধ্যমে হয়তো কেউ শুনতে পায়।

অবশ্য আমি যা শুনি, তার সত্য ও তত্ত্ব কতটা বুঝতে পারি—তার বিচারক আমি নয়, দ্রষ্টব্য বস্তু মানুষ দেখে কিন্তু তার মধ্যে নিহিত সত্য ও তত্ত্বকে দেখতে পারে না—এটাই মানুষের অসহায়তা। তথ্য ও সত্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিকারী এই দেখা অদেখা অসহায়তাই মায়া যা স্রষ্টাকে সৃষ্ট বস্তুর দৃষ্টির দিগন্তে অদৃশ্য করে রাখে। আমিও মানুষ এবং মায়ামুক্ত নয়, তাই যার কথা আমি যে ভাবে শুনেছি, আমি সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করেছি। অতীত না থাকলে কোনও পুণ্যাত্মা নেই এবং ভবিষ্যৎ না থাকলে কোনও পাপীও নেই। কায়মনোবাক্যে পাপ করেনি, সংসারে এমন মানুষ জন্মায়নি। মানুষ নিজের অতীতকে দেখতে পায়। ভবিষ্যৎ দেখতে পান মাত্র একজন, যিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সূত্রধর—তিনি পরমব্রহ্ম পরমাত্মা—তিনি মহাকাল।

আমার আত্মকথার মাধ্যমে আমি আমার অতীতকে সর্বসমক্ষে উন্মোচন করব। পরম শক্তিমান সময় বলবে ভবিষ্যতের কথা। আমার পাপের চেয়ে পুণ্য যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সময় তার উদার লেখনীতে আমার ভবিষ্যতের কথা লিখবে, নচেৎ বাল্মিকীর তুলিতে আমার পাপ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তার দ্বারা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কাঠগড়ায় আমি পাপী হিসাবে দাঁড়াব এবং যুগ যুগান্তরে আমি হব অনন্ত পাপের প্রতিনিধি।

প্রতি পাপের একটা পৃষ্ঠভূমি থাকে। নির্দোষ মানুষকে পৃষ্টভূমিই পাপের দিকে প্রেরণ করে, কিন্তু পাপের ফল ভোগ করে একমাত্র পাপী। পৃষ্টভূমি পাপের ফলের ধার ধারে না। তবুও পাপের পূর্বাপর প্রসঙ্গ লেখা অত্যন্ত জরুরি। হয়তো ভবিষ্যতের মানুষকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করায় এটা কিছু সাহায্য করতে পারে এবং পাপের পৃষ্টভূমি থেকে পাপের সোপানগুলি কেড়ে নিয়ে পুণ্যের সোপান গড়ে দিতে পারে। আমার পাপের পৃষ্টভূমি লেখার জন্য আমাকে শুধু আমার জন্ম এবং বাল্যকালে ফিরে যেতে হবে তা নয়, সৃষ্টির শুরুতেও ফিরতে হবে। তবেই আমার পাপের পৃষ্টভূমি এবং আমার পাপের উদ্দেশ্য সকলের কাছ স্পষ্ট হবে। এই কাহিনী আমি শুনেছি প্রথার কাছে। প্রথার বয়স কত? আমি বলতে পারব না। আমার জন্মের পূর্বেই সে আমার দেখাশোনার কাজে নিযুক্তা। সৃষ্টির আদি অন্ত তার নখ-দর্পণে। কত কাহিনী, কিংবদন্তি, উপাখ্যান সে শ্রুতিপটে লিখে রেখেছে। অদ্ভুত প্রথার শক্তি! হাজার হাজার বছরের কথা সে সঞ্চয় করে রেখেছে। নিজে পরিণত হয়েছে একটা বুড়ি

রাক্ষসীর কুহক পেড়িতে। কাউকে ভয় দেখিয়ে রেখেছে, আবার কাউকে সম্মোহিত করে রেখেছে সে। তার নির্দেশ আমার পিতা ব্রহ্মা এবং মুনি ঋষিরাও মেনে চলেন। আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকায় প্রথাকে আমার মাসি সম্বোধন করাব কথা কিন্তু তার বয়স হলেও তাকে বৃদ্ধা মনে হয় না। সে কখনও ক্লান্ত হয় না। আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে। উপরন্তু তার বিশ্বাস সে অনন্তকাল চলবে। যতদিন মানব সংস্কৃতি থাকবে ততদিন সে তার শিকড়সহ ডালপালা মেলে বসে থাকবে। তার যুবসুলভ উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা দেখলে কেবা তাকে মাসি সম্বোধন কববে। তাই আমি তাকে নাম ধরে ডাকি এবং সহচরীর মতো ব্যবহার করি। অবশ্য মনে মনে তাকে ভয় করি। তাকে কে না ভয় করে? সে কথাও তার অজানা নয়। তাই মাঝে মাঝে তার জটিল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। প্রথার গুণাগুণ সম্পর্কে পরে বলব। এখন তার মুখ থেকে শোনা কাহিনী থেকে আমার আত্মকথন শুরু করছি।

পৃথিবীতে অসংখ্যা নরনারী সৃষ্টি করার পর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা কেন অহল্যানাম্নী নারীকে সৃষ্টি করলেন? আমাকে সৃষ্টি না করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসম্পূর্ণ থেকে যেত না। তাহলে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি এত যত্নসহকারে আমাকে সৃষ্টি করলেন? সেই ভগবৎ রহস্য ভগবান ব্যতীত আব কার জানা আছে যে আমি সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন কবতে পাবব?

এটা হল সৃষ্টির পূর্বকথা। তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন। সৃষ্টিকার্য থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে, বিশ্বকর্তা আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে অখণ্ড চিত্তশক্তিকে নিজ চিত্তে গোপন করে জলশয্যায় অনন্তশয়ন করেছেন। বিশ্বকর্তা যদি শয়ন করেন, তাঁকে জাগ্রত করবে কে? যখন বিধাতা নিদ্রামগ্ন, তখন আর কে জাগ্রত যে তাঁর যোগনিদ্রা ভাঙ্গাবে। কালশক্তিই সদা জাগ্রত। কালশক্তিই সৃষ্টি কামনা ও জীব প্রবৃত্তিকে জাগরিত করার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রহরী। কালশক্তিই বিধাতা। বিশ্বকর্তা নিদ্রিত থাকায় দশদিক ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিজে নিজেকে দেখার প্রশ্ন কোথায়? কিন্তু একমাত্র কাল-ই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে তথা অতীত ও ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কাউকে জাগ্রত করে আবার কাউকে দেয় ঘোর সুসুপ্তি।

বিশ্ব সর্জনার ব্রাহ্মমুহূর্তে নির্বিকার মহাকাল নিজে প্রকট হয়ে স্রষ্টার চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিকে জাগ্রত করা মাত্রই সৃষ্টিকর্তার অন্তরস্থ সূক্ষ্মতত্ত্ব কলাত্মক গুণে আলোড়িত হয়ে সৃষ্টির প্রেরণা পায়। সৃষ্টির শুরু থেকে প্রলয় পর্যন্ত যে কাল আনন্দ নিরানন্দ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা বারংবার ভোগ করে, সে নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার হতে বাধ্য। অব্যক্তমূর্ত্তি কালকে নিমিত্ত করে লীলাচ্ছলে সৃষ্টিকর্তা নিজের নাভি হতে এক অপূর্ব পদ্মকোষ রূপে প্রকট হলেন। সেই পদ্মকোষ এক বিশাল উজ্জ্বল পদ্মপুষ্পরূপে বিকশিত হয়ে নবোদিত দ্বিতীয় অরুণসম নিজ আভায় অন্ধকার নাশ করে। সেই তেজোময় পদ্মাসনের ওপর পরমস্রষ্টা স্বয়ম্ভু আদিদেব ব্রহ্মা প্রকট হলেন।

কিন্তু ব্রহ্মা নিজের আসন, দিব্যপদ্মপুষ্প এবং প্রলয়কালীন অনন্ত জলরাশি ব্যতীত অন্য কিছু দেখতে পেলেন না। চতুর্দিক মায়াচ্ছন্ন ছিল। সেই পদ্মমূলের শেষ কোথায়? কত দূর

ব্যপ্ত সেই পদ্মমূল, ব্রহ্মা তার আদি অন্ত পেলেন না। নিজের যোগপুষ্ট বুদ্ধিকে অনন্ত অনুভূতিতে শাণিত করার জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কত দিব্য বছর যে তপস্যা করেছেন তার হিসাব সময়ই দিতে পারে। তবুও সেই অত্যাশ্চর্য পদ্মমূলের উৎপত্তিস্থল তিনি খুঁজে পেলেন না। যুগ যুগান্তরে যোগনিষ্ট সুগন্ধে সেই পদ্মের প্রত্যেকটি পাপড়ি যখন সুরভিত হয়ে পুণ্যজগতকে সুগন্ধিত করে তোলে, তখন ব্রহ্মা অনুভব করেন যে, বিশ্ব সৃষ্টি করার জন্য সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন নেই। উপরন্তু সেই রহস্যের পিছনে পাগলের মতো ছুটতে হবে। ভগবৎ মায়াই সৃষ্টি প্রেরণার মূল। কারণ, সেই মায়াই ছিল দৃশ্য এবং দৃষ্টির কার্যকারিণী শক্তি। আদিদেব অন্তরস্থ শক্তির বলে প্রথমে দ্রষ্টা ও পরে স্রষ্টা রূপে বিশ্বনির্মাণের জন্য প্রেরিত হলেন। প্রথমে তিনি চতুর্মুখরূপে দ্রষ্টা হিসাবে চর্তুদিক পর্যবেক্ষণ করেন এবং কালশক্তি দ্বারা চিৎশক্তি আলোড়িত হওয়ায় প্রলয়কালীন অন্ধকার বিনাশ করে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত করলেন এক অনির্বচনীয় বিশ্ব। আমার পিতা চিত্রশালার অনন্য শিল্পী, তাঁর কল্পনাই জীব-জন্তু,নর, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা, দানব, বনস্পতি রূপে সাকার হল। মহাশূন্যের প্রচ্ছদপটে উদ্ভাসিত হল স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, অন্তরীক্ষ, মর্তলোক, নাগলোক, পাতাললোক। শ্যামল বনস্পতিব অনন্ত সবুজিমার মধ্যে নানা রঙের পুষ্প প্রস্ফুটিত হল। কিন্তু এই বিচিত্র বিপুলা বিশ্বকে ভোগ করবে কে? স্রষ্টার সৃষ্টিকে যথার্থ সমাদর কে করবে?

নিজের জন্য বাঁচা জীবের ধর্ম। মানুষ নিজের জন্য খায়, কিন্তু নিজের জন্য কেউ গান করে না, ছবি আঁকে না, কৃতিত্ব অর্জন করে না। একজনের কৃতি যদি অপরকে কৃতকার্য না করে তাহলে সে কৃতি যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন তার কি মূল্য? তাই কৃতি খোঁজে অনুরাগী, গুণগ্রাহী সমাজ। স্রষ্টা খোঁজে দর্শক, পাঠক, শ্রোতা, যা স্রষ্টাকে দেয় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির অনুভূতি। তখন ব্রহ্মা ভাবলেন—জীবহীন পৃথিবী এবং বনস্পতির কি মূল্য?

বহু চিন্তার পর পিতা জীব সৃষ্টি করলেন। প্রাণীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হল। বনস্পতি এবং নদনদী যুক্ত হল। কিন্তু শিল্পকলা সমাদর করার মতো দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি জীবের ছিল না। অবশেষে এইসব গুণে গুণান্বিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার পরম তথা নবম সৃষ্টি হল "নর।" এই "নর"-এর অন্তরে তিনি যোগ, জপ, বিদ্যা, বৈরাগ্য ইত্যাদি নানাপ্রকার সাত্ত্বিক গুণ সংযোজন করলেন। "নর" প্রখর বুদ্ধিমান। স্রষ্টার গুণমুগ্ধ শ্রোতা এবং দর্শক। নিজের সৃষ্টির অনুভূতিতে পরম পিতা ব্রহ্মা পুলকিত হলেও সন্তুষ্ট হলেন না। প্রকৃতির বৈচিত্রতাকে "নর" আদর যত্ন করে কিন্তু—"নর"-"নর"কে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানায় না। প্রত্যেক "নর" ভাবে সে শ্রেষ্ঠ সেই সর্বোত্তম। এর কারণ কি? স্রষ্টা নিজ সৃষ্টির বিশ্লেষণে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হলেন।

শ্রেষ্ঠজীব "নর"-এর মুখাকৃতি, অঙ্গসৌষ্ঠব কণ্ঠস্বর একইরকম। একই নক্সায় গড়া "নর"-এর শরীর ও প্রবৃত্তি। কারও মধ্যে কোনও নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নেই। কোনও আকর্ষণ বিকর্ষণও নেই। তাই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জীব যদি জীবের প্রতি সংবেদনশীল, স্নেহপরায়ণ এবং শ্রদ্ধাশীল না হয় তাহলে পৃথিবী পুনরায় প্রলয়ের

অন্ধকারে ডুবে যাবে। অনাসক্তি প্রেমহীনতা ও অযত্নের মধ্যে সৃষ্টির প্রসার ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। সৃষ্টি সংরক্ষণের দায়িত্ব কে নেবে?

"নর" বহুগুণে গুণান্বিত হলেও সে সৃষ্টি তথা নিজের প্রতি অত্যন্ত অযত্নশীল। পরস্পরের মধ্যে স্নেহ, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি নেই। ফুলের সুগন্ধ যদি শুধু ফুলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, পদ্মমদু যদি ভ্রমর এবং মৌমাছিকে আকৃষ্ট না করে, নদী যদি কেবল নিজের গর্ভকে পুষ্ট করে, সূর্য যদি কেবলমাত্র নিজেকেই আলোকিত করে, বনস্পতি যদি নিজেকেই কেবল ছায়াদান করে তাহলে তার কি দাম? স্রষ্টা সৃষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তপস্যায় মগ্ন হলেন।

চিত্রশালার সব চিত্র একই রকম। আমি যেমন চিত্রও সেইরকম। তাহলে অমি কেন চিত্র দেখব, স্পর্শ করব, সঞ্চয় করব? আমার থেকে যে ভিন্ন, আমার কাছে যা অভাব, তার কাছে যদি ভাব, তখনই উৎপন্ন হবে মহাভাব—দিনে দিনে স্রষ্টা তথা 'নর'-এর অসন্তোষ বেড়ে চলে। স্রষ্টা সন্তুষ্ট হলে সৃষ্টি—প্রতিভার মৃত্যু হয়—একথা বোধহয় সত্য। নিজের সৃষ্টির যত প্রশংসা করবে ততই কটাক্ষ করবে। নব-নব সৃষ্টির কল্পনায় ভাবমগ্ন হয়ে থাকবে। তাহলে সৃষ্টি এবং সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব।

পিতার চিরকাল সেই অবস্থা। একদিন ভিন্ন ধরনের এক সৃজন বেদনা অনুভূত হল, উন্মেষ হল এক অভিনব সৃষ্টির। এক অপূর্ব বৈশিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠতার স্পর্শ দিয়ে তিনি তুলি চালালেন। সমস্ত সাবভূত সৌন্দর্যের সমাহারে যে প্রজা সৃষ্টি করলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা সে পূর্বসৃষ্ট নরের চেয়ে ভিন্ন এবং বিশিষ্ঠ মনে হল। নিজের সৃষ্টির উৎকর্ষে নিজে মুগ্ধ হলেন ব্রহ্মা। সেই বিশিষ্ঠ প্রজাটিকে বললেন—তোর নাম 'নারী'—তুই নরের সঙ্গিনী। তুই ন-অরী—তোর চোখে কেউ শত্রু নয়।

'নারী'র প্রতি অঙ্গে যে বিশেষ কলা চাতুর্য অনুপম মাধুর্য ফুটে উঠল তাহাই আকর্ষণ করল পূর্ব সৃষ্ট 'নর'কে। নব-নারীর প্রতি আকৃষ্ট হল। তার জন্য আগ্রহ কৌতহুল এবং আবেগ প্রকাশ করে, তার প্রতি যত্নশীল হয়। তার কাছে এমন কিছু বিশেষ গুণের অভাব আছে, যা স্রষ্টার অভিজ্ঞ মনে পরবর্তীকালে সৃষ্ট নারীর ক্ষেত্রে প্রস্ফূটিত হয়েছে। সবসময় তাই হয়। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়। অভাব থেকে ভাব, ভাব থেকে মহাভাব। এটাই সৃষ্টির বিকাশের নিয়ম।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিজের সৃষ্ট নারীদের দেখে মুগ্ধ হলেন, কিন্তু তৃপ্ত হলেন না। সেই অনিন্দসুন্দরী নারীদের অনুপম অঙ্গশৌষ্ঠবেও তারতম্য লক্ষ্য করলেন। নভঃমণ্ডলে নক্ষত্র পুঞ্জের ঔজ্জ্বল্যতার মধ্যেও প্রভেদ আছে। সবগুলি তারতম্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অসামঞ্জস্যগুলিকে একত্রিত করে চিত্র প্রতীম একটি নারী সৃষ্টি করলে কেমন হয়।

স্রষ্টার এই আকাঙ্খা অদ্ভুত নয়, কিন্তু আকাশ ছোঁয়া। একজনের ওপর সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিলে তার অবস্থা কি হবে, সেকথা কি কখনও ভেবেছে, কল্পনা-বিলাসী-স্রষ্টা? একজনের কিছু অভাব না থাকলে সেই 'অভাব'এর অভাব যে চরম অভাববোধে তার অহংকে অন্তরীক্ষে তুলে আবার রসাতলে ফেলে দিতে পারে, এই আশঙ্কা কখনও কি স্রষ্টার

মনে জাগে? কারও সম্পর্কে যদি সমালোচনার অবকাশ না থাকে, যদি তার ব্যক্তিত্বের লাগাম কেউ না ধরে, একথা কি স্রষ্টা জানে না?

সহস্র অনিন্দ্যসুন্দরী নারীর মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতাকে রেণু-রেণু জীবকোষের নক্সায় তুলে অবশেষে প্রজাপিতা ব্রহ্মা যে ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন, তার নাম রাখলেন অহল্যা। অসৌন্দর্য, হল্যা, কুশ্রীভাব, অশোভা যে নারীর মধ্যে নেই, সেই হল অহল্যা, অনিন্দ্যা—অনন্যা।

নিজের সৃষ্টির উৎকর্ষতায় পিতা তৃপ্ত হলেন। নিজের সৃষ্টিকে নিরীক্ষণ করে তিনি মুগ্ধই নন—স্তম্ভীভূত, তটস্থ ও ভয়ভীত হলেন।

সৌন্দর্য ভয়ভীত করে—তটস্থ, নির্বাক, নিস্পন্দ করে দেয় শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যায়। দৃষ্টিশক্তিকে নিষ্প্রভ করে দেয় রক্তপ্রবাহ স্থির হয়ে যায়, চেতনাকে জড়ে পরিণত করে। আমি নাকি ছিলাম সেইরকম অধীর করে দেওয়ার মতো সৌন্দর্যের প্রতিমা।

অহল্যা যে অনুপমা, একথা ত্রিলোকে ধ্বনিত হল ত্রিকালে দুন্দুভিত হল।

শিল্পী সৃষ্টি করে নিজের আনন্দ ও অন্তরাত্মার পরিপ্রকাশের জন্য। সৃষ্টি চেতনা, সৃষ্টি চিন্তন, সৃষ্টির বেদনা ও যন্ত্রণা স্রষ্টার নিজস্ব অনুভব। কিন্তু সৃষ্টি যখন পূর্ণ বিকশিত, সাকার তখন তাহা স্রষ্টার নিজস্ব নয়, সে সমাজের রাষ্ট্রের সমগ্র পৃথিবীর। সেই সৃষ্টি জগতের জন্য কি সন্দেশ বহন করে আনবে সেটা স্রষ্টার এক্তিয়ারে থাকে না। যথেষ্ঠ সাবধান হলেও সৃষ্টি সবসময় স্রষ্টার কল্পনার শিকলের মধ্যে থেকেও খোলা আকাশের পাখি। সেই পাখিটি কি গান গাইবে, পৃথিবীকে কি কথা শোনাবে, সেই চিন্তায় স্রষ্টা মাঝে মাঝে সৃষ্টির সাকারতায় চিন্তিত হয়ে ওঠে, নিজের সৃষ্টি স্রষ্টাকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে।

আমার সৌন্দর্যের জন্য পিতা চিন্তিত ছিলেন না, সমগ্র বিশ্বকে আমার সৌন্দর্য কি সন্দেশ দেবে সেটাই ছিল পিতার উদ্বেগের মূল কারণ। সকলের মনে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ থাকে। সুন্দর বস্তুর অধিকারী হওয়ার কামনা প্রত্যেক সচেতন প্রাণীর জন্মগত প্রবৃত্তি। তাই অত্যন্ত সুন্দর বস্তুর জন্য পাগল হলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

প্রজাপিতা ব্রহ্মা নারী সৃষ্টি করলেন নরকে আকর্ষণ করে সৃষ্টি ও সর্জনার প্রতি যত্নশীল এবং আগ্রহী হওয়ার জন্য। সৃষ্টির স্থিতি ও প্রবাহের জন্য তার আবশ্যকতা ছিল কিন্তু 'অহল্যা' সৃষ্টি করলেন কার জন্য? নর, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা সবাই অহল্যার অধিকারী হওয়ার জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এককথায় বলতে গেলে উন্মাদ। অহল্যা কার হবে? কেনই বা কারও হবে? কারও হওয়ার জন্য কি অহল্যা বাধ্য, কারণ সে অনিন্দ্যা—অনুপমা!

তখন কতই বা আমার বয়স! বোধহয় আট কিংবা নয়। সেই অবুঝ বয়সেই আমি অনেক কথা বুঝতে পারতাম। জগৎ যে স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সেটা আমি জানতাম। দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস এমনকি বনের হিংস্র জীবজন্তুরাও অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে সুন্দরী নারীর অভাব নেই—স্বর্গের অপ্সরাদের তো সৌন্দর্যের

তুলনা নেই। অথচ, আমার কি এমন বিশেষত্ব যে, আমি সকলের নয়নাভিরাম দৃশ্য হয়ে শোভা পাব?

প্রতিদিন পিতার কাছে বহু দেবতা আসেন আমাকে দেখলেই তাঁরা আদর করেন—কোলে বসান—গালে চুমু দেন। বুকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি কথা বলেন। কত মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন। পিতা প্রতিবাদ করেন না। মনে হয় যেন নিজের সৃষ্টির উৎকর্ষতায় গর্ব অনুভব করেন।

আমি ভাবি, আমার রূপের জন্যই এত আদর ভালোবাসা। আমি যদি অহল্যা না হয়ে হল্যা হতাম, তাহলে কি এত আদর, ভালোবাসা পাওয়া যেত?

আমার বাল্য-সহচরী ঋচা। আমার চোখে সে সুন্দরী। সে কালো, সে দাসকন্যা, আমার পাশে সে নাকি দুধে খার-এর মতো। অথচ তার মতো নম্র-মধুর স্বভাবের মেয়ে কমই আছে। তার মানে রূপই মুখ্য—স্বভাবচরিত্র গৌণ। অনেকসময় নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হই। নিজেকে এত ভালোবেসে ফেললাম যে, আমার চারদিকে কি ঘটছে, সেদিকে আমার খেয়ালই রইল না।

আমার এই স্বভাবের জন্য পিতা চিন্তিত। তিনি এতই চিন্তিত যে, ঘরে একটা আয়নাও রাখলেন না। আমাকে পাশে বসিয়ে উপদেশ দিতে শুরু করলেন—"প্রাণীর শরীর তুচ্ছ, ক্ষণ ভঙ্গুর, রূপ অলীক। শারীরিক সুখ ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। তাই শরীরের প্রতি বেশি নজর না দিয়ে অন্তরাত্মার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিলে প্রাণীর জীবন সার্থক হয়। শরীরের বিনাশ আছে—ব্যক্তিত্বের বিনাশ নেই।" ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য তিনি উপদেশ দিলেও আমি রূপচর্চায় অধিক যত্ন নিতাম। পিতার উপদেশ শুনতে শুনতে একদিন জিজ্ঞাসা করে বসলাম—"শরীর রূপ যদি তুচ্ছ, অনিত্য, তাহলে স্রষ্টা সুন্দর রূপ সৃষ্টি করলেন কেন? দেবতা, রাজা, ঋষি সকলেই শুধুমাত্র সুন্দরী মেয়েদের বিবাহ করেন কেন? ওঁদের কুৎসিৎ নারী বিবাহ করার দৃষ্টান্ত তো নেই? আমার এবং ঋচার মধ্যে ঋচা অধিক সহনশীলা নম্র এবং কোমল স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও এখানে আসা দেবতা ও মুনিঋষিরা আমাকে বেশি আদর করেন কেন? সেটা শুধুমাত্র আমার রূপের জন্য নয় কি?

আমার কথায় পিতা ক্ষণিকের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর কোমল কণ্ঠে বলেন—"মা, অহ্য, তুই যা বললি, তা সত্যি, কিন্তু সেটা হল মোহ। মোহ চিরন্তন নয়। প্রাণীর মন থেকে একদিন রূপের মোহ চলে যায়, তখন তার ব্যক্তিত্বই রূপের ওপর বিজয়লাভ করে।" সেই বয়সে এত গভীর দর্শন তত্ত্ব আমার মাথায় ঢোকেনি। আমি শুধু এইটুকু অনুভব করি যে, পিতা আমার মনকে রূপ কেন্দ্রিক করতে চান না। কিন্তু আমি রূপ কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হব কি করে? অহর্নিশ প্রত্যেকের চোখে, ভাষায়, স্পর্শে আমার রূপের জয়গান ঘোষিত হচ্ছে।

এমনই অনির্বচনীয় আমার রূপ, আমার সৃষ্টি সাধারণ নর-নারীর সঙ্গম থেকে হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। তাই আমি আমি ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মানসকন্যা বলে আমার জন্ম

সম্পর্কে নানা কাহিনী কিংবদন্তি প্রচারিত হয়। সে কাহিনী আমার রূপের বিশেষণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ব্রহ্মা আমার পিণ্ড রক্ষা করেছেন এবং ব্যক্তিত্ব গড়েছেন। তাই আমি ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ কলাকৃতি বলাটা অসংগত নয়।

আকাশ যেমন নিজে নিজের অন্ত পায় না। মানুষ সেইরকম নিজের অন্তরকে পায় না। আমি কি চাই? কি পেলে আমি সুখী হব? আমার কাম্যবস্তু কি?

আমি কিছুই জানি না। লক্ষ্যহীন তরীর মতো আমি বাল্যকাল থেকে কৈশোরে উপনীত হয়েছি। কিন্তু আমার লক্ষ্যস্থল কোথায়? কে আমাকে লক্ষ্যপথের রাস্তা দেখাবে—লক্ষ্যস্থলের সন্ধান দেবে?

আমার পরিচারিকা প্রথা এবং চার অন্তরঙ্গ সহচরী ত্বয়ি, আনীক্ষিকা, বার্তা ও নীতি সকলের কাছে আমার জন্ম সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী শুনলেও আমি জানি আমার পিতা ঋষি মুদ্‌গল, মায়ের নাম ও পরিচয় আমার জানা নেই। গর্ভধারিণীর নাম হল জননী—মা। এর চেয়ে বড় পরিচয় মায়ের আর কিছু নেই। অবশ্য মায়ের নাম জানি না বলে আমার দুঃখ হয় না, দুঃখ হয় মাকে দেখিনি, মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা কিরকম জানি না। যেহেতু আমার বাবা একজন ঋষি সম্ভবত জগতের কল্যাণসাধন কিংবা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে চলে গেছেন আমাকে পিতামহ ব্রহ্মার তত্ত্বাবধানে রেখে। অবশ্য আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম তাহলে পিতা আমার শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতেন, তারপরে তপস্যা করতে যেতেন। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ওপব এত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ মেয়েরা গুরুকুল আশ্রমে যায় না। বাড়িতে মায়ের কাছে শিক্ষালাভ করে। আমার মা না থাকায় আমার শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়েছে পিতামহ ব্রহ্মার উপর। ভাই নারদ বলেন আমি নাকি ভীষণ সৌভাগ্যবতী। পিতামহ ব্রহ্মার শিষ্য বা শিষ্যা হওয়া ভাগ্যের কথা। দেবতারা বহু সাধনাব পর পিতামহ ব্রহ্মার শিষ্যত্ব লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই জ্ঞান হওয়ার পূর্বে সম্ভবত ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে পিতামহের আদর যত্ন ও শাসনের মধ্যে আমি বনবাসিনী হলেও রাজ্যকন্যার মতো সুখে আছি। পিতামহ পিতার স্থান পূরণ করেছেন। তাই আমি তাঁকে 'পিতা' সম্বোধন করি। কিন্তু কাকে মা বলে ডাকব? কে আমাকে দেবে মাতৃস্নেহ। জীবনের লক্ষ্যস্থলের সংকেত কে দেবে? নারীজন্মের সার্থকতা ও স্বপ্নের মধু গীতি শোনাবে?

মাতৃস্নেহবঞ্চিতা মেয়ে আমি—বনলতার মতো কখন কোন গগনচুম্বী স্বপ্নবৃক্ষকে আশ্রয় করে সপ্তলোকে প্রসারিত হই, তার আদি অন্ত পাইনা আমি। আমার রূপের জয়গান করে সখীরা সর্বদাই আমাকে মর্ত থেকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দেয়। আমার চঞ্চল মন আর মর্তে থাকতে চায় না। যদি মর্তে থাকার হত তাহলে স্রষ্টা দিব্যরূপা অহল্যা কেন গড়েছেন?

মানুষ মর্তবাসী, দেবতা স্বর্গপিপাসু, আমি পিতামহ ব্রহ্মার আদরণীয়া কন্যা হলেও মর্তের মানবী। তাই আমার জন্য নির্দিষ্ট তটিনী তীরে এই রম্যবনে অনাড়ম্বর পর্ণকুটীরে আমার চার সখী তথা প্রথার তত্ত্বাবধানে আমি থাকি। স্বর্গরাজ্য আমার জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার মন কি সে কথা মানে! যে অপ্সরীরা স্বর্গরাজ্যের শোভাসদৃশ তারা যে আমার পায়ের তলার যোগ্য

নয়, সে কথা আমি সখীদের কাছে শুনেছি। তাই আমার মনে জাগে স্বর্গের অভিলাষ। স্বর্গবাসী দেবতাদের স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মন প্রতিবাদ করে। স্বর্গ তাঁদের বাসস্থান। সমস্ত দুর্লভ বস্তুর অধিকারী তাঁরা। তা সত্ত্বেও মর্তের দুর্লভ বস্তু তাঁদের ভোগ্য। ইচ্ছা হলে তাঁরা মর্তে অবতরণ করেন। মানুষকে যোগভ্রষ্ট বা যোগসিদ্ধ করেন, এমনকি মানুষের বাসভূমিতেও আধিপত্য বিস্তার করেন। তাহলে মানুষ কেন স্বর্গরাজ্যের সম্পদ লাভে বঞ্চিত হবে? বিশেষত অহল্যার জন্য স্বর্গদ্বার নিজে থেকেই উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা। অহল্যা তো সাধারণ মর্তমানবী নয় সে অদ্বিতীয়া অনিন্দিতা। স্বর্গরাজ্য ও দেবতাদের অলৌকিক কাহিনী শোনাতে আমার সখীরা খুব ভালোবাসে। তাদের জ্ঞান ও অপরিসীম। তারা ব্রহ্মার অন্তরঙ্গ শিষ্যা। তারা বেদবর্ণিত দেবতাদের সাথে আমাকে পরিচিত করায়। আমার পিতা ব্রহ্মা বেদের রচয়িতা। তাই বেদ শোনায় আমার অসীম আগ্রহ।

পিতার আদেশে ছোটবেলা থেকেই আমি বেদশ্রবণ অভ্যাস করেছি। অবশ্য বেদে বর্ণিত বরুণ, বিষ্ণু, যম, রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ ইত্যাদির মধ্যে ইন্দ্রগাথা আমার অধিক প্রিয়। কারণ, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকেব প্রভু। তাঁর সৌন্দর্য, বীরত্ব, ঐশ্বর্য, দানশীলতা ও সাহসের তুলনা নেই। তিনি দেবদুর্লভ। দেবতা ও ঋষিগণ সর্বদা তার জয়গানের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী। আমার পিতা ব্রহ্মা দিব্যদর্শী। চারটি বেদে তিনি ইন্দ্রের গুণগান করেছেন। সমগ্র বেদের পংক্তির সংখ্যা দুইশত পঞ্চাশ। উপরন্তু অন্য দেবতাদের গুণগান করার সাথে ইন্দ্রের জয়গান করতে ভোলেননি। ঋক্‌বেদ অধ্যয়নের সময় আমি এক চতুর্থাংশ ইন্দ্রগীতি গাইতে বাধ্য হই। সখীদের সামগান, ভাই নারদের উক্তিতে, পিতার মুখে ও ঋষিদের মন্ত্রধ্বনিতে ধ্বনিত হন ইন্দ্রদেব। সাত বছর বয়সেই ইন্দ্রদেব সম্পর্কে আমি বহু জ্ঞান অর্জন করেছিলাম এবং মনে মনে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে কল্পনা করতাম। বেদের পাতা ওল্টালেই ইন্দ্রগীতি। পাতা ওল্টানোর প্রয়োজন নেই, আমার পিতা মুখ খুললেই বেদ ধ্বনিত হয়, ইন্দ্রগাথা ঝঙ্কৃত হয় হৃদয়তন্ত্রীতে। পিতা আমাকে বেদপাঠ করান। পিতার মুখে বেদের দেবতাদের কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি ও স্বর্গরাজ্যের কল্পনায় হারিয়ে যাই। ইন্দ্রের বীরত্ব এবং মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। প্রথার মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস শুনতে শুনতে ভাবি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কত সত্যি কত মিথ্যা!

কাশ্যপ ঋষির পত্নী অদিতির পুত্রগণ হলেন দেবতা। এবং কাশ্যপের অপর পত্নী দিতির পুত্ররা হল দৈত্য। একই পিতার ঔরসজাত দেবতা এবং দৈত্য। অথচ তাদের মধ্যে যুগব্যাপী বৈরিতার কারণ কি? প্রথার কাছে গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে। সেই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পিতা বুঝিয়ে দেন। অমৃতলাভের বাসনাই মৃত্যুর কারণ। ভক্তি বাসনাযুক্ত হলে যেমন অভক্তি ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হয়, অমরত্ব মোক্ষভিত্তিক না হয়ে বাসনাভিত্তিক হলে মৃত্যুতে পরিণত হয়। তাহাই ঘটেছিল দৈত্য এবং দেবতাদের জীবনে। উভয়েরই মনে জাগে নীরোগ, অমর হওয়ার বাসনা।

ক্ষীরসাগরের অতলগহ্বরে অমৃতের ভাণ্ডার। উভয়েরই লক্ষ্য হল ক্ষীরসাগর মন্থন এবং

অমৃতলাভ। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বিষধর বাসুকী নাগকে মন্থনরজ্জু করে সমুদ্রমন্থন শুরু হল। বাসুকীর মুখ থেকে বিষ নির্গত হতে থাকে এবং আহত বাসুকী মন্দারকে দংশন করে মহাভয়ঙ্কর হলাহল উর্ধ্বমুখী হয়। সেই বিষের জ্বালায় দেবতা, মানুষ এবং অসুর দগ্ধ হতে থাকে। তখন দেবতারা রুদ্রের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীহরি এবং শিব একত্রে সেখানে উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে শিব শ্রীহরিকে বললেন—"আপনি সুরশ্রেষ্ঠ, সমুদ্রমন্থনে প্রথমে যা পাওয়া গেছে, অগ্রপূজ্য হিসাবে তা আপনারই প্রাপ্য। সমুদ্রমন্থনে নির্গত বিষ গ্রহণ করে দেবতাদের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করুন।" বিষ্ণুর আচরণ চিরকাল রহস্যময়। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ তিনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। শিব আর কি করেন? নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহৎ স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া শিবের নীতিবিরুদ্ধ। সমগ্র পৃথিবীকে বিষের জ্বালা থেকে মুক্ত করার জন্য শিব নিজেই সমস্ত বিষপান করলেন। জগৎকল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই তীব্র হলাহল পরিণত হল অমৃতে। শিবের কণ্ঠ নীল হয়ে গেল। জগতের সমস্ত জ্বালা আকণ্ঠ পান করে শিবের নীলকণ্ঠ হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমার কোমলমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পিতার মুখে শিবের উদারতার কাহিনী শুনে আমি শিবভক্তে পরিণত হলাম। স্বচক্ষে না দেখলেও তাঁর নীলকণ্ঠের কল্পনায় আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠি। সাতবছর বয়সেই আমি নীলরঙের প্রেমে পড়ি। আমাব অজান্তেই আমি কালিমা এবং হলাহলের ভ্রমে পড়ি।

ক্ষীরসাগরের উত্তাল উর্মিমালার সাথে প্রতিযোগিতা করে জলক্রীড়ায় মত্ত ছিল অনিন্দিতা অপ্সরারা। অমৃতলোভী দেব অসুরের সমুদ্রমন্থনের ফলে তাদের জলক্রীড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ষাটকোটি অপ্সরা এবং তাদের সুন্দরী পরিচারিকারা যখন জলের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাঁদের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে দেবতা এবং অসুরেরা মুগ্ধ। মন্দকেশী, সুকেশী, মিত্রকেশী, শুভংকেশী, চারুকেশী, প্রিয়কেশী, সুলোচনা, সুনয়না, সৌদামিনী, সুকামিনী, সুভাষিণী, সুহাসিনী, দেবদত্তা, দেবার্পিতা, দেবার্চ্চনা, দেবসেনা, দেবপ্রিয়া, দেবাঙ্গনা, মনোরমা, তিলোত্তমা, সুদত্তা, সুরমা, সুদর্শনা, সুযশা, সুবিদ্যা, সুমিত্রা, সুমেধা, সুরূপা, সুপ্রিয়া, সৌভাগিনী, সুরঞ্জনা, দেবমুখী, দেবভোগ্যা, দেবরঞ্জনা, উত্তমা, বিশ্বাসিনী, বিহঙ্গিনী, বিলাসিনী, বিমোহিনী, সুলগ্না, সুবেশিনী, রম্ভা, মেনকা এবং বিশ্বমোহিনী অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী দেবতা ও অসুরদের এইরকম বিমোহিত অবস্থা দেখে প্রমাদ গুণলেন। যা জগতের কল্যাণ করে তাহাই সৌন্দর্য। অপ্সরাদের সৌন্দর্য দেবতা এবং অসুরদের সমুদ্রমন্থনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। তারা অমৃত, অমরত্ব এমন কি নিজেদের হিতাহিত পর্যন্ত ভুলে গিয়ে সদ্যস্নাত অপ্সরাদের সৌন্দর্য দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করছেন। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় যত তৃপ্ত হচ্ছে, অতৃপ্ত বাসনা ততই তীব্র হচ্ছে। উর্বশী শুধু রূপসী নন, বিদুষীও। দেবতা এবং অসুরদের মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি অপ্সরাদের সুরক্ষা সম্বন্ধে যতটা চিন্তিত ছিলেন, এরপর অপ্সরাদের নিয়ে দেবতা-অসুর-মানব-যক্ষ ও গন্ধর্বদের মধ্যে ভয়ানক কলহের সৃষ্টি হবে সে কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁদের সৌন্দর্য কি

ত্রিলোক বিপন্ন করবে। তাহলে কি সৌন্দর্যের নামে বিধাতা তাঁদের শরীরে গরল ভরে দিয়েছেন। সূর্য কিরণে সৃষ্ট মেঘকণাসম তরল, সরল, ছন্দময়ী উর্বশী অপ্সরাদের আশ্রয়ের নিমিত্ত দেবতা এবং অসুর বলেন—"হে দেবাসুর নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে এখন আমাদের নিজেদের রক্ষার উপায় চিন্তা করুন। আমরা আপনাদের শরণাপন্ন!" কিন্তু উর্বশীর মধুর বচনে দেবতা এবং অসুর কেউই প্রকৃতিস্থ হলেন না। উপরন্তু অমৃতের নেশা নয়—অমরত্বের নেশায় তাঁরা পুনরায় সমুদ্রমন্থন করতে লাগলেন এবং অসাবধানতাবশত মন্দার পর্বত পাতালে চলে গেল। কামনার বিষজ্বালায় পর্বতও পাতালগামী হতে পারে। অসহায় দেবতারা প্রার্থনা করতে লাগলেন। পাতালের গহ্বর থেকে পর্বতকে কে উদ্ধার করবে? যে কোনও একজন অন্য সবাইকে পাপ থেকে উদ্ধার করে। সে কে? নিজের মনের ভিতরে থাকা চৈতন্যরূপী ঈশ্বর ব্যতীত সে শক্তি আর কারই-বা আছে? অবশেষে স্বয়ং বিষ্ণু অতল সাগর থেকে মন্দারপর্বত উদ্ধার করলেন। পুনরায় তিনিই দেবতাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে সাগরমন্থন করলেন। চৈতন্যই মনমন্থনের মন্দারপর্বত, যেখান থেকে পাওয়া যায়, অমৃত অভিজ্ঞানের দুর্লভ উপলব্ধি।

কামনার কাছে কি সবই তুচ্ছ হয়ে যায়! তাই অপ্সরাগণ সর্বসাধারণের ভোগ্যবস্তু। হায় অপ্সরা! অমরত্বের কামনার কাছে অন্যের সুখ-দুঃখ জীবনের লক্ষ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অপ্সরাগণ ভাগ্যকে মেনে না নিয়ে আর কি করত?

অনিন্দ্য সুন্দরী সুরার অধিষ্ঠাত্রী বরুণকন্যা দেবী বারুণী সমুদ্রগর্ভ থেকে প্রকট হলেন। দৈত্যরা বারুণীকে গ্রহণ করল না, কারণ তিনি ছিলেন সুরার দেবী। তাই সেইদিন থেকে দৈত্যরা সুরাপানে বঞ্চিত হয়ে অসুরনামে পরিচিত হল, এবং এই সুযোগে দেবতারা বারুণীকে গ্রহণ করেন সুর নামে খ্যাত হল। সমুদ্রমন্থন অব্যাহত। অবশেষে নির্গত হল পারিজাত পুষ্প, উচ্চৈশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী। এই সবকিছুরই প্রাপক দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র। এতে কেউই আপত্তি করল না। কিন্তু অমৃতের জন্য দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। প্রথার মুখে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার কথা শুনে আমি ভয়ে কাতর হয়ে প্রশ্ন করলাম—'অমৃত লাভের জন্য দেবতা ও দৈত্য উভয়েই সমুদ্রমন্থন করে, অতএব অমৃত উভয়েরই প্রাপ্য। নিজেদের মধ্যে অমৃত ভাগ করে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করল কেন?"

আমার কথা শুনে পিতা গম্ভীর হলেও প্রসন্ন হলেন। স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন—"মা অহল্যা, তোর বালিকামন যে নীতির প্রশ্ন তুলেছে, সে প্রশ্ন কিন্তু দেবতা ও দৈত্যদের মনে জাগেনি। অমৃত এমনই এক বস্তু, যার বন্টনের সময়ে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। দেবতা ও দৈত্যরা যুদ্ধে মত্ত হয়ে অমৃতের কথা ভুলে গেল এবং সেই সুযোগে বিষ্ণু অমৃত অপহরণ করলেন। বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তির কথা জেনেও অমৃতের মোহে কাণ্ডজ্ঞানহীন দৈত্যেরা বিষ্ণুর কাছে থেকে অমৃতহরণে উদ্যত হল। অমরত্বের অলীক কামনায় জর্জরিত দৈত্যগণ একের পর এক বিনাশ প্রাপ্ত হয় বিষ্ণুর দ্বারা দৈত্যনিধন হওয়ার পর নিষ্কণ্ঠক ইন্দ্র ত্রিলোকপ্রাপ্ত হলেন এবং মুনিঋষি

দেবতাসহ মানবকেও শাসন করলেন। অমৃতপান করে দেবতাগণ অমরত্ব লাভ করেন এবং কাশ্যপ পত্নী দিতি পুত্রশোকে মুহ্যমান হলেন। সত্য হোক কিংবা কাহিনী, প্রথার মুখে দৈত্যদের বিনাশ এবং দৈত্যমাতা দিতির দুঃখ অনুভব করে আমি কেঁদে ফেললাম। আমার মনে হল আমার বুকে মায়ের হৃদয়ের শোক উদ্বেল হয়ে উঠেছে। পিতা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"মা অহল্যা, ভেবেছিলাম দেবতাদের জয় ও অমৃত লাভের আনন্দে দৈত্যদের বিনাশের দুঃখ তোর কাছে গৌণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তুই শুধু শরীরে কোমল ও সৌন্দর্যময়ী নয়, তোর অন্তর ও উদারতার মহিমায় সৌন্দর্যময়। অবহেলিত ও পরাজিতদের দুঃখে তোর হৃদয় বিগলিত হওয়ায় সেই সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।"

অন্য দিনের মতো আমি নিজের প্রশংসায় উৎফুল্ল হতে পারলাম না। দিতির দুঃখে কাতর হয়ে আমি পিতাকে পুনরায় প্রশ্ন করলাম—"পিতা! এই সৃষ্টিতে কেন এত বৈষম্য? দেবতা, দৈত্য, মানব, দানব সকলেই যদি স্রষ্টার অসীম কলাত্মক প্রতিভার প্রকাশ তাহলে তারা একত্রে অবস্থান করতে পারবে না কেন? কেনই বা তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জগতের পরিকল্পনা করলেন স্রষ্টা! এই বৈষম্য থেকেই একদিন বিদ্বেষের সূত্রপাত হবে না কি"? আমার মুখে এই কথা শুনে পিতা যত আনন্দিত হলেন তার চেয়ে অধিক বিস্মিত হলেন। শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—"অহল্যা একথা সত্যি যে, আমি আমার শিষ্যাদের তোর সহচরীরূপে নিযুক্ত করে তোকে বেদজ্ঞানী করার চেষ্টা করেছি, প্রথাকে নির্দেশ দিয়েছি এই মাটির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে তোকে পরিচিত করাবার জন্য। নারদকেও তোর শিক্ষার ভার দিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোর বয়সের তুলনায় শিক্ষার ভার অধিক হয়ে যাচ্ছে। তাই এত অল্প বয়সেই অনেক জটিল বিষয়ে চিন্তা করে তুই মনকে ভারাক্রান্ত করছিস। তুই যা চিন্তা করছিস, সে বিষয়ে যদি ঋষি এবং দেবতারা চিন্তা করতেন তাহলে ব্রহ্মাণ্ড মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হত। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও শান্তিতে নেই। সেইজন্য অমৃত ও ঐশ্বর্যের সমবন্টন হচ্ছে না। স্বর্গরাজ্যেও রাজা প্রজার বিভেদ আছে। সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ইন্দ্রদেব নিজের আসনের সুরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত নন"। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য কিংবা তাঁর আসনের সুরক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম না। আমার আগ্রহ ছিল মাতা দিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য। তাই প্রশ্ন করলাম—"দিতির পুত্রশোক কিভাবে প্রশমিত হল?" পিতা রহস্যময় হাসি হাসলেন। সেই হাসিতে ছিল করুণা, শ্লেষ এবং ক্ষোভ। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষরত মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইন্দ্রহন্তা পুত্রলাভের জন্য দিতির তপস্যা ছিল খুবই স্বাভাবিক।" পুত্রশোকাতুরা পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে কশ্যপ বলেছিলেন —শুদ্ধাচারে তপস্যা করলে ইন্দ্রহন্তা পুত্রের জননী হওয়া সম্ভব হবে। কুশপ্লব অরণ্যে অধীরা জননী কঠোর তপস্যায় রত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সম্ভবত মাসির তপস্যার উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই তিনি মাসির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। দিতির তপস্যা ও সিদ্ধির জন্য অগ্নি, কুশ, কাঠ, জল, ফলমূল, ঘি, মধু, গোরস প্রভৃতি দ্রব্য তিনি এনে

দিতেন। দিতির তপঃক্লান্ত শরীরের সেবা ইন্দ্র স্বহস্তে করতেন। পুত্রশোকাতুরা মাসি শোকমুক্ত হওয়ার জন্য তপস্যা করছেন—এটাই ছিল ইন্দ্রের ধারণা। দেবরাজ ইন্দ্রের অনেক সৎগুণের মধ্যে গুরুজনের প্রতি সম্মানবোধ ও সেবাপরায়ণতা ছিল অন্যতম। ইচ্ছা করলে মাসির সেবার জন্য তিনি পরিচারিকা নিযুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজে মাসির পদসেবা করতেন এবং উচ্ছিষ্ট তুলতেন।

মাসি হয়েও ইন্দ্রের মৃত্যু কামনায় দিতি তপস্যা করছিলেন, সেই ইন্দ্রই ছিলেন তাঁর তপস্যার সহায়ক। নারীর হৃদয় কুসুম কোমল আবার কঠোর নির্দয়। দিতি ইন্দ্রের সেবায় বিগলিত। ইন্দ্রকে কোলে টেনে সরলা জননী পাপ প্রকাশ করে—"বৎস! আমি জননী হয়েও স্বার্থের জন্য রাক্ষসীর মতো আচরণ করছি। একথা সত্যি যে তুই আমার পুত্রদের বিনাশের কারণ। কণিকামাত্র অমৃত আমার পুত্রদের দিলে তারা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে তোদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকত। কিন্তু তাদের অমৃত থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করলে, তারাও সমুদ্রমন্থন করেছিল। সমস্ত ঐশ্বর্য তুই নিলি, তারা তাতে ভাগ বসায়নি। কিন্তু অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ হওয়াটা কি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়? তাই আমি ইন্দ্রহন্তা পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করছি। কিন্তু এখন তোর সেবায় আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। তোকে হত্যা করলেও আমার মৃত পুত্ররা ফিরে আসবে না। তাহলে কেন আমার মনে এই বিনাশকারী চিন্তার উদয় হল। তোকে হত্যার কথা চিন্তার করার সময় আমার বোন অদিতির কথা কেন আমার মনে পড়ল না? কি পাষাণী আমি। এখন আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র মুক্তির পথ খুঁজছে। আমি কিন্তু প্রথমেই তাকে বলব সে তোর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করবে না। তোমরা দু'জন ভ্রাতৃবিবাদ ভুলে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ত্রিলোকের মঙ্গলসাধন করবে। তার শিক্ষার ভার আমি তোকেই দেব। এখন আমি তপস্যা করব ইন্দ্রমিত্র পুত্রলাভের জন্য। তুই নিশ্চিন্তে থাক। আমার বলশালী পুত্রের দ্বারা জয় করা ত্রি-ভূবনের অধীশ্বর তুই হবি এই প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হবি তুই। সে তোর আজ্ঞাকারী হয়ে থাকবে। কিন্তু একটা শর্ত, সে তোর স্নেহ ভালোবাসার অধীন হবে। আদেশ ও অহঙ্কারের বশ্যতা স্বীকার করবে না। তুইও তার প্রতি স্নেহশীল না হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করবি কেন?"

দিতির সত্যভাষণে ইন্দ্র চিন্তিত হয়ে ওঠেন। জননীর তপস্যা নিষ্ফল হবে না। দিতির গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মলাভ করবে। সে হবে মহাশক্তিমান। দিতির কথানুসারে সে যে ইন্দ্রের অনুগত হবে তার নিশ্চয়তা কি আছে? পদ্মপাতায় জলের মতো ক্ষমতার আসন সর্বদাই দোদুল্যমান। তাই ক্ষমতাশীল ব্যক্তি স্বয়ং ইন্দ্র হলেও সর্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত।

দিতির শুদ্ধাচার ও তপস্যায় ইন্দ্র উদ্বিগ্ন। জননীর শুদ্ধাচারিতা সন্তানকে শক্তিমান করে। দিতি যদি শুচিতা হারায় তাহলে তার গর্ভস্থ সন্তান দুর্বল হয়ে যাবে। দিতি তাঁর শুচিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ইন্দ্রের উপর অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহে দিতি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যান। খোলা চুল মাটি স্পর্শ করে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। দিতির এই অসংযত দিবানিদ্রা ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে গর্ভস্থ সন্তান দুর্বল হয়ে যায়। এই সুযোগে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা দিতির গর্ভে আঘাত

করেন। দিতির গর্ভ ভঙ্গ হয়। শিশু ভ্রূণটি সাতখণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় দিতি অসহ্য যন্ত্রণায় রোদন করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, ইন্দ্রদেব ইন্দ্রপদ হারানোর আশঙ্কায় তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। দিতি নিজের বোনপো ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানায়—"বাসব, তুই ত্রিলোকের রাজা। আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তুই রক্ষা করতে পারবি। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রাজবৈদ্য ধন্বন্তরীও তোর পরিচিত, আমার গর্ভরক্ষা করার দায়িত্ব তোর।"

বিচিত্র ইন্দ্রর মন। যে ভ্রূণের বিনাশের জন্য তিনি নিদ্রিতা মাসির উদরে নির্দয়ভাবে আঘাত করেছিলেন, সেই ভ্রূণের রক্ষার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যকুল হয়ে ওঠে। স্বর্গরাজ্যের চিকিৎসাবিদ অশ্বিনীকুমারদের সাহায্যে তিনি দিতির গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। নিজের এই নিষ্ঠুরতায় আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হন ইন্দ্র। কিন্তু মায়ের মন আকাশের মতো উদার। অনুতপ্ত ইন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন—"ইন্দ্র, সিংহাসনলোভী মন বড়ই নিষ্ঠুর অবশ্য সিংহাসনের মোহ থাকা সত্ত্বেও তোর হৃদয়ে দয়া, করুণা ও প্রেমের অভাব নেই, সেইজন্যই তুই আমার সন্তানকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিস, তাই তুই নির্দোষ। আমার গর্ভস্থ ভ্রূণ সাতখণ্ডে বিভক্ত হয়েও অশ্বিনীকুমাদের চিকিৎসায় জীবনলাভ করেছে। তারা সাতটি শিশুরূপে জন্মলাভ করবে এবং সাত মরুৎ হিসাবে আকাশের সাত দিকে বিচরণপূর্বক ত্রিলোকের মঙ্গলসাধন করবে। কল্যাণমূলক কাজে তারা হবে তোর সাহায্যকারী।"

দিতির উদারতায় ইন্দ্র মুগ্ধ হলেন এবং ঐ সাত মরুৎ তাঁর মিত্ররূপে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সাত মরুৎ আবহ. প্রবহ, সংবহ, উদবহ, বিবহ, পরিবহ, পরাবহ নামে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মালোক এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করে সৃষ্টি রক্ষা করতে থাকে। ইন্দ্রহন্তা পুত্রলাভের জন্য তপস্যা অবশেষে সাত মরুতের জন্মের কারণ। মনভোলানো গল্প বলায় প্রথার সমকক্ষ কেউ নেই। আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে তার কথা শুনে কখনও হাসি, কখনও অসহায়ভাবে কাঁদি, মাঝে মাঝে বসে চিন্তা করি।

বেদপুরুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মা একদিন আমাকে চিন্তান্বিত দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—"মা, অহল্যা, ইন্দ্র বীর এবং দেবতাদের রাজা হলেও তাঁর শান্তি নেই। কারণ ক্ষমতালোভী হৃদয় নিজের পদের প্রতি অসহায় আসক্তির জন্য মাঝে মাঝে পাপকে প্রশ্রয় দেয়।"

আমি লক্ষ করেছি, ইন্দ্রের জয়গান করার সাথে সাথে ইন্দ্রের পাপকে প্রকাশ করতেও ভোলেন না পিতা। পিতার এই নিরপেক্ষতা আমার ভালো লাগে। কিন্তু আমার ভাই নারদ যখন ইন্দ্র বৃত্তান্ত শুরু করে, তখন প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা থাকে না। নারদদাদার মতে, যিনি ত্রিলোকের পালনকর্তা, তেত্রিশকোটি দেবতার শাসনাধিকারী, রাজ্যের সুরক্ষা তথা প্রজাকল্যাণের জন্য মাঝে মাঝে কূটনীতি অবলম্বন করতে তিনি বাধ্য। রাজনীতিতে পাপ, ব্যাভিচার, অন্যায়, দুর্নীতি ব্যতীত কেই-বা নিজের আসন বেশিদিন সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে? যে কূটনীতির আশ্রয় নেয়নি, সেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। বেচারা ইন্দ্র নিজের সিংহাসন সম্পর্কে এত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও বারংবার সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। একবার

ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করার পর ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা শরীর থেকে মস্তকচ্যুত হওয়ার মতো বেদনাদায়ক। শরীর থেকে মস্তকচ্যুত হওয়া বরং একপ্রকার মুক্তি, কারণ তখন পার্থিব যন্ত্রণার অনুভব থাকে না। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তি স্বর্গ থেকে নরকে যাওয়ার মতো দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হওয়ার সাথে পুনরায় ক্ষমতালাভের কুৎসিৎ সাধনায় নিজের বিবেক ও ব্যক্তিত্ব জলাঞ্জলি দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। নিজের পদের সুরক্ষার জন্য ইন্দ্র যদি কিছু অন্যায়ও করেন, তাহা অমার্জনীয় নয়। ইন্দ্র পাপ করলেও পাপমুক্ত হয়ে পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

অবশ্য রাজনীতি বা কূটনীতি সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। ঐ সমস্ত গভীর তত্ত্ব আমার বালিকামনের চপলতায় স্থান পায় না। কি লাভ ঐসব ব্যাপারে। আমি তো কখনও ক্ষমতাসীন হব না! ঐসব জটিলতত্ত্ব মাথায় ঢুকিয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করব কেন? অবশ্য আমার ভাই নারদের বাক্‌পটুতা ও বর্ণনা চাতুরীর সাথে যে পরিচিত, সে নিজের পাপ, মৃত্যু, কলঙ্ক এবং পরাজয়ের কথাও তাঁর মুখে শুনে আনন্দলাভ করবে। প্রথা এবং ভাই নারদের কাছে নানারকম গল্প শুনে শুনে বয়সের তুলনায় আমার কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তি প্রখর হয়ে উঠেছে। ভাই নারদের বীণার তারে বেসুরো রাগরাগিণী বাজিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলি—"ইন্দ্রদেবের সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ঘটনা নিশ্চয় চমকপ্রদ। আমাকে সেই গল্প বলো। না হলে আজ আমি আব পড়ব না। পিতা জিজ্ঞাসা করলে বলব—আজ আমাকে পড়াবার সময় তোমার হয়নি।"

পিতার নির্দেশে ভাই নারদ সপ্তাহে দু'দিন আমার লেখাপড়ার তদারকি করার জন্য মর্তের রম্যবনে আসেন। আমি তার কাছে পড়ি কম, আদর পাই বেশি। আমার কথা শুনে ভাই নারদ স্নেহমিশ্রিত মৃদু শাসনের সুরে বলেন—"পিতার কাছে প্রশ্রয় ও সকলের কাছে রূপের প্রশংসা শুনে শুনে তুই খুব বেড়েছিস; ভেবেছিস তুই যখন যা চাইবি কিছুই তোব অপ্রাপ্য নয়—এমন কি তুই চাইলে স্বয়ং ইন্দ্রদেবও ইন্দ্রপদ তোর পায়ে নিবেদন করে দেবে।" হ্যাঁ দিতে পারেন। চেয়ে দেখব? শুনেছি, তিনি মহান দাতা। সবাইয়ের অভিষ্ট পূরণ করেন। ভাই নারদকে রাগাবার জন্য আমি ইচ্ছা করেই বলি।

"অহল্যা তুই নিরাশ হবি, আমি ইন্দ্রদেবকে জানি, মাথা ছাড়া তিনি থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতা ছাড়া তিনি থাকতে পারবেন না। অবশ্য তাঁরই বা দোষ কি? তেত্রিশ কোটি দেবতা দিনরাত যদি তার স্তুতি করেন তিনি ব্যতীত ত্রিলোকে অরাজকতা দেখা দেবে বলে সবাই একই সুরে গাইতে থাকে, তাহলে যে কোনও লোকই নিজের পদবী ও পদকে নিজের আত্মা ও পৈতৃক সম্পত্তি মনে করবে। আমার মনে হয়, ইন্দ্রদেবের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির মূলে চাটুকার দেবতা ও ঋষিদের স্তুতি। যেমন তুই বিশ্বসুন্দরী সকলের এই চাটুবাক্য শুনতে শুনতে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে বড় ভেবে অহংকারে মত্ত হয়েছিস।"

এই কথায় আমার রাগ হয়। তাঁর তীরে তাঁকে আঘাত করে আমি বলি—"সেই চাটুকার দেবতার অগ্রণী আমার ভাই নারদ বলে আমি শুনেছি, সেটা কি সত্যি?" তিনি মোটেই

অপ্রস্তুত হলেন না। মজাকরে হাসতে হাসতে বললেন—চাটুকারও একটি পদবী। দানা-পানির ব্যাপার। তুই ছেলেমানুষ, দুমুঠো অন্ন কিভাবে যোগাড় হচ্ছে, তুই কি করে জানবি? আমার যে পেশা, লোককে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়, সে আমিই জানি। এটুকু জেনে রাখ—চাটুকার সকলের প্রশংসা করে কিন্তু সকলেই তার নিন্দা করে, কারণ সকলে জানে চাটুকার যেগুলি বলে, সেগুলি প্রকৃত প্রশংসা নয়, নেহাৎই চাটুবাক্য।"

"জেনে-শুনেও তাঁরা চাটুবাক্যে খুশি হয় এবং প্রশ্রয়ও দেয়?" বিস্মিতভাবে অমি প্রশ্ন করি।

ভাই নারদ সেই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলেন—"সেটাই তো আশ্চর্য, বক্তাও জানে মিথ্যা বলছে, শ্রোতাও জানে মিথ্যা শুনছে, তবুও মিথ্যাকে আশ্রয় না করলে আত্মবিশ্বাসের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। যাক্ সে কথা, ইন্দ্রেব সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ঘটনা আর একদিন বলব। এখন আমাকে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে যেতে হবে, পিতামহেব আদেশ। তোর লেখাপড়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য পিতা তাঁকে ডেকেছেন। আমার লেখাপড়া সম্পর্কে পিতা নিজে চিন্তা না করে গৌতম নামে এক মর্তবাসীকে কেন ডেকেছেন? আমি প্রশ্ন করি, ভাইয়ের সব কথাই কৌতুকে ভরা। হাসতে হাসতে বললেন—"মর্তের মানব হলেও গৌতম মর্তলোকের মহর্ষি তোর লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁর সাথে পরামর্শ না করে কি ভোগবিলাসী দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে পরামর্শ করতেন?"

"প্রতি কথায় ইন্দ্রের নাম না নিলে তোমার চাটুকার পদবী কি লোপ পাবে? মহর্ষি গৌতমের কথায় ইন্দ্র প্রসঙ্গ ওঠার যথার্থতা কোথায়.....?" সত্যিই আমি রেগে যাই ভাইয়ের ওপর। তিনি তো কখনও বিরক্ত হন না, আজও তার ব্যতিক্রম হল না। শান্তভঙ্গীতে বলেন—"যথার্থতা আছে, ইন্দ্রদেব এবং গৌতম একসময়ে প্রজাপিতা ব্রহ্মার শিষ্য ছিলেন। উভয়ে সহপাঠী বন্ধু। একজন জ্ঞানপিপাসু, অন্যজন ক্ষমতালিপ্সু, অবশ্য উভয়েই লোভী। মহর্ষি গৌতম এখন দেবর্ষি হওয়ার তপস্যার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। শুধুমাত্র ইন্দ্রদেব নয় সমগ্র দেবলোক মহর্ষি গৌতমের সাধনার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মহর্ষি গৌতমের তপস্যার উদ্দেশ্য ইন্দ্রপদ লাভ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। ইন্দ্রদেব বহুদিন থেকেই গৌতমের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কারণ জ্ঞানমার্গে তিনি কোনওদিন গৌতমের সমকক্ষ হতে পারেননি। সহপাঠীদের মধ্যে ঈর্ষা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু গৌতমের মহর্ষি থেকে দেবর্ষি হওয়ার প্রচেষ্টায় ইন্দ্রদেব আদৌ সন্তুষ্ট নয়। এটাও কি একধরনের পদবী লিপ্সা নয়? গৌতম ইন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা সে বিষয়ে দেবসভায় গোপন আলোচনা চলছে। কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মার প্রিয়তম শিষ্য হলেন গৌতম। কারণ জ্ঞান, অর্থ ও ঐশ্বর্য অর্জনের পথ সুগম করতে পারে কিন্তু অর্থ ও ঐশ্বর্য জ্ঞানার্জনের পথকে দুর্গম করে। এই দৃষ্টিতে জ্ঞানের স্থান অর্থের চেয়ে উচ্চে। জ্ঞানী নির্ধন হলেও সর্বত্র পূজিত কিন্তু ধনীব্যাক্তি বিদ্যা এবং জ্ঞানরহিত হওয়ায় পূজো পাওয়া দূরের কথা কেউ তাকে ভালোবাসে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষা মর্তের মানুষ মহর্ষি গৌতম অধিক শ্রদ্ধাভাজন নয় কি?

আমি তখনও দেবরাজ ইন্দ্র কিংবা মহর্ষি গৌতমকে দেখিনি। অবশ্য দেবরাজ ইন্দ্রের খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের কথা শুনেছি। বেদের প্রতি ছন্দে ইন্দ্রের অজস্র স্তুতি শুনেছি। তাই মহর্ষি গৌতম দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা এত সহজে কিভাবে মেনে নেব? দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের মতো বিচক্ষণ পণ্ডিত না হতে পারেন, কিন্তু মুর্খ তো নয়। পিতামহ ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ শিষ্য না হলেও শিষ্যত! সেইটুকুই একজনকে পূজ্য বিবেচিত করার পক্ষে যথেষ্ঠ। কিন্তু এইরকম তুলনার যথার্থতা কি? ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র এবং সংসার বিরাগী মর্তমানবের তুলনা কেনই বা করব আমি?

সুন্দর-অসুন্দর সবকিছুরই স্রষ্টা একজন। শিল্পীর তুলিতে কখনও ফুটে ওঠে পাপ কখনও পুণ্য, কখনও শুভ কখনও অশুভ। কিন্তু শিল্পী সুন্দরকে নিয়ে গর্ব করে আর অসুন্দরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জঞ্জালের স্তূপে। শিল্পীর হাতের দোষ হোক কিংবা রঙ তুলির দোষ, অসুন্দর সৃষ্টির তো দোষ নয়। নিজে দোষী না হয়েও অসুন্দরের স্থান সর্বদা জঞ্জালের স্তূপে, আর সুন্দর মাথার মুকুট।

আমার পিতামহ ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। শুভ, অশুভ অসুন্দর সুন্দরের শিল্পী। স্রষ্টা অহংকারের সিংহাসনে বসে থাকলে সৃষ্টি সার্বজনীন হয় না। একথা জেনেও পিতামহ অহংকারমুক্ত ছিলেন না। বিশেষত আমার সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর অহংকার দেবসভায় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। প্রতি সভাতেই আলোচনার বিষয়বস্তুকে যে কোনও উপায়েই তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে যেতেন। সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রসঙ্গ আলোচনা আরম্ভ হলেই তিনি আমার রূপের প্রাঞ্জল বর্ণনায় সবাইকে স্তম্ভীভূত করে দিতেন। পিতা সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, অহল্যা অনন্যা সুন্দরী এবং তিনি নিজেও দ্বিতীয় অহল্যা সৃষ্টি করতে পারবেন না। অর্থাৎ আমিও প্রথম এবং অন্তিম অহল্যা। আমার পূর্বে এবং পরে সৃষ্ট সমস্ত নারীই আমার চেয়ে কম রূপসী, পিতার এই ঘোষণায় যাটকোটি অপ্সরা এবং ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণীও ঈর্ষায় মলিন হয়ে যান বলে আমি ভাই নারদের কাছে শুনেছি।

আমার রূপ সম্বন্ধে পিতার অহংকার আমার অজান্তেই যে আমার মনে ভিতর অজগরের মতো চেপে বসেছিল, সেটা আমি অনেক পরে বুঝতে পারি। কিন্তু সেই বয়সেই রূপের অহংকারে আমি নিজেকে স্বপ্ন রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেছিলাম। আমার ঐ রকম আচরণের যথেষ্ট কারণও ছিল। আমি যে সুন্দরী, সেকথা শুধু দর্পণ নয়, বলত নরকিন্নর,পশুপাখী সকলের চোখ। এমনকি ফুলের ওপর শিশিরের বিন্দু ঘাসের ওপর বর্ষার জলও সগর্বে গোষণা করত আমার সৌন্দর্যের। আমার কাছে প্রকৃতির সৌন্দর্যও মলিন হয়ে যেত.। এমনকি স্বয়ং পিতামহ এবং ভাই নারদও আমার সৌন্দর্যে বিমোহিত। আমাকে দেখলে পিতার বেদোচ্চারণে বিঘ্ন ঘটত; ভাইয়ের বীণা বেসুরো বাজত।

পিতা এবং ভাইকে এইরকম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকাতে দেখলে আমার বুকের ভিতর অজ্ঞাত ভয় সৃষ্টি হত। সেই অল্প বয়সেই আমি চলে চাই চিন্তারাজ্যের কং গভীরে। আমার মনে পড়ে যায় প্রথার কাছে শোনা অতীতে পিতার এক পাপ ইচ্ছার কাহিনী। ত্বয়ি, বার্ত্তা, আনিক্ষিকা

এবং নীতি পিতার শিষ্যা হলেও তারা পিতার পাপপুণ্যের আলোচনা করতে পশ্চাৎপদ হয় না। হবেই বা কেন? গুরু কিংবা পিতামাতা যেই হোক না, পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা সকলের ক্ষেত্রে সমান। পাপ পুণ্যের আলোচনা না হলে ভবিষ্যতেব জন্য কি দৃষ্টান্ত থাকবে? ব্রহ্মার পাপের বর্ণনায় বার্ত্তার মুখ ব্যথা হয় না, অন্যেরা তার কথা পান করে। অন্যের পাপ ও কলঙ্ক অমৃতের মতো সুস্বাদু, অমৃতপানে অমরত্ব লাভ হয় কিন্তু পর নিন্দায় অকালমৃত্য হয। মৃত্যুকে ভয় নেই বলেই মানুষ বারংবার পুনর্জন্ম চায়। আমিও স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলাম পিতার পাপের কাহিনী।

পিতামহের কন্যা সরস্বতী যেমন বিদুষী তেমনই রূপসী। তিনি কামরহিতা হওয়ায় তাঁর সাত্ত্বিক সৌন্দর্য তাঁকে অধিক আকর্ষণীয়া করে তোলে। নিজ কন্যা সরস্বতীর অপূর্ব সৌন্দর্যে পিতা একদিন কামমোহিত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মার দশপুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মাব এই অধার্মিক আচরণে লজ্জিত ও মর্মাহত হয়ে নির্ভিক চিত্তে পিতাকে ধিক্কার দিলেন—"হে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা, আপনি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা. আপনার দক্ষিণহস্তে ধর্ম ও পৃষ্ঠদেশে অধর্ম বিরাজ করছে। অধর্মকে পিছনে রেখে আপনি দণ্ডনীতি প্রণয়ন করেছেন নিজের দেহ ও মন থেকে কলাত্মক চেতনাকে আলোড়িত করে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আপনি নিজের থেকে সরস্বতী এবং কাম উৎপন্ন করে স্বয়ং কন্যার প্রতি কামাসক্ত হচ্ছেন। আপনার পূর্বে অন্য কোনও ব্রহ্মা এরকম পাপাচার করেন নি। আপনার এই পাপ ভবিষ্যতে পিতা পুত্রীর সম্পর্ককে পাপজর্জর করবে। পৃথিবীতে কামরহিত পবিত্র সম্পর্ক বলে আর কিছু থাকবে না। আপনার এই অধর্মাচরণ শিল্পীমনের সাত্ত্বিক প্রতিভাকে কলুষিত করবে। ভবিষ্যতে রক্ষক-ই হবে ভক্ষক। শিল্পী শিল্পকে পণ্য করবে। আপনার এই আচরণে আমরা পুত্ররা অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছি।"

মাঝে মাঝে তরুণও বয়োঃজ্যেষ্ঠের পথ প্রদর্শক হতে পারে। পুত্রদের ভৎর্সনায় লজ্জিত হয়ে ব্রহ্মার কামবাসনা নিমেষেই নির্বাপিত হয়ে গেল সত্যি, কিন্তু আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়ে তিনি নিজের শরীর ত্যাগ করলেন। তখন চতুর্দিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ব্রহ্মার পাপ থেকেই সৃষ্টি হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম অন্ধকার।

পিতার শরীর ত্যাগের কাহিনী শুনে আমি বিব্রত ও ব্যথিত হওয়ার সাথে সাথে বিস্মিত হলাম। শরীর ত্যাগের পর পিতা আবার বিশ্ববিস্তার করলেন কিভাবে? আমি বার্ত্তাকে প্রশ্ন করলাম।

স্মিত হেসে বার্ত্তা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"তুমি নিতান্তই সরল—শরীর ত্যাগের অর্থ মৃত্যু নয়, আবার মৃত্যুও। মানুষ তার জীবদ্দশায় কতবার মৃত্যু বরণ করে? প্রতিদিন মানুষ নিজের শরীর ত্যাগ করে নবকলেবর ধারণ করে। প্রতিদিন নূতন মানুষ হিসাবে জীবনের উপলব্ধি পায়। নিজের শরীর, মন ও চেতনা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় ভুল ও অসুন্দরতা। যে, তা না করে সে জীবন্ত হলেও তার মধ্যে জীবনের যথার্থ স্পন্দন থাকে না সে প্রতিদিন নূতন নূতন মরণলাভ করে। ব্রহ্মা তপঃনিষ্ঠ, বেদজ্ঞানী। নিজের মুহূর্তের ভুলের

জন্য তিনি হাজার-হাজার বছর তপস্যা করেন। নিজের কামাসক্ত শরীরকে পশ্চাত্তাপে দগ্ধ করে তপস্যার মন্ত্রজলে স্নান করে দিব্যরূপ ধারণ করেন। পাপ করা যত বড় পাপ নয়, পাপ করে প্রায়শ্চিত্ত না করা তার চেয়ে বড় পাপ। প্রায়শ্চিত্তের অন্তে ব্রহ্মা পুনর্বার সৃষ্টি বিস্তারের মনস্থ করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর কামরহিত পুত্র মারীচ ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার সম্ভব নয়। স্রষ্টা হওয়ায় তিনি অনুভব করেন, সৃষ্টি বিস্তারে কামেরও প্রয়োজন আছে। প্রেমময় কামকলা পাপ নয়, কিন্তু বীভৎস কামবাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য কামাসক্ত হওয়া পাপ। সৃষ্টি বিস্তারের কল্যাণকর ভাবনায় জন্ম দিলেন স্ত্রী-পুরুষযুগল স্বয়ম্ভু সার্বভৌম সম্রাট মনু এবং তাঁর স্ত্রী মহারাণী শতরূপার। সেই দু'জন সৃষ্টি বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিথুন মার্গে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে ব্রহ্মার উদ্দেশ্য সফল করেন।

বার্তার বর্ণনা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। কামবাসনা থেকে পাপ এবং পাপ থেকে সৃষ্টির কল্যাণে উত্তরণ, পিতার ব্যক্তিত্বকে আমার কাছে আরও মহিমময় করে তোলে। এইসব সত্যি হোক বা কল্পনা—অত্যন্ত ভাবব্যঞ্জক এবং শিক্ষাপ্রদ। আমি ভাবলাম—সৌন্দর্য কি দিগ্‌ভ্রষ্ট করার জন্য বাঞ্ছনীয়? কামবাসনা স্বাভাবিক—কিন্তু তার থেকে মুক্ত হয়ে মনকে বাসনামুক্ত করা হল শ্রেষ্ঠ কর্ম, কিন্তু সৌন্দর্যের সাথে কামবাসনা কি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? যদি একথা সত্য তাহলে পিতা আমার শরীরে অফুরন্ত সৌন্দর্য ভরে দিয়েছেন কেন? সৌন্দর্যের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার বয়স সেটা নয়। আমার সৌন্দর্যের অহংকার ধীরে ধীরে আমাকে আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করেছিল। নিজের সৌন্দর্যে নিজে বিভোর হয়ে আমি স্বপ্ন বিলাসিনী হয়ে উঠলাম। একা আমি নয়, ঐ বয়সে সকলেই স্বপ্ন-পিপাসু হয়ে থাকে। আমি একটু বেশি কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠেছিলাম। তার কারণ সংসার সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর সংসার কি? পারিবারিক জীবন কি রকম, আমার বয়সী মেয়েদের আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত? এইসব ছিল আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। আমি যে আশ্রমে পালিত হচ্ছিলাম বলতে গেলে সেটি ছিল নির্জন। কারণ শুধুমাত্র আমার লালন পালনের জন্যই পিতা ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু পিতা থাকতেন ব্রহ্মালোকে। অবশ্য তিনি প্রায়ই আমার কাছে আসতেন, ভাই নারদও নিয়মিত আসতেন। আমার সাথে আশ্রমে থাকত প্রথা, আমার সহচরী ও আমার বাল্যবান্ধবী ঋচা। আমাকে কোনও কাজ করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধে বেদের পংক্তি গুনগুন করে আমি এ কুঞ্জ থেকে ও কুঞ্জে উড়ে বেড়াতাম। আমি শুধু ফলমূলই খেতাম। রান্নার ধার ধারতাম না। কার জন্যই বা রান্না শিখব? মা না থাকায় যত্ন করে সংসারের কাজকর্ম শেখাবার কেউ ছিল না। আমি অত্যন্ত খোলামেলা উন্মুক্ত জীবন কাটাতাম।

বনলতিকার মতো আমি ইচ্ছামত লতিয়ে যাচ্ছিলাম। জীবনের পথে। বাধা বন্ধন ছিল না। বর্ষার জল আমাকে স্নান করিয়ে দিত। সূর্যালোক আমার ভিজে চুল শুকিয়ে দিত। মরুৎগণ আমার কেশবিন্যাস করত। বনফুল আমার খোঁপা সাজিয়ে দিত। ঘাসফুলের রং আমার পায়ের পাতা রাঙিয়ে দিত। আমার বসন-ভূষণ, খাদ্যপানীয়, প্রসাধন সবকিছুই

প্রকৃতি অনায়াসে উজাড় করে দিত। তাই আমি ছিলাম প্রকৃতি কন্যা। আমি মা-মা ডাকলে প্রকৃতির প্রতিধ্বনি আমার ডাকের জবাব দিত, আমার খেলার সাথী ছিল গাছপালা, ঝরণা, পশুপাখী। আমি তাদের ভাষা বুঝতাম, তারা আমার। তা না হলে আমার মনের কথা জেনে তারা সবকিছু আমার কাছে উজাড় করে দিত না।

ঘরের কাজ অবশ্য কিছু করতাম না। পশুপাখী, গাছপালার যত্ন নিতাম। শুধু আশ্রমে নয়, আশ্রমের বাইরেও অরণ্যের সমস্ত পশুপাখী, গাছপালা, কীটপতঙ্গ—সবাই ছিল আমার অন্তরঙ্গ। কাবও দুঃখ আমি সহ্য করতে পাবতাম না। শীতে ঘাসপাতার চোখ ছলছল করতে দেখলে আমি ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে নিজেকে ভিজিয়ে নিতাম শীতের চোখের জলে। ঘাস ফুলের চোখ মোছা হয়ে যেত আমাব স্পর্শে। রৌদ্রতাপে লতাপাতা দগ্ধ হলে, আমি আমার চোখের জলে ভিজিয়ে দিতাম তাদেব। অরণ্যেব কাঁটা বিঁধে আমার পদতল রক্তাক্ত হলে, আমি নিরীক্ষণ কবতাম সেই কাঁটাটিকে। কাবণ, আমাব পাযে বিদ্ধ হওয়ায় তার কষ্ট হচ্ছে না তো! পাথরের আঘাতে একবার আমার মাথায় রক্তক্ষরণ হওযায় আমি পাথরটিকে স্পর্শ করে পরীক্ষা করি—আমার মাথা পাথরেব চেয়ে কঠিন নয তো! রক্ত আমার মাথা থেকে ঝরছে না, পাথরের গা থেকে ঝরছে। আমি কখনও একটা ফুল তুলে নিজের খোঁপায় লাগাই না। আমার মনে হত, একটা ফুল ছেঁড়া অর্থাৎ দু'টি দবদিপ্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে দেওযাব সমান দুঃখদায়ক। এমনকি আমার নিজেব আহারের জন্যও আমি ফল সংগ্রহ করতাম না। ফুল নিজে থেকেই ঝবে পড়ত আমার খোঁপায। ফল নিজেই পড়ত আমার খাদ্যের জন্য। সূর্যোদয়ের পূর্বেই পক্ষীরা নানাবকম কূজনে অবণ্য মুখরিত করত আমার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। মরুৎগণ সুবাসিত করত আকাশ পৃথিবী। আমি একাকী বোধ করলে বনলতিকারা আমায় আলিঙ্গন করে আমার গালে এঁকে দিত চুম্বন। আমি চকিত হয়ে স্পর্শ করতাম আমার গাল, পুনবায় ফুলের অধর কে বেশি কোমল। আমার চতুর্দিকে ঘিরে থাকা প্রকৃতি, পাহাড়, পর্বত, ঝরণা, নদী, ঘাস এবং ধূলিকণাও ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাদের সাথে ছিল আমার এক দিব্য সম্পর্ক। তাই নিঃসঙ্গতাব মধ্যেও পরিপূর্ণতাব কলরবে আমার অনুঢ়া হৃদয় মুখরিত হত।

অন্য আশ্রমেব মুনিকুমারীদেব সংস্পর্শে আমি কখনও আসিনি। হৈমবন্ত পর্বতের পাদদেশে গভীর অরণ্যে এই নির্জন স্থানে পিতা কেন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমি তখন বুঝতে পারিনি। পরে জানতে পারি। আমার অভূতপূর্ব সৌন্দর্যে পাছে মুনি-ঋষিদের তপঃভঙ্গ হয় বা আমাকে পাওয়ার অনুচিত কামনায় তাদের মধ্যে বৈরীভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি হয়, সেই ভয়ে পিতা আমাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় ছিল না। কিন্তু আমি নিঃসঙ্গও ছিলাম না। আমার সঙ্গী ছিল আমার চতুঃপার্শ্বস্থ মহাপ্রকৃতি।

"মাটি সকলকে পালন করেও স্বয়ং প্রভা রসপূর্ণা—মধুমতী। তবুও সূর্যের তুলনায় তুচ্ছ। সেইরকম অহল্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী, সৌন্দর্যতত্ত্বের শেষকথা হলেও ইন্দ্রের তুলনায় তুচ্ছ।"

একদিন হঠাৎ এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে ত্বয়ি। এইরকম অপ্রাসঙ্গিক তুলনার উদ্দেশ্য কি, সেটা ত্বয়ি জানে। কিন্তু আমি বিরক্ত হলাম। এগারো বছরের বালিকা হলেও নিজের রূপের অহংকার আমার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তার কারণ তো পিতা ব্রহ্মা, একথা সবাই জানে। নিজের কন্যা অহল্যার সৌন্দর্যে পিতা গর্বিত। এমন কি ইন্দ্রসভার অপ্সরারাও আমার চেয়ে সৌন্দর্যে ন্যূন বলে পিতা প্রতিদিন সগর্বে ঘোষণা করেন।

এই কথা শুনে ইন্দ্রদেব নাকি আমার সৌন্দর্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—'তাহলে তো অহল্যার স্থান ইন্দ্রলোকে।'' অবশ্য একথা বলার যথার্থতা আছে! ব্রহ্মাণ্ডের সকল দুর্লভ বস্তুর ভোক্তা হলেন ইন্দ্রদেব। অহল্যা যদি নারী শ্রেষ্ঠ; তাহলে সেও ইন্দ্রভোক্তা হওয়া স্বাভাবিক। অহল্য সুন্দরীশ্রেষ্ঠা এবং ইন্দ্রদেব সুরশ্রেষ্ঠ। যদি ইন্দ্রদেব এবং অহল্যার মধ্যে তুলনাত্মক বিচার করা যায়, তাহলে অহল্যার চেয়ে ইন্দ্রের সৌন্দর্য শতগুণ বেশি বলে আমার চারসখী ত্বয়ি, আনিক্ষিকা, নীতি এবং বার্ত্তার দৃঢ় অভিমত। সেইজন্যই ত্বয়ি আমার মুখের ওপর এইরকম অপ্রিয় কথা বলে দেয়। বৈদিক ঋষিরা নয়, দেবতা, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, নর কিন্নর সবাই ইন্দ্রদেবের সুন্দর প্রেমময় ব্যক্তিত্বে অভিভূত। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক সর্বত্রই ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে প্রিয় অপ্রিয চর্চা চলছে। তিনি বহু বাঞ্ছিত, বহু চর্চিত অথচ বিতর্কিত পুরুষ। সেইজন্য তাঁর জন্ম, তাঁর পিতামাতা, পরিবার, অতীত, ভবিষ্যৎ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা মতামত প্রকাশিত হত। বিতর্কিত পুরুষ হওয়ায তাঁর প্রশংসক যত নিন্দুকও ততোধিক। তাঁর নিন্দা ও প্রশংসা শুনতে শুনতে আমার মনে ইন্দ্রদেব সম্পর্কে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। তাই সেদিন আমি জেদ ধরেছিলাম ইন্দ্রদেব সম্পর্কে সব কিছু জানার জন্য—তাঁর জন্ম, পিতামাতা, অভিরুচি, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ.....। আমার কাছে সবকিছুই ছিল চাঞ্চল্যকর কাহিনী, কিংবদন্তি।

ত্বয়ি, অনিক্ষিকা, বার্ত্তা ও নীতি এইরকম সুযোগ খুঁজছিল। সম্ভবতঃ তারাও ইন্দ্রগাথা গাইতে আনন্দ অনুভব করত। তাই মাঝে মাঝে তারা ইন্দ্রদেবের কীর্তি আমার কাছে ব্যাখ্যা করত। আজ আমি সমস্ত ইন্দ্রকীর্তি শুনতে উৎসুক হয়ে উঠেছি। তারাও আমাকে ঘিরে সাগ্রহে বসে পড়ে লতাকুঞ্জে। ত্বয়ি আরম্ভ করে ইন্দ্রদেবের জন্মবৃত্তান্ত। সত্যি যেন সে স্বচক্ষে দেখেছে ইন্দ্রদেবের জন্ম। তার কথা থেকে এটুকু নিশ্চিত যে, সে ইন্দ্রদেব সম্পর্কে কোনও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করছে না। যা বলছে, যুক্তি প্রমাণসহ বলছে। আমার চারসখীই অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন। তাই, তাদের কথা আমার কাছে বেদবাক্য-স্বরূপ। বয়সের ভারে প্রথা মাঝে মাঝে মনগড়া কাহিনী কিংবদন্তী বলে। তার চিন্তাধারা অত্যন্ত রক্ষণাত্মক ও রুচিশীল। তাই তার কাছে ইন্দ্রগাথা শুনলেও আরও একবার শোনার জন্য সখীদের কাছে জেদ ধরলাম।

ত্বয়ি বলে—''শোন সখী, ইন্দ্রদেব ত্রিলোকপালক ও অচিন্ত্যপুরুষ হওয়ায় তাঁর সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করা লোকচরিত্রের বৈশিষ্ঠ। এমনকি তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। যদিও ইন্দ্রদেব ঋষি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র হিসাবে পরিচিত কিন্তু ইন্দ্রের প্রকৃত পিতামাতা সম্পর্কে নানা কথা কানে আসে। কেউ কেউ বলে, কোনও অজ্ঞাত

আর্যকূলসম্ভূতা কুমারী মাতার অবৈধ সন্তান ইন্দ্র। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকনিন্দার ভয়ে সেই কুমারীমাতা ইন্দ্রের মতো তেজস্বী, সুস্থ-সুন্দর পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। কেউ বলে ইন্দ্র দৌসের পুত্র, আবার কেউ বলে ইন্দ্রের পিতা দাস ছিলেন। এইরকম অবৈধ সন্তানকে ত্যাজ্য করার সিদ্ধান্ত নেন দেবতারা। কিন্তু দয়াময়ী অদিতি ও হৃদয়বান ঋষি কশ্যপ শিশু ইন্দ্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কালক্রমে ইন্দ্রের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কলঙ্কিত জন্মবৃত্তান্ত ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু মেধাবী বিচক্ষণ স্বাভিমানী ইন্দ্রের স্মৃতি থেকে বাল্যকালের সেই লাঞ্ছনাময় স্মৃতি অপসৃত হয় না। বোধহয় সেইজন্য ইন্দ্র মাঝে মাঝে উগ্র দুধর্ষ ও জ্বালামুখী হয়ে ওঠেন। বাল্যকালেই নিজের দাস পিতাকে হত্যার চেষ্টা করেন। তাঁর অবাঞ্ছিত জন্মের পিছনে দাস (অনার্য) বংশের পিতার ভূমিকা আর্যকূলসম্ভূতা জননীর চেয়ে নিশ্চিতভাবে অধিক। ইন্দ্রদেবের পিতৃকূল অনার্য ও মাতৃকূল আর্য। কিন্তু বাল্যকালে অনার্যকূলের কোনও পুরুষ বা রমণী তাঁকে পুত্রহিসাবে গ্রহণ করেনি, কারণ অনার্য বা দাসগোষ্ঠী ছিল মাতৃকেন্দ্রিক। তাই ইন্দ্র আর্য মাতার পরিচয় নিয়ে আর্যহিসাবে গ্রাহ্য হন। আর্যকূলসম্ভূত ঋষি কশ্যপ ও মাতা অদিতি এই বুদ্ধিমান, সুন্দর, বীর এবং সর্বগুণসম্পন্ন অবাঞ্ছিত শিশুটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে লালন-পালন করেন। তাঁরা তাঁকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেরণা দেন। এই কারণে বাল্যকাল থেকেই ইন্দ্রদেব মাতৃকূলের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং পিতৃকূলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। এই ঘৃণা যুক্তিসঙ্গত। প্রথমত অনার্যকূলসম্ভূত পিতা বাল্যকালেই ইন্দ্রকে হত্যার চেষ্টা করেন এবং অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করেন। এক অবিবাহিতা আর্যকুমারীকে গর্ভবতী করার পিছনে অনার্য পুরুষের প্রেমভাব অপেক্ষা কামভাবই অধিক একথা নিশ্চিত। 'প্রেম' শৃঙ্খলিত কাম উচ্ছৃঙ্খল। তাই নিজের অবৈধ জন্মের জন্য মাতা অপেক্ষা পিতাকেই তিনি অধিক দোষী মনে করেন। দ্বিতীয়ত কশ্যপ ও অদিতির পুত্র হিসাবে পরিচিত হওয়ার পর নিজের কলঙ্কিত জন্মবৃত্তান্ত লোকের মন থেকে দূর করার জন্য আর্য প্রতিনিধি হিসাবে অনার্যদমন শুরু করেন। আর্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অনার্যদমনও এক প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন ইন্দ্রের পিতা ছিলেন শিল্পী ত্বষ্টু। ইন্দ্রের জন্য তিনি বজ্রনির্মাণ করেছিলেন। ইন্দ্রকে সোমপান করিয়েছিলেন সর্বপ্রথম। ইন্দ্রকে দুধর্ষ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিক্ষাদাতাও পিতৃতুল্য। বোধহয় সেইজন্য কেউ কেউ ত্বষ্টুকেও ইন্দ্রের পিতা বলে থাকেন। নিজ পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে বাল্যকাল থেকেই যে সন্দেহ জন্মেছিল, তাহাই তাকে উগ্র, প্রতিশোধ পরায়ণ ও অনার্য দমনকারীতে পরিণত করেছিল।

ইন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত শুনে আমি ক্ষুব্ধ হলাম। কার ওপরে ক্ষুব্ধ হলাম ঠিক জানি না, কিন্তু যে সমাজ পাপকে ঘৃণা করার পরিবর্তে নিষ্পাপকে ঘৃণা, অবহেলা ও লাঞ্ছিত করে অবশেষে উগ্র, প্রতিশোধ পরায়ণ, দমনকারীতে পরিণত করে, আবার তাকেই অপরাধী বলে ঘোষণা করে, অমি সমাজের সেই পুরোধাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে। আমার স্পষ্টবাদিতা ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমার সখীরা জানে। তাই প্রসঙ্গ বদলের জন্য তুয়ির মুখ

থেকে কথা কেড়ে নিয়ে অনিক্ষিকা বলে—"জন্ম তো মানুষের হাতে নেই। তার জন্য এত গৌরচন্দ্রিকা কেন?" অহল্যা, ইন্দ্রের রূপ, গুণ ও ব্যক্তিত্বের কথা শোন.....। যেজন্য ত্বয়ি আজ তোমাকে তুচ্ছ বলল, সেই কথাটা শোন। ইন্দ্রের রূপ তো তুমি দেখনি। দেখলে বুঝতে পারবে যে, তাঁর রূপ অবর্ণনীয়। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব বর্ণনা করব—কিন্তু আমার বর্ণনা অপেক্ষা ইন্দ্র শতগুণ সুন্দর।"

"আচ্ছা—যতটা সম্ভব ততটাই বর্ণনা কব..... "আমি ব্যগ্র হয়ে উঠি ইন্দ্ররূপের বর্ণনা শোনার জন্য। অম্বি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বর্ণনা করে চলে ইন্দ্ররূপ—

"ইন্দ্রদেব অনন্য মানবীয় রূপ-গুণে বিভূষিত হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। ইন্দ্রদেবের শরীর কেবল দীর্ঘ ও বিশাল নয়, অত্যন্ত সৌম্য, সুঠাম এবং সুদৃঢ়। শরীর অনুযায়ী মস্তক সুঠাম ও শক্ত। তাঁর বজ্রবাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং শক্তিশালী। হস্তযুগল সুন্দর ও সুগঠিত। অরুণবর্ণ করতল। শক্তি সম্পন্ন প্রশস্ত করতল অশ্বদের দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। পদ্ম ডাঁটির মত মাংসল শক্ত আঙ্গুলগুলি বজ্রনিক্ষেপে নিপুন। তাঁর কর কমল এমনই মনোরম যে, হাত বাড়ালে ত্রিলোক সম্মোহিত হয়ে যায়। তাঁর সু-উচ্চ সুন্দর গণ্ডদেশের অস্থি সমূহ তাঁর স্বাভিমান ও বীরত্ব প্রকট করে। ইন্দ্রদেবের উদর বিস্তৃত এবং শক্ত, যার ফলে তিনি প্রচুর পরিমাণে সোমরস উদরস্থ করতে পারেন। তাঁর কণ্ঠদেশ সুডৌল ও সুঠাম। পেশীবহুল প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ। আকাশের মতো প্রশস্ত তাঁর ললাট। চক্ষুদ্বয় পূর্বাহ্ণ সূর্যের ন্যায় মনোরম এবং উজ্জ্বল। উদিত চন্দ্রসম তার স্বর্ণাভ গণ্ডদেশ। পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সু-উচ্চ নাসা অত্যন্ত সুশোভন। মধুবর্ণ বঙ্কিম অধর সোমরসের মতো মাদকতায় ভরা। সেইজন্য তিনি সুশ্রিপ্র নামে খ্যাত। কদম্ব পুষ্পের কেশরসম উজ্জ্বল পীতবর্ণ তাঁব মুখমণ্ডল। স্বর্ণবর্ণ মনিময় রত্নখচিত তাঁর অঙ্গ। তাঁর ঘন কুঞ্চিত কেশ এবং শ্মশ্রু ও স্বর্ণাভ উজ্জ্বল। ইন্দ্রদেবের কণ্ঠে অমূল্যরত্নমালা, কটীদেশে মহামূল্য চন্দ্রহার। আঙ্গুলে রত্নখচিত অঙ্গুরীয়। মনিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কন শোভা পায়। যখন তাঁর চিত্ত প্রসন্ন তখন তাঁর নীলকমল সদৃশ চক্ষুদ্বয়ের পদ্মকেশরসম মাধুর্যপূর্ণ কটাক্ষপাত উল্লসিত, প্রেমাসক্ত করে দেয় জড় ও জগৎকে। ইন্দ্রদেবের করকমলে নখগুলি মুক্তোর সদৃশ। সেখানে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রতিফলিত হয়। তাঁর চরণকমল থেকে আরম্ভ করে সকল অঙ্গ একটির চেয়ে অন্যটি অত্যন্ত মনোরম। যে অঙ্গটির ওপর চক্ষু স্থিরীভূত ও নিশ্চল হবে, অন্য অঙ্গটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিত্তচঞ্চল করবে। সেই দিব্যপুরুষের রূপ ও শরীর জাগতিক সমস্ত বস্তুর সৌন্দর্যের সারাংশ বললে অত্যুক্তি হবে না। সূর্য যেমন নিজেকে প্রকাশিত করে ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করে, সেইরূপ ইন্দ্র রূপের তেজে নিজেকে উদ্ভাসিত করার সাথে সাথে অপরকে সম্মোহিত করেন। শৌর্য ও সৌন্দর্যের বলে তিনি অচেতনকে চেতন করেন এবং চেতনকে বিমূঢ় করে দেন।"

একসাথে ইন্দ্রদেবের আপাদমস্তক বর্ণনা করে নিজে সম্মোহিত হয়ে যায় অম্বি। ত্বয়ি, বার্ত্তা এবং নীতি নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ভাববিহ্বল।

ইন্দ্রদেবের এই অচিন্ত্য সৌন্দর্য বর্ণনায় আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। তাঁর সৌন্দর্যের তুলনায়

আমার রূপ যে 'তুচ্ছ' এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এই সুরসিক আর্যবীর ইন্দ্রের দর্শনের জন্য আমার কিশোরী মনের কৌতূহল সীমা লঙ্ঘন করে। কিন্তু আমি জানি ইন্দ্রদেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে না। কেন কে জানে পিতা সেটা চান না। অবশ্য পাঁচ-ছ'বছর বয়সে অস্পষ্টভাবে ইন্দ্রদেবকে দেখেছিলাম। সেই অস্পষ্ট স্মৃতি ইন্দ্ররূপ বর্ণনায় আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

আমাকে আনমনা দেখে বার্ত্তা আমার পিঠ চাপড়ে বলে—"একদিন না একদিন ইন্দ্রদেবের সাথে তোমার নিশ্চয় সাক্ষাৎ হবে। তখন আর তুমি এগারো বছরের কিশোরী থাকবে না। তখন তুমি পূর্ণযুবতী এবং নিশ্চয় কোনও ভাগ্যবান জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পত্নী হয়ে থাকবে। ইন্দ্রদেবের কিছু না কিছু অনুগ্রহ লাভে তোমার আশা থাকবে। তোমার স্বামী রাজা হন বা ঋষি, মনস্কামনা পূরণের জন্য তিনি নিশ্চয় যজ্ঞ করবেন এবং ইন্দ্রদেব যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে সকল কামনা পূবণ করবেন। সখি! ইন্দ্রের, সুগঠিত শরীর ও বীরত্বেই তাঁর পৌরুষ সীমিত নয়, তাঁর অজস্র গুণ আছে। তিনি দানবীর হিসাবে খ্যাত। তাই তিনি 'মঘবান' রূপে পরিচিত। অন্ন, ধন, স্বামী, পত্নী, সন্তান, গোধন, বিজয়, প্রসন্নতা সবকিছুই তিনি অকাতবে দান করেন। তিনি অভিষ্ট পূরণকাবী। প্রার্থনা করলে যে তিনি দান করেন তা নয়, বিনা প্রার্থনায়ও দান করার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে থাকেন। তিনি এমনই দানশীল যে পঙ্গুকে অঙ্গদান, অন্ধকে চক্ষুদান, মূককে জিহ্বা দান কবতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন না। এইরকম কথা শুনে তুমি নিশ্চয় ভাবছ, ইন্দ্রদেবের তো অতুল ঐশ্বর্য, তিনি দাতা হবেন না কেন? কিন্তু ইন্দ্রের দানশীলতা কেবলমাত্র পার্থিব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক বাসনাও পূরণ করেন। সংগ্রামকারীকে জয়, পুণ্যকামীকে পুণ্য, পুত্রকামীকে পুত্র, জ্ঞানপিপাসুকে জ্ঞান, প্রেমীকে প্রেম, তপস্বীকে সিদ্ধি এমনকি ভোগলিপ্সুকে ভোগ এবং পাপালিপ্সুকে পাপও প্রদান করেন। কেউ চাইলে তিনি ত্রিলোকও দান কবতে পাবেন। তাই গৃহস্থ হোক বা সন্ন্যাসী ভৌতিক, বৌদ্ধিক, তথা আধ্যাত্মিক ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল প্রকার অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থী হতে হবে। তখন ইন্দ্রও তোমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে যাবেন। কারণ ইন্দ্রের তুলনায় তোমার সৌন্দর্য ন্যূন হতে পারে—কিন্তু তুমি তো ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রদেবকে তোমারই পাওয়ার কথা, কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মা তোমার জন্য ইন্দ্রদেবকে যোগ্য মনে করেন না।"

বার্ত্তা বলেন—"সারা সংসারের সম্বন্ধ করছেন। কে কার জন্য উপযুক্ত, সে কথা তিনি জানেন। বিবাহের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই আমাদের অহল্যার জন্য যদি তিনি ইন্দ্রকে উপযুক্ত না মনে করেন তার পিছনে নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।" নীতি মুখ ঘুরিয়ে বলে—"কারণ আর কি! একটাই কারণ। মানুষের যত গুণই থাক, সে যদি সংযমী না হয় তাহলে সে নিজেও সুখী হবে না কিংবা জীবনসাথীকে সুখী করতে পারবে না। কথায় বলে—"যদিও থাকে গুণ হাজার, চরিত্র ছাড়া সবই অসার।" ইন্দ্রদেবের চরিত্র সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। নীতির কথায় বিরক্ত হয় বার্ত্তা। বলে—'ইন্দ্রদেবের ভালো গুণগুলি

অহল্যার কাছে বলার সাথে সাথে খারাপ গুণগুলিরও ইঙ্গিত দেওয়া আবশ্যক। কারণ ইন্দ্রদেবের গুণাবলী সর্বজন বিদিত। সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্গুণগুলি অনেকসময় অতিরঞ্জিত, ঈর্ষাপ্রণোদিত এবং মনগড়া ব্যাখ্যায় প্রচারিত হয়। প্রত্যেক সফল ব্যক্তির পিছনে কিছু না কিছু কলঙ্কের ইতিহাস থাকে। কখনও তাহা সত্য কখনও মিথ্যা আবার কখনও সামান্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা যায়। তাই ইন্দ্রের চরিত্রের অন্ধকার দিকটি এখন থাক। তাঁর বীরত্বের জয়গান একটু শুনুক অহল্যা। দাসপিতার ঔরসে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে ইন্দ্রদেব আজ কিভাবে আর্যনেতা থেকে লোকপালক পদবীতে উন্নীত হয়েছেন, সে কথা জানায় লাভ আছে। পরনিন্দায় কি লাভ? ইন্দ্রের বীরত্ব সম্পর্কে আমি যে একেবারেই জানি না তা নয়। কিন্তু বিস্তারিতভাবে শুনিনি। ইন্দ্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত আমি ভাই নারদের কাছে শুনেছি। বিস্তারিতভাবে শোনার জন্য ভাই নারদকে কতবার অনুরোধ করেছি, কিন্তু তাঁর এত সময় কোথায়? সংক্ষেপে সবকথা বলে একটা রহস্যের মধ্যে তোমাকে রেখে দিয়ে অন্তর্ধান হওয়া তাঁর অভ্যাস।

বার্ত্তা এ সম্পর্কে অনেক কথা জানে। তাই এবার তার পালা। সে ইন্দ্রের বীরগাথা বর্ণনা করতে থাকে।

"ইন্দ্রের চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হল বীবতা। তাঁর শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতায় কে কার থেকে কম বলা যায় না। উভয় শক্তিতে বলিয়ান ইন্দ্রদেব বীরতার আবেগে কখনও শত্রুনাশ করেন আবার কখনও আর্যের রক্ষাকারী হিসাবে দাস ও দানব দমন করেন। কখনও আবার নিজের দুধর্ষতাকে দমন করতে না পেরে অকারণে বিপক্ষের নির্দোষ মানুষকে হত্যা করতে পিছপা হন না। শুধুমাত্র অসুরদের হত্যা করে আর্যদের রক্ষা করায় ইন্দ্রের বীরতা সীমাবদ্ধ নয়। মহাবলশালী বৃত্রকে হত্যা করে তিনি পৃথিবীকে জল দান ও ফলপ্রসূ করেছিলেন। তিনি কারও ত্রাণকর্তা আবার কারও সংহার-কর্তা। আর্যদের প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি বহুযুদ্ধে আর্যদের জয়লাভ করান।"

বৃত্রাসুরের উপাখ্যান বহুবার শুনলেও আমার কৌতূহল ও রোমাঞ্চের অবসান হয় না। বৃত্রাসুরের উপাখ্যানের সাথে যে মহান আত্মা জড়িত সেই দধিচির কথা স্মরণ করলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। তাই আজ আর একবার বিশদভাবে ইন্দ্রের বীরত্বের অমরগাথার মাধ্যমে দধিচি উপাখ্যান শোনার জন্য আমি উদগ্রীব। আমার অনুরোধ বার্ত্তা রক্ষা করবে নাইবা কেন? তার কাজই হল সকাল সন্ধ্যা আমাকে কিছু বার্ত্তা দেওয়া, তাই সে গলা ঝেড়ে পুনরায় আরম্ভ করে ইন্দ্রগাথা ও বৃত্রাসুর উপাখ্যান।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র দেবসভায় তাঁর স্বর্ণকমলাসনে উপবিষ্ট। তাঁর অনিন্দসুন্দরী পত্নী শচীদেবীও তাঁর পাশে উপবিষ্টা হয়ে দেবসভার শোভাবৃদ্ধি করছেন। উনপঞ্চাশ মরুৎ, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রের সেবায় রত ছিলেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব বিদ্যাধর এবং সুন্দরী অপ্সরাগণ সভাস্থল বেষ্টিত করে ইন্দ্রসভাকে রমণীয় করে তুলেছে। ত্রিলোকের সকল ব্রহ্মবাদী দেবর্ষি, মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি এবং বিদ্বানমণ্ডলী মন্দ্রমধুর কণ্ঠে বেদপাঠ করছেন।

বেদপাঠের ছলে ইন্দ্রগীতিই গাইছেন। গন্ধর্ব ও চারণগণ সুললিত কণ্ঠে ইন্দ্রের রূপগুণ ও ব্যক্তিত্বের স্তুতিগান করছে। সুন্দরী পরিচারিকারা চামর দোলাচ্ছে। মনোমুগ্ধকারী নৃত্যে অপ্সরাগণ ঋষিদেরও চিত্তবিনোদন করছে। সোমরসের প্রভাবে ইন্দ্রদেব অত্যন্ত উৎফুল্ল।

যথা সময়ে দেবগুরু আচার্য বৃহস্পতি দেবসভায় উপস্থিত হলেন। দেবতারা দণ্ডায়মান হয়ে দেবগুরুকে সম্মান জানালেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব নিজের আসনে বসে অপ্সরাদের নৃত্য উপভোগ করতে থাকেন। সুরাসুর বন্দনীয় দেবগুরু বৃহস্পতিকে সম্মান জ্ঞাপন তো দূরের কথা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। ঐশ্বর্যের এটাই নিয়ম। যখন ঐশ্বর্য নাগালের বাইরে থাকে তখন মানুষ পূজ্যপূজা করে ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় রত হয়। যখন ঐশ্বর্য্যের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে পূজ্য মনে হয় না। তাহাই পুনর্বার তাকে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার পথ দেখায়।

ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ইন্দ্রদেবকে মদমত্ত করে তুলেছিল। দেবগুরুকে তিনি হেয়জ্ঞান করলেন। সৌজন্য সহকারে দেবগুরু সভা ছেড়ে চলে গেলেন এবং ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ করলেন। গুণীজনের জন্যই দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায় অথচ রাজাই হন ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী। গুণীজনের অনাদর ও অসম্মান করে রাজাগণ সর্বসাধারণের কাছে নিজের ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। সেইরকম রাজসভায় বৃহস্পতির মতো বিদ্বান থাকবেন কিভাবে? বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর অকস্মাৎ সব কিছু নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অপ্সরাদের নৃত্য ও গন্ধর্বদের সঙ্গীতের তাল, লয়, ছন্দে ব্যতিক্রম হল। ঋষিগণ অস্তায়মান চন্দ্রের মতো নিষ্প্রভ এবং ইন্দ্রদেব অস্তমিত সূর্যের মতো ম্লান হয়ে গেলেন। নিজের আচরণে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। ইন্দ্রদেবের এটা একটি অত্যন্ত ভালোগুণ। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারতেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করতেন। গুরুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তিনি বৃহস্পতির প্রাসাদে পৌঁছালেন, কিন্তু তখন অভিমান ও অপমানে তিনি দেশান্তরী হয়েছেন। বৃহস্পতি বিনা ইন্দ্রলোক শ্রীহীন ও বিপন্ন হয়ে যায়। ইন্দ্রদেব ঘোর অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকেন।

যখন দেশে গুণীজন উচিত সম্মান না পেয়ে দেশান্তরী হন, তখন দেশের ওপর বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তার থেকে রক্ষা পেতে হলে বাইরের দেশের শরণাপন্ন হতে হয়। দেবতাদের সেটাই হল। দেবতাদের মস্তিষ্ক, জ্ঞান ও বিবেকস্বরূপ গুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রলোকে অনুপস্থিত থাকার সুযোগে দেবতাদের চিরশত্রু দৈত্যগণ দেবতাদের প্রচণ্ড আক্রমণ করে। বহুকষ্ট ও সাধনার ফলে দেবতারা সাধারণ স্তর থেকে দেবতার স্তরে উন্নীত হয়ে থাকেন। কিন্তু একবার দেবত্বলাভ করলে স্তুতি শুনে যজ্ঞ হবির ওপর নির্ভর করে এবং অপরের সেবালাভ করে সমরবিমুখ ও অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে দৈত্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে তাঁরা পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। এইরকম আত্মরক্ষার জন্য বহুবার তাঁরা অন্যের শরণাপন্ন হয়েছেন, তার হিসাব মানুষের কাছে নেই, তাই মানুষ সব কথায় দেবতাদের শরণাপন্ন হয়। অবশ্য দেবতারা কিছু করুন বা নাই করুন

মানুষের আত্মবিশ্বাস হয়ে তাকে ধৈর্য, শক্তি, সাহস ও আশা প্রদান করে থাকেন। মানুষকে পাপের পথ থেকে দূরে রাখার জন্য দেবতারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভক্তকে ভয় প্রদান করে পাপ হতে নিবৃত্ত করা দেবতার অবিস্মরণীয় অবদান। পুনরায় সেই ভয় যদি ধর্ম যুক্ত হয়, তাহলে তাহা পরিণত হয় বরাভয়ে, বরাভয় অধর্মযুক্ত হলে পরিণত হয় চরম বিপর্যয়ে। মাঝে মধ্যে সেটাই ঘটে ক্ষমতাধিকারীদের জীবনে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—জন্ম, জীবন, মৃত্যু জীবন নাটকের তিনটি অধ্যায়। মানুষ, দেবতা, অসুর সবাই এইখানে শরণাপন্ন হতে বাধ্য। ইন্দ্র দেবরাজ হলেও প্রয়োজনে শরণাপন্ন হতে দ্বিধাবোধ করেন না। এটাই ইন্দ্রের মহানতা।

ব্রহ্মার উপদেশ অনুযায়ী বজ্রনির্মাতা ত্বষ্টার জিতেন্দ্রিয় তপস্বী পুত্র বিশ্বরূপকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করলেন দেবতাগণ। ইন্দ্রদেব নিজের গুণে তাঁকে প্রসন্ন করেন। নিজের জ্ঞাতিবর্গের বিপক্ষে গেলে নিন্দিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বিশ্বরূপ দেবতাদের পৌরহিত্য করার জন্য সম্মত হলেন। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা দেবতা হলেও মাতা ছিলেন অনার্যকুলসম্ভূতা অসুর কন্যা। তাই পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলের জন্যই বিশ্বরূপের সহানুভূতি ছিল। যজ্ঞের সময় তিনি প্রকাশ্যে দেবতাদের হবিভাগ প্রদান করতেন এবং গোপনে মাতৃকূলের অসুরদেরও হবিভাগ প্রদান করে তাঁদেরও মঙ্গল কামনা করতেন। ইহা বিশ্বরূপের মহানতা হলেও দেবতাদের প্রতি ছিল কপটাচরণ ও দেশদ্রোহিতা। দেববাজ ইন্দ্রের এই কপটাচারণ সহ্য হয় না। যদিও ইন্দ্রদেবের জন্ম আর্য-অনার্যের মিলনে। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি আর্যদের মিত্র এবং অনার্যদের শত্রু! এ ব্যাপারে তিনি কখনও কপটাচরণ করেননি। যদি কখনও পিতৃকূলসম্ভূত অসুরদের প্রতি মনে সহানুভূতি জাগে, কিন্তু নৈতিকভাবে তিনি কখনও দেবতা বা দেবতাদের বাসভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। অসুরেরা কপটাচরণ করে বলে অসুরকূলের প্রতি ইন্দ্রদেবের ভীষণ ঘৃণা। বিশ্বরূপের কপটাচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রদেব তার শিরশ্ছেদ করে হত্যা করলেন।

"তাহলে তো ইন্দ্রদেবের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়ে থাকবে"—ত্বয়ি আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করে। নীতির সব নিয়ম জানা ছিল। সর্বজ্ঞের মতো সে উত্তর দেয়—"হ্যাঁ, ইন্দ্রদেবের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।"

—"কিভাবে? কি করে এতবড় পাপ থেকে মুক্ত হলেন?" —উৎকণ্ঠায় আমি জিজ্ঞাসা করি।

"ইন্দ্রদেব নিজের সমস্ত পাপ বিতরণ করে দিলেন।"

"পাপ বিতরণ করে দিলেন! কিভাবে—কাকে? পাপ কি বিতরণ করা যায়?" আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ব্যক্তি কি না পারে? ক্ষমতা ও আসন ধরে রাখার জন্য রাজা, মহারাজা, নেতা, নায়ক জঘন্য পাপ করে, অন্যের মাথায় পাপটা চাপিয়ে দেয়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি হল তীক্ষ্ণ অস্ত্রস্বরূপ। মানুষের শিরশ্ছেদ করলেও শাস্তিভোগ করে না। শাস্তিভোগ করে সেই যে বিনা বিচারে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নির্দেশ অনুযায়ী অস্ত্রপ্রয়োগ করে। হত্যা বা

রক্তপাতের জন্য কেউ কি অস্ত্রকে দায়ি করে? তাই অসহায় প্রজাই রাজার পাপ ভোগ করে থাকে।

"কোন অসহায় প্রজাদের বিতরণ করলেন ইন্দ্রদেব তাঁর পাপ?" —আমি তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করি।

"সেই প্রজারা ছিল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রী-জাতি" —অট্টহাসি করে বলে নীতি।

"এরা অসহায় কেন? স্ত্রী-জাতি কি পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ইত্যাদি জড় ও উদ্ভিদের সাথে তুলনীয়? —আমি তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করি। বিরক্ত হয়ে নীতি বলে— "একথা আমাকে না বলে ইন্দ্রদেবকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

অন্বিক্ষিকা দেখল—ইন্দ্রদেবের পাপ বন্টন নিয়ে সখীদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম। শান্তস্বরে সে আমাক বোঝায়। "ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ নিবারণ করতে ইন্দ্রদেব অসমর্থ ছিলেন না। ইন্দ্রদেব এমনই পরাক্রমী যে নিজের পাপকেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডন করতে পারেন। তাই তিনি এই পাপকে সবিনয়ে এবং সগর্বে অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলেন।" একবছর তিনি এই পাপকে বহন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্তাবক স্বার্থান্বেষী চাটুকারেরা তাঁকে পরামর্শ দেয়— "দেবরাজ! রাজা প্রজার পুণ্যফল ভোগ করে এবং প্রজা রাজার পাপের ফল ভোগ করে। আপনি সাধারণ রাজা নন, ত্রৈলোক্যপালক দেবরাজ ইন্দ্র। পাপ বহন করা আপনার পক্ষে শোভনীয় নয়। লোকেদের মন থেকে ব্রহ্মহত্যা পাপের অপবাদ দূর করার জন্য নিজের পাপকে চার ভাগে ভাগ করে ভূমি, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রী-জাতির মধ্যে বন্টন করে পাপমুক্ত হয়ে যান। আপনি যদি পাপের ভার বহন করতে থাকেন তাহলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহাতল, রসাতল, পাতাল ইত্যাদি সপ্তঅর্ধলোক, আসমুদ্র পৃথিবী আপানার অপবাদে মুখরিত হবে। আপনার ওপর থেকে প্রজাদের আস্থা চলে যাবে। তাই হে পাপ হন্তা! আপনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করুন।" এইরকম স্তুতিবাক্যে কে না প্রভাবিত হবে? উপরন্তু নিজের পাপকে অন্যের মাথায় চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যদি যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব আসে, তাকে কে না গ্রহণ করবে? প্রশংসকদের এই সাধু প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ইন্দ্রদেব নিজের পাপকে চার ভাগে ভাগ করে ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রী-জাতির মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।"

"কিন্তু এটা কি অন্যায় নয়? আমি প্রতিবাদ করি। শুধুমাত্র ন্যায় ও ধর্ম নিয়েই কি সংসার চলছে? রাজা, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং স্বার্থপর প্রজাপালকদের পাপ ও অধর্মের কুফল সবসময়ই নিরাপরাধ জনসাধারণ ভোগ করে থাকে। এটাই সংসারের রীতি। অবশ্য দু'প্রকারের মানুষের ওপর পাপ ও অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। সমর্থ এবং অসমর্থ ভূমি, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রী-জাতি অসমর্থ নয়। তারা অপরের পাপ গ্রহণ করে পুণ্যে পরিণত করতে পারে বলেই পৃথিবী রয়েছে। অসমর্থ ব্যক্তির ওপর পাপ চাপিয়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। কত নিরপরাধ অসমর্থ মানুষ অন্যের পাপানলে প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রী-জাতি দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও পরোপকারী হওয়ায় সপ্তলোকের অসংখ্য পাপাচারকে গ্রহণ করে বেঁচে আছে। —অপরকে রক্ষা করতে পারছে।

এই পাপভাগী নিরপরাধীগণ কিভাবে পাপকে পুণ্যতে পরিণত করে আমি বুঝতে পারলাম না। নীতি সেকথা আমাকে বুঝিয়ে দেয়। "নির্বিকারে কত পাপের আবর্জনাকে গ্রহন করে ভূমি তাকে নবজন্ম দেয়—পরিণত করে শষ্য-শ্যামলা প্রকৃতিতে। আবর্জনা, মৃতদেহ, ভস্ম, ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি ভূমিগর্ভে স্থান পাওয়ার পর আর পূতিগন্ধময় আবর্জনা থাকে না, বিচিত্রবর্ণ প্রকৃতির রূপ ধরে জগতের কল্যাণ করে।"।

"জল আবর্জনা গ্রহণ করে তাকে ধুয়ে নির্মল করে দেয়। প্রবহমান জলধারা আবর্জনা গ্রহণ করলেও নিজের জীবনের লক্ষ্যস্থল ভোলে না। বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে বারংবার গতিপথ পরিবর্তন করলেও নদী তার লক্ষ্যস্থল বদলায় না। শুধু তাই নয়, আবর্জনার বাঁধ দিয়ে জলকে আবদ্ধ করে রাখলেও সে উর্ধ্বগামী হয়ে নির্মল বারিধারায় পৃথিবীকে পুষ্ট করতে পারে। উপরন্তু জল যার সাথে সংযুক্ত হয় তাকে শুধু নির্মল নয়, সমৃদ্ধও করে এবং তার বৃদ্ধি সম্পাদন করে।"

"বৃক্ষ পাপের বহু উর্ধ্বে থাকে। পার্থিব আঘাত তার উত্তরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। বৃক্ষের অঙ্গহানি হলেও বৃক্ষের অটুট মনোবলের জন্য সেই স্থান থেকে নূতন অঙ্গের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়ে তাকে পুনরায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। তাই বৃক্ষ কখনও অপ্রয়োজনীয় হয় না, এবং স্ত্রী-জাতি....." এইটুকু বলে আন্বিক্ষিকা চুপ করে যায়। আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। কোন দিব্যগুণে স্ত্রী-জাতি পাপকে পুণ্যে পরিণত করে? গম্ভীরভবে নীতি বলে—"এখন তুমি বালিকা, পরে বুঝতে পারবে, কামুক পুরুষের ঘৃণিত বিকারকে গ্রহণ করে স্ত্রী-জাতি প্রেমময় নিষ্পাপ পুণ্যফলে ভরে দেয় এই ব্রহ্মাণ্ডকে। নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয় যে মানব শিশু—সেই পাপের পুণ্যরূপ। এই সংসারে কত শিশু পুরুষের পাশবিকতা থেকে স্থান পায় নারীর গর্ভে, কিন্তু তারা দেবশিশু হয়ে জন্মলাভ করে জননীর গর্ভ হতে। বৈধ অবৈধ বিচার না করে জননীর বক্ষ থেকে ঝরে অমৃত। হিসাব দিলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে পৃথিবীর বহু বীর, বহু যশস্বী ব্যক্তি অবৈধ সন্তান। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দ্রদেবের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর জন্ম রহস্যাবৃত। কিন্তু তিনি ত্রৈলোক্যপালক দেবেন্দ্র। নারীর এই মহান গুণকে তিনি সর্বদা সম্মান দিয়েছেন। নিজের মাতৃকুল আর্য হওয়ায় তার প্রগাঢ় আর্যপ্রীতি। এই কারণেই পিতৃকুল অনার্যদের প্রতি তিনি কখনও সহানুভূতিশীল নন।"

নারীজাতির উদারতা সম্পর্কে নীতির বক্তৃতা শুনলাম। নারীজাতির প্রতি ইন্দ্রদেবের সম্মানজ্ঞাপন, কপটতার প্রতি ঘৃণা এবং ইন্দ্রদেবের পাপগ্রহণ এবং পাপ বিতরণের কাহিনী শুনে যত সুখী হলাম তদনুরূপ দুঃখিতও হলাম। মনে হল, পাপ কি দেহের ময়লা যে জল দিয়ে ধোওয়া যায়, উপরন্তু তাকে বিতরণ করা যায়? পাপ তো আত্মার কালো দাগ। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজে ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে করতে পারবে? সম্ভবত ইন্দ্রদেবের মতো ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আত্মাকে পাপের কালো দাগ মলিন করতে পারে না। তাই পাপ করেও তাঁরা পাপমুক্ত সজ্জনদের মতো জীবন কাটান।

বিশ্বরূপের হত্যাকারী ইন্দ্রদেব পাপমুক্ত হওয়ার পর আবার বৃত্রাসুরের বধ কিভাবে

করলেন? বৃত্রাসুর কে? এইরকম অনেক প্রশ্ন আমার মন জাগে—তখন আমার চারসখী ধারাবাহিকভাবে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দেয়।

বিশ্বরূপ হত্যার সংবাদে, ত্বষ্টা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। নিজের দুধর্ষ পুত্র, 'বৃত্র'কে ইন্দ্রহন্তা হওয়ার জন্য তিনি উৎসাহ দেন। 'বৃত্র' কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর দর্শনই নয়, সে ছিল অত্যন্ত ক্রুর ও হৃদয়হীন। তার পর্বতের মতো বিশাল শরীর ছিল দগ্ধ কাষ্ঠের মতো কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুদ্বয় ছিল মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো তপ্ত এবং উগ্র। স্বর্গ-মর্ত এবং পাতালকেও কম্পিত করার মতো পরাক্রমশালী, নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শত্রুকে পরাজিত করার নীতিতে ইন্দ্রদেবকে হত্যা করার প্রয়াস না করে ইন্দ্রশাসিত ত্রিলোক ধ্বংস করতে থাকে।

প্রথমে সে জলসম্পদ সমূহ নিজের রাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে। ইন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃয়ায় জল ব্যতীত বনস্পতি ধ্বংস হয়। খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। অনাবৃষ্টি ও অনাহারে ত্রিলোক দগ্ধ হতে থাকে। পিতা ত্বষ্টার তপোবলে বৃত্র ত্রিলোককে সন্ত্রস্ত করে রাখে। ইন্দ্রের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইন্দ্রশাসিত ত্রিলোক ধ্বংস করাই ছিল বৃত্রের উদ্দেশ্য।

শুধুমাত্র বিশ্বরূপ হত্যার জন্য নয়—দেবতা ও অসুরদের বিবাদ বহু প্রাচীন। তাই ইন্দ্রহত্যা নয় ইন্দ্রকে ক্ষমতাচ্যুত করাই বৃত্রের উদ্দেশ্য। রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলে বিদ্রোহী প্রজারা ইন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করবে, এটাই বৃত্রের একমাত্র লক্ষ্য।

ইন্দ্র আর্যবীর। ত্রিলোক অভিষ্টপূরণকারী। ইন্দ্রের প্রতি অসুরদের হিংসাভাব কেন? আমি প্রশ্ন করি। বোধহয়, সেই সময় আমি ইন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করতে আরম্ভ করেছি।

নীতি সামান্য বিরক্ত হয়। বলে—"শুধুমাত্র বেদপাঠ করে ইন্দ্রস্তুতি করলে কেউ জ্ঞানী হয় না। এই বনের শুকসারীও শুনে শুনে বেদগান করে। নিজের মাতৃভূমির ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যও জানা প্রয়োজন। তুমি যখন এই মাটির ইতিহাস জানবে তখন অসুরদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করবে না।

"কিন্তু বৃত্র বধ হল কিভাবে?"

বৃত্রহন্তা আর কে হতে পারে ইন্দ্রদেব ব্যতীত।

ইন্দ্রদেব কোন অস্ত্রে বধ করলেন বৃত্রের মতো শক্তিশালী দানবকে?

আমি এই প্রশ্ন করায় নীতি বলে—"ত্যাগের অস্ত্রে। ত্যাগের অস্ত্রই বজ্রে পরিণত হল বিশ্বত্রাসের নিধনের জন্য।

কার ত্যাগ?

"দধিচির"—ত্বয়ি উত্তর দেয়।

আমার জন্মভূমি মর্তলোকের কাহিনী শুনেছিলাম আমার চারসখীর মুখে।

সত্য থেকেই জগতের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। সত্য থেকে বিচ্যুত হলে ধ্বংস অনিবার্য।

একদিন এই পঞ্চসিন্ধুর ভূ-খণ্ডে আদিম ঋত সমাজ প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে অখণ্ড সাম্যভাব নিয়ে অক্ষত বনভূমিতে বহুকাল সমষ্টিগত জীবন অতিবাহিত করত এবং ঐক্যের

সামগানে দ্রাব্য পৃথিবীকে মন্দ্রিত করেছিল। ঋত সমাজে ব্যক্তিগত লোভ, হিংসা স্বার্থপরতা ছিল না। ছিল না সম্পদ, সংস্কার ও সমমনস্কতার বৈষম্য। বৈদিক ঋষিরা বেদ রচনা করার পূর্বেও এই পঞ্চসিন্ধু ভু-খণ্ডে আদিম ঐক্যের সংস্কৃতি ছিল সমৃদ্ধ এবং সুদৃঢ়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থ সাম্যভাব কখনও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তাহা সম্ভব নয়। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় সম্পূর্ণ সাম্যভাব ছিল কারণ, মানুষ তখন নিজের মস্তিষ্ক আবিষ্কার করেনি। এই মস্তিষ্কই মানুষের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। সব মানুষ সমান বলার অর্থ এই নয় যে, সবাইর মস্তিষ্কের ক্ষমতা সমান। বিভিন্ন প্রকার শারীরিক তথা মস্তিষ্কের ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীতে আছে। মস্তিষ্কের বিভেদের অর্থ বৈষম্য। তাই বৈষম্যই সৃষ্টির ভিত্তি। কিন্তু মানব সভ্যতার প্রাক্কালে বৈষম্যের অর্থ বিদ্বেষ ছিল না। কালক্রমে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাধ্যমে সৃষ্টি হল মানুষের মধ্যে বিভেদ এবং বিভেদ থেকে জন্ম হল বৈষম্য।

বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কের মানুষ বিভিন্ন চিন্তা ব্যক্ত করল। এই চিন্তার বৈষম্যই মানুষকে বিবিধ শক্তি ও বিশ্বাসের অধিকারী করে। কিছু শক্তি যখন মানুষকে পার্থিব বন্ধনের দিকে আকর্ষিত করে, তখন অন্য কিছু শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

সিন্ধু, শতদ্রু, রাভি, আশ্নিকী, আর্যাকীয়া, বেতসী, সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গানদীর তীরে গড়ে উঠেছিল আদিমানবের বলিষ্ঠ আদিম সভ্যতা। সতত গমনশীলা চিরস্রোতা গঙ্গা, মানুষের অশান্ত চিত্তকে শান্ত স্নিগ্ধ বশীকরণ মন্ত্রে মুগ্ধকারী কলকলনাদিনী যমুনা, বাসনা, বিকার, আসক্তি নিবারণী শ্বেতবর্ণা বাঙ্ময়ী মধুর নদী সরস্বতী তড়িৎগমনা, অন্তঃসলিলা শুতুদ্রী প্রকৃতি পালনকর্তী অন্নময়ী প্রাণময়ী পার্বতীয়া পরুষ্ণী (রাভি), ধন, প্রাণ, রসদায়িনী, মরুৎবর্দ্ধনী মরুৎবৃদ্ধা, ঋজুগামিনী অকৃত্রিমা কল্যানী আর্যকীয়া, চিরনির্মল পুন্যতোয়া আশ্নিকা, অবিদগ্ধা, শান্তস্নিগ্ধা, বিতস্তা, লাবণ্যময়ী প্রেরণাদায়িনী, সুসোমবতী, সুসোমা নদীগুলির কল্যাণস্পর্শে পৃথিবীর আদিম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল প্রকৃতির আদিম সন্তানদের সহজ সরল জীবন প্রবাহে। নদী এবং হ্রদে মৎস্য শিকার করে, অরণ্যের ফলমূল আহরণ করে, প্রকৃতির সাথে লড়াই করে আবার প্রকৃতিকে ভালোবেসে, নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে তারা সিন্ধু সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা অস্ত্র ধরেছিল। লৌহের ব্যবহার না জানলেও পাথর, তামা এবং ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্র চালনায় তারা দক্ষ ছিল। সুরক্ষিত গ্রাম্যসভ্যতা থেকে সুপরিকল্পিত নগরসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কর্মঠ, মুক্ত এবং স্বাধীন, অস্ত্র চালনায় দক্ষ। কৃষিকার্যে নিপুন। তারা অত্যন্ত সরল এবং নির্ভয়। জীবনের আশঙ্কা নেই, মৃত্যুর ভয় নেই।

উত্তর পশ্চিম দিকে কোথায় যেন একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের অধিবাসীরা গৌরবর্ণ, সুন্দর এবং পরাক্রমী, তারা আগ্নেয়াস্ত্র এবং লৌহনির্মিত ধাতুর ব্যবহার জানে। সেই দ্বীপের নাম "হীরক দ্বীপ"। কিন্তু হীরার ভাণ্ডার নয়—কেবলমাত্র দ্বীপের অধিবাসীরা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, তাই তারা নিজেদের দ্বীপের ঐরকম নামকরণ করেছিল।

কে জানে কত হাজার বছর পূর্বে সেই শ্বেতবর্ণ দুধর্ষ মানবগোষ্ঠী চারণভূমির অন্বেষণে পঞ্চনদীর ভূখণ্ডে আগমন করে। শান্তিপ্রিয়, দেশপ্রেমী আদিম অধিবাসীরা কি প্রতিবাদ করত না? সেই প্রতিবাদ থেকেই আক্রমণ প্রতিআক্রমণ যুদ্ধ এবং শত্রুতার সূত্রপাত হল দুই ভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। যেহেতু সেই হীরকদ্বীপের অধিবাসীরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত তাই তারা সিন্ধুসভ্যতার নির্মাতা আদিম অধিবাসীদের দমন করে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর অববাহিকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। পরাজিত আদিম অধিবাসীরা গভীর অরণ্য ও পর্বত গুহায় বসবাস করতে থাকে। যারা-ঐ শ্বেতকায়দের বশ্যতা স্বীকার করে তারা দাস ভৃত্য, দস্যু ও রাক্ষস! পরবর্তীকালে হিমবন্ত ও মুজবত (হিমালয়, হিন্দুকুশ) পর্বতের অরণ্যে গড়ে ওঠে শ্বেতকায় বুদ্ধিজীবি মানুষের এক আধ্যাত্মবাদী ঋষি পরম্পরা। পৃথক রুচি, বিশ্বাস ও জীবনধারায় অভ্যস্থ দুটি মানবগোষ্ঠী স্ব-স্ব বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়ে নিজেকে উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত করার প্রয়াসে সৃষ্টি হল পৃথক বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ।

বিষয় বাসনা থেকে দূরে থাকার জন্য বুদ্ধিজীবি ঋষিগণ পৃথিবীতে থেকেও নিজেদের এক অপার্থিব জগতের বাসিন্দা বলে মনে করতেন। অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় তপোবনগুলিতে কুটীর নির্মাণ করে তাঁরা বাস করতেন। সমষ্টিগতভাবে আশ্রম প্রতিষ্টা করে নিজ নিজ দর্শন ও বিশ্বাস নিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। নদী উপত্যকাগুলিতে বাস করত নগর সভ্যতার নির্মাতা আদিম বণিক্‌গোষ্ঠী ও শ্রমজীবি মানুষেরা। মনন অপেক্ষা শ্রম ও বাণিজ্যকে তারা অধিক গুরুত্ব দিত। পরবর্তীকালে "পনি" হিসাবে পরিচিত গোষ্ঠী পারাবত সাগর, অর্বাবত সাগর, সরসূত সাগরে নৌবাণিজ্যের মাধ্যমে অন্যান্য ভূ-খণ্ডের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এর ফলে আর্থিক সমৃদ্ধিও ঘটে। এই শ্রমজীবি, কর্মদক্ষ, বস্তুবাদী মানবগোষ্ঠীটি বেদ এবং যজ্ঞকে সম্মান করত না। অপরপক্ষে অরণ্যবাসী ঋষিগণ বেদবিশ্বাসী ও যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। তাঁরা শ্রম অপেক্ষা মননের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। শাস্ত্র আলোচনা ও শাস্ত্ররচনায় সময় কাটাতেন। পেশায় তাঁরা শিক্ষক হলেও 'ভিক্ষায়' জীবিকা নির্বাহ করতেন। ঋষিরা যেমন শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের পন্থাকে ঘৃণা করতেন তেমনই অপরগোষ্ঠী যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড ও ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করতেন। মানুষ বস্তুবাদী হোক বা আধ্যাত্মবাদী হোক, পরিস্থিতির চাপে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন ও নিঃশ্বাসের সাথে মানুষ স্বার্থপর হতে বাধ্য হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মানুষ জীব হিসাবে বন্দী, পুনরায় নানাভাবে শৃঙ্খলিত হয়েও মানুষের ভিতরের অদৃশ্য সত্তা কোনও এক অগম্যস্থানে উড়ে যেতে চায়। সেই অগম্য স্থানটি কি স্বর্গলোক! উচ্চাভিলাষী বুদ্ধিজীবি মানুষদের মধ্যে যাঁরা অধিক প্রতিভাসম্পন্ন ও শক্তিমান তথা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকে বসবাস করে নিজেকে অন্যের চেয়ে উন্নত ঘোষণা করেন। তাঁদের নামানুসারে ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ইত্যাদির সৃষ্টি হল। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার জন্য তাঁরা নিজেকে দেবতা রূপে পরিচিত করেন। সেই প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবিদের প্রচেষ্টায় স্বর্গ

এবং অন্তরীক্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান সংগীত, কলা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি সাধন হয়। সকল পার্থিব এবং অপার্থিব সম্পদ দেবলোকে মজুত হল। স্বর্গবাসী বুদ্ধিজীবি ও বীরগণ ত্রিলোক শাসন করতে লাগলেন। সময়ে অসময়ে মর্তলোকে এসে বিপন্নদের সাহায্য করতেন। মর্তবাসী ঋষিদের নানাবিধ দ্রব্য এবং গোসম্পদ ইত্যাদি দান করে অনুগত করে রাখেন। মন্ত্রদ্রষ্টা যজ্ঞকারী ঋষিগণ স্বর্গবাসী দেবতাদের অলৌকিক শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে তাঁদের পুর্জার্চ্চনা করতে থাকেন। তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন যজ্ঞের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি 'হবি' রূপে তাদের অর্পণ করেন। তাঁদের করুণায় মর্তলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোক প্রাপ্তির আশায় নিয়মিত সাধনা শুরু করেন। ঋষি থেকে মহর্ষি, মহর্ষি থেকে দেবর্ষি এবং দেবর্ষি থেকে দেবতাপদলোভী ঋষিগণ নিজেদের অধিক সময় ব্যয় করতেন কৃচ্ছ্রসাধনায়। কে কিভাবে দেবতাদের খুশি করবে সেইজন্য এক উন্মুক্ত তথা গোপন প্রতিযোগিতা ছিল ঋষিদের মধ্যে। এর জন্য ঋষিদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে বণিক এবং শ্রমজীবি গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থ উপার্জন। তারা বেদপাঠ, শাস্ত্র আলোচনা যজ্ঞাদি এবং স্বর্গবাসী দেবতাদের আরাধনায় বিশ্বাসী ছিল না। তাদের একমাত্র ভরসা ছিল নিজের বাহুবল। তাই তারা দেবতাদের স্তুতি করত না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মহাজনী ব্যবসা শুরু করেছিল। এরা অত্যন্ত ধনী এবং প্রাসাদ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেছিল। ঋষিগণ অর্থ উপার্জনকে হেয় করলেও ধনীব্যক্তির ভিক্ষা ও দেবতাদের কৃপার ওপর নির্ভর করে আশ্রম চালাত। অথচ ধনী বণিকগোষ্ঠী ও শ্রমজীবি মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখত। বুদ্ধিজীবি ঋষিদের কাছে অর্থভাণ্ডার না থাকলেও শব্দভাণ্ডার ছিল। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব পতিপাদনের জন্য তাঁরা বেদবিশ্বাসী; যজ্ঞকারী; শ্বেতকায়-গোষ্ঠীকে 'আর্য' নামে অভিহিত করলেন এবং বেদ ও যজ্ঞবিরোধী, দেবতাদের স্তুতি না করা পরিশ্রমী, ধনাঢ্য দুর্ধর্ষগোষ্ঠীকে দস্যু, দাস, পনি, অজ, শিগ্রু, যক্ষ, কীটক, কিরাত, দৈত্য, দানব ইত্যাদি নাম দিলেন। বস্তুবাদী গোষ্ঠী শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য এই নামগুলি গ্রহণ করে কিন্তু যজ্ঞ ও বেদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ তীব্রতর হতে থাকে ফলে তারা ঋষিদের যজ্ঞভঙ্গ এবং আশ্রম আক্রমণের দ্বারা নিজের মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফলস্বরূপ আর্যগণ তাদের অনার্য, দস্যু, দাস, দানব, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি নামে ডাকে। যার অর্থ ইতর, নিষ্ঠুর। এইভাবে একই ভূ-খণ্ডের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আর্য, অনার্য দুটি নামে দু'ভাগ হয়ে গেল।

আর্য অনার্য যদি ভিন্ন জাতির মানুষ নয় তাহলে আর্যরা গৌরবর্ণ এবং সুন্দর ও অনার্যরা কৃষ্ণবর্ণ এবং অসুন্দর কেন?" —আমি প্রশ্ন করি নীতি হাসে। আমার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঋচার দিকে তাকায়। সাতবছরের বালিকা ঋচা আমাদের সামনে বসে নিবিষ্টচিত্তে শুনছিল আর্য-অনার্য জাতি ভাগের কথা। বালিকাসুলভ চপলতার লেশমাত্র ছিল না তার আচরণে। সব কথা হৃদয়ঙ্গম করে সে বিমর্ষভাবে বসেছিল। আর্য অনার্য বিদ্বেষের লক্ষ্যস্থল ঋচা প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অনার্য এবং অসুরক্ষিত মনে করে। আমি ছাড়া অন্য কেউ তার প্রতি আন্তরিক এটা তার অজানা।

ঋচা শ্যামবর্ণা—কিন্তু নিষ্পাপ কোমলতায় তার মুখটি অত্যন্ত কমনীয়। এই "নিষ্পাপ আত্মাটি কি অনার্য?" —নীতি তীর্যক কটাক্ষ হেনে বলে।

ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, জীবিকা, খাদ্য-পানীয় জীবনদর্শন সবকিছুই মানুষের বর্ণ এবং ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। ঋষিরা বাস করতেন হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতের শীতল ছায়াপ্রদ অরণ্যে। শারীরিক শ্রম অপেক্ষা তাদের মানসিক শ্রম অধিক ছিল। রৌদ্রতাপ তাদের দগ্ধ করত না, সাত্ত্বিক আহার ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা তাঁদের সৌম্যদর্শন করে তোলে। বণিক ও শ্রমজীবি গোষ্ঠী প্রখর রৌদ্রতাপে অক্লান্ত পরিশ্রম করত, প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে অর্থ উপার্জন করত। আধ্যাত্মিকতার কোনও প্রভাব ছিল না তাদের মনে। তাই তাদের বর্ণ প্রায় কৃষ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। মৃগয়াপ্রিয় হওয়ায় তাদের মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ অবশ্যম্ভাবী। এককথায় বলতে গেলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষের রূপ ও আকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঋচার মুখটি দেখ, সে কি অসুন্দর! সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কি? কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত ইত্যাদি বর্ণের মধ্যে শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অন্য বর্ণের মধ্যে শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট এ কথা কে বলেছে? শব্দ সম্রাট বুদ্ধি-জীবীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ্বেতকায়গণ সুন্দর এবং কৃষ্ণকায়রা অসুন্দর হিসাবে পরিচিত। এমনকি চোখও বাক্যের বশীভূত হয়েছে।

আর্য ও দাস মানুষ জাতি এই দুটি বর্ণে বিভক্ত হওয়ার পর দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ করা হল। এর ফলে শ্বেতকায়দের শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণকায়দের কৃষ্ণবর্ণের সন্তান হল। এইভাবে আর্যগণ হলেন শ্বেতকায় এবং দাসগণ কৃষ্ণকায় কিন্তু আর্য ও দাসের মিলনে যে সন্তান জন্মলাভ করে তাদের কাছে উভয়ের বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং ইন্দ্রদেব আর্য ও দাস মিলন সম্ভূত। তিনি স্বর্ণবর্ণের শরীরধারী হলেও তার স্বভাব উগ্র ও কঠোর। মাঝে মাঝে তিনি হিংস্র হয়ে ওঠেন। তিনিও হিংসা এবং ক্ষমতালোভ থেকে মুক্ত নন। তাই মানুষ নিজেই নিজের বিভাজনের কারণ।

এই তথাকথিত দাসগোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল অত্যন্ত সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। তারা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করত। দাসেরা মন্ত্র তথা যজ্ঞ বিরোধী হওয়ায় আর্য ঋষিগণ সর্বদা তাদের নিজের শত্রু ভাবতেন এবং তাদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবতাদের শরণাপন্ন হতেন। আর্য ঋষিগণ, ভিক্ষায় জীবিকা নির্বাহ করতেন তাই দাস বণিকেরা সর্বদাই তাদের ধনসম্পত্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকত এবং তারা মনে করত, তাদের সম্পত্তি সুরক্ষিত নয়, কারণ পরিশ্রম বিমুখ আর্যগণ যজ্ঞাদি কার্যের ছলে তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ হরণ করবে। অন্যদিকে আর্য ঋষিরা দাসদের সন্দেহ ও ঘৃণা করত। পারস্পরিক সৌহার্দের পরিবর্তে দুটি গোষ্ঠী একে অপরের ত্রুটি খুঁজে পরস্পরকে আক্রমণ করত একদিন ইন্দ্রের নমে উৎসর্গীকৃত কিছু গাভী অপহরণ করে 'পনি' নামক এক বণিক গোষ্ঠী। ইন্দ্র নিজের গাভী উদ্ধারের জন্য সরমাকে দূতীরূপে প্রেরণ করেন কিন্তু 'পনি' সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্টভাষায় সরমাকে বলে—'ইন্দ্রকে আমরা জানি না, দেবলোকের বাসিন্দা হয়েও তিনি আমাদের জন্মভূমি পঞ্চসিন্ধুর দেশে আধিপত্য বিস্তার করছেন কেন? আমরা তো স্বর্গলোকের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করি না। দেবতারা মর্তলোক ছেড়ে স্বর্গলোকের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও মর্তের মোহ ত্যাগ করতে পারছেন না কেন? বলে দাও ইন্দ্রকে তিনি যে-ই হন না কেন আমাদের রাজা নয়। আমরা তাঁর প্রজা বা ভৃত্য নই। যুগ যুগ ধরে আমাদের জন্মভূমিতে আমার স্বাধীনভাবে বাস করছি, আজ ইন্দ্র বা অন্য দেবতাদের বশ্যতা স্বীকার করব না।"

শুধু এইটুকু কথা, ইন্দ্রদেব তথা স্বর্গবাসী বুদ্ধিজীবী দেবতাদের অহঙ্কারে আঘাত হানে। ইন্দ্রদেব দাস সম্প্রদায়ের শত্রু হলেন। ঋষিরাও বিনা কারণে নিজের ভূঁ-খণ্ডে বর্ণভেদের সূত্রপাত করেছেন। তাঁরা পণ্ডিত, বেদজ্ঞ। মন্ত্ররচনা সামগান ও যাগযজ্ঞ এবং ভূলোক মিথ্যা শুধুমাত্র স্বর্গলোক সত্য এই ব্যাখ্যায় তাঁরা শক্তিশালী দেবতাদের কৃপার পাত্র হতে পেরেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই কারণেই পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলের আদি নির্মাতা মানবগোষ্ঠীটির শ্রদ্ধাভাজন হতে পারলেন না। পঞ্চসিন্ধু সংস্কৃতির আদি-নির্মাতাগণ বেদ এবং যজ্ঞবিরোধী হওয়ায় এই কবিপ্রাণ ঋষিদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষতার প্রশংসা করতে পারল না। আর্যরাজারা এই কবিকুলকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করে তাদের পূজা করতে লাগলেন। তাঁরা দান-দক্ষিণা দিয়ে তাদের পৃষ্টপোষকতা করলেও এই বণিক এবং শ্রমজীবী গোষ্ঠীটি তাদের গুরু হিসাবে গ্রহণ করল না। উপরন্তু তাঁদের হেয়জ্ঞান করে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকে। শুধুমাত্র ঋষি নয়, দেবতাদেরও তার পূজা করল না। তারা ছিল প্রকৃতির পূজক, নিজ মাতৃভূমির পূজক। এর ফলে ঋষিকুলের অহংকার আহত হয়। রাজার সংখ্যা সর্বদাই মুষ্টিমেয়। প্রজা অগণিত যুগে যুগে। শুধুমাত্র রাজার প্রশংসায় সন্তুষ্ঠ না হয়ে কবিগণ জনস্বীকৃতি লাভে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এই প্রয়াসে তাঁরা আদিনিবাসী জনতার বিরাগভাজন হলেন। যে কবি জনতাকে হেয়জ্ঞান করে সে জনতার হৃদয় জয় করবে কিভাবে? কবি তো মন্ত্ররচনা করে বুদ্ধিমান দেবতাদের জন্য। সাধারণের কাছে তা দুর্বোধ্য। যা হৃদয়কে মন্ত্রিত করে না, তাকে মন্ত্র রূপে জনতা কি করে গ্রহণ করত? তাই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস এবং অহংকারের লড়াই চলছে চিরকাল। কবি সংস্কৃতি গড়ে শব্দের সাহায্যে তাহা রাজা ও দেবতাদের স্বীকৃতি লাভ করে। ঋষিরা যা উচ্চারণ করে সেটা বেদবাক্যসম মান্যতা লাভ করে। নিজের মনের নিস্ফল ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য ঋষিগণ এই বেদবিরোধী পরিশ্রমী, প্রকৃতি পূজক, দেশপ্রেমী গোষ্ঠীটিকে নিজেদের তুলনায় হীন মনে করতেন। বেদ প্রশংসকদের আর্য বা শ্রেষ্ঠ এবং বেদ বিরোধীদের দাস বা নিকৃষ্ট বলার ফলে পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলে মানুষজাতি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। কালক্রমে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে তিক্ততা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে দাসবর্ণের লোকেরা নিজের মাতৃভূমিকে প্রাণাধিক ভালোবাসত। কিন্তু অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকবাসী বুদ্ধিজীবী উন্নত মস্তিষ্কধারী মানুষেরা পৃথিবীর সমস্ত দুর্লভ দ্রব্য এবং মানুষ স্বর্গলোকে নিয়ে যায়। ধনরত্ন, সমৃদ্ধ-জীবনযাত্রা, অপ্সরাদের সাথে অবাধ যৌন সম্পর্ক, রথে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ, গন্ধর্বদের নৃত্যগীত, উত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিলাসবহুল বাসস্থান, নীরোগ শরীর, চিরযৌবন, সর্বোপরি অমরত্বের প্রলোভনে পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলের সুযোগ্য সন্তানেরা স্বর্গলোককেই জীবনের লক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে। সেইজন্য স্বর্গলোকে যাত্রার অনুমতিপত্র

পাওয়ায় উদ্দেশ্যে মানুষেরা নিজ মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের পরিবর্তে স্বর্গরাজ্যের সমৃদ্ধিসাধনের জন্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধি উৎসর্গ করে দেয়। এর ফলে স্বর্গরাজ্য উন্নত থেকে উন্নততর হয় এবং পঞ্চসিন্ধু অঞ্চল অবহেলিত থেকে যায়। মুনি ঋষিরা স্বর্গের স্তুতি করতে থাকেন।

সপ্তসিন্ধু থেকে আর্য বৈজ্ঞানিক স্থপতি, চিকিৎসক এবং বিদ্বানদের স্বর্গলোকে পাঠানো হচ্ছিল। ইন্দ্রদেবের নির্দেশে মাতৃভূমি ত্যাগ করে স্বর্গলোকের বাসিন্দা হতে পারায় তাঁরা নিজেকে ধন্য মনে করছিলেন, ইহাই দেশপ্রেমী দাসদের অধিকমাত্রায় আর্যবিমুখ করে তুলেছিল। ব্যোমযান ও অন্তরীক্ষযান ইন্দ্রদেবের আবিষ্কার হলেও ঋভু-বিভু ও বাজ এই তিনভাই এর নির্মাণ দক্ষতা লাভ করেছিল। অধিক বিদ্যাবুদ্ধি লাভের প্রলোভন দেখিয়ে ইন্দ্রদেব তাঁদের স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যান। একবার যে স্বর্গলোকে কাজ করার সুযোগ পেল, সে আর পৃথিবীতে ফিরল না। কখনও একবার অতিথির মতো মাতৃভূমিতে এসে স্বর্গরাজ্যের অলৌকিক বিদ্যা ও অপার্থিব সুখসমৃদ্ধির জয়গান করে মর্তবাসীকে চমৎকৃত ও উপকৃত করে পুনরায় রথযানে স্বর্গরাজ্যে উড়ে গেলেন। ঋভু ইত্যাদি তিনভাই ইন্দ্রের রথ, অশ্বিনীকুমার ও বরুণদেবের রথ নির্মাণ করে ব্রহ্মাণ্ডকে অবাক করে দিয়েছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় মর্তের বাসিন্দা হয়েও শল্যচিকিৎসায় দক্ষতালাভের জন্য স্বর্গরাজ্যের স্থায়ী নাগরিক হওয়ার লোভে তাঁরা সেখানে বিয়েও করেন। অবশ্য আর্যদের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাঁরা ব্যোমযানে এসে তাদের চক্ষুস্থাপন, হাত ও পায়ের প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য জটিল শল্যচিকিৎসা করে আবার ফিরে যেতেন। আর্য ও দাস সংঘর্ষে আহত আর্যদের চিকিৎসার জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বারংবার পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলে এলেও আর্য হওয়ার দরুন তাঁরা দাসদের চিকিৎসা করতেন না। এটা আর্য ও দাস বিদ্বেষকে আরও দৃঢ় করেছিল। আর্যরা পশুসম্পদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত। অপরপক্ষে দাস সম্প্রদায়ের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর ছিল। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় কৃষিকার্য অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় দাসদের ব্যক্তিত্বও কঠোর এবং রুক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই পরিশ্রমজনিত কৃষ্ণবর্ণের চর্ম ও চক্ষু তথা ব্যক্তিত্বকে কু-রূপ হিসাবে বর্ণনা করে প্রমাণ করলেন যে শ্বেতাঙ্গ আর্যরা কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের চেয়ে পৃথক ও উন্নত গোষ্ঠীর মানুষ। পুনরায় দাস বা দস্যুদের শূদ্র আখ্যা দিয়ে অস্পৃশ্য করে দেন। দেবপূজা এবং বেদপাঠে তারা অযোগ্য বলে প্রচার করতে লাগলেন। আর্যরা নিজেদের বৃত্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। মহীদাসের মতো বহু দাস পণ্ডিত মন্ত্র তথা উপনিষদের রচয়িতা হলেও তিনি শূদ্র হিসাবেই গণ্য হতেন। কালক্রমে আর্যদের মধ্যেও পেশার পরিবর্তে জন্মই বংশ ও জাতি নিরূপণ করে। আর্যগণ দাসদের নিজ অপেক্ষা ন্যূন বিবেচনা করে তাদের প্রতি ইতর বা অনার্য শব্দ প্রয়োগ করে এবং পরবর্তীকালে এই শব্দ দু'টি ভর্ৎসনা হিসাবে ব্যবহৃত হল।

আর্য-দাস সংঘর্ষ যুগ-যুগ ধরে চলতে থাকে। দুধর্ষ দাসদের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিশ্রমকাতর যুদ্ধবিমুখ ঋষিগণ সর্বদা বীর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রার্থী

ছিলেন। প্রথম থেকেই ইন্দ্রদেব ছিলেন দাস বিরোধী। আর্যদের স্তুতিতে খুশী হয়ে তিনি যে কতবার স্বর্গলোক থেকে মর্তলোকে এসে নিজের সেনাবহিনী মরুৎগণের সহায়তায় দাসদের ধন, জীবন, নগর, সভ্যতা বিধ্বস্ত করেছেন তার সঠিক হিসাব কারও কাছে নেই।

দাসদের নগর সভ্যতা বারংবার বিধ্বস্ত হওয়ায় তারা উন্নত সমতল অঞ্চল ছেড়ে পাহাড় অরণ্য ইত্যাদি দুর্গমস্থানে চলে যায়। নগর নির্মাণের ইচ্ছা আর তাদের থাকল না। কালক্রমে তারা প্রাসাদ ও নগর নির্মান ভুলে গেল। পর্বত গুহায় লুকিয়ে থেকে শিকার, কৃষিকাজ ও ফলমূল আহরণ করে অত্যন্ত নিরাড়ম্বর জীবনযাপন করতে লাগল, কিন্তু নিজের মাতৃভূমি মর্তলোক বা পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে অন্য পৃথিবীতে পালিয়ে যায় নি। সুযোগ পেলে আর্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে তারা কেন পশ্চাৎপদ্ হবে?

পঞ্চসিন্ধু অঞ্চল তথা অনেক উন্নত ভূ-খণ্ডকে আর্যাবর্ত ঘোষণা করে আর্যরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পঞ্চসিন্ধুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি নির্মাতা দাস নয় আর্য। পৃথিবীর কোনও অংশের এইরূপ নামকরণের ফলে কলির বীজ বপন হল বলে বিশ্বপর্যটক সাংবাদিক নারদ মত পোষণ করেন।

বিশ্বের কোনও ভু-খণ্ডের সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট বর্ণের বা নির্দিষ্ট জাতির মানুষের দ্বারা নির্মিত বলে বলা যাবে না। সংস্কৃতি এক প্রবহমান স্রোত। শুধুমাত্র মানুষ নয় জড়, উদ্ভিদ, জীব ও সংস্কৃতির বিশাল স্থাপত্যের এক এক স্থপতি। পঞ্চসিন্ধু সংস্কৃতির নির্মাতা শুধুমাত্র আর্য বা দাস নয় বরং সেই পবিত্র ভু-খণ্ডের আদি বাসিন্দাদের এক সুশিক্ষিত মানবগোষ্ঠী বলাই সমীচীন। আর্য-দাস সংঘর্ষে দাসদের পরাজয় হল সত্যি এবং ইন্দ্রের ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির কারণও এটি। বারবার দাসদের প্রতিহত করার ফলস্বরূপ আর্যরা ইন্দ্রকে দেবতার আসনে বসান এবং দেবতাগণ ইন্দ্রকে নিজেদের রক্ষাকবচ মনে করে তাঁকে দেবরাজ হিসাবে স্বীকার করলেন। ইহাই ইন্দ্রের দেবত্বপ্রাপ্তি এবং ত্রৈলোক্যপালক উপাধি লাভ করার ইতিহাস।

সংস্কৃতির প্রসারের সাথে আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ইন্দ্রদেব আর্যদের সমস্তরকম সমস্যা ধৈর্য্য এবং বিচক্ষণতা সহকারে সমাধান করতে সর্বদাই তৎপর। অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে অসুরদের পরাস্ত করে তাদের সভ্যতা ধ্বংস করা এবং আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসার ঘটিয়ে ভারত ভু-খণ্ডকে আর্যভূমি হিসাবে পরিচিত করবার পর ভারতীয় আর্যরা ইন্দ্রদেবকে দেবতা হিসাবে পূজা না করে আর কি করত? সুকর্মের দ্বারা মানুষই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎগণও মানব থেকে দেবতার আসনে উন্নীত হয়েছেন। তাই শুধুমাত্র দেবতা নয়, দেবরাজে পরিণত হতে ইন্দ্রদেবের বেশি সময় লাগল না।

অতীতের ঋত সমাজের সেই সাম্যভাব ইন্দ্রদেবের নেতৃত্বে আর্যদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ধনী, দরিদ্র, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত, উচ্চ-নীচ, দেবতা-অসুরের বৈষম্য স্পষ্ট হল হস্তরেখার মতো। অবশেষে পরধন লুণ্ঠন ও স্বার্থপরতা মানুষের মধ্যে রাজা-প্রজা, প্রভু-ভৃত্যের বৈষম্য ভাগ্য লিখনের মতো প্রতীয়মান হল।

মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ লোপ পেল। ধনসম্পদ ও বর্ণের অসমতা থেকে সৃষ্টি হল বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণাশ্রম প্রথা থেকে সৃষ্টি হল ঘৃণ্য জাতিভেদ। আদিম সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা ছিল না। হিংসা ছিল কেবলমাত্র পশুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ অস্ত্রধারণ করল, সেইদিন থেকেই পৃথিবীতে হিংসার প্রতিকৃতি উন্মোচিত হল। আর্যদের পক্ষে এই হিংসা ও লুণ্ঠনের নায়ক ছিলেন ইন্দ্রদেব। অনার্যদের পরাস্ত করে তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে আর্যদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করতেন। তিনি বহু নগর ধ্বংস করেন, পাঁচ সহস্র কৃষ্ণকায় দস্যুকে হত্যা করে শম্বর নগর ধ্বংস করেছিলেন। সেইজন্য তাঁকে পুরন্দর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সেই কারণে বেদগুলি ইন্দ্র স্তুতিতে মুখর। ইন্দ্রদেবের এই দাস-দমন নীতিতে সন্তুষ্ট হয়ে মুনি ঋষিগণ তাঁর প্রশংসা গানে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাঁরাই অনার্যদের ধ্বংস করার জন্য ইন্দ্রদেবকে উৎসাহিত করেন। স্তুতিচ্ছলে বলেন—"হে ইন্দ্র! আদিম মানুষ যেমন বৃক্ষলতা ইত্যাদি ছেদন করে, তুমি সেইরূপ শত্রুকে ছেদন কর। দাসদের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ তোমার অনুগ্রহে আমরা ভাগ করে নেব। এই সংগ্রামে তুমি নিশ্চয় বিজয়ী হবে। এই বিজিত অর্থকে তুমি অবরুদ্ধ করে রেখ না। যেসকল গাভী, অশ্ব, শস্য ও জলসম্পদ তুমি লাভ করবে তাহা আমাদের মধ্যে বিতরণ কর। যজ্ঞবিহীন কৃষ্ণকায় দাসদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে শ্বেতকায় আর্য যজ্ঞকারীদের মধ্যে বন্টন কর।" নীতির কাছ থেকে কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের দুর্দশা, পরধনের প্রতি মুনি-ঋষিদের আগ্রহ ও ইন্দ্রের শক্তিকে হিংসার পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টার কথা শুনে আমি আর্যবিমুখ হয়ে উঠেছিলাম। ইন্দ্রদেবের বীরত্বকে পাশবিক মনে হচ্ছিল। এই চতুঃবর্ণাশ্রম প্রথা থেকে জাতিভেদ সৃষ্টি হয়ে অবশেষে বর্ণবৈষম্যই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্টে পরিণত হবে বলে আমি মনে মনে আশঙ্কা করেছিলাম। "শেষে এমন অবস্থা হবে যে, মানুষ বরং নিজের শরীর ত্যাগ করবে, কিন্তু জাতিভেদ প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।" —আমার মনের কথা প্রতিধ্বনি করে নীতি এই কথা বলে। এইসব কথা আমার বালিকা প্রাণে বড় আঘাত করে। আমি দেখেছি, সমাজে চণ্ডাল অসুর জাতি কী ভীষণ লাঞ্ছিত এবং আর্য ও দ্বিজগণ সেই পতিতদের শ্রম, স্বেদ, উপার্জন ও সেবা দ্বারা সমৃদ্ধ।

"এরা কি এইরকম পতিত হয়ে থাকার জন্য জন্মেছে?" —আমি এইটুকু জিজ্ঞাসা করা মাত্রই বার্তা আমাকে শোনায় প্রথম আর্যরাজা মনুর সর্বপ্রথম ঘোষণা—"দাস হয়ে থাকা শূদ্রের ভাগ্যলিখন। সে ক্রয় হয়ে আসুক বা না আসুক, ব্রাহ্মণের সেবার জন্যই ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি করেছেন। দাসত্ব থেকে তার কখনও মুক্তি নেই। দাসত্ব-ই তার স্বাভাবিক ধর্ম।" আমি কানে চাপা দিলাম। চীৎকার করে উঠলাম—"থাক, থাক আমার আর শাস্ত্রজ্ঞানে রুচি নেই, আমি অজ্ঞান হয়েই থাকতে চাই।" কুটিল হেসে ত্রয়ি বলে—"ধৈর্য্য ধর সখি! এইটুকুতেই এত অস্থির হলে কি জ্ঞান লাভ করবে? মনুর বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। মনুসংহিতায় বলেছে শূদ্রের ধনসম্পদ ব্রাহ্মণের আত্মসাৎ-এ কোনও বাধা নেই, কারণ শূদ্রের নিজস্ব ধনসম্পত্তি বলতে কিছু নেই। শূদ্র যা উপার্জন করবে তা ব্রাহ্মণের। শূদ্র সমর্থ হলেও নির্ধন

হয়ে থাকবে। যদি সে স্ব-উপার্জিত ধনের অধিকারী হয়, তাহলে ধনগর্বে সে ব্রাহ্মণকে উৎপীড়ন করতে পারে। শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট, ব্যবহৃত জীর্ণবস্ত্র এবং অনাবশ্যক অসার শস্য দেবে। জাত অনুযায়ী শূদ্রদের সম্বোধন করবে, এতে তাদের সম্মান কমবে না। কারণ, নির্ধন ও নিচকার্য করা শূদ্রদের সমাজে সম্মান বলে কিছু নেই।"

এইসময়ে ক্ষোভে আমি প্রায় কাঁদো-কাঁদো। ক্রোধ সম্বরণ করে জিজ্ঞাসা করলাম— "যদি শাস্ত্রে এইরকম কথা আছে, শূদ্ররা কি শাস্ত্র পড়েনি? তাঁরা প্রতিবাদ করেন না কেন? এই শাস্ত্র-সংশোধনের জন্য বিপ্লব করেননি? প্রয়োজন হলে অমানবিক ব্যবস্থাকে শাস্ত্র থেকে বর্জন করা যেতে পারে।"

"শোন-শোন—এত উত্তেজিত হয়ো না।" আমার পিঠ চাপড়ে ত্বয়ি পুনর্বার বলে— "ধর্মসূত্র কি বলছে শোন। শূদ্র বেদশাস্ত্র পড়তে পারবে না। পড়লে তো সে বিপ্লব করবে। শূদ্রদের বিপ্লব করার প্রশ্ন উঠছে কোথায়? শূদ্র আর্যকে গালাগালি দিলে তার জিভ কেটে দেবে। বেদ অধ্যায়ণ করলে জিভ কেটে দেবে। বেদ মনে রাখলে তাকে দু'ভাগ করে ছিন্ন করবে। ব্রাহ্মণের ওপর শূদ্রের ছায়াও যেন না পড়ে।"

শূদ্রেরা কি ন্যায় পাওয়ার অধিকারী নয়? তারাও তো মানুষ....."আমি প্রশ্ন করি।"

নীতি বলে—"নিশ্চয়। শাস্ত্র শূদ্রদের জন্য ন্যায়ের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিচারে অন্যায় বিচার হল শূদ্রদের জন্য ন্যায়। বর্ণ অনুসারে বিচার আবার এমন যে শূদ্র সাক্ষী দিতে পারবে না। ভৃত্য মালিকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে না। পুনরায় শাস্ত্রানুসারে আর্যের জন্য অক্ষমণীয় অপরাধ বলে কিছু নেই। আর্য কখনও দাস হতে পারে না। শাস্তি, জরিমানা সব ব্যাপারেই শূদ্রের ভাগ অধিক। শূদ্র ব্রাহ্মণের নাম ধরে ডাকলে গরম লোহা তার মুখে চেপে ধরবে। গালাগালি দিলে জিভ কেটে দেবে। ধর্মোপদেশ দিলে শূদ্রের জিভ কেটে দেওয়ার সাথে সাথে তার কানে ও মুখে গরম তেল ঢেলে দেবে। অথচ ব্রাহ্মণ ভয়ঙ্কর অপরাধ করলেও সে বধ্য নয়, উপরন্তু, ধনসম্পত্তি দান করে অক্ষত শরীরে তাকে স-সম্মানে রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দেবে।" আমার ক্রোধ অশ্রুতে পরিণত হয়—অবাধে ঝরে। অমানবিক কথা শুনলেই আমার অশ্রু ঝরে অবিরাম, এ আমার দুর্বলতা হতে পারে। আমি মনে মনে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম—হায়! যে সভত্যা একদিন সিন্ধু থেকে গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা আর্যনেতা ইন্দ্রদেবের দ্বারাই ধ্বংস হল।

আমার মনোভাব আমার চার সখী কীভাবে যেন পড়তে পারে। ইন্দ্রের বিরুদ্ধে সবকথা বলার পর পুনরায় তার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। যেহেতু আন্বিক্ষিকা শান্ত-স্বভাবা, তাই আমি উত্তেজিত হলে সে-ই মুখ খোলে। আমার মনের অবস্থা দেখে সে বলে— সখি! সব দোষ ইন্দ্রের ওপর চাপিয়ে দিও না। মুনি-ঋষিরা উৎসাহ দিয়ে ইন্দ্রকে অসুর বিরোধী কাজ করান। ইন্দ্রকে মুনি-ঋষিরা যত শ্রদ্ধা করেন অন্য দেবতাদের ততটা করেন না। ইন্দ্রও তো একদিন সাধারণ মানুষই ছিলেন। অসুর দমন করে আর্যদের প্রতিষ্ঠা করায় তিনি হলেন আর্যনেতা। তাঁর কিছু ভালোগুণ ও পরোপকারী মনোবৃত্তির জন্য তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত

হন। বৃত্রাসুরকে বধ করে পৃথিবীকে অনাবৃষ্টি ও অসুরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার পরই ইন্দ্র বিখ্যাত হলেন। বৃত্র ছিল আর্যদের বাধা ও প্রতিবন্ধক। সেই প্রতিবন্ধক দূর করার পর আর্যরা ইন্দ্রদেবকে দেবতার আসনে বসান। কালক্রমে নিজ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি দেবরাজ পদে উন্নীত হন।

আদিম অবস্থায় আর্যরা প্রতিপদে প্রকৃতির প্রতিকূলতার সম্মুখিন হত। দৈনন্দিন জীবনে ছিল নানারকম বাধা-বিঘ্ন। একসময়ে বৃত্রাসুর আর্য সংহার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। জলসম্পদ হরণ করা ছিল তার প্রথম কাজ। ইন্দ্রের সমস্ত বীরত্ব বৃত্রাসুরের সম্মুখে ম্লান হয়ে যায়। বৃত্রাসুরকে বধ করে কি উপায়ে আর্যদের প্রতিবন্ধকতা দূর হবে, তাহাই ছিল দেবতাদের চিন্তার বিষয়।

যেহেতু ইন্দ্রদেবের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময়, তাই প্রথমদিকে সমাজে তার স্থান ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বাল্যকাল থেকেই তিনি বন্ধুহীন। দেবতারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কেবলমাত্র মরুৎগণ বাল্যকাল থেকেই ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। অথচ আজ দেবতা ও মুনি-ঋষিগণ বৃত্রাসুর বধের জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন। সেইজন্য তাঁরা নানাভাবে ইন্দ্রকে উৎসাহিত করেন। এ সংসারে কে প্রশংসা প্রিয় নয়? দেবতাদের প্ররোচনায় ইন্দ্র বিশ্বদেবকে হত্যা করেছিলেন। আজও বৃত্রহন্তা হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন আর্য ঋষিদের প্ররোচনায়। বৃত্রকে হত্যা করে ইন্দ্র হলেন সর্বজন প্রিয়। সকলের রক্ষাকর্তা। তাই ইন্দ্রকে দোষ দিয়ে কি লাভ? এর মধ্যে সান্ধ্যহোম করার জন্য প্রথার ডাকে ইন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে সবাই উঠলাম। সখীদের কাছে ইন্দ্রের রূপের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমাব চোখের সামনে আবির্ভূত হন এক দীর্ঘ স্বর্ণবর্ণ, স্বর্ণকেশ, রূপবান সুরসিক আর্যবীর। ইন্দ্রদেবকে দর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হয়, কিন্তু পিতাকে বললে তিনি নিরুৎসাহিত করেন এই বলে "ইন্দ্র একজন সাধারণ মানুষ। নিজের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও সদুপযোগ করে তিনি সকলের অগ্রগণ্য হতে পেরেছেন। অহঙ্কার ও ভোগলিপ্সার জন্য কাল যে তাঁর পতন হবে না, একথা কে বলতে পারে? ত্যাগ ও নিষ্ঠায় দেবতা এবং ভোগবাদ থেকে দানব। মানুষের উত্তরণ ও অবতরণের এই দুই অবস্থা। ইন্দ্র বহু প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, কিন্তু বিশাল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার ফলে তাঁর মনে ভোগলিপ্সা ও অহঙ্কার জন্মেছে, তাই তাঁর থেকে দূরে থাকাই ভালো।"

আমি প্রতিবাদ করি—"ইন্দ্রদেবের মানবিক গুণাবলীর যদি অবক্ষয়ই ঘটেছে, তাহলে প্রতিদিন তাঁর স্তুতিগান করা হয় কেন? সমস্ত যজ্ঞে তাঁকে আহ্বান করে মুনি-ঋষিগণ যজ্ঞভাগ তাঁকেই অর্পণ করেন কেন?" বেদনার হাসি হেসে পিতা বলে—"সেটাই তো দুঃখ। একবার কাউকে অখণ্ড ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার পর তার দয়ার ওপর নির্ভর করেই জীবন কাটাতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ মানুষের জন্যই সৃষ্টি। সম্পদের সমবন্টন করে নিজ নিজ মৌলিক আবশ্যকতা পূরণ করা সুস্থ সমাজের নিয়ম। সম্পদের জাতীয় উপযোগের জন্য দিব্যগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেবতার আসনে বসিয়ে সমস্ত সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অথচ সম্পদের অধিকারী হওয়ার পরেই অহঙ্কার এবং মোহ রাজা ও প্রজার মধ্যে বিভেদ

সৃষ্টি করে। এই রাজা-প্রজার বিভেদের জন্যই রাজার স্তুতিগান করতে প্রজা বাধ্য হয়।" পিতার সাথে কথা বললেই তত্ত্ব উছলে পড়ে। তাতে আমার বালিকামনের কৌতূহল প্রশমিত হয় না। জগৎস্রষ্টা পিতা, বেদময়—বেদজ্ঞানের ভাণ্ডার। অথচ পিতা বোঝেন না যে, তত্ত্বজ্ঞান আহরণের একটা বয়স আছে—মানসিকতা প্রয়োজন। ইন্দ্রদেব সম্পর্কে আমি পিতার কাছ থেকে এইটুকু জানতে পারি যে, একটি গুণের অভাবের জন্যই ইন্দ্রদেবের পূর্ব প্রতিষ্ঠা ও সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পিতার মতে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী ও জ্ঞান এই পাঁচটি গুণ ইন্দ্রের আছে, কিন্তু বৈরাগ্য নেই। যৌবনে যে কামকে দমন করে, সে সমস্ত শত্রুকে দমন করতে পারে। এই সকল, সৎগুণের জন্যই ইন্দ্রদেব একদিন ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। তাঁর শক্তি ও ঐশ্বর্য দেখে কেউ কেউ তাঁকে পরমাত্মা জ্ঞানে ভক্তি করত, কিন্তু বৈরাগ্যের অভাববশত তিনি আর পরমাত্মার সাথে তুলনীয় নয়।

"যৌবনে আবার কামরহিত কে?" আমার সংশয় দূর করে বার্তা বলে—"তিনি হলেন গৌতম ঋষি, শুধুমাত্র সেইজন্যই গৌতম ঋষির গুরুকূল আশ্রমে তোমার মতো সুন্দরী কুমারীদের নিরাপদে শিক্ষালাভের সুযোগ আছে। তাই তোমাকে গৌতম ঋষির তত্ত্বাবধানে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিতা।"

ইন্দ্রদেবের দুর্লভ ব্যক্তিত্বের বর্ণনা শুনে মন যতটা প্রফুল্ল হয়েছিল, গৌতম ঋষির যোগসিদ্ধ ঋষিসুলভ কাহিনী আমার বালিকা মনে ততটাই নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। হঠাৎ আমি ইন্দ্রদেব এবং গৌতম ঋষির তুলনা করে বসি। রাজার সঙ্গে যোগীর তুলনা অসঙ্গত হত, যদি তাঁরা সহপাঠী না হতেন। পিতা ভাই নারদ ও সখীদের কাছে শুনেছি তাঁরা উভয়ই ছিলেন ব্রহ্মার শিষ্য। তাঁদের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল। দু'জনে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েই দু'জনের মত পার্থক্য হত। গৌতম ছিলেন ত্যাগ নিষ্ঠ, দার্শনিক এবং ইন্দ্রদেব ছিলেন ক্ষমতা পিপাসু, ভোগলিপ্সু রাজা। দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। গৌতম তর্কপ্রিয় ইন্দ্রদেব বিবাদপ্রিয়। তাই বিবাদ ও তর্ক দু'জনের বন্দুত্বকে আরও বেশি গাঢ় করেছিল। ইন্দ্র মুখ খোলা মাত্রেই গৌতম তার কথাকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করতেন এবং গৌতমের যে কোনও কথায় ইন্দ্র বিবাদ সৃষ্টি করতেন। ইন্দ্রদেব সংসারী গৌতম ব্রহ্মচারী। তাই ইন্দ্রদেবের কথা বাস্তবভিত্তিক। অন্যদিকে ব্রহ্মচারী গৌতম আদর্শবাদী গৌতমের কথা মাঝে মাঝে অবাস্তব মনে হত। উভয়কে শ্রদ্ধা করলেও গৌতমের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন পিতা ব্রহ্মা। কারণস্বরূপ এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির পর ইন্দ্রদেব অত্যন্ত ভোগবিলাসে দিন যাপন করতেন এবং গৌতম তপঃনিষ্ঠ জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তাতে ইন্দ্রদেবের বিশেষ দোষ নেই বলে ভাই নারদ ব্যাখ্যা করেন এবং ইন্দ্রের গুণগান করতেন। নিজের বীরত্ব, দানশীলতা, পরোপকার এবং প্রশাসনিক বিচক্ষণতার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। নিজেদের সুরক্ষার জন্য সকলেই ইন্দ্রদেবের ওপর ভরসা করতেন এবং সেইজন্যই ইন্দ্রদেবের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রদেব ব্যতীত আর কেউ স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হোক এটা

দেবতারা চাইতেন না। তাই ইন্দ্রদেবকে খুশী করার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দুর্লভ বস্তু ইন্দ্রদেবের পদতলে অর্পণ করতেন। সমুদ্রমন্থন থেকে প্রাপ্ত সমস্ত দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হন ইন্দ্রদেব। কেবলমাত্র ক্ষীরাব্ধি তনয়া লক্ষীদেবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন নারায়ণ। ঐরাবত হাতি, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, পারিজাত ফুল, সুস্বাদু অমৃত সব কিছু পেয়েছিলেন ইন্দ্রদেব। সুন্দরী অপ্সরাদেরও ইন্দ্রসভায় নিযুক্ত করা হয়েছিল নৃত্যগীতের দ্বারা ইন্দ্রদেবের মনোরঞ্জনের জন্য, চিরকাল তাদের যৌবন অটুট রাখার সাথে আজীবন কুমারী থাকার আদেশনামা জারি ছিল। এত ক্ষমতা ঐশ্বর্য এবং ভোগবিলাসে ডুবে থাকলে যে কেউ মদমত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ইন্দ্রদেব মদমত্ত নয়, দুটি দুর্বলতা তাঁর জনপ্রিয়তার ওপর সামান্য আঁচ এনেছে বলে জনরব শোনা যায়।

ইন্দ্রদেব নাকি অত্যন্ত সোমপ্রিয় এবং রমণীপ্রিয়। তাঁর সিংহাসনের দুপাশে সুসজ্জিতা সুন্দরী যুবতীরা চামর দোলাতেন; কেউ তার পা ধুয়ে দেয়'ত কেউ নিজের সুবাসিত আচলে তাঁর ঘাম মুছে দেয়। ইন্দ্রদেব এমনই বীর যে, যুদ্ধবিরতিকালীন ও তিনি একটি মত্তহস্তীর উপর বসে প্রচণ্ডবেগে যাতায়াত করেন, হস্তী মত্ত হলেও ইন্দ্রদেবের নাগালের বাইরে যেতে পারে না। ইন্দ্রদেবের ব্যক্তিত্বের মহিমা শুনতে শুনতে আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করে আমার জন্মভূমি মর্তলোকে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি বলে অনুভব করি। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থা হয়ে মাতৃভূমির চরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

হে আমার জন্মভূমি, মর্তলোক— তুমি অদিতি, অখণ্ডনীয়া। তুমি সকলের কামনা পূরণ কর—তুমি কামদুঘা।

হিমগিরি হিমবন্তের রমণীয় অঙ্গনের এই আশ্রমে আমি আমার বাল্য ও কৈশোর কাটিয়েছি। আমি দেবকন্যা নই, মানবী। তাই দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ আমার লীলাভূমি নয়, হিমগিরির কোলে এই পবিত্র মর্তলোকেই আমার লীলাভূমি।

বিস্তীর্ণরূপা আমার মাতৃভূমি হিমগিরি হিমালয়ের এই তপোবনের নাম পিতা রেখেছিলেন "রম্যবন।" এখানে সবকিছুই সুরম্য। সাদা বরফে ঢাকা হিমালয়, আকাশের দু'প্রান্ত ছুঁয়ে গলানো রূপার ঢেউ খেলে যায় দিগন্তের বেলাভূমিতে। আকাশে সূর্য, চন্দ্র দিক্‌বদল করলেই বরফের ঢেউয়ের রং বদলায়—সোনা, রূপা, হীরা, নীলা প্রভৃতি নবরত্ন খচিত হয়ে যায় পর্বতের ললাটে। রাতের স্বপ্ন দেখা শেষ না হতেই সূর্য ওঠে আর বরফ ঘেরা শুভ্র পর্বত রক্তিম হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অজস্র সোনা ঝরে পড়ে কোনও অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে। সন্ধ্যা নিবিড় হলে সোনা সব গলে গিয়ে হিমালয়কে রাঙিয়ে দেয় লোহিত রঙে এবং অন্ধকারের ভাঁড়ারে সব লুকিয়ে রাখে আকাশ সুন্দরী রাত আসতে আসতে।

একটা উঁচু পর্বতের ঢেউ খেলান হিম-সোপানে আমি পা রাখি—হারিয়ে যাই মহাপ্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে। পাহাড়ের এক জায়গায় সবুজ, এক জায়গায় নীল। আরও ওপরের দিকে ধাপে ধাপে ধোঁয়া রঙের পাহাড়। তার ওপর ঘন নীলের অখণ্ড রাজত্ব। মেঘের পরে মেঘ বরফের উপর বরফ ঢেউ খেলান নীল এবং সবার উপর বিজয়ী বীরের

মতো হিমালয়ের অনন্ত, অদ্ভুত, অনন্য বিস্তার। মেঘ সরে গেলে দেখা যায় মনোমোহন হিমালয়ের বিরাট ব্যক্তিত্ব হিমশৃঙ্গ। ইন্দ্রপুরী কি হিমালয়ের চেয়ে সুন্দর—মনমুগ্ধকারী? সৌন্দর্যের তুলনা মনে এলেই কেন ইন্দ্রপুরীর কথা বারংবার মনে পড়ে জানি না। অথচ ইন্দ্রপুরী আমি দেখিনি, শুধু শুনেছি, শুনেছি বলেই বোধহয় এত আকর্ষণ। দেখলে হয়তো মনে হত আমার আশ্রম, আমার হিমাদ্রি-ই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৌন্দর্য ও স্বর্গীয় সুষমার ভাণ্ডার আমার কাছে। সখীরা হয়ত ইন্দ্রপুরীর বর্ণনায় অতিরঞ্জিত করতে ভালোবাসে, কিন্তু ভাই নারদ যেভাবে ইন্দ্রপুরীর বর্ণনা দেন তাতে কার-ইবা না ইচ্ছা হয় একবার নিজের চোখে দেখার।

বার্তা কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা। অপ্সরাদের রূপযৌবনের বর্ণনা শুনে আমি নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের কুৎসিৎ নারী হিসাবে ভাবতে শুরু করেছি। অপ্সরাগণ প্রকৃতই সুন্দরী না এসব বার্তার বাক্‌চাতুরী।

সেদিন কোনও এক অনন্যার রূপ-বর্ণনা করতে থাকে বার্তা। কে জানে ইনি আবার কোন বিদ্যাধরী?

বার্তার দিকে পিছন ফিরে পার্বত্যনদীর জলধারার দিকে তাকিয়ে হিমাদ্রির এক সুরম্য গিরিকুঞ্জে আমি বসে আছি এবং বার্তা বলতে থাকে—"সেই রূপবতী কন্যার চারপাশে মধুপ ও প্রজাপতির মহোৎসব লেগে থাকে। শ্বেত জুঁইফুল সাজানো তার খোঁপার নীল কেশদাম নীল সাগরের ফেনিল ঢেউ-এর ভ্রম সৃষ্টি করে। তার কটিদেশের বল্কলে সজ্জিত বন্যকুসুম উপবন সদৃশ। তার বসার ভঙ্গি তুষার নদীর মতো শান্ত ধীর তার দাঁড়াবার ভঙ্গি পার্বত্য নদীর আঁকা-বাঁকা স্রোতের মতো লীলায়িত। সে হাতে তুললে নৃত্যের মুদ্রা ফুটে ওঠে তার অজান্তে। পা তুললে বিনা নুপুরেই ঝঙ্কৃত হয়ে যায় পায়ের তলার পৃথিবী, মৌমাছির গুঞ্জরণ তার শ্বাস-প্রশ্বাসে। সে কথা বললে সঙ্গীতের আরোহ অবরোহ স্তব্ধ হয়ে শোনে সেই সঙ্গীত। তার মুখশোভা সূর্যদেবকে ম্লান করে দেয়, আর চন্দ্রমাকে করে জাজ্বল্যমান। তার সুনীল ভ্রু নীল ভুজঙ্গকে লজ্জা দেয়। চক্ষুযুগল হরিণীর চোখকে করে নিষ্প্রভ।

তার শুভ্র দন্তপঙক্তি মুক্তার মূল্য হ্রাস করে দেয়। সে যখন খোঁপা খোলে, ফুলের বর্ষা হয় মাটিতে, খোঁপা বাঁধলে ফুল ফোটে আকাশে। সে যখন প্রজাপতির পিছনে ছুটে বেড়ায় তখন মনে হয় প্রজাপতিই যেন তার পিছনে ছুটছে কিংবা পুষ্পিত লতাটি মৃদু বাতাসে দুলছে। লাস্যময়ী সেই বনলতিকার রূপে দেবরাজ ইন্দ্র ও স্তম্ভিত। এখন ইন্দ্রসভায়ও তার সৌন্দর্যচর্চা মুখ্য বিষয়। ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ দৈন্য রোগ প্রতিকারের প্রতি কারও নজর নেই।"

বার্তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ত্বয়ি বলে "ভাগ্য ভালো, ইন্দ্র সেই কন্যাকে পিছন দিক থেকে দেখেছেন—তার খোঁপা, তার পৃষ্ঠদেশ ও দুটি সোনার পা। তার মুখ দেখলে ছলে-বলে কৌশলে ইন্দ্রদেব তাকে অধিকার করবেন, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে বৃত্রাসুর বধের মতো পৃথিবীকে বধ করবেন।"

ততক্ষণে আমি রেগে গেছি। কে সেই অনন্যাসুন্দরী কেন সে প্রজাপতির পিছনে

লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে বেড়ায়? সে এমন কে যে ইন্দ্রদেব তার রাজকর্তব্য ভুলে পৃথিবীকে বধ করবে? আমার অসহিষ্ণুতা অনুমান করে আম্বিক্ষিকা বলে—"সৌন্দর্য যদি ইন্দ্রদেবকে রাজকর্তব্য ভুলিয়ে দেয়, তাহলে দোষ সৌন্দর্যের কি ইন্দ্রের অথবা তাঁর পদবীর সে কথা বিচার করার আমি বা কে? তবে আমি এটুকু অনুরোধ করব অহল্যা—তুমি আর প্রজাপতির পিছনে ছুটবে না, আশ্রমের বাইরে আসবে না। আশ্রমের ভিতরে বসে তুমি আত্মমগ্ন হও—ধ্যানস্থ হও। না হলে ত্রিলোকে অরাজকতা বেড়ে যাবে।"

—মানে, তুমি কার কথা বলছ আম্বি? "হতবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি। গম্ভীরভাবে নীতি বলে—"সেই ত্রিলোকসুন্দরী অহল্যা ব্যতীত আর কে হতে পারে? কাল ইন্দ্রদেব হিমগিরিতে অবতরণ করেছিলেন। তোমাকে পিছন থেকে দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেছেন। প্রজাপতির পিছনে দৌড়ে উপত্যকার ঘন অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেইরকম হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা উপস্থিত হলে তিনি আত্মস্থ হন। পিতামহ ব্রহ্মাও কিছু কম যান না। ইন্দ্রদেবের এইরূপ সৌন্দর্যলিপ্সায় আমোদিত হয়ে তিনি বলেন—"বাসব! এ হল আমার শ্রেষ্ঠ সর্জনা—আমার কন্যা অহল্যা। তোমার অপ্সরা নর্তকীদের অহল্যার চলন থেকে নৃত্যের মুদ্রা শেখা উচিত।" পিতামহের কথায় ইন্দ্রদেব আত্মপ্রশস্তির স্পর্শ পেলেন বোধহয়। কথায় তির্যক ছটা দিয়ে তিনিও বলেন—"জানি স্রষ্টা আপনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি অহল্যার সৌন্দর্য স্বর্গপুরীতেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। স্বর্গপুরী অহল্যাকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে। অহল্যা স্বর্গপুরী পরিদর্শন করলে স্বর্গের শোভা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে আপনার সৃষ্টি উপযুক্ত মর্যাদা পাবে।" পিতামহ চমকে ওঠেন। রাগত স্বরে বলেন—"ইন্দ্রদেব! অহল্যা মর্তের মানবী। স্বর্গপুরীতে তার সম্বর্ধনার আয়োজন কেন? এইরূপ অপ্রয়োজনীয়, আড়ম্বরে, দেব, গন্ধর্ব, অপ্সরীদের সময় ও অর্থের অপব্যবহারে স্বর্গপুরীর শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা হবে তো?

"কিন্তু পিতামহ—অহল্যার মতো ত্রিলোকসুন্দরীর যোগ্যস্থান কেবলমাত্র ইন্দ্রপুরী। তাছাড়া তার সমকক্ষ মর্তের মানব কোথায় পাওয়া যাবে যে, সে মর্তে তার ভবিষ্যৎ গড়বে?" ইন্দ্রদেব ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, ভেবেছিলেন তাঁর যুক্তি পিতামহ মেনে নেবেন এবং ঘোষণা করবেন যে, অহল্যা ইন্দ্রপুরীর শোভাবর্ধনের জন্যই সৃষ্ট। একবার পিতামহের মুখ থেকে একথা বেরিয়ে গেলে অহল্যার ইন্দ্রভুবনে শোভা পাওয়ার বিষয়ে আর কোনও বাধা থাকবে না। ইন্দ্রদেব অবশ্য ভেবেছিলেন যে, পিতামহ এই প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশী হবেন, তাঁর সৃষ্টির উপযুক্ত সম্মান ইন্দ্রদেব দিচ্ছেন বলে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দেবেন। কিন্তু কেন কে জানে পিতামহ ইন্দ্রদেবের এই যুক্তিকে গ্রাহ্য করলেন না। মুখভঙ্গি অত্যন্ত কঠোর করে তিনি বললেন—"ইন্দ্রদেব। মর্তলোক ও মর্তের মানবকে হেয়জ্ঞান কর না। স্বর্গের মতো মর্তও আমার সৃষ্টি। দেবতা ও মানুষ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। মানুষ দিব্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলে দেবতাপদে উন্নীত হয়। মন হল আত্মসিদ্ধির সাধক। মনের ধর্ম সংকল্প, সত্য, সংযম ও পবিত্রতার সংযোগে মনে জন্ম নেয় শিবসংকল্প। শিবসংকল্প মানুষকে করে দেবতা

এবং অশিবসংকল্প মানুষকে করে দানব। তাই মানুষ শ্রেষ্ঠকীর্তি। মননশীলতা থেকেই আত্মসিদ্ধি এবং শিবসংকল্প প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষ মননশীল। পশু মননশীল নয়। দেবতা মননশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। তাই মনুষ্যজন্ম এক তপস্যা। প্রতিটি মুহূর্তে নিজের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করে উত্তরণের দিকে সতত অগ্রসর হয় বলে সে মানুষ।

মর্তলোক হল দিব্য অদিব্যর পরীক্ষাস্থল। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে সৎ-অসৎ, পাপ, পুণ্য ভোগ-ত্যাগ, সুন্দর-অসুন্দরের বহু পরীক্ষা সংঘটিত হয়েছে এই মর্তের মাটিতে। মানুষ এবং মর্তলোক কোনও দিনই পরীক্ষাকাতর নয়। একদিকে প্রত্যক্ষ ভোগ্যবস্তু, অন্যদিকে সাধনাসাপেক্ষ পরম কারুণিকের উপলব্ধি। উভয়েরই আকর্ষণ দুর্বার। এই দুরূহ সংঘাতের মধ্যে জীবন-নদী প্রবাহিত। যেখানে পরীক্ষা নেই, সেখানে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন কোথায়? তাই দেব, দানব, মানব সকলেই মর্ত্তভূমিকে সকল পরীক্ষার সাধনাপীঠ হিসাবে নির্বাচন করে এসেছেন। উত্তরণের পুণ্য সাধনপীঠ এই মর্তভূমিকে বা মানুষকে হেয় করছ কেন?

একথা সত্য যে, আমার সৃষ্টিকলার উৎকর্ষ অহল্যা। আবার একথাও সত্যি যে ইন্দ্রলোক সমস্ত সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। কিন্তু মনে রাখ—অহল্যা শুধু দেহসর্বস্ব সৌন্দর্য নয়, সে মনোগত সৌন্দর্য। সে বস্তুগত সৌন্দর্য নয়, সে আত্মাগত দিব্যতা। সৌন্দর্য ভোগ্য নয়, সৌন্দর্য হল হব্য। সৃষ্টির কল্যাণের জন্য প্রতি মুহূর্তে সুন্দরতা নিজের সৌন্দর্যকে স্বাহা করে থাকে, যদি তা না হয় তাহলে সেটা যথার্থ সুন্দরতা নয়।

তাহলে কি অহল্যা একটি পরীক্ষা সামগ্রী—সাধনাযোগ্য বস্তু, যজ্ঞসমিধ—হবি? অহল্যাকে নিয়ে পিতামহ কি পরীক্ষা করতে চান? কার পরীক্ষা চান? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন ইন্দ্রদেব। চিন্তাগ্রস্তভাবে পিতামহ বলেন—"ভেবেছিলাম, মুনি, ঋষি, জিতেন্দ্রিয়দের জন্য অহল্যা এক পরীক্ষা—এক আহ্বান স্বরূপ। কিন্তু দেখছি, অহল্যা নিজেই নিজের জন্য এক পরীক্ষা, আমার জন্য এক পরীক্ষা, ত্যাগী, ভোগী উভয়ের জন্যই এক পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান অহল্যা স্বর্গের না মর্তের, সে সম্পর্কে বিবাদের গুঞ্জরণ। তাই আমি স্পষ্টভাবে বলে রাখছি যে, ত্রিলোকসুন্দরী অহল্যা হল এক যজ্ঞ—সে স্বয়ংপূজন, সঙ্গতিকরণ এবং দান। আত্মদান, বলিদান এবং ঐশ্বর্যদানের পরেও দাতার প্রাণতন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হতে থাকবে 'ইদমনম'। অর্থাৎ এ আমার নয়। ত্যাগের পিছনে স্বার্থচিন্তা না থাকলেই 'যজ্ঞ'র উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অহল্যাকে আমি যে সৌন্দর্য দান করেছি, তাতে সে যজ্ঞময়ী হবে কি না, সেটাই তার জন্য পরীক্ষা। অহল্যার অলৌকিক সৌন্দর্যকে দেব, মানব, দানব কিভাবে গ্রহণ করবে সেটা তাদের জন্য পরীক্ষা। উৎকৃষ্ট সৃষ্টির শুধুমাত্র বাহ্যরূপ নয়, তার অন্তঃরূপও আছে। অগ্নিতে দেওয়া আহুতির দুটি সূক্ষ্মরূপ আছে—প্রথম রূপ সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে যায়, অন্য সূক্ষ্মঅংশ আহুতি দাতার হৃদয়ে প্রবেশ করে শক্তি সঞ্চার করে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি দিলে তা চেতনাকে স্পর্শ করে ও সংস্কারে পরিণত হয়। সৃষ্টির অন্তঃসৌন্দর্যকে যে উপলব্ধি করে তার মধ্যে দিব্যসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি চাই পৃথিবী

সৌন্দর্যের অন্তঃরূপে শক্তিময়ী হোক। পৃথিবীতে দিব্যজীবনের স্থাপনের জন্য আমি অহল্যাকে যজ্ঞাগ্নিরূপে স্থাপন করায় কতদূর সফল হয়েছি, সেটাই আমার জন্য পরীক্ষা। তাই এই সৃষ্টিতে অহল্যাকে সাধারণ অপ্সরাদের সাথে তুলনা করে তার অসম্মান করো না। অহল্যার জন্ম ইন্দ্রলোক কিংবা ইন্দ্রদেবের জন্যও নয়। অহল্যার জন্মের পিছনে আছে এক মহৎ উদ্দেশ্য।" গম্ভীর স্বরে ইন্দ্রদেব জিজ্ঞাসা করেন—"তাহলে অহল্যার জন্ম কোন নরশ্রেষ্ঠর জন্য? ত্রিলোকে সেইরকম কোনও পুরুষ তো আমার চোখে পড়ছে না।"

প্রজাপিতা ব্রহ্মা নির্লিপ্তভাবে বলেন—"ইন্দ্রদেব, অহল্যা এখনও বালিকা। তার বিধিবদ্ধ শিক্ষাও শুরু হয়নি। সে এখনও ব্রহ্মচারিণী। তাই কার জন্য তার জন্ম, সেটা এখন থেকে চিন্তা করা বিজ্ঞতার পরিচয় নয়। অহল্যার শিক্ষাসমাপ্ত হওয়ার পর সে সম্বন্ধে চিন্তা করা যাবে। তবে সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে ইন্দ্রলোকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন কর। দেব-দানব মুনি-ঋষি প্রজা সকলেরই সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। সভায় পৌরহিত্য করার জন্য আমি বিষ্ণুকে সম্মত করাব। পরে যেন কেউ না বলে যে তাদের বৌদ্ধিক আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হল না।"

"কিন্তু পিতামহ—অহল্যা প্রসঙ্গ থেকে হঠাৎ সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা সভা আয়োজন করার তাৎপর্য কি?" ইন্দ্রদেব জিজ্ঞাসা করেন। ভাবগম্ভীর হয়ে পিতামহ বলেন—"যে কোনও বিষয়েই হোক, তত্ত্ব না জানলে তার উপযোগ সম্ভব নয়। সৌন্দর্যের তত্ত্ব না জানলে সৌন্দর্য অসুন্দরতায় পরিণত হতে পারে। তাই ইন্দ্রলোকে এক আলোচনা সভা হওয়া প্রয়োজন। দেবতা, দানব, ঋষি, প্রজা সমস্ত বর্গের প্রতিনিধিদের যথাসময়ে নিমন্ত্রণ কর। বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণু এই আলোচনা সভায় পৌরহিত্য করবেন এবং কৈলাশবিহারী রুদ্র এই সভা উদ্বোধন করবেন। তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাবার দায়িত্ব আমার। বিশ্বচেতনাস্বরূপ সাংবাদিক নারদ এই সভা সংযোজনা করবে। অহল্যার সৌন্দর্য দিক্‌বিদিক্ ঝলসিয়ে দেওয়ার পূর্বে অহল্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে দেওয়া আমার কর্তব্য। পরে যেন কোনও অনর্থ না ঘটে।"

সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় আমার অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার উপস্থিতি ব্যতিরেকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বোঝা দেবতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেব-সাম্রাজ্যের রাজধানী ইন্দ্রলোক তথা ইন্দ্রদর্শনের সুযোগ আমার এসে যায়। পিতার ঘোষণায় উৎফুল্ল হয়ে আমি স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে গেলাম।

হিমবন্ত পর্বতে দেবতাদের বিশাল ঐশ্বর্যময় সাম্রাজ্য, পর্বতমালার সুশোভন ললাটের দুইপাশে বিস্তারিত এই দেবসাম্রাজ্যের আয়তন কে পরিমাপ করতে পারবে? সিন্ধু, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি চিরস্রোতা তুষারনদীগুলির উৎপত্তিস্থল এই দেবভূমি। পৃথিবীর প্রাণরস জলসম্পদের মূল উৎস রয়েছে এই দেবসাম্রাজ্যে। তাই দেবতারা মর্তবাসীদের প্রাণদাতা। এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন আর্যনায়ক বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেব। সেইজন্য এই রাজ্যের অপর নাম ইন্দ্রলোক। পুষ্করদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইন্দ্রলোকের রাজধানী

অমরাবতী। ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডার, অতি রমণীয় স্থান। মধুসাগর পরিবেষ্টিত পুষ্করদ্বীপের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। পুষ্করদ্বীপের মধ্যস্থলে অমরাবতী নগরী যেন মণিময় হারের মধ্যমণি সদৃশ। দশসহস্র স্বর্ণাভ পাপড়ি বিশিষ্ঠ এক দিব্যকমল অমরাবতীর দেবরাজ ইন্দ্রের আসন। অমরাবতীর চতুর্দিকে মানসোওর পর্বতের চারদিকে চার লোকপালকের নগরী। পর্বতশৃঙ্গের উপর দিয়ে সূর্যরথ সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে।

স্বয়ং ইন্দ্রদেব কিংবা বেদময় ব্রহ্মার পক্ষেও সম্ভব নয় অমরাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা করার। আমি তো ছার অকিঞ্চন। আমার কাছে বাগ্‌দেবীর সে করুণা কোথায় যে ইন্দ্রভুবনের অচিন্ত সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি করতে পারব? পার্থিব মানসিকতা নিয়ে অমরাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও মহাসিন্ধুর কয়েকটি ফেনিল ঢেউ যেমন অনন্ত বেলাভূমিকে সিক্ত করে সেইরকম ভাবসিন্ধুর উচ্ছ্বাসের প্রকাশ্য কিয়দংশ না লিখে থাকতে পারছি না। অমরাবতীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থান হল নয়নাভিরাম নন্দনকানন। নানা প্রকার সুমিষ্ট ফলের গাছ, চিত্ত আলোড়নকারী সুগন্ধি পুষ্প এবং দ্রুমরাজি নন্দনকাননের শোভাবর্ধন করছে। নানা রঙ ও আকার বিশিষ্ঠ পাখিদের মধুর সঙ্গীতে নন্দনকানন গুঞ্জরিত। ভ্রমরের মৃদুগুঞ্জনে ফুলের পাপড়িগুলি প্রীতিসিক্ত হয়। গাছের শাখা প্রশাখাগুলি পুষ্প এবং ফলভারে অবগত হয়ে নিজের নম্র মাধুরিমা প্রকাশ করে। নন্দনকাননের আকর্ষণীয় পুষ্প হল পারিজাত। পুষ্পতো নয় যেন জাগ্রত চেতনা, তাই চির অমলিন। এই দিব্যপুষ্পের সুগন্ধ আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করে মন এবং হৃদয়কে দিব্যভাবে আচ্ছন্ন করে দেয়। পারিজাত পুষ্পের পাপড়ির মধ্যে নিজের আত্মাকে এবং পুষ্পকেশরের মধ্যে দেখা যায় পরমাত্মাকে। পারিজাত পুষ্পের জন্যই নন্দনকানন এত আকর্ষণীয় ও বর্ণময়। কাননস্থিত সরোবরগুলিতে স্বর্গরাজ্যের সুন্দরী দেবকন্যারা জলক্রীড়ায় মত্ত। কমলকলির চতুর্দিকে মরাল ইত্যাদি জল-পক্ষীগণ দেবকন্যাদের জলক্রীড়াসহ প্রতিযোগিতায় সতত সচেষ্ট।

শত্রু প্রতিরোধের জন্য অমরাবতী রাজ্যের চতুর্দিকে যে পরিখা নির্মিত হয়েছে সেখানে কলকল্লোলিনী পবিত্র গঙ্গাই প্রবাহিত। অমরাবতী নগরীর দ্বারে চৌকাঠ সকল স্বর্ণ নির্মিত। স্ফটিক নির্মিত তার দরজা। দরজায় খচিত নবরত্ন। বাইরে থেকে শত্রুপক্ষ প্রবেশ করলে এই প্রবেশদ্বারের ইন্দ্রজালে মোহগ্রস্ত হয়ে স্থানু হয়ে যায়—জড়বৎ, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। কেউ কেউ লোভগ্রস্ত হয়ে দরজা থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা সংগ্রহের চেষ্টায় দরজায় আঘাত করে রক্তাক্ত হয়। অমরাবতী নগরীর রাজপথ, প্রাঙ্গণ, প্রান্তর সবকিছুই সুব্যবস্থিত, শৃঙ্খলিত এবং পরিচ্ছন্ন। সেই রাজপথে চলাকালীন প্রতিটি দৃশ্য দর্শককে আত্মহারা করলেও রাস্তায় কারও সাথে কারও কায়িক, আত্মিক সংঘাত হয় না। প্রত্যেকে নিজ নিজ তপস্যায় মগ্ন। একে অপরের প্রতিবন্ধক হয় না। স্থলপথে বহু রথ, এবং আকাশপথে বহু বিমানে যাতায়াত করলেও চালক এবং সারথিগণ এমন সুশিক্ষিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত যে রথ বা বিমান কখনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়নি। চারদিক থেকে এসে একত্রিত হওয়া রাস্তাগুলির মিলনস্থল রত্ন নির্মিত মণ্ডপসদৃশ। সেখানে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনও নিয়ন্ত্রককে দণ্ডায়মান

দেখা যায় না। রথ, বিমান, পদাতিক সকলেই স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত। দ্রুতবেগে আসা রথগুলি, রত্ননির্মিত মণ্ডপগুলিতে নৃত্যরতা সুন্দরীদের নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে ক্ষণিক বিরতির পর নিজ গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে ও পুনরায় গন্তব্যপথের উদ্দেশ্যে রথচালনা করেন।

ইন্দ্রলোকে কেবলমাত্র ঐরাবত হস্তী বা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব সুন্দর নয়। সমস্ত হস্তী এবং অশ্ব অত্যন্ত সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল।

অনন্ত-যৌবনা অপ্সরাগণ সৌন্দর্যে একে অপরের চেয়ে মোহময়ী। জলক্রীড়া প্রিয় অপ্সরাদের রূপলাবণ্য এবং লাজুক আকৃতি যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিশিখার মতো জলের মধ্যে উজ্জ্বল এবং তরঙ্গায়িত দেখা যায়। যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিশিখার গতি যেমন উর্ধ্বমুখী, অপ্সরাগণও সেইরূপ ইন্দ্রমুখী। ইন্দ্রের মনোরঞ্জনকারিণী অপ্সরাগণ অন্য কারও প্রেমিকা হতে পারবে না। কখনও সেইরকম আকাঙ্খা যদি জাগ্রত হয় তাহলে তারা শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্তবাসিনী হবে। অপ্সরাদের অঙ্গরাগে অগুরু, চন্দন, হলুদ, ইত্যাদির সুগন্ধে চারিদিক সুরভিত। নগরীর প্রবেশপথ, মণিখচিত মণ্ডপগুলিতে অপ্সরাদের হাস্য-লাস্য প্রতিফলিত হওয়ায় ইন্দ্রলোক অপ্সরালোকের ভ্রম সৃষ্টি করে। সৌন্দর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও দেবতাগণ সৌন্দর্যকাতর নয় বলে মনে হয়।

নগরের প্রত্যেক দ্বার এবং বাতায়ন পথে পবিত্র অগুরু এবং ধূনার ধোঁয়া বাতাসে মিশে চতুর্দিক সাত্ত্বিক ভাবনায় আচ্ছন্ন করে দেয়।

সমস্ত রাজপথ, জনপথ এমনকি সরুগলি পর্যন্ত আজ বর্ণাঢ্য রথ ও যানবাহনে ভরে উঠতে থাকে। রথ ও যানবাহনে খচিত রত্নরাজি প্রত্যেকে অপরের মধ্যে বিম্বিত হয়ে এক তৃতীয় বিশ্ব সৃষ্টি করতে থাকে দর্শকের চোখে। রথগুলির অগ্রভাগে রত্নখচিত বর্ণাঢ্য ধ্বজা স্বর্ণদণ্ডের ওপর উড়ছে। মনে হয়, সব রথগুলিই বিজয়রথ, সব ধ্বজাই বৈজয়ন্তী। সত্যি যেন রথগুলি জীবন্ত। সারথিদের সুন্দরী সুকণ্ঠী পত্নীদের মধুর সঙ্গীতের সাথে তাল দিয়ে কোকিল, শুকসারী, ময়ূর, ভ্রমর এবং মৌমাছিদের মিলিত সুর এক অপূর্ব সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করেছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে বাদকেরা মৃদঙ্গ, মাদল, দুন্দুভি, বীণা, বাঁশী, নূপুর বাজিয়ে সমগ্র পরিবেশকে উৎসব মুখর করে তুলেছে। সর্বোপরি গন্ধর্বরা স্বর্গীয় নৃত্যে দর্শককে মাতোয়ারা করলেও নিজ নিজ ছন্দে তাঁরা সুনিয়ন্ত্রিত।

অমরাবতীতে প্রতি মুহূর্তে একত্র সূর্যোদয় এবং চন্দ্রোদয় হওয়ার মতো আকাশ অবর্ণনীয় আলোকচ্ছটায় অপূর্ব শোভাময় দেখায়। যেন দিবস এবং রাত্রি, সূর্য এবং চন্দ্র জয়-পরাজয়, জীবন এবং মৃত্যু এখানে পরস্পরের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। কাউকে এখানে আলাদাভাবে অনুভব করা যায় না।

শুধু মৃত্যুর দেবতা এখানে অমর নয় মৃত্যুও অমর। তাই ইন্দ্রদেবের এরাজ্য অমরাবতী। এখানে মধ্যাহ্নেও সূর্যতাপ প্রখর নয়, সন্ধ্যায়ও সূর্যদেব ম্লান নয়। সুদক্ষ কারিগর বিশ্বকর্মা অমরাবতী নগরীতে নিজ কারিগরি দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। পৃথিবী থেকে আনীত ঐশ্বর্যে বিভূষিত অমরাবতীতে প্রবেশ করতে হলে সমস্ত পার্থিব ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হতে

হয়—এটাই ছিল পিতার উপদেশ। কিন্তু আমি অনুভব করি যে, অমরাবতীতে পৌঁছালে পার্থিব ক্ষুদ্রতা অনায়াসে দূর হয়ে যায়। ইন্দ্রদেবের রাজপ্রাসাদ এবং ইন্দ্রাণীর অন্তঃপুরের বর্ণনা কে দিতে পারবে? যদি কেউ সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় সে হয়তো চেতনাশূন্য হয়ে যাবে। ইন্দ্রদেব সকল জ্ঞান, সকল শক্তি ও দিব্য চেতনার অধিকারী বলেই ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের প্রখরতায় তার বিবেকবুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়নি। সাধারণ দেব মানব এই ঐশ্বর্যের অধিকারী হলে তার বিবেকবুদ্ধি ভ্রষ্ট হতে কতক্ষণ? পিতা বলেন—"ইন্দ্রদেবেরও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। তিনি মানুষ থেকে দেবতা। তাই বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়া স্বাভাবিক!"

আমি পিতার সাথে ইন্দ্রপুরীতে এসেছি আমার আগ্রহের আতিশয্যে নয়। পিতার আদেশ পালনের জন্য আমার স্বর্গ অভিযান। পিতা তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষ প্রতিপ্রাদন করবেন। আমি নাকি এক পরীক্ষা হয়ে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হব। সৌন্দর্য সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা হবে। আমি বোধহয় হব তর্ক ও তত্ত্বের বিষয়বস্তু। সুন্দরী অপ্সরা, বিদ্যাধরী এবং সর্বোপর ইন্দ্রপ্রিয়া ইন্দ্রাণী থাকতে আমাকে কেন্দ্র করে সৌন্দর্য তত্ত্বের আলোচনা কেন? আমি কি তাহলে অপ্সরা এবং ইন্দ্রাণীর চেয়েও সুন্দরী! কি করে জানব সে কথা? আমি না নিজেকে দেখেছি না তাদের। নিজের চেহারা দেখার জন্য আমার দর্পণ নেই। তাদের দেখার সুযোগই বা কোথায় ছিল! তাদের দেখার জন্য নয়, ইন্দ্ররূপ দেখার জন্যই আমার উৎকণ্ঠা, এই উৎকণ্ঠা নিছক কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছু নয়। ত্বয়ি এবং আন্বিক্ষিকার কথা কতদূর সত্য সেটাই প্রমাণিত হবে আজ। পিতার আদেশে আমাকে সাধারণ মুনিকুমারীর মতো বল্কল ও পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসতে হয়েছে। আমি তো চেয়েছিলাম সম্পূর্ণ নিরাভরণা হয়ে আসতে। শুধুমাত্র বল্কল পরিহিতা হয়ে আসার জন্য জিদ ধরেছিলাম। পুষ্পদ্বারা নিজেকে সজ্জিত করার আমি ঘোর বিরোধী। আমার কি অধিকার আছে বৃক্ষলতার সৌন্দর্যহানি করে পুষ্পের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার? কিন্তু আমার কথা শুনছে কে? আমি তো নাবালিকা, কিশোরী, কথা বলার অধিকার প্রাপ্ত হইনি। রম্যবন আশ্রমে পিতার কাছে আগত মুনিজনের সাথে পিতার শাস্ত্রালোচনা শুনে শুনে আমি বহুবার আমার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিলেও সেই জ্ঞানকে নারীসুলভ তথা বালিকাসুলভ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমি নীরবে প্রতিবাদ করেছি। আমি নারী থেকে পুরুষ হতে পারব না, কিন্তু নাবালিকা থেকে সাবালিকা তো হব। তখন তো আমার বাক্‌স্বাধীনতা থাকবে। এখন পিতার কথা মানতে হবে।

নানা বর্ণের পুষ্পে সজ্জিতা হয়ে আমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমার সখীরাও আমাকে দেখে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে যায়। সাজ-সজ্জায় অঙ্গরাগ ব্যবহারের ওপর পিতার নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমারও সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। বাল্যকাল থেকে আমি প্রকৃতির কোলে পালিতা। কখনও দেখিনি বনলতিকাকে কৃত্রিম বেশভূষা ও আভূষণে সজ্জিতা হতে, অথচ সে সুশোভিতা। প্রসাধন ও বেশভূষায় কি সৌন্দর্য থাকে। সৌন্দর্য কোথায় থাকে? শরীরে আত্মায় না দর্শকের দৃষ্টিকোণে!

ঋগ্ যজুঃ সাম অথর্ব নামে চারটি রথ নির্মিত হল। "ঋগ্" রথে বসলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা।

ঐ রথ সজ্জিত হয়েছিল নবকিশলয়ে। কন্টকযুক্ত লতা ও সুবাসিত শ্বেত জুঁইতে সজ্জিত "সাম" রথে বসলাম আমি। রথের দ্বাররুদ্ধ হল লতার ঘন পর্দায়। শ্বেতজুঁই-র ঝালর দোলে আমার মুখের সামনে। ভিতরে কে বসেছে দেখা কষ্টকর, কিন্তু লতা ও কাঁটার ফাঁক দিয়ে আমি বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। কন্টকিত লতার জালে বন্দিনী করে পিতা আমাকে কেন ইন্দ্রলোকে নিয়ে এসেছে তা আমার জ্ঞানের বাইরে। নিশ্চয় কিছু মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কৌতূহল দমন করে আমি বসে থাকি এবং ইন্দ্রলোকের শোভায় হারিয়ে যাই। বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমার প্রাণকোষের প্রতিটি কুঁড়ি পাপড়ি মেলতে থাকে। অন্তরের সংকীর্ণতা হারিয়ে যায় দিব্যালোকের স্পর্শে। 'যজু' রথে বসেছে ত্বয়ি ও আন্বিক্ষিকা। 'অথর্ব' রথে বার্ত্তা ও নীতি। 'যজুঃ' রথটি সজ্জিত হয়েছে চার রঙের সুন্দর ফুলে। রথের সম্মুখভাগ ফুলের পর্দায় ঢাকা। মর্তলোকের সমস্ত লোহিতবর্ণের আকর্ষণীয় ফুলে সজ্জিত 'অথর্ব' রথটি এক পুষ্পকুঞ্জের মতো প্রতীয়মান। চারটি রথের পুষ্প ও কিশলয়ের অপূর্ব সুরভিতে আমি অবগাহন করি। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের সুরভিতে কি আমি সুবাসিতা? সুগন্ধিত আমার দেহ মন না আত্মা! "সাম" রথের ভিতরে বসে ইন্দ্রলোকের শোভা দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি সত্যি, কিন্তু ভাবছি আমার মাতৃভূমি মর্তলোকের কথা। নাগধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে আমার লীলাভূমি রম্যবন কোনও অংশে কম নয়। আমার মাতৃভূমি, ইন্দ্রপুরীর তুলনায় কম ঐশ্বর্যময়ী একথা আমার মনে হয় না। সম্ভবত দেবত্বপ্রাপ্তির পর প্রত্যেক ব্যক্তির বিলাসী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক, তাই দেবলোকে এত আড়ম্বর। সোনা, রূপা, মণি-মুক্তো সব কিছুই পণ্যের মতো চোখের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে। কিন্তু আমার মাতৃভূমি তো সমস্ত রত্নকে গর্ভে ধারণ করেছে। সে কখনও নিজের ইচ্ছায় ধনরত্ন প্রদর্শন করে না। রত্নগর্ভা হয়েও লতা পুষ্পের দিব্য আভূষণে সে নিজেকে সাজায়। যদি আমার মাতৃভূমি হয় এক নিঃস্বার্থ তপস্বিনী তাহলে ইন্দ্রলোক সুসজ্জিতা সালঙ্করা বিলাসিনী। ইন্দ্রলোক যদি এমন আকর্ষণীয় তাহলে ইন্দ্রদেব কেমন হবেন? আলোচনা সভার পর আমাকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে। তখন আমি ইন্দ্রদেবকে দেখতে পারব এবং ইন্দ্রদেব আমাকে দেখবেন।

পূর্বে আমি দু'একবার ইন্দ্রদেবকে দেখেছি। তখন আমার বয়স পাঁচ কিংবা ছয়। কাছে যাওয়ার সাহস হয়নি। পিতারও নিষেধাজ্ঞা ছিল কেন কে জানে!

দেবরাজ চৈত্ররথে এসেছিলেন। বিমানটি উদ্যানের মধ্যে রেখে পিতার কাছে যান। তাঁর আসার কথা থাকলে পিতা আমাকে সখীদের সাথে নদীর তীরে, কিংবা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য পাঠিয়ে দেন।

চৈত্ররথ বিমানটিকে দূর থেকে দেখে আমার খুব কৌতূহল হয়। আমার বালিকা মনের চপলতা আমাকে বিমানে বসার জন্য অস্থির করে। একবার ত্বয়ি এবং বার্ত্তাকে অনুরোধ করে পিতার অজান্তে বিমানটির কাছে চলে গেলাম। ইন্দ্রসারথি মাতলি আমাকে দেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কাছে ডাকলেন, আদর করে বললেন—"এই বিমান নিতান্তই সাধারণ, ইন্দ্রলোকে আমার প্রভুর কাছে তোমার মতো বহু দুর্লভ বস্তু আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের

সমস্ত দুর্লভ বস্তুর অধিকারী হলেন ইন্দ্রদেব। তুমি ইচ্ছা করলে ইন্দ্রলোকে যেতে পারবে। নন্দন কাননে পারিজাত পুষ্পের শোভা তোমাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করবে। কিন্তু তোমাকে দেখে পারিজাত পুষ্প ঈর্ষায় ম্লান হয়ে যাবে।"

সেই সময়ে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির জন্য চার পাঁচ বছর বয়সের কথা এখনও আমার মনে আছে। আমাকে কোলে বসিয়ে মাতলি একবার বললেন—"শোন, তুমি বড় হলে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকই তোমার বাসস্থান হবে, যেহেতু আমার প্রভু ব্রহ্মাণ্ডের সকল দুর্লভ বস্তুর অধিকারী তাই তুমিও তাঁরই প্রাপ্য।" তখন আমি 'দুর্লভ' এবং "বস্তু" এই দুটি কথারই অর্থ বুঝিনি। আজ সে'কথা মনে পড়তে মাতলির ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আমি দুর্লভ হতে পারি, কিন্তু আমি কি বস্তু! অবশ্য তখন আমার ইন্দ্রপুরী কিংবা ইন্দ্রদেবের প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না। আমার আগ্রহ কেন্দ্রীভূত ঐ বিমানটিতে। আমার শিশুমন ঐ বিমানে বসে আকাশে মেঘের ভিতর দিয়ে কোন অজানা জায়গায় উড়ে যেতে উৎসুক। ইন্দ্রের রথে বসতে আমার খুব ভালো লাগত। যতক্ষণ ইন্দ্রদেব পিতার সাথে আলোচনা করতেন ততক্ষণ আমি উভয়েরই অগোচরে রথে বসে অপরিপক্ক হাতে রথের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করতাম। ঘোড়াগুলির কান ও লেজ ধরে টানাটনি করতাম। ছোট ছোট হাত তাদের মুখের ভিতর ভর্তি করে তাদের দাঁত গুণতাম। সেই সুশৃঙ্খল অশ্বগুলি অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করত। আমাকে পিঠে বসিয়ে মৃদুতালে নেচে নেচে উল্লাসিত হত।

কিছুদিন আগে আমার সখীদের কাছে শুনলাম 'ইন্দ্ররথ" আবিষ্কারের কাহিনী। অজ্ঞাত আর্যকুমারী এবং দাসপুত্র হওয়ায় সমাজে ইন্দ্রের স্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নে। পরবর্তীকালে তাঁর অলৌকিক মেধা ও প্রতিভায় ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে তিনি জননায়ক, দেবরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। ইন্দ্রদেবের এই উত্তরণের পথে ইন্দ্ররথের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ইন্দ্র কেবলমাত্র মেধাবী নয়, তিনি ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা। বিড়ম্বিত জন্মই তাঁকে বাল্যকাল থেকে সংগ্রামী করে গড়ে তুলেছে। সেই সময়ে সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করে ভারত ভূ-খণ্ডে বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মচারী মুনি-ঋষির চেয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধার প্রয়োজন ছিল অধিক। সিন্ধু সভ্যতার দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের দমন করা ছিল প্রথম সমস্যা। ইন্দ্রই সেই আবশ্যকতা পূরণ করেছিল। তখনই প্রথম আর্যদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ইন্দ্রদেব দ্রুতগামী রথ উদ্ভাবন করেন। দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধে দ্রুতগ্রামী রথ ছিল অত্যন্ত সহায়ক। ইন্দ্রের অভিনব আবিষ্কার এই রথ দেব-দানব মানব যক্ষ সকলকে চমৎকৃৎ করে দেয়। রথারূঢ় ইন্দ্রকে প্রতিহত করার ক্ষমতা আর কারও ছিল না। রথযুদ্ধে অতুলনীয় ইন্দ্রদেব একজন সাধারণ যোদ্ধা থেকে জাতীয় নেতায় উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে রথের আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রথের আবিষ্কারের ফলে আর্যদের সমরকৌশলে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব নিয়ে আসেন ইন্দ্রদেব। রথারূঢ় হয়ে শুধু যে দ্রুতগতিতে শত্রুদের ওপর অস্ত্রাঘাত করতেন তা নয়, মাঝে মাঝে রথকেও অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে শত্রুদের পরাস্ত করতেন। কখনও অস্ত্র-লক্ষ্যচ্যুত

হলে রথের চাকা খুলে শত্রুর ওপর নিক্ষেপ করে তাদের হতভম্ব করে দিতেন। রথের আবিষ্কারক হিসাবে ইন্দ্রদেবকে রথেঁয়ে বা রথেপ্য বলা হয় বলে আমি অনেকদিন পরে জানলাম।

বাল্যকালের সেই স্মৃতি অস্পষ্ট হলেও আজ এই মুহূর্তে রূপ নিয়েছে আমার মনের প্রচ্ছদে। ইন্দ্রদেবকে দর্শন করার পূর্বে সখীদের বর্ণনা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে রথে বসে এক অস্পষ্ট সৌম্যরূপ অবলোকন করছি। পাঁচ-ছ'বছর বয়সে আমি ইন্দ্রদেবকে দেখেছিলাম মাত্র দু'বার। তারপরে পিতা রম্যবনে ইন্দ্রদেবের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন।

একদিন ইন্দ্রদেব রথ থেকে নেমে পিতার সাথে দেখা করতে যাওয়ার পর আমি ঐ রথের কাছে গিয়ে পূর্বের মতো সেই অলৌকিক অশ্বগুলির সাথে খেলতে আরম্ভ করি এবং মাতলির সাহায্যে রথের ওপর উঠে রথ চালনার অভিনয় করি। মাতলি আমাকে খুব ভালোবাসে, শ্রদ্ধাও করে। আমরা রথ চালনার অভিনয় দেখে সে হাসতে হাসতে বলে—"তুমি এই রথের অধিকারিণী হওয়ার যোগ্য। রথচালনা করা আমার মতো সারথিদের কাজ, আমার চাকরিটা নেওয়ার চেষ্টায় আছ নাকি? তুমি এই রথের অধিকারিণী হলে ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রাণীপদ যাবে না, কিন্তু তুমি রথচালনা করলে আমার সারথিপদ চলে যাবে তো!" আমি মাতলির অনেক কথা বুঝতে পারতাম না। বুঝতে পারতাম না বলে প্রতিটি কথা মনে রেখে পিতাকে জিজ্ঞাসা করতাম, আমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলার পরিবর্তে পিতা মাতলির ওপর বিরক্ত হতেন। আমার ওপর বিরক্ত হতেন, এমনকি সখীরা আমাকে কেন ইন্দ্রের রথে বসতে বারণ করেনি। তাই তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হতেন। একদিন আমি পিতাকে বললাম—"আমি ইচ্ছা করলে কিছুদিন পর ইন্দ্ররথটি আমার হয়ে যাবে এবং সেই দ্রুতগামী রথে আমি ত্রিলোক প্রদক্ষিণ করতে পারব বলে মাতলি বলেছেন। যদি ইন্দ্রদেব আমাকে তাঁর রথের অধিকারিণী করে দেন তাহলে খুব ভালো হবে।" এই কথা বলে আমি করতালি দিয়ে নেচে উঠলাম নিষ্পাপ আনন্দে। অকস্মাৎ পিতা চিন্তাকুল এবং গম্ভীর হয়ে গেলেন—অস্ফুটস্বরে বলতে থাকেন—"মাতলির এই স্পর্দ্ধার পিছনে বাসবের লোলুপতাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। আর্যনায়ক থেকে ত্রৈলোক্যপালক হয়েছে বলে সংসারে সে ব্যতীত আর কোনও যোগ্য পুরুষ নেই, এই ধারণা দূর হয়ে যাবে একদিন। পিতার এইসব কথা বুঝতে না পেরে আমি সখীদের জিজ্ঞাসা করলাম। কেন জানি না তারাও এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার মতো মনে হল—শুধু এইটুকু বলে—"এখন তুমি বুঝতে পারবে না—সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার যত যশ তত অপযশ। স্রষ্টা কেন যে যে তোমায় সর্বোৎকৃষ্ট করলেন, সে শুধু তিনিই জানেন।" হ্যাঁ, সেদিনের কথা। আমি রথে বসে রথচালনার অভিনয় করছি, দেখি ইন্দ্রদেব পিতার ঘর থেকে বেরিয়ে রথ অভিমুখে আসছেন। তাঁর শরীরের স্বর্ণকান্তি, মণিময় মুকুটের দ্যুতি, দর্পিত চলনভঙ্গি, দূর থেকে মনে হচ্ছে চলন্ত অগ্নি উৎসবময় যজ্ঞকুণ্ড।

কি জানি পিতার ভয়ে কিংবা ইন্দ্রদেবের ভয়ে তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে আসার সময় আমি পা পিছলে পড়ে গেলাম। পায়ে আঘাত লাগায় আমি কেঁদে উঠে নিজেকে সংযত

করলাম। ইন্দ্রদেব নিমেষে আমার কাছে এসে পৌঁছালেন, তাঁর বলিষ্ঠ হাতে আমাকে তোলার চেষ্টা করার আগেই আমি বহুকষ্টে উঠে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করলাম। শিশুসুলভ সরলতায় চিৎকার করে বলেই দিলাম—না, না আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না। ইন্দ্রদেব হাত সরিয়ে নিলেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কেন সুকুমারি! আমার কি দোষ? আমি তো শূদ্র নয়, দাসও নয়, আমি তো আর্যপুরুষ।"

"আমি জানি না—আপনার কাছে যেতে পিতা বারণ করেছেন। আমি লুকিয়ে আপনার রথে বসি বলে পিতার কাছে গালাগালি শুনি....।" আমি সত্যি কথা বলে দিলাম।

"কিন্তু অন্য দেবতারা তোমাকে আদর করেন। বৃহস্পতি এসেই তোমাকে কোলে বসিয়ে পিতামহর সাথে শাস্ত্র আলোচনা করেন। রুদ্র তো কৌতূকচ্ছলে তোমার ক্ষীণ শরীরটিকে হাতে তালুর ওপর তুলে ধরে ডমরু বাজাবার অভিনয় করেন; তুমি ভয় পেয়ে কাঁদলে সাপেরা তোমাকে অভয় দেয়। উপরন্তু পিতামহ ও এই ঘটনাটি উপভোগ করেন। রুদ্র প্রত্যেকবার এসেই প্রথমে এই কাজটি করেন। এই সব খবর আমি তোমার সাংবাদিক ভাই নারদের কাছে শুনেছি। আমাব প্রতি পিতামহর এরূপ বিরূপ মনোভাব কেন? আমি যোদ্ধা বলে তোমকেও বধ করব, পিতামহ এরূপ আশঙ্কা করেছেন? আমি কিছু উত্তর না দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলাম। ইন্দ্রদেব হিমালয়ের মতো আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন। স্নেহের সুরে বললেন—"দেখি, দেখি কি হয়েছে, হাড় ভাঙ্গেনি তো? অশ্বিনীকুমারদের এখনই ডেকে পাঠাব। তুমি আর আমাকে ভয় পাওনা তো? আমি দস্যু দমন করি—কিন্তু শিশু ও নারীদের রক্ষা করি। এমনকি শত্রুপক্ষের শিশু ও নারীদের আমি বধ করি না। তাদের উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করি। তুমি তো শিশু উপরন্তু নারী অবধ্য। তুমি আমার রথে বসেছিলে বলে আমি রাগ করিনি, বরং আমি খুশী হয়েছি। ধরে নাও, এই রথটা তোমার....।"

"আমার"! কান্না ভুলে আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ তুমি যখন বড় হবে, তখন তো আর এই রম্যবনে বন্দিনী হয়ে থাকবে না, তুমি ত্রৈলোক্যমোহিনী হয়ে বিশ্বভ্রমণ করবে। ইচ্ছামতো রথে বসে উড়ে বেড়াবে.....।" "আর আপনি?" আমি মুখ নিচু করে প্রশ্ন করি। ইন্দ্রদেবের সুন্দর স্বর্ণাভ পা দুটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তাঁর মুখ দেখিনি, সেজন্য আমাকে মাথা তুলে আকাশ পর্যন্ত তাকাতে হবে যে!

মন্দ্রমধুর স্বরে দেবরাজ বলেন—"এত বড় রথ আমার.....। তুমি তো কৃশাঙ্গী আমার বসার জায়গায়ও অবশিষ্ঠ থাকবে। আমি তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাব। ইন্দ্রলোকে নিয়ে যাব। সেখানকার সমস্ত সুন্দর জিনিস তোমাকে দিয়ে দেব। তুমি কি তাতে খুশী হবে না?" আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ইন্দ্রদেবের সঙ্গে রথে উড়ে যাওয়ার কথায় পিতা কি ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন সেটা আমার বালিকা মনের পরিধিতে বুঝতে পেরেছি। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার পা মচকে যাওয়ায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি মাটিতে বসে পড়ি, ভয় ও যন্ত্রণার মিশ্রিত ভাবাবেগে আমি কেঁদে ফেলি। ইন্দ্রদেবও বসে পড়লেন আমার সামনে।

বসার পরও তাঁর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর সুন্দর বলিষ্ঠ হাতের তালুতে আমার ছোট কোমল পা'টি তুলে নিলেন, তাঁর তালুর মধ্যে শিশির বিন্দু সম আমার পায়ে আঘাত লাগা স্থানটি যত্ন ও সংবেদনা সহকারে স্পর্শ করে ইন্দ্রদেব বলেন—"তোমার পার্থিব পায়ের তুলনায় অপার্থিব পারিজাত পুষ্প ও তুচ্ছ। দেখ, তোমার পায়ের তলায় আমার হাতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পারিজাত ফুল ঝরে পড়েছে.....।"

এইবার আমি রেগে যাই। আমার পায়ে এত যন্ত্রণা, ইন্দ্রদেব সেটা না দেখে পারিজাত ফুল কোথায় দেখতে পেলেন? আমি তাঁর হাত থেকে পা সরিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলাম। ইন্দ্রদেব বাধা দিলেন না। ততক্ষণে পিতা আমার নাম ধরে ডাকছেন।

আর একদিনের কথা। আমার সপ্তম জন্মদিন পালনের আরএক সপ্তাহ বাকি। আমি বাগানে সখীদের সাথে বসে গল্প করছি। আলোচনা হচ্ছে জন্মদিনে আমার মুখটা কেমন দেখাবে কি করে জানব? আমাদের আশ্রমে থাকা সমস্ত দর্পণ পিতা জলাশয়ে নিক্ষেপ করেছেন। আমি তখন সবসময় দর্পণ দেখতাম। দেব, কিন্নর, মুনি ঋষি সকলের প্রশংসা শুনতে শুনতে দর্পণ দেখা আমার একটা বদভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, তাই বিরক্ত হয়ে পিতা একটিও দর্পণ রাখেন নি আশ্রমে। আশ্রমে দর্পণ রাখা নিয়ম নয়। আমি ভাবছিলাম, অন্তত জন্মদিনে একটা দর্পণ কোথাও থেকে আনলে খুব ভালো হত।

এইসময় দেবরাজ ইন্দ্র রথ থেকে নেমে আমাদের নিকটে এলেন। আমরা চারজন দেবরাজকে অভিবাদন জানিয়ে নতমুখে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি, ইন্দ্রদেব আমাদের বাধা দিয়ে বললেন—"এইটুকু বলে যাও, তোমার জন্মদিনে কি উপহার দিলে তুমি খুশী হবে, পারিজাত—অমৃত—কিংবা—" সেইরকম নতমুখী অবস্থায় আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—"একটা দর্পণের আমার খুব শখ, মাত্র একদিনের জন্য, আমাদের ঘরে দর্পণ নেই। পিতা বারণ করেছেন; দেবরাজ সশব্দে হেসে উঠে বললেন—"পিতামহ বেদগর্ভ। তিনি ঠিকই করেছেন। তোমার দর্পণে কি প্রয়োজন? দর্পণ তাদের প্রয়োজন যাদের মুখে প্রসাধনের সাহায্যে কৃত্রিম শোভা সৃষ্টি করতে হয়।

—"না, আপনি আমাকে একটা দর্পণ দেবেন জন্মদিনের উপহার.....। আপনার অতুল ঐশ্বর্য। দর্পণ একটা দিতে পারবেন না?"

—মুখ নিচু করে ভয়ে এইটুকু বললাম।

"নিজের মুখ দেখতে চাও?" দেবরাজ প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ, আমাদের আশ্রমের দর্পণগুলির পিতা জলে নিক্ষেপ করেছেন। আমি স্পষ্টভাবে বলি।

"তাহলে তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও—তার মধ্যে তোমার কোমল মুখটি কি পবিত্র দেখাচ্ছে।" দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলামাত্রই আমি নির্ভয়ে মুখ তুলে তাঁর বিশাল স্বর্ণিম চক্ষুতারকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। পূর্বে শোনা সব ঐশ্বর্যই সেখানে দেখতে পাই। আমার নিজের মুখ দেখতে পেলাম না।

বললাম—"আপনার চোখ ছাড়া সেখানে আর কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"ওঃ তোমার বয়স খুবই কম। নাহলে বুঝতে পারতে আমার চোখে তোমার মুখ কিভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। যদি বল, আমার একটা চোখ উৎপাটন করে তোমাকে জন্মদিনের উপহার দেব। আমার দুটি চোখ চলে গেলেও আমি তোমার মতো দেবশিশুদের নিশ্চয় দেখতে পাব।" ইন্দ্রদেবের এই ধরণের কথায় আমি আরও বেশি ভয় পেলাম। ইন্দ্রদেব আর্যকুলের রক্ষাকর্তা, তাঁর চক্ষুহানি হলে আর্যকূল বিপন্ন হবে। পিতা শুনলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। আমার দর্পণে কাজ নেই। দর্পণ চাইলে চোখ দেওয়ার অর্থ এই যে, ইন্দ্রদেবও আমাকে একখানা দর্পণ দিতে চান না। সম্ভবত তিনি পিতাকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। তাবলে নিজেকে চক্ষুহীন করবেন আমার শিশুসুলভ খেয়ালের জন্য।

—"না, না, আমার দর্পণের দরকার নেই, আপনি চক্ষুহানি করবেন না।" আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলি।

অবিচলিত ভাবে ইন্দ্রদেব বলেন—"আমার একটা চোখ তোমাকে দিলে কিছু ক্ষতি হবে না। স্বর্গলোকে আছেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তাঁরা শল্য চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। তাঁদের চিকিৎসায় খুশি হয়ে আমি তাদের ভুলোক থেকে দ্যুলোকে নিয়ে এসেছি। তাঁরা আমার একটি চক্ষু স্থাপন করে দেবেন। আমার জন্য চক্ষুর অভাব হবে না। প্রতিদিন কোনও না কোনও দাস মৃত্যুবরণ করছে। তাদের চোখের রঙ আলাদা হতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রখর। সেই সব চক্ষু স্বর্গলোকে সংরক্ষিত আছে। স্বর্গে, মর্তে যার প্রয়োজন, তার জন্য চক্ষু ভাণ্ডার উন্মুক্ত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্যোমযানে এসে ভূলোকেও শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন করেন। তোমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।" অশ্বিনীকুমারদ্বয় চক্ষুরোপনে অত্যন্ত দক্ষ আমি জানি। যদি চক্ষু ভাণ্ডারে চক্ষু না থাকে তাহলে দাসবর্ণের লোকেদের কাছ থেকে জীবন্ত চক্ষু উৎপাটন করে আনতেও আর্যগণ পশ্চাৎপদ হবেন না। সামান্য একখানা দর্পণ থেকে কথা কোথায় পৌঁছাল। ইন্দ্রদেবকে বারণ করে নিমেষে আমি দৌড়ে পালালাম। সব কথা পিতাকে বলে দিলাম। পিতা গম্ভীর হয়ে কি ভাবলেন। আমার জন্মদিনে স্বর্গলোকে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হল না। কেবলমাত্র সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আশ্রমবাসী ঋষি ও ঋষিপত্নীদের নিমন্ত্রণ করা হল। অনাড়ম্বরভাবে আমার সপ্তম জন্মদিন পালিত হল। এই ঘটনার পর পিতামহ ব্রহ্মালোকেই দেবতা এবং ইন্দ্রদেবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। রম্যবন দেবতাদের জন্য নিষিদ্ধ হল। তারপর আমি আর ইন্দ্রদেবকে দেখিনি। তাঁর রূপ আমার কাছে একেবারেই অস্পষ্ট।

আমি কিন্তু পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"ইন্দ্রদেব সবাইর ইচ্ছাপূরণ করেন, আমাকে যদি তিনি কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলেন, তুমি কেন তাঁকে আসতে বারণ করলে? পিতা গম্ভীর হয়ে বলেন—"কখনও বাসবের প্রলোভনে ভুলবি না। বাসব বীর যোদ্ধা, উদার, দানশীল, পরোপকারী এবং আর্যদের রক্ষাকর্তা হতে পারে, কিন্তু সে বস্তুবাদী। এখন ভোগই তার জীবনের ব্রত হয়েছে। জীবন ভোগের জন্য নয়, ভাবের জন্য। সময়ে সময়ে ভোক্তার

ভাবের অভাব দেখা যায়। ভাবশূন্য জীবন তোকে সুখী করবে না। তোর বিষয়ে আমার জীবনের লক্ষ্য ভিন্ন।"

আমি অবাক হয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে থাকি। পিতার একটা কথাও আমার চেতনায় অর্থবহ নয়। বড় হবার পর পুরাতন কথা মনে পড়লে আমি ভাবছিলাম—আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করবে কে? পিতা না আমি? জীবন যদি আমার তাহলে পিতার লক্ষ্য আমার লক্ষ্য হবে কিভাবে? কিন্তু এ বিষয়ে বেশি কিছু আলোচনা করলাম না। শুধু আমার বালিকা মন অসময়ের কুয়াশার মতো বিষণ্ণ ও সন্দিগ্ধ হয়ে যায়।

স্বর্গলোকে পৌঁছে রথের ভিতরে বসে আমি এইরকম অনেক কথা ভাবছিলাম। তখন সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক চলছিল দেব-মানবের মধ্যে। সভায় সভাপতিত্ব করছেন যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণু মিতভাষী। তাই তিনি এই তর্কসভার পক্ষপাতী নন। তিনি শুধু তর্কের সারাংশ উদ্ধৃত করে ব্যঞ্জনার ছটায় নিজের মতামত দেবেন। তর্কসভার উদ্বোধন করে শিব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে চলে গেছেন। তিনিও অযথা তর্কের ধার ধারেন না। তিনি নিজে শিব। তাই সুন্দরতার অর্থ তাঁর কাছে 'শিব' এই কথা বলে তিনি অন্তর্ধান হয়েছেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সভার সময়েও বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে নৃত্যগীতে মগ্ন। সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে কারও কোনও আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। দেবতারা সৌন্দর্যলিপ্সু অথচ সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ নয় অনিচ্ছুক। দেবতাদের মনজানা দুঃসাধ্য। ঋষিগণ সৌন্দর্যতত্ত্বকে পার্থিব থেকে অপার্থিব স্তরে নিয়ে গেলেন। কয়েকজন দেবতা ও ঋষি নিজের অক্ষমতা আড়াল করার জন্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য তত্ত্ব উত্থাপন করেন। দেবতাদের কাছে সৌন্দর্য ভোগবাসনার অপর নাম। যাহা সুন্দর তাকে অধিকার করো—ভোগ করো। দেবতারা এটাই করে আসছেন। আজ আর কি নূতন তত্ত্ব দেবেন? তাঁরা ত্যাগের দ্বারা দেবত্ব লাভ করলেন, পুনরায় ভোগ ও প্রলোভনের জীবন কাটাচ্ছেন। নিরর্থক শব্দগুলিকে ঋষিরা এমন ভাবপ্রবণ হয়ে বলছেন যে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ।

এ পর্যন্ত ইন্দ্রদেব এবং প্রবীণ ঋষিগণ নীরব ছিলেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ দেবতা এবং ঋষিদের তর্ক যখন অপ্রাসঙ্গিক মনে হল তখন প্রথম মুখ খুললেন ইন্দ্রদেব। ইন্দ্রদেব মুখ খোলা মাত্রই মহর্ষি গৌতম ও নিজস্ব মতামত প্রকাশ করলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রও তর্কে অংশগ্রহণ করলেন।

প্রথমে ইন্দ্র বললেন—"মানুষের মন সৌন্দর্য প্রিয়। তাই সৌন্দর্য মনের ইচ্ছাকেই পূরণ করে থাকে। সৌন্দর্যের মোহিনী শক্তি আছে। ইহা মানুষকে অসীম আনন্দ দেয়।"

ব্রহ্মা—"এই আনন্দ পার্থিব না অপার্থিব?"

ইন্দ্র—"পার্থিব এবং অপার্থিব।"

গৌতম—"না, যে সৌন্দর্য পার্থিব আনন্দ দেয়, তা সৌন্দর্য নয়, সৌন্দর্যের নামে মায়া।"

ইন্দ্র—"সৌন্দর্যের এক আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহা পার্থিব হতে পারে, অপার্থিবও।

গৌতম—"বাস্তবিক আকর্ষণের নামে মোহ, কারণ যাহা অনুভবের দিব্যতা প্রতিপাদন করে, তাহাই সৌন্দর্য।"

বিশ্বমিত্র—"সৌন্দর্য কেবল আকর্ষণ করে না, ব্যক্তিগত অধিকারের জন্য সৌন্দর্য-গ্রাহীকে প্রলুব্ধ করে।" সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বিশ্বমিত্র এই মত প্রকাশ করেন।

বশিষ্ঠ—"যা প্রলুব্ধ করে তা সৌন্দর্য নয়—সৌন্দর্যের নামে বিকার,—লালসা—লোভ।"

ইন্দ্র—সৌন্দর্য ঐশ্বরীয় রহস্যের প্রতীক। তাই ইহা মোহগ্রস্ত করে মোহ ও রহস্যের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে পরীক্ষা করেন।

এই সময় গৌতম বলেন— 'সৌন্দর্য মোহভঙ্গের কারণ।'

বশিষ্ঠ—"সৌন্দর্য ব্যাধি পীড়া, জরা, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।"

বিশ্বমিত্র—সৌন্দর্য শাপগ্রস্তও করে।

ইন্দ্র—সৌন্দর্যের কোনও নির্দিষ্ট নীতি নেই। ইহা নীতি অনীতির উর্দ্ধে যে মুহূর্তে সৌন্দর্য নৈতিকতার বন্ধন অনুসরণ করে। সেই মুহূর্তে সৌন্দর্যের উৎকর্ষতা হ্রাস পায়।

গৌতম—'একমাত্র সৌন্দর্যই নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করে।'

ইন্দ্র—"সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য। এই পৃথিবী হল দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং রসনা পরিতৃপ্তকারী সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। তাই এ হল চিরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

গৌতম—"উচ্চমানের সৌন্দর্যবোধ এক অতিন্দ্রিয় আনন্দ দেয়। এই আনন্দ স্থূল বিষয়ানন্দ থেকে উচ্চতর এবং মৌলিক। তাই ইন্দ্র বা ইন্দ্রিয় সৌন্দর্যের বিকারকেই ভোগ করে থাকে।"

উত্যক্ত ইন্দ্র বলেন—"সৌন্দর্য আবেগ সৃষ্টি করে, যার সেই আবেগ নেই, সে জড়।"

গৌতম—'সৌন্দর্যই আবেগ দমন করতে সাহায্য করে থাকে। সৌন্দর্য স্থূলভাবে উপলব্ধ নয়। ইহা সত্যকে জ্ঞানের পরিসরে উন্নীত করে দিব্য অনুভবে পরিণত করে।"

ইন্দ্র—'সুন্দরতা এক বস্তুরূপ। সুন্দরতা যদি মনকে উত্তাল না করে তাহলে সে সুস্থ নয়, অসুস্থ। সুন্দরতা চায় ভোক্তা এবং ভোগ্য। ইহা জ্ঞানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়।"

গৌতম—সুন্দরতা বস্তুরূপ নয়। ইহা আত্মার প্রতিচ্ছবি। ইহা ভোগ্য নয়, ত্যাগ এবং নিবৃত্তি। সুন্দরতার বস্তুমূল্যও নেই। দৃষ্টি অনুযায়ী দর্শন। তাই সুন্দরতাকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা অনুচিত।"

ব্রহ্মা দেখলেন ইন্দ্র এবং গৌতম অতীতের সেই বিবাদমান পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দেবতা এবং ঋষিগণ ইন্দ্র ও গৌতমের তর্কযুদ্ধ উপভোগ করছেন। অথচ আলোচনা সমাধানে কেউ প্রয়াসী নয়। এই অন্তহীন আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ না টানলে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পূর্বে ঋষিগণের ভূলোকে ফিরে যাওয়া বিধেয়। ইন্দ্র দেবতাদের সম্রাট হলেও সে সর্বকনিষ্ঠ এবং চিরতরুণ। সে ভোগী এবং বিলাসপ্রিয়, উগ্র ও বস্তুবাদী। তাই গৌতমের সাথে তার মত ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এই আলোচনার ফলাফল পূর্বেই ব্রহ্মার

জানা থাকলেও সম্ভবত ইন্দ্র এবং গৌতমের মতামত সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করার জন্যই তিনি এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন।

আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার জন্য তিনি বিষ্ণুকে অনুরোধ করলে বিষ্ণু সভাপতির ভাষণে বললেন—"প্রত্যেক মানবীয় অনুভব নৈতিকতার উপলব্ধি এবং হিংসার নিবৃত্তির জন্য অভিপ্রেত। সৌন্দর্যের লক্ষ্যও সেইটুকু। যদি তা না হয়, তাহলে সৌন্দর্যের নামে তাহা কুরূপতা—হল্য—অমৃতের নামে হলাহল। উচ্চমানের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় স্রষ্টার উচ্চমন থেকে পুনরায় ইহা দর্শক মনকে উত্তুঙ্গতার শিখরে নিয়ে যায়। এই অবস্থায় দর্শকের উচ্চতম চেতনায় এক চিরন্তন এবং অসীম সৌন্দর্য বিম্বিত হয়। ইহাই ব্রহ্মদর্শন। সৌন্দর্যবোধ অতিন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক আনন্দ সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য হল জীবন, মন ও আত্মা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার কলাত্মক সমাধান। তাই সৌন্দর্য আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ওপরই আধারিত। সৌন্দর্য মানুষের জীবন ও তার শাশ্বত মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে ও জীবনকে সমুন্নত করে থাকে। ভৌতিক বস্তুকে আশ্রয় করলেও সৌন্দর্য কোনও কালে ভৌতিক নয়। ইহা চিরকাল আধ্যাত্মিক। সৌন্দর্য শুধুমাত্র সমসাময়িক মূল্যবোধকে সমুন্নত করে না। ইহা অনন্তকালের পরম লক্ষ্য সাধন করে থাকে। তাই মহান সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং উপলব্ধি মূর্ত নয়, অমূর্ত। সর্বশেষ কথা হল সৌন্দর্য মানবের কামনাবাসনাকে মোক্ষপথে পরিচালিত করে। ইহাই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

পরোক্ষভাবে ব্রহ্মা গৌতমের মতকে সমর্থন করে ইন্দ্রের মতকে খণ্ডন করলেন। অতীতে ইন্দ্র এবং গৌতম যখন ব্রহ্মার শিষ্য ছিলেন তখন সর্বদাই ব্রহ্মা গৌতমের পক্ষ সমর্থন করেছেন। তাই কেউই এতে বিস্মিত হলেন না। তবে ইন্দ্র অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলে প্রথা আমার কানে কানে বলে। এই আলোচনার পরিণতি শুভ নয় বলে সে ভবিষ্যৎবাণীও শোনায়। ইন্দ্রকে গৌতমের চেয়ে ন্যূন প্রমাণ করার জন্যই বোধহয় পিতা এইরকম একটা সভার আয়োজন করেছিলেন।

অবশেষে সভা ভঙ্গ হল। ইন্দ্রদেবের দেবসভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য পিতার নির্দেশ এল। তুয়ি, আন্বিক্ষিকা, বার্ত্তা ও নীতির সাথে আমি নতমুখে ধীর পদক্ষেপে সভার দিকে অগ্রসর হলাম। সত্যি যেন আমি স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছি—হয়তো এই সভায় বিধিনির্দিষ্ট আমার স্বামীও উপস্থিত থাকতে পারেন। এটা পিতার ষড়যন্ত্র নয়তো! এইরকম একটি সভার আয়োজন করে বিশিষ্ঠ দেবতা ও ঋষিদের মধ্য থেকে তিনি আমার জন্য উপযুক্ত স্বামী মনোনয়ন করছেন না তো! সম্ভবত এটা-ই সত্য। স্বয়ম্বরে নিজেকে প্রদর্শন করা আমার মোটেই পছন্দ নয়। অবশ্য স্বয়ম্বরে স্বামী মনোনয়নের সুবিধা ও স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়! স্বয়ম্বর তো এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পিতার শর্ত যে পূরণ করবে সেই আর্যকুমারীর যোগ্য বর বিবেচিত হবে। এখানে আর্যকুমারীর স্বাধীন মতের স্থান কোথায়?

শর্ত তো পিতা নির্ধারণ করেন। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি নতমস্তকে এসে দাঁড়ালাম। আমার মনে হল, নৃত্য গীত কোলাহল সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবাই একদৃষ্টে আমাকে দেখছেন।

মুনি, ঋষি, দেবতা সকলের এক অবস্থা। ইন্দ্রদেবকে প্রণাম করে আমি চোখ তুলে তাকালাম। সখীদের বর্ণনার চেয়ে সহস্রগুণ শৌর্য ও সৌন্দর্যবান ব্যক্তিত্বের দর্শনে আমার কিশোরীপ্রাণ নবরাগে রঞ্জিত হল। আমি জানি না—কি ভাবাবেগে মুহূর্তের মধ্যে চেতনা হারালাম। সখীরা আমাকে ধরে রথে ফিরিয়ে আনে। অশ্বিনীকুমারগণ ও ধন্বন্তরী ছুটে এলেন আমার জ্ঞান ফেরাবার জন্য, কিন্তু পিতা বারণ করলেন। তিনি বললেন—"ওর কিছু হয় নি, প্রথমবার অন্তরীক্ষ পথে দ্রুতবেগে অতিক্রম করার জন্য মর্তবাসিনী কন্যাটি ক্লান্ত হয়ে গেছে, মর্তের মাটি স্পর্শ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" অচেতন অবস্থাতেই আমি ফিরে এলাম ভূলোকে, আমার জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু স্মৃতি ফিরে পেলাম না। মনে হল, আমি দ্যুলোক বা ইন্দ্রদেব কাউকেই দেখিনি। আমার মাতৃভূমি আমার স্বর্গ। হিমবন্ত পর্বতের পাদদেশে এই নির্জন শান্তিময় রম্যবনই আমার অমরাবতী। আমার এই ভূস্বর্গ ভোগপ্রধান নয়। তাই আমি আর চেতনা হারাই না।

সখীদের কাছে শুনলাম, আমার সৌন্দর্য অবলোকনে কয়েকজন ঋষি যখন বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন তর্কনিষ্ঠ দার্শনিক মহর্ষি গৌতম অবিচলিত নির্বিকার চিত্তে বসেছিলেন এবং যান্ত্রিক শৈলীতে আশীর্বচন উচ্চারণ করছিলেন আমার উদ্দেশ্যে।

"আর ইন্দ্রদেব?" আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম।

"এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস ফুটে উঠেছিল তাঁর দৃষ্টিতে।"

"কি প্রতিজ্ঞা?"

"জয় করার প্রতিজ্ঞা।"

"ওঃ যুযুৎসু ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে আর কি-ই বা আশা করা যায়" —হেয়জ্ঞান করে আমি এইটুকু কথা বললাম এবং আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বালিকার মতো বিস্মৃতিতে হারিয়ে দিলাম। প্রকৃতিই ছিল আমার অন্তরঙ্গ সখী। প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতা বশত আমি আমার নিঃসঙ্গতা ভুলে গিয়েছিলাম।

পিতার কাছে বেদ অধ্যায়ন করে আমি ভাবময়ী হয়েছিলাম, ভাই নারদের মধুর বচন ও সঙ্গীত শুনে আমি সঙ্গীতময়ী এবং প্রকৃতির সাথে ওত-প্রোতোভাবে জড়িত হয়ে আমার মাতৃভূমি সেই তপোবনের প্রতি প্রেমময়ী হয়ে উঠেছিলাম। এই তিনজনকে নিয়ে আমার সময় নির্বিঘ্নে কেটে যাচ্ছিল। আমার চারসখী অনেক সময় আমাকে একান্তে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বেদচর্চায় ব্যস্ত থাকত। কিন্তু ঋচা আমার দেহের ছায়ার মতো অনুসরণ করত। অনেক-সময় আমি একা একা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। ভয়, আশঙ্কা কিছুই ছিল না। রাক্ষস, দৈত্য, দানব, হিংস্রপশু কাউকেই আমি ভয় পেতাম না। গভীর অরণ্য যেন মায়ের কোল। অরণ্যের সব ঐশ্বর্য যেন আমার কাছে জমা হত। আমি যেদিকে পা বাড়াই, মরুৎগণ সেই দিকে পুষ্পের সুগন্ধ প্রবাহিত করেন। ফুল ফোটে, পাখির কূজন শোনা যায়, নদী বয়ে যায় আমার চলার পথে। গাছ ঘন ছায়া দেয় আমার মাথার ওপর। আমার ঘনকুঞ্চিত কেশের মধ্যে ভ্রমরেরা আত্মগোপন করে মধুগুঞ্জন করে। মৌমাছি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মধুকোষের

সন্ধান করে গুনগুন করে। বর্ষা, মেঘ, সূর্য, চন্দ্র, সবুজিমা, অরুণিমা, ফুল, ফল, জল, মধু কি অভাব আমার? পায়ের তলায় পৃথিবীমাতা, মাথার ওপর উদার অন্তরীক্ষ, চারপাশে বর্ণাঢ্য প্রকৃতি। সেখানে নিঃসঙ্গতার স্থান কোথায়? ময়ূর-ময়ূরী, হরিণ-হরিণী, শুকসারী আরও কত বিচিত্র পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ এবং বনস্পতিতে সমৃদ্ধ আমার এই তপোবন।

আমি সবাইয়র ভাষা না বুঝলেও ভাব বুঝি। অনেকে বলেন—পশুপাখীর ভাষা থাকতে পারে, ভাব নেই। ভাবের অভিব্যক্তি বা আসবে কোথা থেকে? কিন্তু আমি জানি জড় জীব এমনকি প্রকৃতির প্রতিটি অনু-পরমাণুতে প্রতি মুহূর্তে ভাবঝঙ্কার কম্পন সৃষ্টি করে। তুমি যেমন দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে স্পর্শ করবে—সেই রাগে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে তোমার অন্তর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি সবাইকে স্পর্শ করব। যাকে ভালোবাসব অবশ্যই তাকে স্পর্শ করব—অনুভব করব—আমার ভাবতরঙ্গকে প্রবাহিত করে দেব প্রিয়বস্তুর অনুপরমাণুতে। প্রিয়'র থেকে দূরত্ব আমার সহ্য হয় না। সেইজন্য আমি সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করি ভাবের আদান-প্রদান করি। সে জড় কিংবা জীব, পশু কিংবা বনস্পতি আমি সবাইকে কোলে তুলে নিতে চাই। একবার আদর করে সরীসৃপের উদ্যত ফনাকে ছুঁয়েছিলাম। ভাই নারদ বীণা বাজাচ্ছিলেন এবং সেই মধুর সুর তন্ময় হয়ে শুনছিল সর্পরাজ। আমি ছুঁয়ে দেওয়ায় তার একাগ্রতা ভঙ্গ হল, সেইজন্য সে ফোঁস ফোঁস করে উঠল। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। ভাই বললেন—"না জেনে কাউকে ছুঁয়ে দেওয়া উচিত নয়।"

কিন্তু আমার তো ইচ্ছা হয়, যাকে ভালোবাসব তাকে স্পর্শ করব, আদর করে গলায় জড়াব—তাতে ক্ষতি কি?

"তা বলে পশু-পাখী, দেবতা, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য করবি না। সংসারে নানা নীতি-নিয়ম আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু শেখা উচিত। পিতা তোকে সকলের দৃষ্টির অগোচরে রাখায় তুই সংসারের আদব-কায়দা কিছুই শিখলি না। সবাইকে ছুঁয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এখন তুই বালিকা, এরপর যুবতি হবি.....।" ব্রহ্মচারী ভাই নারদ যুবতী শব্দটি খুবই সঙ্কোচ সহকারে উচ্চারণ করলেও তার ফর্সা মুখ ঈষৎ লাল হয়ে যায়। সেই লালিমার অর্থ আমি কিছুই বুঝিনি সেই বয়সে। ভাইয়ের কথায় আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। আমি বললাম—"বালিকা হই বা যুবতি ছোঁয়ায় দোষ কি? আমি তো সখীদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালোবাসি—ঋচাকে কোলে নিয়ে আদর করি—। লতা-পাতা, বৃক্ষ, পশু-পাখী, ঝরণা, পাহাড় কাকে না ছুঁই? কখনও তো কেউ প্রতিবাদ করেনি—আমারও কিছু ক্ষতি হয়নি।

"সে সব ঠিক আছে। কিন্তু তা বলে কি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে হিংস্র জন্তুকেও ধরবি? পুরুষদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালোবাসবি? শাসনের ভঙ্গিতে ভাই বলে। আমি হঠাৎ ভাইকে জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করলাম এবং দুষ্টুমি করে বললাম—এই তো আমি তোমাকে ছুঁলাম, আদর করলাম—তুমিও তো পুরুষ, কি ক্ষতি হল বলত দেখি।"

ভাই ব্যস্তভাবে নিজেকে আমার থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন—ব্যাস, ব্যাস, আর এরকম

করবি না, মেয়েরা বড় হয়ে গেলে বাবা, ভাইকেও এইভাবে আদর করার কথা নয়। এ হচ্ছে বৈদিক সংস্কার।"

—বড় হয়ে গেলে বাবা ভাইকেও এইরকম আদর করা উচিত নয়, তাহলে কি অনাদর করা উচিত? ঘৃণা করার কথা? ভাই অস্থিরভাবে বললেন—"হে নারায়ণ! একে নিয়ে মানুষ আরও কত ভীষণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তা শুধু তোমারই জানা।" পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"ভালোবাসায় বারণ নেই, কিন্তু ছোঁয়া মানা, বাবা, ভাইও তো পুরুষ।"

—পুরুষ কি হিংস্র? হিংস্র জন্তুকে ছোঁয়া মানা এবং পুরুষকেও কই তুমি তো আমার কিছু ক্ষতি করলে না? ফোঁস ফোঁস করলে না? চিন্তিত মুখে বিড়বিড় করে ভাই বলেন—"তোর দোষ নেই, দোষ পিতামহের। শুধু বেদভ্যাস ও সামগান করাচ্ছেন। শুধু অর্থ বোঝাচ্ছেন, তত্ত্ব নয় তিনিই বা কি করবেন—পুরুষ মানুষ। ত্রয়ি, আন্বিক্ষিকা ইত্যাদিরাও পুঁথিগত বিদ্যা ব্যতীত সংসার তত্ত্ব কিছু জানেন না, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মচারিণী। এবার তোর উপযুক্ত গুরুর প্রয়োজন। গুরুপত্নীদের সংস্পর্শে এলে সংসার-তত্ত্ব নিজে নিজেই বুঝতে পারবি। আমি দেখছি পশু-পাখীর সাথে থেকে তুই পাখিতে পরিণত হয়েছিস, শুধু উড়ে বেড়াচ্ছিস্ আত্মস্থ হস্‌নি। মানবিক আচরণও কিছু শিখিস্‌নি। অবশ্য মানুষ আর তুই কোথায় দেখলি.....।"

কৌতূহলবশত আমি প্রশ্ন করি—"পিতা আমাকে মানুষের থেকে দূরে রেখেছেন কেন? মানুষ কি দুষ্ট প্রাণী? ভাই নারদ প্রতিবাদ করে উঠলেন—"আরে না, না স্রষ্টার শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি হল মানুষ। তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক করে মানুষ। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই মানুষের আবশ্যকতা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা। স্রষ্টার সৃষ্টির প্রকৃত উপযোগ ও প্রযত্ন করতে পারে মানুষ। নিজের অভিষ্টপূরণের জন্য ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ থেকে নব-নব সৃষ্টিও করতে পারে মানুষ। মানুষের চেয়ে বলবান আর কেউ নয়। মানুষ ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিতেই বলীয়ান। মানুষের আত্মার সাথে যদি ইন্দ্রিয়গুলি স্রষ্টা না দিতেন, তাহলে আত্মা নীরব দ্রষ্টা হয়ে থাকত কিছুই করতে পারত না।"

তাহলে পিতা কেন আমাকে মানুষের থেকে দূরে রেখেছেন? —আমি প্রশ্ন করি ভাই নারদ একটু মৌন থেকে বললেন—"উপযুক্ত সময় হলে তুই মর্তের মানুষের সংস্পর্শে আসবি, তখন জানতে পারবি মানুষের সম্পর্ক কত জটীল। বৈদিক ছন্দ, গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিজগতী, যষ্টি, ধৃতঃ ইত্যাদি কত সহজে তুই আয়ত্ত করেছিস আমার কাছ থেকে, কিন্তু মানবিক সম্পর্কের ছন্দরক্ষা করে জীবনকে ভাবমধুর করা এত সহজ ব্যাপার নয়। সেইজন্য আমি মুক্ত যাযাবর জীবন বেছে নিয়েছি।"

ভাই নারদের মুখে বৈদিক ছন্দগুলির নাম শুনে আমার কিশোরী হৃদয়ের কোমল কল্পনা প্রকাশ করতে শুদ্ধস্বরে সামগান করতে লাগলাম। আমার গানের সাথে ভাইও বীণায় ঝংকার তোলেন। বনস্পতির হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে অপূর্ব ঝংকার। অকস্মাৎ পিতা সেখানে উপস্থিত হন এবং আমাদের সঙ্গীত রসে নিমজ্জিত হলেন।

ভেবেছিলাম, আমার সুললিত স্বর শুনে পিতা আজ আমার প্রশংসা করবেন, কিন্তু ব্রহ্মার

প্রশংসা পাওয়া এত সহজ নয়। সঙ্গীত শেষ হওয়ার পর পিতা বললেন—"অর্থজ্ঞান ব্যতীত বেদপাঠে কোনও ফললাভ হয় না। বরং অনিষ্ট ঘটে। যে ব্যক্তি অশুদ্ধ উচ্চারণ করে সে বেদের অবমাননা করে এবং যে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে সে আর্য। বেদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহতা মন্ত্রগানকে অর্থবহ কল্যাণময় করে। সেজন্য ব্যাকরণ জ্ঞান আবশ্যক। আমার মনে হয় তোকে কিছুদিন গুরুকুল আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করতে হবে। গুরুকুল আশ্রমে যাওয়ার জন্য মনকে প্রস্তুত কর। ঋচার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, তুই তার ভাষাটাই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিস। অথচ নারদ, ত্বয়ি, আন্বিক্ষিকা, বার্ত্তা, নীতি এমনকি আমার সাথেও তুই এত অন্তরঙ্গ নয়। তাই বেদের ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিসনি।" আমার চারসখী, পিতা এবং ভাই নারদ এই আমার সংসার। এদের ছেড়ে কোন গুরুকুল আশ্রমে যাব বিদ্যাশিক্ষা করতে, ভাবতে পারছি না। চারবেদ আমার কণ্ঠস্থ, আমি সঙ্গীত নিপুণা। আমার পিতা পরমগুরু ব্রহ্মা এবং মহান সঙ্গীতজ্ঞ ভাই নারদ। দেহের ছায়ার মতো চারসখী বিদ্যাবতী, ত্বয়ি, আন্বিক্ষিতা, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি সবসময় আমার পাশে রয়েছে। আমার চারদিকে বিদ্যার বলয়। কোন দুঃখে আমি অন্য গুরুকুল আশ্রমে যাব? আমার মনের দ্বন্দ্ব ও কুণ্ঠা বুঝতে পেরে পিতা বললেন—"এ কথা সত্যি যে, আমার কাছ থেকে শুনে শুনে তুই বেদময়ী হয়েছিস, কিন্তু নিয়মিত শিক্ষা ব্যতিরেকে তুই বেদমতী হতে পারছিস না। বেদের স্বর, বর্ণ ইত্যাদি উচ্চারণ বিধি জানার জন্য 'শিক্ষা' আবশ্যক। গুরুকুল আশ্রমে গুরু বেদপাঠ করেন এবং শিষ্যবর্গ গুরুকৃৎ উচ্চারণ অনুকরণ করে বেদমন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণ শিক্ষা করে। বেদমন্ত্রের ত্রুটিশূন্য উচ্চারণের জন্য স্বরজ্ঞান আবশ্যক। পুস্তক থেকে মানসিক জ্ঞান পাওয়া যায়। গুরুকুলে বাস করলে শিষ্য কুলীন হয়। বিদ্যার লক্ষণ, নম্রতা ও বিনয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। সর্বস্ব সমর্পণ করার পরেও আরও অধিক সমর্পনের স্পৃহা জাগে মনে।

মানুষ যে কোনও উপায়ে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ব করতে পারে কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত সে বিদ্যার উপযুক্ত বিনিয়োগ হতে পারে না। আত্মজ্ঞানের জন্য গুরুবরণ আবশ্যক। পুঁথিগত মানসিক জ্ঞান অহংকারের জন্মদাতা হতে পারে, অহংকারের মৃত্যুদাতা হতে পারে না। গুরুবরণ দ্বারা অহংকারের বিনাশ সম্ভব। দেহাভিমানের বিনাশ ও ব্যক্তিত্বের বিলোপের জন্য এক বিশাল ব্যক্তিত্বধারী গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ আবশ্যক।

"আমি কিছু করতে পারি—এই অহংকারের বিলোপের জন্য "গুরুর জন্যই আমি সবকিছু করতে সমর্থ"—এই অনুভব একান্ত আবশ্যক। পিতার এই কথায় আমার কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না, কারণ আমি পিতার কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। কিন্তু পিতার কথা শুনে ভাই নারদ প্রশ্ন করেন—"দেহাভিমানের বিনাশ ব্যাপারটা বোঝা গেল কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিলোপ কথাটা বুঝতে পারলাম না।" ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যই মানুষ শিক্ষালাভ করে। ব্যক্তিত্বের বিলোপ কে চায়?" ভাই নারদের দিকে তাকিয়ে স্মিতহেসে বললেন—"সব জেনেও না জানার অভিনয় করা এবং তোমার থেকে বয়স অধিক হওয়ায় আমার কাছ থেকে সব কিছু শুনে আত্মসমীক্ষা করাটাই হল ব্যক্তিত্বের বিলোপ। যার ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত হয়

কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিত্বের বিলোপে সক্ষম। নিজের অহংকারকে বিলুপ্ত করাই ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন।"

পিতাকে বোঝাবার চেষ্টায় আমি বললাম—"ভাই নারদও মার্জিত পুরুষ। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও বেদজ্ঞ। তাঁর স্বরজ্ঞান আছে। তিনি আমার সৎগুরু হতে পারবেন। অন্য গুরুবরণের প্রয়োজন কি?" তৎক্ষণাৎ পিতা উত্তর দিলেন—"নারদের অবশ্য স্বরজ্ঞান আছে, কিন্তু তোকে স্বরজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সময় কোথায় তার? উদাত্ত, অনুদাত ও স্বরিত এই তিনপ্রকার স্বর-শৃঙ্খলায় বেদভ্যাস করবার জন্য নারদের মতো চঞ্চল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকারী ব্রহ্মচারী উপযুক্ত নয়। নারদের কাজ হল সাংবাদিকতা। তার ফলে তুই তার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর পাবি। কিন্তু শিক্ষালাভ করে বিদ্যাবতী, বেদমতী ও আত্মস্থ হওয়ার জন্য তোকে গুরুকুল আশ্রমে যেতে হবে। যদি তুই ভেবে থাকিস নারী শুধু গৃহকর্ম করবে এবং বিদ্যার্জনের কাজ পুরুষের—এই ধারণাও ভুল। যাজ্ঞবল্ক নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে আধ্যাত্মজ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং মৈত্রেয়ী পরম বিদুষী হিসাবে অধ্যাপনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যুবকদের পঁচিশবছর বয়স পর্যন্ত তপোবনে ব্রহ্মচর্য পালন করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হয় এবং যুবতিদের ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভের নিয়ম্। এখন তোর এগারো বছর বয়স। তোকে পাঁচবছর গুরুকুলে থাকতে হবে। তবেই তোকে মহিলা বলা যাবে। মহিলা হল সেই—যে বিচারে মহান। যে বিচারে ক্ষুদ্র ও দুর্বল সেই হচ্ছে 'অবলা'। তুই মহিলা হতে চাস্ না অবলা হতে চাস্? অবশ্য বৈদিকশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির জন্য অবলা শব্দের প্রয়োগ নেই। তাই আমার অহল্যা 'পুরন্ধ্রা' হবে—সে নগর রাষ্ট্র ধারণ করবে। শুধু রূপে নয়—জ্ঞান বিবেকে সে হবে অহল্যা। তাই আমার অহল্যাকে গৌতম আশ্রমে অন্তত পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করতে হবে। গৌতমের আশ্রমে ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। সেখানে ঋষিপত্নীরা ব্রহ্মচারিণীদের সমস্ত দায়িত্ব নেন। শিক্ষান্তে সংসার জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরাই ব্রহ্মচারিণীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেন। অবশ্য গৌতম অবিবাহিত—কিন্তু সে স্থিতপ্রজ্ঞ! গৌতমের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বছর থাকার জন্য আমি গৌতমের সাথে কথা বলেছি।"

পিতার মুখে গৌতমের নাম শুনে ভাই নারদের মুখে কুটিল হাসির বক্ররেখা ফুটে ওঠে, কিন্তু আমি সে হাসির অর্থ বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ গৌতম ঋষিকে আমাকে সমর্পণ করার কথা সিদ্ধান্ত পিতা কেন নিলেন, তা তিনিই জানেন। অবশ্য গৌতম ঋষি জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, নৈয়ায়িক, কামরহিত, নির্বিকার যোগী। কিন্তু শুনেছি তিনি অত্যন্ত কঠোর এবং গম্ভীর ও শুষ্ক। তাঁকে দেখলে মনটা খাঁ-খাঁ করে। যখনই তিনি পিতার সাথে দেখা করতে এসেছেন, আমি প্রণাম জানিয়েই সরে এসেছি। কিন্তু গৌতম ঋষিকে পিতা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তা না হলে গৌতম ঋষিকে পিতা আমার দায়িত্ব দিতেন না।

আমি নাবালিকা। হিতাহিত জ্ঞান রহিতা। আমার বয়স মাত্র এগারো। মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা আমি পিতার আদরে অত্যন্ত আদরিণী ছিলাম। সংসারজ্ঞান ছিল না। সম্ভবত সেই কারণে সংসারের কঠোর-শৃঙ্খলিত জীবনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে গৌতমের মতো তর্কনিষ্ঠ

তপঃসিদ্ধ গুরুর হাতে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া একাকিনী চারসখীর সাথে শুধু সামগান করে মাঝে মাঝে মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠছিল। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গৌতম ঋষির আশ্রমে অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী এবং গুরু ও গুরুপত্নীদের সাথে সুন্দর তপোবনে কয়েকবছর কাটাবার জন্য মনে কৌতূহল জাগে। কিন্তু গৌতম আশ্রমে শিক্ষালাভ এক চপল বালিকাসুলভ কৌতূহলের থেকে যথেষ্ট কঠোর ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কথা বুঝতে পারলাম উপনয়নের পর।

"মনুর্ভবঃ'" তিনরাত্রি ধরে আচার্য গৌতম এই গুঢ়জ্ঞানটি আমাকে দিয়ে চলেছেন। আচার্যের কাছে আসার পর শিষ্য বা শিষ্যাকে চাররাত আচার্য গর্ভে ধারণ করেন এবং তারপর তাকে জন্ম দেন। অর্থাৎ তিনরাত্রি নিভৃতে গূঢ়জ্ঞান দেওয়ার পর শিষ্য আচার্যের সন্তানরূপে গ্রহণযোগ্য হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হল। কুটীরের মধ্যে তিনরাত্রি ধরে আচার্য গৌতম আমাকে 'মনুর্ভবঃ', 'মনুর্ভবঃ'-ই বলে চলেছেন, বলে চলেছেন—সত্যংবদ, ধর্মংকর, স্বাধ্যায়হ্নু প্রমবঃ, সত্য বল, ধর্ম কর, অধ্যয়ন থেকে বিরত হও না। এইসব আমার কাছে নতুন নয়, পিতার কাছে আমি এ দীক্ষা নিয়েছি। কিন্তু গুরুকুল আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী আমি আচার্যের কাছে মানুষ হওয়ায় এবং চরিত্রবতী হওয়ার জন্য দীক্ষা নিলাম এবং চতুর্থ দিবসে আমার শিষ্যত্বের জন্মউৎসব পালিত হল। দেবতারা এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন, ভাই নারদও এসেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রদেব আসেননি। ছোটোখাটো উৎসবে তিনি দ্যুলোক থেকে ভূলোক আসেন না। কিন্তু আমার ভাই নারদের হাতে একটি রত্নখচিত দর্পণ পাঠিয়েছিলেন জন্মদিনের উপহার স্বরূপ। কিন্তু আচার্য গৌতম সেটা গ্রহণ করলেন না।

'ইন্দ্রদেবের আশীর্বাদ ও করুণা থাকলে ধনরত্নের প্রয়োজন নেই"—এই কথা বলে তিনি দর্পণটি ফিরিয়ে দিলেন। আরও কয়েকজন দেবতা না আসতে পারলেও নানারকম উপহার পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি গ্রহণ করা হল, কিন্তু ইন্দ্রদেবের উপহার কেন প্রত্যাখ্যান করা হল তা আমি বুঝতে পারলাম না। প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হলেও চুপ করে থাকলাম। গুরুকুলের কিছু নিয়ম আমাকে মানতে হবে। আমি খুশী হয়েছি কারণ আমি এবার দ্বিজত্ব পেলাম। ইচ্ছা করলে আমি সরাসরি দেবতাদের আহ্বান করতে পারব। এমনকি ইন্দ্রদেবকেও আহ্বান করতে পারব। মাকে না দেখায় আমার জন্ম-মাতৃগর্ভ থেকে হয়েছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে আচার্যর মুখ থেকে বিধিপূর্বক। প্রথমে আচার্য আমার মাথায় হাত রেখে মন্ত্রপাঠ করলেন এর দ্বারা আমি তাঁর গর্ভে চলে গেলাম বলে ধরে নিতে হবে। তিনরাত ধরে সাবিত্রীমন্ত্র পাঠের দ্বারা তাঁর মুখ থেকে আমার নবজন্ম হল—এটা নিয়ম। এখানে আচার্য হলেন আমার দ্বিতীয় জননী। পিতামাতা শারীরিক জন্ম দেন। কিন্তু আচার্য জাতি বা সংস্কৃতি প্রদান করেন। সেই দৃষ্টিতে আজ থেকে আমি আচার্যের কন্যাসাদৃশ। প্রথম থেকেই আশ্রমে বিতর্ক সৃষ্টি হয় আমাকে নিয়ে। তার কারণ আমার বাল্যসহচরী, আর্য দাস সংঘর্ষে পিতামাতাকে হারানো ঋচাকে আমি সঙ্গে এনেছিলাম। ঋচা আমার দেহের ছায়াসদৃশ। পিতা ভেবেছিলেন, আশ্রমের নিকটবর্তী দাসপল্লীতে কারও কাছে

থাকবে অথবা আশ্রমের মুনিপত্নীকে শুরুগাইয়ের কাজ অথবা বাগানের কাজ করে খাদ্য জোগাড় করবে। কিন্তু আমি জিদ্ ধরলাম ঋচাকেও আমার সাথে দ্বিজত্ব প্রদান করে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। আচার্য গৌতম আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন দৃঢ়ভাবে। কারণ দাসবর্ণের লোক যারা পরবর্তীকালে সেবা ও ভৃত্যের কাজ করে শূদ্ররূপে পরিগণতি হবে, তাদের জন্য বৈদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার রুদ্ধ। বিশেষত আচার্য গৌতম এ বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমি যুক্তি করি--তাহলে ইতরা শূদ্রানীর গর্ভজাত মহীদাস ঐতরেয় উপনিষদ রচনা করেছেন কিভাবে? কুমারী মাতা এবং দাস পিতার ঔরসে জন্মলাভ করে ইন্দ্রদেব কি করে দেবরাজ পদ লাভ করলেন মন্ত্রযোগ্য হলেন কি ভাবে?

আমার বাল্যসখী ঋচা সর্বগুণসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দেহের রং কালো হওয়ায় সে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল বলে আমার ক্ষোভ জাত হয়। শাস্ত্রবিদ্ নৈয়ায়িক গৌতমের এটা ন্যায়!

আমি প্রথমে রেগে গেলাম যে ঋচা দীক্ষিতা না হলে আমিও দীক্ষিতা হব না। ভাই নারদের কাছে আমি শুনেছি যে ভূলোকের এই পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলে বর্ণভেদ ছিল না। পঞ্চসিন্ধু আদি সংস্কৃতির নির্মাতা আদিম অধিবাসীগণ সাম্য, মৈত্রী এবং গোষ্ঠী জীবনকে ভিত্তি করেই এক বিরাট সভ্যতা নির্মাণ করতে পেরেছিল। সেই সভ্যতায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য আর্য-দাসের বৈষম্য ছিল না। সমাজে সকলের কল্যাণের জন্য বহিঃশত্রু ও প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই সংঘর্ষ হত। সেই সংঘর্ষও ছিল গোষ্ঠী ভিত্তিক। তাদের মধ্যে বর্ণভেদের ধারণাও ছিল না। চতুঃবর্ণ এবং বর্ণবিভাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্ণভেদ এবং বর্ণভেদ থেকেই আজ জাতিভেদের উৎকট ব্যধি দেখা দিয়েছে। বর্ণভেদ থেকে বর্ণবিভাগের ধারণা প্রথমে আর্যরাই সৃষ্টি করেন এবং মানব জাতিকে আর্য এবং দাস অথবা ভদ্র এবং ইতর এইভাবে দু'ভাগ করে দেন। ঈশ্বরের দুর্লভ সৃষ্টি মানুষের অমৃতময় অন্তরে চিরন্তন বর্ণবিদ্বেষের রক্তাক্ত দাগ টেনে দেয় আগামী বংশধরদের জন্য। কিছু আর্যঋষি নিজেদের এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্য যুক্তি করেন---দেহের বর্ণভিত্তিক নয়, কর্মের ভিত্তিতে আর্য ও দাস বা দস্যুর বিভাজন করা হয়েছে। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে আর্যগুণ থেকেও ঋচা শিক্ষা থেকে বঞ্চিতা হল কেন? কৃষ্ণকায় দম্পতির কন্যা তথা কৃষ্ণাঙ্গী হওয়ার জন্যে নয় কি?

মনে পড়ছে ঐতরেয় মহীদাসের কথা। ব্রাহ্মণ পিতা এবং ইতরা নাম্নী দাসমাতার গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন মহীদাস। তিনি কৃষ্ণকায় ছিলেন। ইতরার পুত্র হওয়ায় সে ঐতরেয় হিসাবে খ্যাত ছিল এবং দাসবর্ণের ব্যক্তি বা শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে আর্যসংস্কার ছিল বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও সমাজে তার স্থান ছিল নিম্নে। তাঁর ব্রাহ্মণ পিতা তাঁকে যজ্ঞকার্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার সমাদর ছিল না। মাতা ইতরা কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি তাঁকে বেদ অধ্যয়নের প্রেরণা দেন। মানুষ হিসাবে তার বেদ অধ্যয়ন এবং মন্ত্রদ্রষ্টা হওয়ার অধিকার আছে বলে তিনি প্রত্যয় ও প্রেরণার বাণী শোনাতেন' মায়ের প্রেরণায় একদিন মহীদাস মন্ত্রদ্রষ্টা হন। তাঁর রচিত।

উপনিষদ ঐতরেয় উপনিষদ রূপে সমাদৃত হয়। দাসবর্ণ হলেও নিজের প্রতিভা ও সাধনা বলে তিনি ব্রহ্মবাদী হতে পেরেছিলেন। মহীদাসের প্রতিভা সম্পর্কে সেই সময়ে আর্যঋষিদের মধ্যে নানা বিতর্ক হলেও অবশেষে জ্ঞানের কাছে বৈদিক সমাজেব মাথানত হয়েছিল। সমাজের চোখে হীন শূদ্র মহীদাসেব রচিত আটটি পঞ্চক এবং চল্লিশটি অধ্যায় বিশিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বহু পংক্তিতে মানবের প্রতি নির্দেশ ঝঙ্কৃত হয়েছে---'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি।' বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল.....। এই চরৈবেতি ঝঙ্কার ছোটবেলা থেকেই আমাকে উৎসাহিত করে। বলতে গেলে মাতৃহীন জীবনে রম্যবনে একাকিনী বাল্য ও কৈশোর কাটিয়েছি 'চরৈবেতি', 'চরৈবেতি'-র প্রেরণায়।

কিন্তু যতবার আমি এই শব্দ 'চরৈবেতি' উচ্চারণ করি, আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে সমাজের অন্ধ বিচারের বিরুদ্ধে। ব্রাহ্মণ (আর্য) ব্রাহ্মনেত্তর জাতি (শূদ্রও)কে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু তার ঔরসজাত সন্তান ব্রাহ্মণের মর্যাদা পাবে না। ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও সে দাসপুত্র, নিন্দিত, লাঞ্চিত, নিম্নবর্গীয়। পিতার সম্পত্তি এবং যজ্ঞকর্মাদিতেও তাব অধিকার নেই। কেবলমাত্র মহীদাস নয, ব্রাহ্মণেতব অনেক মহাত্মা স্বীয় সাধনার বলে পূজ্যস্পদ হতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, জ্ঞান বর্ণবিচার করে না। তাহলে জ্ঞানদর্শী ঋষি গৌতম একথা জেনেও ঋচাকে আশ্রমে স্থান দিলেন না কেন? এমনকি ঋচা গো-দোহন করলে সেই দুগ্ধ যজ্ঞকার্যে লাগবে না বলে তাকে আশ্রমেব গো-সেবা করার অনুমতিও দেওয়া হল না বরং ঋষিপত্নীবা নিজেরাই গো-দোহন কবতেন কিন্তু কোনও শূদ্রদাসীর দ্বারা গো-দোহন কবাতেন না।

এখন আমি বুঝতে পারছি, ঋচাকে আমার সাথে নিয়ে আসার জন্য পিতা কেন নিষেধ করেছিলেন। দাসপল্লীতে থাকতে যাওয়াব সময় ঋচার চোখে যে নীরব বিদ্রোহের অগ্নিশিখা আমি দেখেছি তা যে একদিন না একদিন জ্বলে উঠবে না সে কথা কে বলতে পারে? বিভেদ ও বৈষম্য থেকে বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষ থেকেই জন্ম নেয় বিদ্রোহ।

আমি এইরকম নানা যুক্তি করি। আমার এই যুক্তিতে আশ্রমের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। ব্রহ্মাপুত্রী বলেই আমাব এই ঔদ্ধত্য, কয়েকজন এই মত প্রকাশ করলেও আবার কয়েকজন আমার জ্ঞান ও নির্ভিকতার প্রশংসা করেন। আচার্য গৌতম একটি কথায় আমার সব যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন—"নিয়মের অর্থ নিযম, সেখানে যুক্তি তর্কের স্থান নেই। তোমাকে এই আশ্রমের নিয়ম মেনে চলতে হবে নচেৎ শিষ্যত্ব হারাতে হবে।" শিষ্যত্বের লোভে আমি আশ্রমের নিয়ম মেনে নিলাম। ঋচা থাকে নিকটস্থ দাসপল্লীতে। আমি স্থির করলাম—প্রতিদিন আমি যা অধ্যয়ন করব, দাসপল্লীতে গিয়ে ঋচাকে সেটা অধ্যয়ণ করাব। আচার্য যদি তাতে বাধা দেন, তাহলে আমি আশ্রম ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাব।

'উপনয়ন' উৎসবের প্রথম বিধি হল 'মাতৃ ভোজন'। যজ্ঞবেদীতে যাওয়ার পূর্বে স্নান করে শিষ্য শেষবারের মতো মায়ের সাথে ভোজন করে, এরপর তার মায়ের সাথে ভোজন করা নিষেধ। আমার ক্ষেত্রে মাতৃ ভোজনের প্রশ্ন ওঠেনি। কারণ আমার মায়ের সাথে আমি

কখনও ভোজন করিনি। আমি তাঁকে একবারও দেখিনি। তাই পৃথিবীকে মাতারূপে গ্রহণ করে, ভূমিতে বসে মাটিকে চণ্ড অর্পণ করে একাকী ভোজন করলাম। জাতিভেদে উপনয়নের বয়সের তারতম্য ছিল। আমি ব্রাহ্মণকন্যা হলেও যেহেতু নারী তাই পাঁচ বাছরের পরিবর্তে এগার বছর বয়সে আমার উপনয়ন হল। মাতৃভোজনের পর আমি সাধারণ বালক বালিকাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। আমি হলাম ব্রহ্মচারিণী। আমি আর ঋচার সাথে খেতে পারব না। এবার কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে ব্রহ্মচারিণীর জীবন কাটাতে হবে।

মাতৃভোজনের পর মস্তকমুণ্ডনের নিয়ম সম্ভবত নারী হওয়ায় কিংবা ব্রহ্মাপুত্রী আমার দীর্ঘকেশের অগ্রভাগের কিয়দংশ কেটে নিয়মরক্ষা হল। অবশ্য এখন থেকে মুক্ত কেশে আমি আর ঘুরে বেড়াতে পারব না। কেশ ধুয়ে শুকিয়ে 'পশ' (কেশ গোলাকার করে ওপরে গাঁট দেওয়া) বাঁধতে হবে। এবার মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত শৃঙ্খলার কঠিন বন্ধন। পুনরায়-স্নানের পর মুঞ্জঘাসে প্রস্তুত মেখলা পরলাম। হৈমবন্ত পর্বতে প্রচুর মুঞ্জঘাস জন্মায়, রম্যবনে থাকাকালীন আমি মৌঞ্জের মেখলা পরায় অভ্যস্ত ছিলাম। এখানে অবশ্য এই মেখলাকে তিনপ্রস্থ করে কটি ও বক্ষদেশ আবৃত করতে হয়। অর্থাৎ আমাকে বেদত্রয়ী ঋক্, যজু এবং সামবেদ অধ্যয়ন করতে হবে। ইহা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। মেখলার ভিতর অন্তর্বাস হিসাবে পাটের তৈরি কৌপীনও পরতে হল, এটি আমার পক্ষে বড় কর্কশ ও কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু আশ্রমের কঠোর নিয়মে সূক্ষ্মবস্ত্রের স্থান নেই। তাই নিয়ম মাফিক 'শ্রদ্ধেয়া দুহিতা মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে অমি পাটের কৌপীন পরিধান করি। এরপর অগ্নিদেবের 'ত্রিপস্ত্যভাবকে (পৃথিবীর অগ্নি, সূর্য এবং বাড়বাগ্নি) আরাধনা করে তিনটি সমিধ সংগ্রহের জন্য আমাকে বনে যেতে হবে। রম্যবনে এটা আমার দৈনন্দিন কাজ ছিল। এখানে অবশ্য মৃগছাল পরিধান করে প্রত্যহ অগ্নি উপাসনা করতে হবে।

উপনয়ন অনুষ্ঠানের শেষ বিধিটি এবার সম্পন্ন হবে। গুরু ও শিষ্য একমন একপ্রাণ না হলে শিক্ষাদান সফল হয় না। তাই গুরু শিষ্যের হৃদয় স্পর্শ করার নিয়ম আছে। সেদিন আরও দুজন শিষ্যের উপনয়ন হল। আচার্য তাদের ছাতি স্পর্শ করে বুকে জড়িয়ে বললেন—'আজ থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে নির্মল বিশ্বাস ও চিরন্তন শ্রদ্ধা প্রকট হোক্।' এই পবিত্র দৃশ্যে আমি ভাববিহ্বল হয়ে গেলাম। এবার আমার পালা। কিন্তু আচার্য গৌতম আমার হাত স্পর্শ করে বিধি সমাপন করলেন। আমাকে ছাতিতে লাগালেন না। নারীর ক্ষেত্রে আচার্য সম্ভ্রম সহকারে উপনয়ন বিধি সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁর এই আচরণ আমার ভীষণ ভালো লাগে।

এবার অশ্বারোহন পর্ব। আমাকে একটি প্রস্তর নির্মিত শিলের উপর উঠতে হল। গুরু বললেন—"এই শিলাখণ্ডের মতো মন ও বিচারকে দৃঢ় কর। চরিত্রকে স্থির ও অচঞ্চল রাখ।" আমরা যে ক'জন শিক্ষার্থিনী ছিলাম, তাদের দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল "সদ্যোবধূ" ও "ব্রহ্মবাদিনী"। সদ্যোবধূ শিক্ষার্থিনীরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করে বিবাহ করত। ব্রহ্মবাদিনী শিষ্যাগণ সারাজীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে ব্রহ্মচিন্তায় কাল

কাটাতেন। তাঁরা হলেন সন্ন্যাসিনী। কিন্তু গুরুকুলে থাকাকালীন সবাইকে ব্রহ্মচারিণী বলা হত। কাকে জিজ্ঞাসা করে আচার্য আমাকে 'সদ্যেবধূ' ব্রহ্মচারিণী পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন আমি জানি না। অন্য কয়েকজন ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করায় আচার্য তাদের মত কে সম্মান দেন। আমার মধ্যে একটি দুষ্ট কৌতূহল মাথা তোলে। কিছু না বুঝে আমি প্রতিবাদ করি—'আপনি আমার মতামত জানতে চাইলেন না কেন? আমারও ব্রহ্মবাদিনী হয়ে থাকার ইচ্ছা। ভাই নারদের জীবন আমাকে প্রভাবিত করেছে।'

ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার ইচ্ছা আমার আজকের নয়। ভাই নারদের কাছে আমি শুনেছি—ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর জীবনগাথা। তাঁরা গার্হস্থ্ জীবনেও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। অবশ্য মাতৃত্বের গৌরবে ভূষিতা হতে হলে বিবাহ আবশ্যক। ইহা সম্ভবত প্রত্যেক নারীর অন্তর্মনের সারভূত সত্য। কিন্তু সব নারী গর্ভধারণের সুযোগ পান না। কেউ বিবাহিতা হয়েও শারীরিক কারণে গর্ভধারণে অক্ষম। পুনরায় অবিবাহিতা নারী পরিস্থিতিতে গর্ভধারণে বাধ্য হলেও মাতৃত্বের স্বর্গীয় গৌরবকে সে অন্তর থেকে স্বাগত জানায়। সন্তান জন্মের পর সমাজের নিষ্ঠুর পরিহাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ কেউ ইন্দ্রদেবের মায়ের মতো সন্তানকে পরিত্যাগ করেন। সম্ভবত আমার মাও.....।

বিড়ম্বিত মাতৃত্ব সম্পর্কে আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগে। বিবাহ মনুষ্যসৃষ্ট এক সামাজিক নিয়ম—প্রকৃতির নিয়ম নয়। প্রকৃতির নিয়ম হল জননী হওয়া। প্রকৃতির নিয়ম অলংঘ্য সামাজিক নিয়ম লংঘ্য। কিন্তু যখন সামাজিক নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর অহেতুক প্রাধান্য বিস্তার করে তখন প্রাকৃতিক নিয়ম নিন্দিত হয় এবং সামাজিক নিয়ম অন্তঃকরণে হয় অবাঞ্ছিত। এই রূঢ় প্রথার পরিবর্তন আবশ্যক। এইসব আমি ভাই নারদের কাছে বহুবার শুনেছি। বিবাহিত দম্পতির জীবন কি প্রকার তা আমি প্রত্যক্ষ করিনি। তাই আমি এ পর্যন্ত বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করিনি। তাই আমি জিদ্ ধরলাম যে—'সদ্যোবধূ'র পরিবর্তে আমি 'ব্রহ্মবাদিনী শিষ্যা হতে চাই। কিন্তু আচার্য গৌতম দৃঢ়স্বরে আমাকে জানালেন যে তিনি ব্রহ্মার ইচ্ছাকে সম্মান দেন। তাই আমাকে 'সদ্যোবধূ' শিষ্যাই হতে হবে। অবশ্য আচার্য গৌতম আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে পরে বিবাহ সম্পর্কীয় আলোচনার অবসরে জীবনে বিবাহের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি বুঝিয়ে দেবেন। শুধুমাত্র এইটুকু বললেন—"ঋষিকা ঘোষা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। উপযুক্ত স্বামীর অপেক্ষায় থেকে তিনি বৃদ্ধা হয়ে যান। নারীত্বের সার্থকতা মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর হাহাকার করত গার্হস্থ্ জীবনের জন্য। তাঁর রচিত মন্ত্রের নানা স্থানে তাঁর অন্তর্বেদনা প্রতিধ্বনিত হয়। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে তুমিও বিবাহের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পারবে। বিবাহিত জীবনযাপন করেও ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারবে এবং ঋষিকাও হতে পারবে। মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। যদি ভবিষ্যতে কোনও ব্রহ্মবাদী ঋষির পত্নী হওয়ার সুযোগ পাও তাহলে তাঁর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে বিবাহ বাধা নয়—বরং বিবাহ হল মুক্তির পথ।"

ঋচার প্রতি আচার্যের বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার, ইন্দ্রদেবের উপহার প্রত্যাখ্যান এবং আমার ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার ইচ্ছায় বিরোধিতা—এই তিনটি কারণে প্রথম থেকেই আমার অন্তরে আচার্যের প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন হয়ে যায়। শ্রাবণের শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে আসছে। চলতি শিক্ষা বছরের উপকর্ম উৎসব পূর্ণিমা তিথির মধ্যে পালিত হওয়ার রীতি চলে আসায় আচার্য গৌতম অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। উপকর্ম উৎসবে নানারকম মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হত, কিন্তু সকল অনুষ্ঠানই শিক্ষা কেন্দ্রিক। যজ্ঞ, বেদ-বেদাঙ্গ আলোচনা, সামগান গুঁরুকৃত উচ্চারণ অনুসরণ করে বেদমন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল প্রাক্তন শিষ্যদের সামগ্রিক আলোচনা। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোকের বিদ্বানগণ নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। অধিকাংশ সময়েই মুখ্য অতিথি হতেন ইন্দ্রদেব। মুখ্য আলোচক রূপে আসতেন পিতা ব্রহ্মা এবং সংযোজক হিসাবে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন ভাই নারদ। ইন্দ্রদেবের সাথে অপ্সরা এবং গন্ধর্বরাও আসতেন এবং আশ্রমের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতেন। ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীদের ইন্দ্রিয় সংযমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত সেজন্য অপ্সরা এবং গন্ধর্বগণ ছিল তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। বাস্তবিক উপকর্ম উৎসব সবাইয়ের কাছে ছিল অত্যন্ত বাঞ্ছিত, অবসর। আশ্রমের অভাব অসুবিধা দূর করার সাথে দাসদের দৌরাত্ম থেকে আশ্রমকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রত্যেক উৎসবে ইন্দ্রদেবকে মুখ্য অতিথির সম্মান দেওয়া হত। প্রত্যেকবার উৎসবে যোগ দিতে আসার সময় সপ্তসিন্ধু ভূখণ্ডে তিনি ঐশ্বর্য বর্ষণ করে ফিরে যেতেন। মাঝে মাঝে নিজের নিত্য ব্যবহার্য স্বর্গীয় বস্তুসকল ঋষিদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ইন্দ্রদেবের সাথে আসা সেনাবাহিনী, চিকিৎসক, পরিচারক, বিদূষক প্রভৃতির ব্যোমযানগুলিও ঋষিদের জরুরীকালীন ব্যবহারের জন্য দিয়ে যেতেন ইন্দ্রদেব। প্রয়োজন হলে ঋষিগণ সেই যানে দ্যুলোক যেতে পারতেন। ইন্দ্রদেবের এই উদারতা ও বদান্যতার জন্য ঋষিগণ কৃতজ্ঞ ছিলেন। উপকর্ম উৎসবে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন প্রকার স্বর নির্ভুলভাবে গেয়ে আমার অদ্ভুত স্বরজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারব বলে আমার বিশ্বাস ছিল। আচার্য গৌতম ও আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল সামগ্রিক আলোচনায় অংশ নেওয়ার, কিন্তু আচার্য বোধহয় এ ব্যাপারে আমাকে উপযুক্ত মনে করেন নি। তাই এ ব্যাপারে প্রাক্তন ছাত্রদের নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু আলোচনার সময়ে যার ইচ্ছা অংশ নিতে পারবে বলে আচার্য ঘোষণা করেছিলেন। গুরুকুল আশ্রমের যথার্থ বাক্ স্বাধীনতা আমার খুব ভালো লেগেছিল। এই উৎসবে ঋচাও যদি অংশগ্রহণ করতে পারত—এই ইচ্ছাটাকে আমি কিছুতেই দমন করতে পারছিলাম না। ঋচা কোনও গুণে আমার চেয়ে কম নয়, বাল্যকালে আমরা দুই বোনের মতো দিন কাটিয়েছি, সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। যে আর্য দাস সংঘর্ষে ঋচা তার বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনকে হারিয়েছিল সেটা আমি দেখিনি, কিন্তু এক নারকীয় পরিবেশ থেকে ঋচাকে উদ্ধার করে আমি জিদ ধরেছিলাম অনাথা ঋচাকে রম্যবনে আমার আশ্রমে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। প্রথমে পিতা সম্মত হননি,

তিনি ঋচার প্রতি নির্দয় ছিলেন না। কিন্তু সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকায় ঋচাকে আমার সাথে রাখতে তিনি শঙ্কিত হচ্ছেন। ঋচা আমার সাথে থাকলে দাসবর্ণের লোকেদের ঋচাকে কেন্দ্র করে আশ্রম তথা আমার উপর আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। সে রকম ঘটনাও ঘটত। দাসবর্ণের উগ্রপ্রকৃতির যুবকেরা আর্যদের প্রতি বিদ্বেষহেতু আশ্রমগুলি আক্রমণ করত। আর্যকন্যা এমনকি বিবাহিতা আর্যনারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করত। তারা বলপূর্বক আর্যনারীদের বিবাহ করত অবশ্য দাসপুরুষ আর্যনারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে সেই দাসপুরুষের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু সেই একই দোষে আর্যপুরুষের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছিল না। যদি কোনও আর্যপুরুষ দাসনারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত তাহলে আর্যপুরুষকে উদার আখ্যা দেওয়া হত। সেই দাস-নারী আর্যপুরুষের রক্ষিতা, উপপত্নী বা দাসী হিসাবে গণ্য হত। তাদের মিলনে যে সন্তান জাত হত তাকে দাসীপুত্র বলা হত। পৈতৃক উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত, দাসীপুত্রকে সমাজ হীন চোখে দেখত। এমনকি 'দাসীপুত্র' এক ভর্ৎসনায় পরিণত হয়েছিল।

রাজা এবং দাতাগণ ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের গোধন, পশুধন শস্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, ভূসম্পত্তি সহ অসংখ্য দাসীও দান করতেন। কিন্তু আর্যনারী ও দাসপুরুষের মিলনে জাত সন্তান মাতার বর্ণ ও জাতির পরিচয় বহন করত। দাসবর্ণ মাতৃকেন্দ্রিক হওয়ায় এইরূপ হত। তাহলেও এইধরনের মিলন সমাজে স্বাগত ছিল না। সেই কারণে ইন্দ্রদেবের মাতাও ইন্দ্রদেবকে কশ্যপ পত্নী অদিতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম পর্যন্ত প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন।

সমাজে আর্যদের জন্য এক নিয়ম দাসদের জন্য ভিন্ন নিয়ম। পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম।

স্থির করলাম, সামগ্রিক আলোচনার সময় ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্বান-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে আমার মনের নানা সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থেকে জাত প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর আদায় করে নেব।

সিন্ধু শতদ্রু, পারুশ্নী অশিক্নি, আর্যকীয়া, বেতসী ও সরস্বতী নদী তটস্থ সমস্ত আশ্রমের আচার্য এবং প্রধান শিষ্যদের আগমনের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। গৌতম-আশ্রম উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল।

নিমন্ত্রিত অতিথি এবং বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন—বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র, ইন্দ্র এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা।

বশিষ্ঠএবং বিশ্বামিত্রের মধ্যে পূর্বের কলহ আর নেই। পাবুশ্নী নদীতীরে সংঘটিত দশরাজ্ঞ যুদ্ধে রাজা সুদাসের পক্ষে ছিলেন তাঁর পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যপক্ষে ভিন্ন সম্প্রদায়ের দশজন রাজার পৌরহিত্য করেছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। দুটি বিশ্বাসের মধ্যে এই সংগ্রামে সুদাসের বিজয় হলেও বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে আর ব্যক্তিগত বৈরীভাব নেই। বিশ্বামিত্রের আতিথ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাকেই। ইন্দ্রদেবের আতিথ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ত্রয়ি আন্বিক্ষিকা, বার্তা ও নীতির ওপর। অন্যান্য দেবতা, ঋষি ও বিশিষ্ট অতিথিদের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল অন্যান্য ঋষিপত্নীদের ওপর। গুরুপত্নীদের সাথে থেকে শিষ্যরা

অতিথি সৎকার-এর রীতিনীতি আয়ত্ত করতে পারে। গৃহস্থের নিকট অতিথি দেবতুল্য। পরবর্তী জীবনে সকলে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করবে। উপযুক্ত আতিথেয়তা না করতে পারলে পাপ হয়। তাই আতিথেয়তা আয়ত্ত করা ছিল গুরুর নির্দেশ।

আর্যাবর্ত একদিন বিপন্ন হয়েছিল বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক সংঘর্ষে। অথচ আজ তাঁরা দেবর্ষি। কে বলে ঋষিগণ কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ থেকে মুক্ত? ঋষিরাও মানুষ। কান্যকুব্জের রাজার পুত্র বিশ্বামিত্র, জন্ম থেকেই বুদ্ধিমান তেজস্বী এবং পরাক্রমশালী। সিংহাসনে আরোহনের পর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর উপর। কান্যকুব্জে অখণ্ড শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় ছিল। অবশ্য জনতার মতামতকে শাসন অপেক্ষা করত না।

বিশ্বামিত্রের রাজ্যের সীমার বাইরে ছিল দেবর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম। বশিষ্ঠের রাজ্য ছিল স্বয়ংশাসিত। মানব সম্পদ এবং মানবশক্তির বিকাশের ওপর বশিষ্ঠ গুরুত্ব দিতেন। মানবশক্তিই ছিল বশিষ্ঠ-রাজ্যের প্রধান সম্বল। প্রজাগণ স্বয়ং শৃঙ্খলিত ও নীতিবান ছিলেন তাই সেনাবাহিনীকে প্রজাদমন করতে হত না। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের রাজ্যের শাসননীতি দুটি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদা মৃগয়ায় গিয়ে বিশ্বামিত্র নিজ রাজ্যসীমার বাইরে চলে যান এবং বশিষ্ঠের রাজ্যে পৌঁছে বশিষ্ঠ আশ্রমের খ্যাতি ও মহিমা সম্পর্কে অবগত হন। বশিষ্ঠ কেবলমাত্র একজন ঋষি নন তিনি ছিলেন এক মহান শক্তি। তাই তাঁকে দর্শনের অভিপ্রায়ে সদলবলে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁর রাজ্যজয়ের বাসনা ছিল না। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তিনি বশিষ্ঠের কাছে পৌঁছালেন। বশিষ্ঠের আন্তরিক সম্ভাষণে বিশ্বামিত্র প্রীতি হলেন। বশিষ্ঠ অনুরোধ করলেন—"মহাশয়! আপনি প্রথমবার আমার আশ্রমে পদার্পণ করেছেন, আপনি এখানে দু'চারদিন বিশ্রাম নিন, আমাদের সেবা করার সুযোগ দিন, মৃগয়াজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য এই আশ্রমের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম।" ঋষির সৌজন্য বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তিনি ভাবেন বশিষ্ঠের উচ্চাকাঙ্খাত কম নয়। এতবড় সেনাবাহিনী বিপুল সংখ্যক রাজকর্মচারী প্রভৃতির দু'চারদিনের খাদ্যপানীয় কোথা থেকে যোগান দেবে জ্ঞানগর্ভ ঋষি? সামগান শুনে আর হবিগ্রহণ করে দেবতারা সন্তুষ্ট হতে পারেন কিন্তু মানুষ তো যজ্ঞাহুতিতে ক্ষুধা মেটাতে পারে না। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন— "দেবর্ষি আমার সাথে আমার চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী আছে, তাদের সেবার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং অর্থের আবশ্যক, আপনি এর জন্য পূর্বে প্রস্তুত নন, হঠাৎ কোথা থেকে এত খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করবেন? তাই আমরা আবার পরে আসব আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে তখন দু'চারদিন থাকব। স্মিত হেসে বশিষ্ঠ বললেন—"রাজা বিশ্বামিত্র! ধর্মনীতি অনুসারে ঋষিরা ভিক্ষা করেন, এর ফলে মনের অহংভাব নষ্ট হয়, তথা অর্থ বা খাদ্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি নাশ হয় কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ঋষিগণ কাঙাল। কিছু ঋষি ও রাজার মতো বৈভবশালী। আমার কথা ভিন্ন। আমি একা আপনার আতিথ্যের খরচ বহন করব না, আমার

প্রজাদের ও এটি পবিত্র কর্তব্য। সেই মানব শক্তির ওপর ভরসা রেখে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি। আপনি একবার আমাকে সেবা করার সুযোগ দিন।"

কৌতূহলবশত বিশ্বামিত্র আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দুদিন ধরে সুস্বাদু খাদ্য, সুমিষ্ট পানীয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শুধু মোহিত করলেন না, চকিতও করলেন। বিদায়ের পূর্বে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই আতিথ্যের রহস্য কি? কোথা থেকে আনলেন এত খাদ্য পানীয়?" অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার। আমার সকল ইচ্ছাপূরণ করার জন্য আছে আমার কামধেনু। কামধেনু হল আমার প্রজাশক্তি। আমার প্রজা ও শিষ্যরা কামধেনুর এতই যত্ন করে যে সে একাই আমার রাজ্যের মাস-মাস ব্যপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিজনিত খাদ্যভাব পূরণ করতে পারে। তাই আমার রাজ্যে অনাহার জনিত মৃত্যু নেই। মনে করুন, কামধেনুই হল এ রাজ্যের মানবশক্তির সঞ্চয় ভাণ্ডার এ রাজ্যের পুণ্যের ভাঁড়ার।

বিশ্বামিত্রের মনে রাজোচিত লোভ জাত হল। যা দুর্লভ, তা রাজার। আতিথ্যের প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ দেওয়ার পরিবর্তে নিঃসঙ্কোচে আদেশ দিলেন— "ঋষিবর কামধেনু আমাকে উপহার দিন। আমি রাজা। কামধেনু আমার অধিকারে থাকা উচিত।" বশিষ্ঠ আশ্চর্য হলেন না। রাজার লোলুপতা সম্পর্কে তিনি অবগত। কিন্তু কামধেনু পার্থিব সম্পত্তি নয়, কামধেনু জনগণের অলৌকিক মনোবল। বিশ্বামিত্রের সেনাশাসিত রাজ্যে কামধেনুর দুগ্ধ-ক্ষরণ হবে না। শাসনের চাবুকে কামধেনুর দুগ্ধ উৎপাদন সম্ভব নয়।

ঋষি বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রকে সেটাই বললেন। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, ব্রাহ্মণ হওয়ায় বশিষ্ঠ লোভাতুর। তাই কামধেনু দিতে নারাজ। তিনি ব্রাহ্মণকে প্রলোভন দেখিয়ে বললেন— "আমি তোমাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব ও দুলক্ষ গাভী দান করছি, প্রতিদানে তুমি আমাকে তোমার কামধেনু দান কর।"

এই প্রস্তাবে বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না। তারপর বিশ্বামিত্র নিজের সৈন্যদের সাহায্যে বশিষ্ঠের আশ্রম আক্রমণ করলেন। বশিষ্ঠ তখন নিজের দেশের অগণিত জনতার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এই যুদ্ধে দুধর্ষ কাম্বোজ, যবন, বর্বর, শক, হরিত এবং কিরাত নামে পরিচিত দাসবর্ণের লোকেরা বশিষ্ঠের পক্ষে বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং বশিষ্ঠের জয় হয়।

এই সংগ্রামে জয় হল দেশপ্রেমের। বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা রাজার নির্দেশে চাকরির শর্ত অনুযায়ী লড়াই করছিল কিন্তু বশিষ্ঠের পক্ষে বর্ণবিদ্বেষ ভুলে ঐক্যবদ্ধ দেশবাসী দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার জন্য লড়াই করছিল। আর্য ঋষিগণ যে দেশভক্ত দুধর্ষ যোদ্ধাদের অনার্য বর্বর আখ্যা দিয়ে রাজ্যের অনুন্নত অঞ্চলে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন, তারাই প্রাণপাত করে বশিষ্ঠকে জয়যুক্ত করেছিলেন।

অসংখ্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিশ্বামিত্র বারম্বার বশিষ্ঠের আশ্রম আক্রমণ করেন—কিন্তু পরাজয় তাঁর ভাগ্যলিখন। বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করেন যে,বিজয় শুধুমাত্র রাজার আয়ত্তাধীন নয়। নিজের ভিতরের শত্রুকে দমন না করলে বহিঃশত্রুকে দমন করা সম্ভব নয়। পুত্রের হাতে

রাজ্যভার সমর্পণ করে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। আত্মদমন, আত্মসংযম এবং আত্মদর্শনের ফলে বিশ্বামিত্র আত্মশক্তি লাভ করেন এবং জনহিতার্থে শক্তি বিনিয়োগ করে মহর্ষি পদলাভ করেন।

বিশ্বামিত্রের তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল বশিষ্ঠকে জয় করা এবং দেবর্ষি পদলাভ করার মহৎ আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি দেবর্ষি পদলাভ করতে পারলেন না। আকাঙ্ক্ষাহীন তপস্বীই দেবর্ষি পদলাভ করে থাকেন। তপস্যায় অটল থেকে দেবর্ষি হওয়ার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনা করতে থাকেন অথচ একদিন স্বচ্ছ তটিনীতে অলৌকিক সুন্দরী তরুণীর স্নানস্নিগ্ধ যৌবনের আভায় আকৃষ্ট হয়ে তার প্রেমভিক্ষা করেন। এই প্রেম অপার্থিব ছিল না। সেই সৌন্দর্যময়ী নারী হল স্বর্গরাজ্যের অপ্সরা মেনকা। মর্তে অবতরণ করে বনবিহার কালে নদীতে স্নান করছিলেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের প্রেমের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। দু'জনে স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করতে লাগলেন। এবং মেনকা ও বিশ্বামিত্রের মিলনে এক লাবণ্যময়ী কন্যার জন্ম হল।

এতদিনে বিশ্বামিত্রের চৈতন্য উদয় হয়। তিনি নিজেকে ধিক্কার দেন—"তপস্যা করার জন্য আমি রাজ্য, স্ত্রী, পুত্রের মোহ ত্যাগ করলাম, অথচ কামবাসনাকে জয় করতে পারলাম না। ইন্দ্রদেবের স্বর্গরাজ্যের বেশ্যা অপ্সরা মেনকাকে দেখা মাত্রেই আমার তপস্যা বিস্মরণ হয়ে গেল। পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে কামবাসনার শিকার হলাম।" বিশ্বামিত্রের মোহভঙ্গ হল। তিনি মেনকা এবং শিশুকন্যাকে ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে চলে গেলেন তপস্যা করতে। একবারও চিন্তা করলেন না মেনকা এবং শিশু কন্যাটির কি অবস্থা হবে।

পুরুষের মন—শিশির কণার মতো নিমেষে ভূলোক থেকে দ্যুলোকে চলে যায়। কামবাসনা প্রশমিত হতেই পুরুষ কত সহজে চলে যায় মোক্ষপথে—স্ত্রী ও সন্তান তাদের মোক্ষপথের বাধাস্বরূপ। তারা তাই ভাগ্যকে মেনে নিয়ে পড়ে থাকে পঙ্কিল সংসারে। সেইজন্য আর্যাবর্ত অগণিত মহর্ষি এবং দেবর্ষির পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে। নারী মমতাময়ী তাই সন্তানকে বুকে নিয়ে সংসারজীবন নির্বাহ করে। বাৎসল্যই নারীর বন্ধন—আবার মোক্ষ। ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার বা কোথায়! সম্ভবত সেই কারণে ঋষির তুলনায় ঋষিকার সংখ্যা কম। এতক্ষণে প্রথা মুখ খোলে হ্যাঁ শাস্ত্রেও এই নির্দেশ আছে—পুত্রকে পত্নীর কাছে রেখে, সন্ন্যাসে যাও। বিশ্বামিত্র তাই করেন—এতে কোনও দোষ নেই।" আমি কঠোর দৃষ্টিতে প্রথার দিকে তাকাই, প্রথা কুটীল হাসি হেসে আমার দৃষ্টি তার ওপর থেকে সরিয়ে দেয়।

ঋষিপত্নী বেদমতী বলেন—"কিন্তু মেনকা কি করলেন? তিনিও শিশুকন্যাটিকে গভীর জঙ্গলে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। অসহায়া শিশুটিকে লালন-পালন করেন কণ্বমুনি—তার নাম শকুন্তলা। বিশ্বামিত্রের ঐরকম কাজে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর্যগণ এগারো বারোটি সন্তানের জনক হওয়ার পরেও সন্তানদের পত্নীর দায়িত্বে রেখে ঋষি হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত কম নয়। কিন্তু মেনকা কি করে এ কাজ করলেন? সে মা, না রাক্ষসী!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রথা বলে—"স্বর্গরাজ্যের অপ্সরাদের জননী হওয়া নিষেধ। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদের মর্তের রাজা বা সাধকদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু কারও স্ত্রীরূপে সংসার করা তাদের বারণ। শুধুমাত্র মেনকা নয়, এইরকম কত অপ্সরা রাজনৈতিক ব্যভিচারের শিকার হয়েছেন। তাঁরাও নারী। তুমি কি ভাবছ শিশুকন্যাটিকে শকুনদের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে নিজের কর্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সময় মেনকার কষ্ট হয়নি! কিন্তু কি করবে? স্বর্গরাজ্যের এই নিয়ম.....। না হলে ভয়ঙ্কর অভিশাপ ও শাস্তি ভোগ করতে হয়.....।" আমি বিষণ্ণ হয়ে যাই—মনে হয় আমিও বোধহয়..... আর এক শকুন্তলা! কোনও শাপগ্রস্তা কিন্নরী ও ব্রহ্মবাদী ঋষির অবাঞ্ছিত মিলনের পরিত্যক্ত ফুল। ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে বেঁচে আছি।

বেদমতী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেন—"স্বর্গের অপ্সরাদের জীবন অত্যন্ত করুণ। প্রত্যহ তাঁরা ইন্দ্রসভায় নৃত্য করেন। যক্ষ, কিন্নর ও অন্যান্য দেবতাদের কামবাসনা পরিতৃপ্ত করেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা চিরকুমারী, সন্তানের জননী হওয়া নিষেধ। যার যেভাবে খুশী তাদের ব্যবহার করে। অথচ তাঁরা বারম্বার শাপগ্রস্তা হন। তাদেরও মন আছে, সংসার করার স্বপ্ন আছে, জননী হওয়ার আকাঙ্খা আছে, সে কথা কি কখনও কেউ ভেবেছে? ত্রিলোকের কামজর্জরিত পুরুষেরা এই অপ্সরাদের যৌনশোষণ করেন, অথচ অপ্সরাগণ কখনও এর বিরোধিতা করেননি, উপরন্তু অপ্সরাগণ নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। নারী নিজের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হলে এইরকম শোষিত ও লাঞ্ছিতা হতে বাধ্য।"

"দেবতা ঋষি ও সমগ্র আর্যসমাজ এ সম্পর্কে নীরব কেন?" আমি প্রশ্ন করি। মুখ টিপে হাসতে হাসতে প্রথা বলে—"মুখ্যত ইহা দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য হলেও অন্যান্য দেবতা, আর্যঋষি, ধনী রাজা এবং ইন্দ্রভক্তগণও অপ্সরা-নৃত্য উপভোগ করেন; এবং অপ্সরাদের যৌনশোষণ করার সুযোগ নেন। ইহা বর্তমান এক প্রথায় পরিণত হয়েছে। অপ্সরাদের নৃত্য ছাড়া ইন্দ্রসভা শুরু হয় না। স্বর্গরাজ্যের রীতিনীতির সাথে অপ্সরাগণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এসব বন্ধ করার সাহস বা আগ্রহ কারও নেই। কি করে বা হবে? প্রথা তো অপরিবর্তনীয়।" প্রথার শেষ কথাটি অত্যন্ত কঠোর এবং কর্কশ মনে হল। "কে বলে প্রথা অপরিবর্তনীয়?" আমি প্রতিবাদ করি। যে প্রথা মানবিক মূল্যবোধের বিরোধী তাকে বর্জন না করলে মানুষের নিজের সৃষ্ট প্রথাই কালসর্প হয়ে তাকেই দংশন করে। আজকের এই অপ্সরা প্রথা কাল কিরূপ ধারণ করবে কে জানে? দেবসভার অপ্সরা প্রথা দেবমন্দিরে প্রচলন হবে এবং ভবিষ্যতের ধর্মীয় জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যাবে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। যজ্ঞের সময় ও পূজামণ্ডপে নারীরা নৃত্য করবে—যাজ্ঞিক, রাজা, ধনী, পৃষ্ঠপোষক এবং যজমানদের দ্বারা নানাভাবে শোষিতা হবে নারী। শেষে ইহা এক কলঙ্কিত প্রথায় পরিণত হবে। তখন এই প্রথা বিলুপ্ত হবে কিনা?"

"হ্যাঁ, প্রথাও বর্জনীয়। কিন্তু তা সম্ভব হবে না। সমাজের ধ্বজাধারীগণ এটা হতে দেবে

না। কারণ এরফলে তাদের কুৎসিৎ লালসা বাধাপ্রাপ্ত হবে। যারা শোষিত হয়, তারা প্রতিবাদ করে—কিন্তু তাদের প্রতিবাদ শোনে কে? তাদের হাতে কোনও ক্ষমতা থাকে না। শুধুমাত্র সংঘর্ষজনিত ক্ষয়ক্ষতিই তাদের প্রাপ্য। তবে অহল্যা, তুমি এত দূরের কথা কেন ভাবছ? তাছাড়া এসব ভেবে লাভ কি? সমাজ কি তোমার মতামতের গুরুত্ব দেবে? প্রথার জন্মদাত্রী এই সমাজ—তাই প্রথাকে বর্জন করতে তার ভীষণ কুণ্ঠা। সমাজ সর্বদা প্রথার প্রতি সংবেদনশীল।" —এইটুকু বলে প্রথা বেদমতীকে প্রশ্ন করে হ্যাঁ, তারপর বিশ্বামিত্রের কি হল? তিনি কিভাবে মহর্ষি থেকে দেবর্ষিতে পরিণত হলেন? এই ব্রহ্মচারিণীদের সেই সম্বন্ধে কিছু বলুন। অতিথি সৎকারের পূর্বে তাঁদের পরিচয় জানা প্রয়োজন।

আচার্যা বেদমতী তখন বিশ্বামিত্র প্রসঙ্গে বলেন—"মেনকাকে ত্যাগ করে বিশ্বামিত্র কৌশিকি নদীর তীরে তপস্যা শুরু করেন। সেই তপস্যার বলে তিনি কামবাসনাকে পরাহত করে কামরহিত সাধকে পরিণত হন।

ইন্দ্রপদ লাভের পর নিজের সিংহাসন সম্পর্কে ইন্দ্র সর্বদাই সন্দিহান। কেউ সাধনারত হলেই তিনি ভীত হয়ে উঠতেন। তাঁর সিংহাসন দখল করার জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চক্রান্ত করছে এবং সকলের সাধনার লক্ষ্যই ইন্দ্রপদ—এই চিন্তায় ইন্দ্র উদ্বিগ্ন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পদ ও ক্ষমতা যত সুখ দেয় তার চেয়ে বেশী দেয় দুঃখ। ক্ষমতার কাছে সমগ্র সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়। ক্ষমতালিপ্সু মানুষ অবশেষে কুচক্রীতে পরিণত হয়। বিশ্বামিত্রকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাঁর তপস্যাভঙ্গের জন্য নিজ রঙ্গালয়ের অন্যতমা সুন্দরী গণিকা রম্ভাকে মর্তে প্রেরণ করেন।

কৌশিকী নদীর স্বচ্ছশীতল স্রোতে ভেসে ভেসে রম্ভা জলক্রীড়া করতে থাকেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটে। তিনি চোখ খুলে দেখেন—অপ্সরা রম্ভা তার সদ্যস্নাত সৌন্দর্যের জাল বিস্তার করেছে। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধস্বরে রম্ভাকে ভর্ৎসনা করেন—'তুই স্বর্গের নগণ্য বেশ্যা, আমাকে কি মনে করেছিস? আমি কামকে পরাজিত করেছি। কার প্ররোচনায় তুই আমাকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্র করেছিস? তোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। আমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য তুই শিলায় পরিণত হয়ে এক হাজার বছর মর্তের মাটিতে পড়ে থাকবি। সৌন্দর্যের ভুল উপযোগের ফলস্বরূপ সকলের অবহেলার পাত্রী হবে। কেউ তোকে রম্ভা বলে চিনবে না।

"নারীর শিলায় পরিণত হওয়ার অর্থ কি? কৌতূহলবশত আমি প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রথা বলে—"মানুষ তার জীবদ্দশায় কতবার যে জড়ে পরিণত হয়—দুঃখ, অবহেলা, নিন্দা, পশ্চাত্তাপে যদি মানুষ পাথর না হত, তাহলে সে উন্মাদ হয়ে যেত। স্বর্গের অপ্সরার যদি স্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় তাহলে মনকে পাথর করে মর্তে পড়ে থাকতে সে বাধ্য।"

কিন্তু রম্ভা বা মেনকার তো কোনও দোষ নেই, দোষ ইন্দ্রদেবের অথবা বিশ্বামিত্রের। স্রষ্টা, মেনকা ও রম্ভাকে সুন্দরী রূপে সৃষ্টি করলেন, সেই সৌন্দর্যকে ইন্দ্রদেব নিজের

রাজনৈতিক স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করলেন, বিশ্বামিত্র নিজের কামবাসনার কাছে পরাজিত হলেন—অথচ সেজন্য শাপগ্রস্তা হলেন রম্ভা এবং মেনকা। ইন্দ্রের ইন্দ্রপদ অটুট থাকল—বিশ্বামিত্র মহর্ষি থেকে দেবর্ষি হলেন, এ কিরকম ন্যায়?" ক্ষুব্ধ হয়ে আমি প্রতিবাদ করি। বেদমতী বলেন—"এই ব্যবস্থাই চলে আসছে—তাই অপরিবর্তনীয়। সত্যি তো বিশ্বামিত্র মহর্ষি থেকে দেবর্ষি হলেন। অবশ্য রম্ভার প্রতি ক্রোধিত হওয়ার পর তিনি অনুতপ্ত হন এবং ক্রোধকে পরাজিত করার জন্য আরও অনেক বছর তপস্যা করেন। লোভ, মোহ ও কামকে তিনি পূর্বেই পরাজিত করেছিলেন। অবশেষে তিনি হলেন দেবর্ষি। এখন তিনি একজন সমাজসেবী বশিষ্ঠের সাথে সমস্ত শত্রুতার অবসান হয়েছে বর্তমান দুজনে মিত্র। আর্যবর্তে আর্য-অনার্য সমন্বয় সাধনের জন্য বশিষ্ঠ উদ্যোগী হয়েছেন এবং বিশ্বামিত্র অনার্যদের আর্যীকরণের জন্য কার্যরত। বিশ্বামিত্রের পূর্ব-কলঙ্ক মুছে গেছে। পরোপকার ও পুণ্যকার্যের গুণে এখন তিনি একজন আদর্শ আর্য ঋষি। মানব জীবনে পাপ স্বাভাবিক এবং সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমাজের পতিত ও দলিতদের উত্থানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

"আমি তো শুনেছি, দাস ও দৈত্যদের দমনের জন্য পরাক্রমী রাজাদের সাহায্য নেন"—প্রথা বলে।

—"বনবাসী আর্য ঋষিরা যুদ্ধ করবে কেন? আর্যরাজাগণ যুদ্ধপ্রিয়, তারা বিমান, রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেছেন। নানা প্রকার লৌহ নির্মিত অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োগে তারা দক্ষ। যখন দাসবর্ণের লোকেরা যজ্ঞপণ্ড করে তখন ঋষিরা রাজা এবং ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেইজন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা দিনরাত তাঁদের স্তুতিগান করেন। এখানে বিশ্বামিত্রের দোষ কোথায়? আর্যরাজাদের রাজ্য সুরক্ষিত রাখবার জন্য বনজঙ্গলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আর্য-অনার্য সমন্বয় সাধনে বশিষ্ঠকে সাহায্য করেছেন। শান্তির জন্য যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। একাকী যুদ্ধ করা যায় না। তাই দেশের সুরক্ষার জন্য রাজা ও ঋষি একমন একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য।'

আমি উপহাস করি—"অনার্যরা যেন দেশের লোক নয়, অথচ তারাই প্রকৃত দেশভক্ত। নিজের দেশ ছেড়ে স্বর্গে যাওয়ার বাসনা নেই তাদের।" আমার পরিহাসের জবাব দেয় প্রথা। শানিত কণ্ঠে সে বলে—"আচ্ছা, সে সময় আসুক! এখন তো ব্রহ্মচর্যাশ্রম। গুরুর কাছে শিক্ষালাভ শেষ হোক। তারপর অনার্যীকরণ কার্যে ব্রতী হবে। হয় তো আর্যরাজ্যের সীমা পেরিয়ে কোনওদিন তুমি অনার্য বস্তিতে রাজরানী হবে। সমগ্র দেশকে অনার্য করে মানুষের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন করবে।"

'অনার্যীকরণ' শব্দটিকে প্রথা এমন বিদ্রুপের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে যে, ক্রোধে আমি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলি। ক্রোধ সংবরণ করে এটুকু বললাম—"আর্যীকরণ নয় অনার্যীকরণও নয় মানবীকরণই হবে আমার ব্রত। কখনও যদি কঠোর তপস্যা করার সুযোগ আসে, তখন 'মনুর্ভবঃ' হবে আমার মহামন্ত্র।

মন না জেনে মনন যেরূপ নিরর্থক দেবতাকে না জেনে হবন করা যেরূপ নিষ্ফল, সেইরকম অতিথির রুচি না জেনে অতিথিসৎকার করা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রের দেবতাকে জানলে মন্ত্রের অর্থ জানা যায়। তাই ইন্দ্রের রুচি না জেনে ইন্দ্রের আতিথেয়তা করা কিভাবে সম্ভব? সমাবর্তন উৎসবের পূর্বে বিভিন্ন ঋষির তত্ত্বাবধানে দূরাগত অতিথিদের গুণাবলীর আলোচনা শুরু হয়। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণ অতিথি সম্পর্কে নিজের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করে। প্রত্যেক অতিথি সম্পর্কে আশ্রমিকদের জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন মনে করে সবাই এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করে।

ইন্দ্রের স্বরূপ বীরত্ব দমনশীলতা সম্পর্কে সকলেই অবগত। তাই তাঁর প্রিয় খাদ্য পানীয় ও দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনাচক্রের পুরোধা হলেন মহর্ষি গৌতম। আচার্য মুদ্গল, আচার্যা বেদবতী, আচার্য পুণ্ডরীক, আচার্যা চিন্ময়ী, আচার্য পরাশর, আচার্যা বিশ্বামিত্রা প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন। ইন্দ্রের রুচি সম্পর্কে জানার জন্য প্রথম সারিতে বসেছে—ত্বয়ি, আন্বিক্ষিকা, বার্তা ও নীতি। কারণ ইন্দ্রের আতিথ্যের দায়িত্ব তাদেব। আমি তাদের পাশে বসেছি। আমার পাশেই দেহরক্ষীর মত বসে আছে প্রথা। সম্ভবত ব্রহ্মাপুত্রী তদুপরি সুন্দরী হওয়ায় আমি সবসময় প্রথম সারিতে বসার সুযোগ পাই। আমার সাথে প্রথাও। কারণ প্রথা আমার সঙ্গ ছাড়ত না।

মাঝে মাঝে প্রথাকে ভালো লাগে। মনে হয় সমাজকল্যাণের জন্য সে চিন্তা করে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভীষণ বাজে তর্ক করে, স্বার্থপরের মতো কাজ করে। যেখানে লাভ সেখানে ভাব। মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করায় যেন তার আনন্দ। সেইসময় মনে হয় তাকে সামনে থেকে দূর করে দিই। তার স্বার্থপর বাজে যুক্তি করা মুখটা ভেঙ্গে দিতে, কিন্তু সাহস হয় না। প্রথার বয়স কত কে জানে! আমি তো তার চেয়ে অনেক ছোট, অপরিপক্ক কি করে মুখ খুলব?

আচার্য গৌতম প্রথমে ইন্দ্র সম্পর্কে বললেন—বাসব হলেন সর্বকনিষ্ঠ আর্য-নেতা, যিনি স্বর্গ-রাজ্যের সম্রাট (ইন্দ্র) হয়েছেন। বহুকাল ধরে তিনি অখণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। বহু ইন্দ্র আসবে যাবে কিন্তু ইন্দ্র বলতে শচীপতিকেই বোঝায়। ইন্দ্র পদবীটি বাসবের অলৌকিক বীরত্ব ও দানশীলতার জন্য নামবাচক পদে পরিণত হয়েছে। সেই বাসব ইন্দ্র আজ ত্রৈলোক্যবাসীর মনোরাজ্যের সম্রাট। নিজ প্রতিভাবলে তিনি আজ মহাজাগতিক শক্তির উৎসস্বরূপ সমস্ত পার্থিব, অপার্থিব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি আমাদের মুখ্য অতিথি হয়ে আসছেন। তাঁর যথোচিত আতিথ্যে যেন কোনও ত্রুটি না হয়। তাই তাঁর খাদ্য পানীয় সম্পর্কে আচার্যারা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের অবগত করুন।

আচার্যা চিন্ময়ী রন্ধনশাস্ত্রে নিপুণা। সবাইর খাদ্য পানীয় সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত যত্নশীলা। ইন্দ্রের খাদ্যভ্যাস সম্পর্কে তিনি বললেন—"চালের প্রস্তুত নানারকম পিঠে ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়। দুধ ও দই-এর মিশ্রণে প্রস্তুত 'পায়েস'ও ইন্দ্রের প্রিয়। তিনি পছন্দ করেন সুগন্ধি চালের অন্ন। যদিও দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ইন্দ্রদেবের রুচি আছে তারমধ্যে 'দধ্যাশার' ও 'ঘৃতাশার' ইন্দ্রদেবের অত্যন্ত প্রিয় পানীয়। এগুলি দুধ, দই এবং ঘৃতের সাথে সোমরস

মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়। অশ্বত্থ বৃক্ষের কোমল কিশলয় ইন্দ্রদেবের নিত্য আহার্য কারণ এগুলি শক্তিবৃদ্ধি করে। এগুলি বন থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু হল সোমরস। সোমরস দেহমনকে সতেজ রাখে। সোমরস ব্যতীত ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করার পূবে যথেষ্ঠ পরিমাণ সোমরস প্রস্তুত করতে হবে। হৈমবত পর্বতমালার নিম্নদেশে যে কুঞ্চিত অনুচ্চ পর্বতমালা দুই দিগন্ত ছুঁয়ে বিস্তৃত, তার নাম মৌজবত। সেই মৌজবত পর্বতের অত্যন্ত শীতল জলবায়ুতে দুর্লভ সোমলতা পল্লবিত হয়ে মৌজবত পর্বতের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। গরুড় জাতির একজন বৈদ্য সুপর্ণ, সোমলতা থেকে সোমরস প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। সোমলতা সংগ্রহ এবং সোমরস প্রস্তুত আর্যগণ শেখেন সুপর্ণর কাছে। সোমযজ্ঞ করে তাঁরা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করতেন। বেদবতী এবং অন্যান্য আচার্যারা সোমরস প্রস্তুত প্রণালী আয়ত্ব করেছেন। যদিও আর্যপুরুষগণ প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করতেন, কিন্তু সোমলতা সংগ্রহ ও সোমরস প্রস্তুতের কাজটি আর্যনারীদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

সোমপানের প্রতি ইন্দ্রের অনুরাগ এতই প্রবল যে তাঁকে 'সোমপা' বলে সম্বোধন করা হয়। দেবতা, আর্যরাজা, আর্যঋষিগণ—কে বা সোমের সেবক নয়। কিন্তু সোমপানে ইন্দ্রদেবকে কেউ হারাতে পারবে না।

ইন্দ্রদেবের সোম আসক্তিকে কেউ কেউ দুর্বলতা বলে অভিহিত করতেন। অমৃতের প্রতি আসক্তিও মানুষ কিংবা দেবতাকে দুর্বল করে দেবে। তাহলে আসক্তিকে দুর্বলতা ছাড়া আর কি বলা যাবে? ইন্দ্র এবং সোমরস সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ কাহিনী লোকমুখে আলোচিত হত। জন্ম হওয়া মাত্রেই ইন্দ্রদেব তাঁর পিতার সঞ্চিত সোমরস পান করেন। সেইজন্য তাঁর পিতা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বাল্যকালে ইন্দ্র তাঁর পিতাকেই হত্যা করেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ইন্দ্রদেব যতটা সোমাসক্ত, ততটাই উগ্র। মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রদেব অধিক সোমাসক্ত। যে কোনও সময়ে ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করা যায়। সোম এবং অমৃতই ইন্দ্রের হব্য। ইন্দ্র শয্যাত্যাগ করা মাত্রই সোমপান করেন, শয্যাগ্রহণের পূর্বে সোমপান করেন, কিন্তু সর্বাধিক পরিমাণে সোমপান করে মধ্যাহ্নে।

শুধুমাত্র সোমপানের জন্যই ইন্দ্রদেব যজ্ঞে যোগ দিতে এত উৎসাহী। সুমিষ্ট, উত্তেজক, স্ফূর্তিদায়ক সোমপান করে ইন্দ্রদেব উৎফুল্ল, উন্মত্ত এবং কর্মপটু হয়ে ওঠেন। সোমের প্রভাবে তিনি মত্তহস্তীর মতো শত্রুদমন করেন। যেমন বায়ু বৃক্ষকে আন্দোলিত করে ও অশ্ব রথকে গতিশীল করে সেইরকম সোমরস ইন্দ্রদেবকে রিপুদমনকারী ও বেগবান করে। সোমই ইন্দ্রদেবের শক্তির উৎস। সোমপান করার সময় ইন্দ্রদেব এমন বিহ্বল হয়ে যান যে তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফ সব সোমরসে ডুবে যায়। তীব্র গতিতে শ্মশ্রুগুম্ফ আন্দোলিত করে সোমরস ঝেড়ে ফেলার দৃশ্য অতি অপূর্ব। সোমরস দেখামাত্রই ইন্দ্রদেব ক্রোধ, প্রতিহিংসা সব ভুলে যান। যে তাঁকে সোম অর্পণ করে তিনি তাঁর অভীষ্ট পূরণ করেন। সোমপানে প্রীত হয়ে তিনি শাপগ্রস্তকে শাপমুক্ত করেন। সোম ইন্দ্রদেবের শক্তিবর্দ্ধক হলেও ইহা তার এক দুর্বলতা রূপে

পরিগণিত হয়। ইন্দ্রের অপর একটি দুর্বলতা সম্পর্কে গুরুপত্নীগণ প্রায় মৃদু আলোচনা করতেন। আচার্যগণও এই আলোচনা থেকে মুক্ত ছিলেন না। আলোচ্য বিষয় ছিল ইন্দ্রের নারী লোলুপতা। সুরাসক্ত ব্যক্তি যেমন নারীর প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করে, সেইরকম সোমাসক্ত ইন্দ্রদেবও নারীর প্রতি অত্যন্ত দুর্বল বলে জনশ্রুতি আছে। "ইন্দ্রদেব রসিক পুরুষ। যেমন রূপ, তেমন বীরত্ব। ইন্দ্রদেব নিজে সুন্দরী নারীদের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হন, তেমন নারীদেরও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। কুমারী কন্যাদের গর্ভবতী করায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কুমারী মাতার অবৈধ সন্তানদের সমাজের ঘৃণিত কটাক্ষ থেকে দূরে রাখার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, সেখানে তাদের প্রতিভার বিকাশ সাধন তাঁর লক্ষ্য। নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি মানবী, দানবী, আর্যা, অনার্যা, কিন্নরী, অপ্সরা কোনও তারতম্য করেন না। তাঁর প্রেমপূর্ণ হৃদয়রাজ্য ত্রিলোকের নারীদের জন্য সদাই উন্মুক্ত।" —আচার্য মুদ্‌গল ইন্দ্রের চরিত্রের নারী লোলুপতার দিকটি তুলে ধরার সময় আচার্য গৌতম এবং অন্যান্য আচার্যগণ গম্ভীরভাবে বসেছিলেন। কৌতূহলবশত ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে আলোচনা করে সন্দেহমোচন করার চেষ্টা করছিল। আচার্যারা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে আমোদ অনুভব করছিলেন। প্রথা আমার পাশেই বসেছিল—মৃদুস্বরে আমার কানের কাছে বলে—"ইন্দ্রদেব যদি এইরকম নারী লোলুপ, সোমাসক্ত, কামুক তাহলে তাঁকে অতিথি হিসাবে আশ্রমে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে কেন? এখানে এত সুন্দরী কুমারীরা আছে বিশেষত অনিন্দ্যসুন্দরী অহল্যা আছে। ইন্দ্রদেব যদি কিছু অঘটন ঘটান। সেদিন স্বর্গরাজ্য অমরাবতীতে যেভাবে অহল্যার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমার তো বুকে ভয় ধরে গেছে। দৃষ্টি তো নয়—কুলপ্লাবিনী বন্যা, যে বাঁধ, সামাজিকতা, নীতি নিয়ম কিছুই মানে না। অহল্যার মনের জোর-ই বা কত যে, সে ইন্দ্রদেবের প্রেমাতুর আবেগ-বন্যাকে প্রতিরোধ করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে? আচার্য সবকিছু জেনেও অহল্যার উপনয়ন উৎযাপন করার জন্য কেন ইন্দ্রদেবকে ডাকলেন?

প্রথার এইরকম বাঁকা কথায় আমি রেগে গেলাম। খুশি হলাম কি মনে মনে! তাহলে প্রথাকে ভর্ৎসনা করলাম না কেন? আমি তো কথায় কথায় রক্ষণশীলা, অন্ধবিশ্বাসী প্রথাকে ভর্ৎসনা করি। একজন ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করে—"গুরুদেব! আর্যরাজা আর্যঋষি এবং আর্যজাতির অন্যান্য পুরুষগণ বহুপত্নীক। একাধিক সুন্দরী পত্নী থাকলেও অন্য আরও সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া এবং তাকে পত্নী, উপপত্নী, রক্ষিতা, দাসীরূপে রেখে নিজের যৌনবাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। এর জন্য সমাজে তাঁরা নিন্দিত নয়। কারণ এটা সমাজের প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। অথচ ইন্দ্রদেব বহু গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র এই একটি গুণের জন্য সমাজ তাকে দোষারোপ করে কেন?"

"ইন্দ্রদেবের প্রতি কেউ কেউ দোষারোপ করেন—কারণ তিনি বিবাহিতা নারীর প্রতিও আসক্ত হয়ে পড়েন এবং ছলে-বলে-কৌশলে তার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে নিজের

কামবাসনা চরিতার্থ করেন। দীর্ঘজীহ্বী নাম্নী এক বিবাহিতা দানবীর সাথে তিনি এইরূপ ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি মহর্ষি অত্রীর সাধ্বী কন্যা উপালাকে কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য করার জন্য ইন্দ্র তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেন, অবশ্য পরে অশ্বিনীকুমারদের সাহায্যে তাঁকে রোগমুক্ত করেছিলেন। উপালা ছিলেন কুশাশ্বর পত্নী। উপালার আখ্যান বর্ণনা করার সময়ে ঘৃণায় আচার্য গৌতমের মুখ বিকৃত দেখাচ্ছিল। উপস্থিত গুরু, গুরুপত্নী, শিষ্য, শিষ্যা সংকোচে মৌন হয়ে বসেছিলেন। ইন্দ্রদেব সম্পর্কে আমার মনেও ঘৃণা জন্মায়। কাউকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা ঘৃণ্য নয়। একজন আর্যরাজা যদি ন্যায়পথে বিবাহিতা নারীকেও জয় করে ভোগ করে সেটাও নিন্দনীয় নয়। যেহেতু এটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুষ্ঠ রোগাক্রান্তা হওয়ায় পতি-পরিত্যক্তা একজন অভাগিনী নারী তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে রোগমুক্ত করার বদলে যৌনশোষণ করবেন এর চেয়ে পাশবিক ঘৃণ্য কাজ আর কি হতে পারে। এই অপরাধের জন্য তাঁর ইন্দ্রপদ চলে যাওয়া উচিত। নারী লোলুপতা এমনই যে সেখানে রোগী অসহায়া আশ্রয়প্রার্থিনী কোনও বাছ-বিচার নেই। ইহা কামুকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের কামুক পুরুষ কিভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে ত্রিলোক পালন করেছেন—সেকথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এটা সত্যি না অপপ্রচার। আচার্য গৌতম এবং অন্যান্য ঋষিগণ নিশ্চয় অপপ্রচার করবেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝির ফলে অপবাদ ছড়ায়। প্রকৃত ঘটনা বলতে পারবেন ইন্দ্রদেব, কিংবা কুশাশ্ব পত্নী উপালা। ইন্দ্রদেবকে এই ঘটনার সত্যাসত্য কে জিজ্ঞাসা করবে? রাজার কাছে কেউ কি তাঁর অপরাধের তালিকা চায়, না ভগবানের কাছে তাব অবিচারের হিসাবে চায়? এইরকম দুঃসাহস ত্রিভুবনে কারও নেই। এ সম্পর্কে অবশ্য ঋষিকা উপালাকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

অত্রিকন্যা উপালা শুধুমাত্র সুন্দরী নয়, তিনি ছিলেন বিদুষী এবং বেদজ্ঞা। তিনি নিজেও কতগুলি মন্ত্র রচনা করেছিলেন বলে আমি শুনেছি। এখন তিনি কুশ্বাশ্রমে নিজের জরাগ্রস্ত রুগ্ন স্বামীর সাথে বৃদ্ধাবস্থা অতিবাহিত করছেন। তাঁর অধিকাংশ সময় বেদপাঠ এবং পতিসেবায় নিয়োজিত। তিনি আর বেশি হাঁটাচলা করতে পারেন না। তাই তাঁর সাথে দেখা করতে হলে আমাকে 'কুশ্বাশ্রমে' যেতে হবে। গৌতম আশ্রম থেকে রম্যবনে যাওয়ার পথে ঘন অরণ্যের দক্ষিণ কোণে 'কুশ্বাশ্রম' দূর থেকে দেখা যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া এত সহজ নয়। অরণ্যপথে হিংস্র জন্তুর যত প্রাদুর্ভাব তার চেয়ে অধিক প্রাদুর্ভাব দাসবর্ণের বিদ্রোহী যুবকদের। অবশ্য পিতার কাছে বায়না করলে তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। তাঁর সাথে ব্যোমযানে যাওয়া যাবে, কিন্তু আমি ব্যোমযানে যেতে চাই না কারণ এরফলে দাসবর্ণের বিদ্রোহী যুবকেরা ভুল বুঝবে। ভাববে তাদের প্রতি ঘৃণায় কিংবা ভয়ে আমরা আকাশপথে চলে গেলাম। পরে তারা কুশ্বাশ্রমের ওপর আক্রমণ করতে পারে। সেইজন্য ভাই নারদকে রাজি করে অরণ্যপথে রথে চড়ে যেতে হবে। কে জানে, রম্যবনে ফিরে যাওয়ার সময় একবার কুশ্বাশ্রম যাওয়া যাবে কি না!

উপনয়ন উৎসবের পরদিন থেকে আরম্ভ হবে বেদ-অধ্যয়ন। একটানা দু'মাস বেদ অধ্যয়নের পর পরবর্তী দু'মাস অধ্যয়নের বিরতি। সেই সময় বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শিক্ষার্থীরা সেই সময় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করত কিংবা কেউ কেউ গুরুর আজ্ঞা নিয়ে গৃহে গমন করত। আমার তো গৃহ বলতে আর এক আশ্রম। সেই গৃহের আকর্ষণ আমার বনভূমি, বনস্পতি, নদী, পর্বত, পশুপাখী এবং দাসপল্লীতে আমার সঙ্গী-সাথিরা।

এখানেও সেইসবের অভাব নেই। তাছাড়া আমার অনুপস্থিতিতে রম্যবনে আমার আশ্রমকুটীর ধ্বংস হয়ে যাবে না। তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে আমার দাস ভাই বোনেরা। আমি শিক্ষা শেষ করে ফিরে যাওয়ার সময় আমার বাগানে ফুল ফুটে থাকবে। আমার চেনা পশুপাখী, গাছপালা সবাই আমার পথ চেয়ে থাকবে। আমার অনুপস্থিতিতে তারা নিরাশ্রয় হবে না। আমি তো তাদের আশ্রয় ছিলাম না, তারাই ছিল আমার অবলম্বন। তাই অনধ্যয়ন কালেও আমি রম্যবনে যাব না। আমার আশ্রম জীবন বিলম্বে শুরু হওয়ায় পিতার ইচ্ছা যে আমি একটানা পাঁচ বছর আশ্রমে থেকে আচার্য এবং আচার্যাদের তত্ত্বাবধানে গৃহস্থ জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি। সেটাই পিতা জানিয়েছিলেন আচার্য গৌতমকে। সেইজন্য আচার্য গৌতম ছুটিতে আমাকে রম্যবনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেননি। তাই শিক্ষান্তে সমাবর্তন উৎসবের পরই আমি রম্যবনে ফিরে যেতে পারব। সে যাই হোক ঋষিকা উপালার সাথে সাক্ষাৎ করব বলে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি।

এমন সময়ে প্রথা হঠাৎ প্রশ্ন করে—''আচার্য মহাশয়! ইন্দ্রদেব এইরকম কামুক এবং নারী লোলুপ জেনেও আশ্রমের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন কেন? আপনার আশ্রমে অনেক ব্রহ্মচারিণী আছেন বিশেষত বর্তমানে সুন্দরী অহল্যা আছে। এই পরিস্থিতিতে ইন্দ্রদেবকে আশ্রমে ডাকা সমীচীন হচ্ছে কি?'' কথাগুলি বলে আমার দিকে তীর্যক কটাক্ষ হেনে প্রথা মুখ টিপে হাসে। তার এইরকম আচরণে আমি বিব্রত বোধ করি। আচার্য কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, সম্ভবত তিনি এই ধরণের প্রশ্ন আশা করেননি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন—''তোমার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়, কিন্তু বিবাহিতা ও কুমারী সকল আশ্রমবাসিনীদের জন্য এটি একটি পরীক্ষা। নারীর দিক থেকে সামান্য দুর্বলতার ইঙ্গিত পেলেই ইন্দ্রদেব তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেন বলে আমার বিশ্বাস। তিনি কামুক হতে পারেন, কিন্তু ইতর বর্বর নয়। তিনি আর্যবীর, তাঁর কাছে আভিজাত্যের অভাব নেই। তাই যেখানেই তিনি নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন সেখানে সেই নারীর দুর্বলতার ইঙ্গিত পেয়েছেন। নারী চরিত্রবতী হলে পাষণ্ড বর্বরও তার অঙ্গস্পর্শ করতে সাহস পাবে না। তাই ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করা সবদিকে থেকেই উপযুক্ত। যে কোনও নারীর পক্ষে ইন্দ্রদেব অগ্নিশিখা সম। যে নারী পতঙ্গের মতো সেখানে ঝাঁপ দেবে, সে ভস্মীভূতা হবে।''

"কিন্তু আগুন পাপী এবং নিষ্পাপ উভয়কেই দগ্ধ করে। তাই আগুন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত নয় কি?" —এই প্রশ্ন নীতির। দৃঢ়কণ্ঠে আচার্য উত্তর দেন—"আগুন যত ভয়ঙ্কর হলেও ত্রিলোকে তার আবশ্যকতা অপরিহার্য, সেইরূপ ইন্দ্রদেব সোম, নারী এবং

স্তুতিপ্রিয় হলেও ত্রিলোকে তাঁর উপস্থিতি কাম্য। তিনি ত্রিলোকের রাজা। চিরস্রোতা নদীসকলের উৎপত্তিস্থল তাঁর রাজ্য। ব্যোমযান, রথযান, আগ্নেয়াস্ত্র অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র অর্থভাণ্ডার, চিকিৎসা বিদ্যা—সবকিছুর উৎপাদন এবং বিতরণের ব্যবস্থা হয় তাঁর রাজ্যে। ত্রিভুবনকে তিনি সকল প্রকার সাহায্য দান করেন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত অনার্য শত্রু দমন সম্ভব নয়।

ভূখণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশ শ্বেতদ্বীপ থেকে রাজ্য বিস্তার করে আর্যগণ সমগ্র ভূখণ্ডকে আর্যাবর্তে পরিণত করেছেন, তার সমস্ত কৃতিত্ব ইন্দ্রদেবের প্রাপ্য। এখন অনার্যরা নিজ নিজ নিকটবর্তী অঞ্চলকে স্বাধীন ঘোষণা করে স্বতন্ত্র অনার্য রাজ্য দাবি করছে, তারা আর্যরাজাদের অধীনতা স্বীকার করে না। অনার্যরা দাস হিসাবে আর্যমালিকদের কাছে কাজ করতেও নারাজ। বর্তমান দাসপ্রথার বিরুদ্ধেও স্বর উত্তোলন হচ্ছে। সমগ্র আর্যাবর্ত যদি এইভাবে বিভাজিত হয়ে যায়, তাহলে দেশের অখণ্ডতার ওপর এর প্রভাব পড়বে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে আর্যাবর্তর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। এই পরিস্থিতিতে ইন্দ্রদেবই সহায়। অনার্যদমন এবং যুদ্ধকৌশল তার নখদর্পণে। তাই কয়েকটি দুর্বলতার জন্য তাঁর বহু পুরষোচিত গুণকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। নারীলোলুপতা রাজোচিত তথা পুরুষোচিত গুণ না হতে পারে, কিন্তু তত দোষাবহ নয়। নারীর কামুকতা এবং পুরুষলোলুপতা অত্যন্ত দোষাবহ। ইন্দ্রদেব নাবী নয়—পুরুষ—বীরপুরুষ। তাই বীবত্ব এবং দানশীলতাই তাঁব পরিচয়। নারীগণ সুশীলা হলে ইন্দ্রদেব সদাচারী হতে বাধ্য হবেন।"

বিনম্রভাবে নীতি বলেন—"মহাশয়! নারীর ক্ষেত্রে কামুকতা অক্ষমণীয় অপরাধ, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে অপরাধ হলেও ক্ষমণীয়। এই নীতি পুরুষ প্রণীত, সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আমরা শুনেছি আর্যঋষি এবং আর্যরাজাগণ তাঁদের পত্নীদের সাহায্যে ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন, স্ত্রীদের সেবা ও আতিথ্যের মাধ্যমে ইন্দ্রদেবের কৃপাভাজন হয়ে নানাভাবে লাভবান হচ্ছেন। ইহা কি নারীর অপব্যবহার নয়! স্ত্রী কি রাজা এবং দাতাগণের মনোরঞ্জনের বস্তু! অতিথিসৎকার পুরুষের দ্বারাও হতে পারে। ঋষিগণ সুন্দরী পত্নীদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কেন?

নীতির এইরূপ স্পষ্টোক্তিতে উপস্থিত ঋষিগণ অপদস্থ হন। ঋষি মুদ্‌গল তীব্রকণ্ঠে বলেন—"ইহা অর্থকে অনর্থ করার মতো কথা। সেবা সাহচর্য এবং অন্যের মন জেনে তার পরিচর্যা করা হল নারীর সহজাত গুণ। স্ত্রী হল অর্ধাঙ্গিনী, গৃহের কর্ত্রী তাই গৃহে অতিথি এলে তাঁর সৎকার স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য এবং তা ন্যায়সঙ্গত। যখন নারী অতিথি আপ্যায়ন করে, তখন অতিথি সেই নারীর কাছে ঈশ্বর এবং নারী অতিথির কাছে মাতৃদেবী। ইহাই অতিথি এবং গৃহকর্ত্রীর সম্পর্ক। ইহাকে যদি স্ত্রীর অসদুপযোগ বলা হয়, তাহলে কেউ কারও দ্বার স্পর্শ করবে না।"

নতমস্তক হয়ে নীতি বলে—"আমি আপনার সাথে একমত; কিন্তু একথা সত্য যে সুন্দরী স্ত্রীর মাধ্যমে বহু কার্যসাধন করা যায়। কার্যসাধনের পর স্ত্রীকে দোষারোপ করা হয়। এইরকম

উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে, যেমন—মেনকা, রম্ভা, উর্বশী.....। অবশ্য তাঁরা কারও পত্নী নয়, কিন্তু তারা ইন্দ্রদেবের স্নেহধন্য হলেও ইন্দ্রদেব তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করেন, পুনরায় তাঁদের অভিশাপও দেন ঐরূপ কাজের জন্য.....।

"থাক থাক সেইরকম দু'-একটা উদাহরণ দিয়ে অতিথি সৎকারের ক্ষেত্রে নারীর মহান ভূমিকাকে নিন্দিত এবং কলুষিত করা দোষাবহ। ইন্দ্রদেবের আতিথ্যে যেন কোনও রকম ত্রুটি না থাকে। তিনি শুধু অতিথি হয়ে আসছেন না, তিনি আমার সহপাঠীও। আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য থাকলেও আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পিতামহ ব্রহ্মার গুরুকুল আশ্রমে আমরা একত্রে বহুবছর কাটিয়েছি। তাঁর সৎগুণের তুলনায় দুর্গুণ অত্যন্ত তুচ্ছ। তাই অতিথি হিসাবে তাকে আহ্বান না করে আর কাকে করতাম?"

এখানেই সেদিনের সভা ভঙ্গ হল। আমরা ব্রহ্মচারিণীরা বেদমাতা আচার্যাদের সাথে সোমরস প্রস্তুত প্রণালী শেখার জন্য তাঁর সাথে গেলাম। কিন্তু আমার মনে উপালা সম্পর্কে সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে।

শ্রাবণী পূর্ণিমাব পূর্বাহ্ণে উপকর্ম উৎসবের সূচনা করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। উপবীত গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রভৃতি তিনবর্ণের শিষ্যদের গুরুর নিকট বেদ অধ্যয়নের মুহূর্ত উপস্থিত হল। আচার্য গৌতমের আশ্রমে দুটি ব্যতিক্রম ছিল, তিনি শুধু নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণ করতেন এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেতর এবং বালিকাদের শিষ্যত্বের সুযোগ দিতেন। সম্প্রতি এই আশ্রমে আমার চার সখী এবং আমি এই পাঁচজন শিষ্যা উপনীতা হয়েছিলাম। যেহেতু প্রথা বয়স্কা—তাই আমার তত্ত্বধায়িকা হিসাবে সে আশ্রমে থাকত।

আচার্যের নির্দেশে প্রথমে আমাকেই সামগান করতে হল। সামের মূলমন্ত্র হল সাম্য! যেখানে সাম্য নেই, সেখানে সামগানের আবশ্যকতা কি? উপকর্ম উৎসবে ইন্দ্রদেব বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অত্রি ইত্যাদি বিশিষ্ঠ অতিথিদের আবাহন করে সামগান করার সময়ে এই প্রশ্নটি বারবার আমার মনকে আন্দোলিত করছিল। তাই নির্ভুল উচ্চারণসহ মাধুর্যপূর্ণ সামগান করলেও আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। আচার্য গৌতম সেটা লক্ষ্য করেন। প্রথা আমার পাশে বসেছিল, সে চিমটি কেটে আচার্যের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে সতর্ক করে দেয়। আমি মধুরকণ্ঠে বেদমন্ত্রের পদচ্ছেদ করে ধীরভাবে সমুচিত লয়ে গান করলাম। যে বেদমন্ত্রের অর্থ না জেনে বেদমন্ত্র পাঠ করে সে অধম পাঠক। আমি পিতা এবং ভাই নারদের কাছে বেদমন্ত্রের অর্থ জেনেছিলাম। তাই উপকর্ম উৎসবে সামগান করতে সক্ষম হলাম। ইন্দ্রদেব সমেত উপস্থিত সমস্ত বিদ্বানমণ্ডলী প্রীত হন। অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেব সাধু-সাধু বলায় আচার্য গৌতম গর্ব অনুভব করছেন বলে মনে হল। এই উৎসবের সফলতা হল আচার্য গৌতমের সফলতা। তাছাড়া গুরুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তাঁর পুত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব গৌতমের ওপর ন্যস্ত করায় তাঁর পক্ষে সেটা গৌরবের বিষয় ছিল। এর দ্বারা আচার্য গৌতম নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ইন্দ্রদেবের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে পেরেছেন আমার মাধ্যমে। প্রথা এবং বার্তা এই কথাই বলছিল আমার কানে কানে।

সামগানের পর ইন্দ্রদেব আমার প্রশংসা করেন। আচার্য গৌতমকেও সাধুবাদ জানালেন। আমার মতো শিষ্যা পাওয়ায় গৌতম যে ভাগ্যবান সে কথাও ব্যক্ত করলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—"তোমার শুদ্ধ উচ্চারণে আমি খুশী হয়েছি, তোমার অভীষ্টপূরণ করতে পারলে আমি খুশী হব। শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য তোমার সমস্ত কিছু শুভ হবে। তা না হলে বৃত্রাসুরের মতো বিপরীত ফল হত। আমার তথা আর্যাবর্তের পরম শত্রু যে স্বর্গরাজ্য থেকে মর্তলোকে প্রবাহিত জলধারাকে রুদ্ধ করে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল, সেই একবার আমার বিনাশ কামনায় যজ্ঞ করেছিল। সেই যজ্ঞে বৃত্রাসুর দ্বারা আহুত ঋত্বিকগণ 'ইন্দ্র শত্রু বধস্ব' মন্ত্রটি অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছিল। মন্ত্রটির অর্থ ছিল—ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ বৃত্রাসুর বিজয়লাভ করুক। কিন্তু ঋত্বিকেরা ইন্দ্রের 'ই' শব্দটি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করার ফলে ইন্দ্র শত্রু যস্য—অর্থাৎ ইন্দ্র যাহার শত্রু অর্থে পরিবর্তিত হয়ে বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ইন্দ্র যার শত্রু সে বধ হোক, অবশেষে তাহাই হল। ঋত্বিকগণের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের জন্য যজমানের যজ্ঞফল শুভ না হয়ে অশুভ হল। আশ্রমজীবনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনীদের যথার্থ শিক্ষা আচার্যদের জ্ঞান ও শিক্ষাদানের সফলতার উপর নির্ভব করে। শুধুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান নয় জীবনের জ্ঞানও আবশ্যক। শিষ্য-শিষ্যার মেধা ও মন না জেনে জ্ঞান প্রয়োগ করলে কাঙ্খিত ফলের পরিবর্তে অনিষ্ট ফল লাভ হয়। তাই গুরুকুল আশ্রমের জীবন শিষ্যের পক্ষে যতটা কষ্টদায়ক, গুরুর পক্ষেও ততটাই কষ্টকর। আমার বন্ধু আচার্য গৌতম শিষ্য-শিষ্যাদের মেধা, মন, রুচি ও জীবনের লক্ষ্য অনুসারে শিক্ষাদানে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষত পিতামহ ব্রহ্মার বিদুষী কন্যা অহল্যাকে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর দায়িত্ব শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রহ্মাপুত্রীর মন ব্রহ্মা ব্যতীত একমাত্র গৌতমই সম্ভবত জানতে পারবেন। সেইজন্য ব্রহ্মা অহল্যার শিক্ষার দায়িত্ব গৌতমের উপর ন্যস্ত করেছেন। আমার সহপাঠী গৌতম একদিন ব্রহ্মার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। আজ ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যা যদি তাঁর প্রিয় শিষ্যা হতে পারে, তাহলে গুরুঋণ পরিশোধ হল বলে ধরে নিতে হবে।"

ইন্দ্রদেবের রূপ অপেক্ষা তাঁর বক্তব্য অধিক সুন্দর মনে হল, কিন্তু উপালা উপাখ্যান স্মরণে আসামাত্রই তার রূপ বিকৃত এবং কদাকার মনে হল আমার। তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ইচ্ছা হল না আমার। অবশ্য তাঁর কথায় আচার্য গৌতমের প্রতি ঈর্ষা ও শ্লেষ মিশ্রিত ছিল বলে আমার চারসখী এবং প্রথা আমাকে পরে বলে। আমার কিন্তু কথাটা মোটে ভালো লাগল না। আচার্য এবং ইন্দ্রদেবের মধ্যে যতই মতান্তর থাকুক না কেন, আমাকে মাঝখানে রেখে কলহ সৃষ্টি করাটা কি যুক্তিসঙ্গত?

উপালার বিষয়ে ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তাই উপকর্ম উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করিনি। সামগ্রিক আলোচনায় বাধ্য হয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু কোনও কথা বলিনি। আমাকে নিয়ে ইন্দ্রদেব এবং আচার্যের মধ্যে কলহ সৃষ্টির কথাটা আমার মোটেও ভালো লাগেনি। যদি সখীদের কথা সত্যি হয়, তাহলে শিক্ষা শেষ করে ভালোয়-ভালোয় রম্যবনে ফিরে যেতে পারলেই আমি শান্তি পাব। তখন পিতার

ইচ্ছায় এবং আমার নিজের পছন্দে পতি নির্বাচন করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করব। ব্রহ্মবাদিনী না হলাম নেই। দুই সহপাঠীর মধ্যে বিবাদিনী হয়ে কি খ্যাতি লাভ করব?

উপকর্ম উৎসব শেষ হতে না হতেই কোথায় যেন আর্য-অনার্য সংঘর্ষের সংবাদ এল। আর্যগণ সামযজ্ঞ করে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান জানালেন। অনার্যদমন এবং সামযজ্ঞের হবি গ্রহণ করার জন্য ইন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ ব্যোমযানে সেই স্থানে চলে যান। তাঁর যাওয়ার সংবাদ আমরা পরে পাই। তাই বিদায় প্রণতি জানাতে পারিনি। ভালোই হল। সংঘর্ষের কারণ না জেনে সোমরসের আকর্ষণে হোক বা শুধুমাত্র অনার্য-বিদ্বেষের জন্য যিনি আর্যপক্ষ সমর্থন করে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তিনি আর্য-নেতা হতে পারেন, কিন্তু অহল্যার আরাধ্য হতে পারবেন না।

আচার্য গৌতম সর্বদা উত্তর দিকে বসেন এবং দক্ষিণ দিকে আমাকে বসিয়ে অধ্যাপনা করেন। শুধুমাত্র বেদ অধ্যয়ন নয়, অধ্যয়নে বসার ভঙ্গিটিও শাস্ত্রীয়। সেটা আমার পূর্বেই জানা ছিল।

অধ্যয়নের বিধি অনুসরণ পূর্বক আচমণ করে শুদ্ধ তথা স্বল্প বস্ত্র পরিধান করি। উত্তরমুখে নম্রভাবে বসে জানুর ওপর দু'হাত সংযতভাবে স্থাপন করি। আচার্যর অনুমতি পাওয়ার পর সুপ্রসন্ন মনে অনন্যমতি হয়ে উরুর তৃতীয়ভাগে দক্ষিণ কনুই স্থাপন করে অধোমুখে ইষ্ট-ভঙ্গীতে বসি। হস্তাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্রহ্মাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করি।

বেদ অধ্যয়নের পূর্বে যখন গুরুকে অনুসরণ করে শিষ্যগণ ওঁ উচ্চারণ করেন তখন ত্রয়ী বিদ্যার প্রতিনিধি পরম অক্ষর ওঁ-এর সর্বব্যাপী মহিমায় বনভূমি ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। ওঁ-কারের সাথে ভুঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করার সময়ে আশ্রমের অপরপার্শ্বে অবস্থিত বন থেকে আর এক ওঁ-কার ধ্বনি উর্ধ্বে উঠে আমার কণ্ঠের ওঁ-কার ধ্বনির সাথে মিশে যায়। সেই ওঁ-কার ধ্বনি ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের—কিন্তু আচার্য অপ্রসন্ন হন। এটা যে আমার কীর্তি, সে কথা তাঁর অবিদিত ছিল না, কিন্তু আমি ব্রহ্মার আদরিণী কন্যা হওয়ায় সম্ভবত আচার্য নীরব থাকতেন। আচার্য কেবলমাত্র বেদ অধ্যয়ন করান না, আমার সারাদিনের কাজেব ওপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। অন্য সহচীরদের ওপর তাঁর এত নজর ছিল না, তারা আমার সঙ্গে এসেছে, কিন্তু পিতার মূল লক্ষ্য হল আমার শিক্ষালাভ। তাই আমাকেই কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করতে হয়। আমার খাদ্যপানীয় আচরণ এবং দৈনন্দিন জীবন কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত হত। রম্যবনে আমি ছিলাম মুক্ত বিহঙ্গী। তার অর্থ এই নয় যে, আমি উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম। সেখানে আমি গান গাইতাম, নাচতাম, বন্ধুদের সাথে হেসে-খেলে দিন কাটাতাম। বর্ণভেদ কি জানতাম না। রম্যবনে আমার জন্য সব কাজ ছিল পুণ্য কাজ, সব আচরণ ছিল ধর্মাচরণ। যদিও আমি পাপ পুণ্যের আক্ষরিক সংজ্ঞা জানতাম না। এখানে পাপ এবং অধর্ম থেকে দূরে থাকার জন্য আমাকে পাপ এবং অধর্মের সংজ্ঞা মুখস্থ করতে হয়। যে পুণ্য এত সহজ মনে হয়েছিল, 'পাপ'-এর সংজ্ঞা জানার পর তা' কষ্টসাধ্য মনে হল।

প্রতিনিয়ত আমাকে আচার্যের অধীনে থাকতে হত। আমার জন্য দুধ ও লবণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রসাধন, পাদুকা, ছত্র, নৃত্য, গীত, বাদ্য—ক্রীড়া-কৌতুক সব কিছুই নিষিদ্ধ ছিল। আচার্য গৌতম আমাকে উপদেশ দেন—"তুমি শান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, একান্তপ্রিয়, সত্যবাদিনী, মিতভাষিনী, সংযমী, ক্রোধহীনা এবং নিরহংকার হতে চেষ্টা কর অহল্যা। তোমার মধ্যে ক্রোধ আছে রূপের অহংকারও আছে, তুমি মিষ্টভাষিণী হলেও মিতভাষিণী নয়, তুমি ক্ষমাশীলা হলেও ক্রোধহীনা নয়, তুমি শান্ত হলেও গম্ভীর নয়। তুমি অত্যন্ত চপলা, ক্রীড়া এবং আমোদ প্রিয়। ভিক্ষা করতে যাওয়ার সময়ে কিংবা গুরুর জন্য নদী থেকে জল আনার সময় এমনকি অরণ্য থেকে কাঠ এবং যজ্ঞসমিধ সংগ্রহের সময় কিরাতগ্রাম, শবরপল্লী এবং অনার্যবসতিতে প্রবেশ করে সেই অশিক্ষিত বেদনিষিদ্ধ জনগণের সাথে বহু সময় অতিবাহিত কর। তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছ, তুমি ভুলে গেছ যে তারা আমাদের পরম শত্রু। ব্রহ্মচারিণী হিসাবে তোমার নিরন্তর গুরুর সেবা, তথা তাঁর সাথে শিষ্ট আচরণ করা উচিত এবং সর্বোপরি গুরুর ক্ষতি হয় এমন কাজ করা উচিত নয়। গুরুর সেবা এবং ভিক্ষা করাই ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্তব্য। গুরুর অনুমতি ব্যতীত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য অন্য কাউকে দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু তুমি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য নিয়মিত অনার্য বসতিতে কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশুকে দিচ্ছ বলে আমি শুনেছি। তুমি যা ভিক্ষা করবে তাহা প্রথমে আমাকে নিবেদন করবে ও আমার আদেশে তার থেকে কিছু ভোজন করা উচিত। সেটা কি তুমি করছ?

আমি নম্রভাবে বলি—"আমি তাহাই করি। আপনার অনুমতি ব্যতীত আমি কোনওদিন ভোজন করি না। অবশ্য ভিক্ষালব্ধ কিছু দ্রব্য আমি ক্ষুধার্ত শিশু এবং বৃদ্ধাদের দান করেছি। কেন জানি না, গৃহস্থেরা আমাকে অধিক ভিক্ষা দেন। আপনি বলেছেন—একদিনের জন্য যতটা আবশ্যক, সেই পরিমাণ ভিক্ষা আনতে, তার চেয়ে অধিক আনলে সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি থেকে লোভ, মোহ এবং অনাবশ্যক দ্রব্য জমা করার প্রয়াস বাড়বে পরের দিনের জন্য বেশি হলে আলস্য বাড়বে। ঘরে জিনিস আছে বলে ভিক্ষায় যেতে মন চাইবে না। এইসব চিন্তা করে প্রয়াজনের অতিরিক্ত জিনিস আমি তাদের বিতরণ করি, যাদের প্রকৃতই প্রয়োজন আছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটাই আমি প্রতিদিন আপনাকে নিবেদন করি। আপনার অনুমতি নিয়ে ভোজন করি। এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু অধিক দ্রব্য আমি কি করব?"

কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আচার্য প্রশ্ন করেন—"লোকেরা তোমাকে অধিক দ্রব্য কেন দেয় জানো?"

আচার্যের প্রশ্নের কোনও উত্তর না পেয়ে আমি নিষ্পাপ সরলতা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

আচার্য গৌতমও অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে ছিল কঠোর কটাক্ষ। আমার কি অপরাধ? সেই কথা ভেবে মন খারাপ হয়। নিষিদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করার মতো কুণ্ঠিত স্বরে আচার্য বলেন—"কারণ, তোমার মুখটি অত্যন্ত সুন্দর....." কথাটি

উচ্চারণ করতে করতে আচার্যের মুখমণ্ডলের শিরাগুলি কঠোর হয়ে যাওয়ায় তাঁর মুখটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাচ্ছিল। তাঁর চোখ বলছিল সুন্দর মুখ পাওয়াটা আমার অপরাধ। এই সুন্দরতা আশ্রমজীবনের বাধাস্বরূপ। কিন্তু আমার কি করার আছে? চেষ্টা করলে আমি চপলতা ত্যাগ করে গম্ভীর ও মিতভাষিণী হতে পারব, কিন্তু শত চেষ্টায়ও সৌন্দর্যকে আমার মুখ থেকে সরিয়ে দিতে পারব না.....। সত্যি কি গৃহস্থেরা আমার মুখ দেখে আমাকে অধিক ভিক্ষা দেন? বোধহয় আমার মুখে অনাথ, বৃদ্ধ অনাহার পীড়িত, সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহারা মানুষদের জন্য সমবেদনা ফুটে ওঠে। চেষ্টা করলেও ভিক্ষা করার সময় তাদের প্রতি সমবেদনা ও করুণার ভাব আমি আমার মুখ থেকে মুছে ফেলতে পারি না। কারণ আশ্রমের সীমা পার হলেই দাসবসতি চোখে পড়ে। যারা একদিন নগরীতে সচ্ছল জীবনযাপন করত, বর্ণসংঘর্ষের জন্য তাদের দীনহীন জীবনযাপনের দৃশ্য—কাকে না ব্যথিত করে! বোধহয় আমি মনে মনে অধিক ভিক্ষার কামনা করতাম, এবং সেই কথাই আমার মুখে লেখা হয়ে যেত।

আমার মুখটি সুন্দর বলে ঘোষণা করার পর আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে আকাশ, পৃথিবী, বনস্পতি ও পশুপাখীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন আচার্য। যেন আমাব মুখ সুন্দর হওয়ায় তিনি আর কোনও দিনই আমার মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমার মুখ সুন্দর হওয়া যদি অপরাধ, তাহলে সে অপরাধ আমার নয়—পিতা ব্রহ্মার। আচার্যের পরমপূজ্য গুরুদেবের। আচার্য নিজের গুরুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করছেন না কেন? আমি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করি—আমার এই সুন্দরতা দূর করার উপায় কি গুরুদেব? উপায় বলে দিলে আমি আমার মুখ থেকে সৌন্দর্যকে মুছে ফেলব। তাহলে গৃহস্থেরা আর আমাকে অধিক ভিক্ষা দেবেন না। আচার্য আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"সুন্দরতা নয়, নিজের থেকে অসুন্দরতাকে মুছে ফেল অহল্যা, সে উপায় আমি বলে দেব.....। সেজন্য তোমাকে কঠোর সাধনা করতে হবে। দেহের উর্ধ্বে গিয়ে দেহাতীত সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে হবে, তাহলেই তোমার শিক্ষা সার্থক হবে। বেদগুরু ব্রহ্মার তোমাকে এখানে পাঠাবার লক্ষ্য সাধন হবে।"

আমি চমকে উঠলাম। আমার বুকে ভয় ঢুকে যায়। আমার মধ্যে কোথায় আছে অসুন্দরতা? আমার তো জানা নেই। সে কোথায় লুকিয়ে আছে.....।" আমি নিজের ভিতরের অসুন্দরতাকে মুছে দেব বলে অসুন্দরতাকেই খুঁজতে লাগলাম। সৃষ্টির আদিকালে বেদবাণীতে পরমাত্মা মানুষকে মানুষ হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন।

তাহলে আর্য, অনার্য দেবতা, দস্যু, মানব, দানব, উচ্চ-নীচের প্রাচীর কে সৃষ্টি করল অনন্ত আকাশ এবং অদিতি পৃথিবীর সন্তানদের মধ্যে। বিশ্বকে আর্য করার ওঁ-কারের মধ্যে পৃথিবীকে গোষ্ঠী সম্প্রদায় এবং জাতিতে খণ্ড-বিখণ্ডিত করল কে? সমিধ সংগ্রহ করতে গিয়ে সেদিন বহুসময় ঋচা ও রুদ্রাক্ষের সাথে দাসপল্লীতে বসে কি যে আকাশ পাতাল গল্প জুড়েছিলাম তার হিসাব নেই।

রুদ্রাক্ষ অশ্রুসজল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল—মুখে তার ভাষা নেই—তার হৃদয়ের প্রতিবাদ আমার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল, সে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছিল। তার প্রশ্নের উত্তর দাবি করছিল। ঋচাও আমার কাছে কিছু সন্তোষজনক উত্তরের আশায় ম্লানমুখে অপেক্ষা করেছিল। আশ্রমে এত বেদজ্ঞ আচার্য মহর্ষি, মেধাবী, শিষ্য থাকা সত্ত্বেও ঋচা এবং রুদ্রাক্ষ আমাকে জ্ঞানের সাগর বলে কেন ভাবে? বোধহয় এইজন্যই যে আশ্রমে তাদের প্রবেশ নিষেধ। শিষ্যদের সাথে বসে বেদ অধ্যয়ন করতে পারে না। আচার্যগণ তাদের ঘৃণা এবং সন্দেহের চোখে দেখেন। মনে করেন ওরা বোধহয় যজ্ঞ-ভঙ্গের উদ্দেশ্যে আশ্রমে এসেছে। ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের সরল জিজ্ঞাসাকে ছল মনে করে আচার্যগণ তাদের আশ্রমের সীমা স্পর্শ না করার কঠোর আদেশ দেন। শিষ্যরাও ঋচা রুদ্রাক্ষ বা তাদের জ্ঞাতিটুকুম্বদের দেখলে এড়িয়ে চলে যায়। সেই কারণেই আমার কাছে স্নেহ সহানুভূতি পেয়ে আমার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। আমার জ্ঞান সীমিত জেনেও আমাকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া তাদের কোনও উপায় নেই।

কোন অনাদিকাল থেকে দেব দানবের মধ্যে এই অখণ্ড শত্রুতা। ফলে মানবকুলই ক্ষতিগ্রস্ত—পৃথিবী বিপন্ন। সেটাই শত্রুতার নীতি। দুটি বিবাদমান গোষ্ঠী পরস্পরের অনিষ্টসাধনের জন্য নিরীহ মানুষ ও প্রকৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংস করে। অমরত্ব লাভের জন্য ভাই ভাই-এর মধ্যে অমৃত বন্টনের ভয়ানক পরিণতি থেকেই দেব দানব এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হলে কেউতো কারও শত্রু ছিল না, আর্য-অনার্য দেবতা-দানবের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এইরকম তীব্র ছিল না সমুদ্রমন্থনের পূর্বে।

আমাকে নীরব দেখে অধৈর্যভাবে রুদ্রাক্ষ প্রশ্ন করে—"বলোত, আমরা কি তোমার শত্রু?"

"না, না, রুদ্রাক্ষ—কে বলল তোমরা আমার শত্রু—শত্রু তো দু'প্রকার। এক রাক্ষস, দুই অরাতি। বলপ্রয়োগ করে যে অন্যের সুখ, শান্তি, স্বপ্ন, সংকল্প, পুণ্য, সম্পদ, পবিত্রতা, সংহতি নষ্ট করে—সে রাক্ষস। অরাতি হল সেই সম্পদ থেকেও যে কৃপণ, দানশীল নয়, শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিপন্নের সহযোগিতা করে না।"

কিন্তু আমার তো রাক্ষস জাতিতে জন্ম। আমরা দস্যু, দৈত্য দানব দাস—তাই আর্যজাতির শত্রু হিসাবে চিহ্নিত এবং নিন্দিত। রুদ্রাক্ষের কথায় অভিযোগ কম, অভিমান বেশি। দুঃখে ঋচার মুখ অস্তমিত চাঁদের মতো ফ্যাকাশে।

আমি তাদের অভিমান বুঝি। কি উত্তর দেব। আর্য-অনার্য যে জাতিবাচক নয়, গুণবাচক, সেই কথাটা যত বোঝালেও কেউ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অলঙ্ঘনীয় সম্প্রদায়বাদ ও জাতিবাদকে দূর করা এত সহজ নয়। আর্য সমাজের উচ্চবর্ণ গোষ্ঠী সেটা চান না। অনার্য এবং সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেরা হীনমন্যতা এবং বিদ্বেষমুক্ত হোক একথা তারা চিন্তার মধ্যেও আনেন না।

কেবল আর্য-অনার্য নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র—এইভাবে মনুষ্যসমাজ আজ

খণ্ডিত। এগুলি জাতি নয়—কর্মভিত্তিক পদবী। যাঁরা মানব সমাজে অজ্ঞানতা দূর করে সমাজের পথপ্রদর্শক হন, তাঁরা ব্রাহ্মণ পদবী প্রাপ্ত হন। গুণ ও কর্মে তাঁদের সাত্ত্বিক হওয়া আবশ্যক। যাঁরা সমাজ থেকে অন্যায় দুর্নীতি দূর করে ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখেন—তাঁরা ক্ষত্রিয়। যারা মানুষের সমাজের আবশ্যকতা অনুযায়ী ব্যবসা বাণিজ্য করে সমাজকে সমৃদ্ধ করে তারা বৈশ্য হিসাবে পরিচিত। যাদের জ্ঞান আহরণের শক্তি সীমিত তারাও ভূমিমাতার সন্তান। তাদের জন্ম নিরর্থক নয় এই পৃথিবীতে তাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। তারা নিরহঙ্কারভাবে সমাজের সেবা করতে পারে, তারা শূদ্র হিসাবে সম্মানিত। রাষ্ট্রের প্রতি নিজের কর্তব্য ও সহজাত গুণের প্রকাশ অনুসারে মানুষ চতুঃবর্ণে বিভক্ত হয়েছে। চতুঃবর্ণের সক্রিয়-সহযোগেই জন্মভূমি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য প্রতিটি নাগরিকের উচিত নিজের সৎগুণগুলির বিকাশ সাধন করা। তার অর্থ এই নয় যে, অন্যের ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। ইহা অত্যন্ত দোষাবহ এবং বর্বরোচিত কাজ। কর্মগুণে যদি পদবী তাহলে ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্রোচিত কাজ করেও ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য হবে কেন? অথচ রুদ্রাক্ষ ক্ষত্রিয়সুলভ গুণ প্রদর্শন করলেও সে ক্ষত্রিয়ের সম্মান পাবে না কেন? আজকের সমাজে অন্ধকারকে বিনাশ করার জন্যই এর প্রয়োজন।

মানবাত্মার তেজ ও দীপ্তিই মানবের স্বরাজ্য। কোনও ভূখণ্ডের অধিবাসী পরস্পরের সামর্থ ও শক্তিকে গ্রহণ করে সমগ্রভাবে সংকল্পবদ্ধ হলেই মাতৃভূমি তথা মানবসমাজের শক্তি বৃদ্ধি হয়। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য না থাকলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। ফলে ব্যক্তি তথা রাষ্ট্র স্বরাজ্যচ্যুত হয়। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্রভিত্তিক যে সঙ্কীর্ণ কলহে আজ আশ্রমবাসী আর্য তথা বনবাসী দাসগণ লিপ্ত রয়েছেন—তার ফলে এই আশ্রম সংস্কৃতি যে বিপন্ন হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

উপদ্রবী তথা রাক্ষসদের দমন করা রাষ্ট্রনেতা তথা আশ্রম অধিকর্তার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এই দমননীতি জাতিভিত্তিক না হোক। আর্য ঋষিদের বোঝা উচিত যে আশ্রমের ভিতরে অনেক উপদ্রবী আছেন, যদিও তারা রাক্ষস হিসাবে চিহ্নিত নয়। বরং রুদ্রাক্ষকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করার অধিকার দেওয়া উচিত। কর্মঠ, শক্তিশালী, হৃদয়বান, বিচারশীল, সদাচারী রুদ্রাক্ষের দিকে আমি তাকালাম। সে কি আর্য নয়? সে যদি আর্য নয় তাহলে আর্য কে? আর্যের সংজ্ঞা কি?

কি করেছে এই রুচিশীলা, ব্রতশীলা, কর্মময়ী ঋচা, যায় জন্য সে দানবী রাক্ষসী নামে অভিহিত।

সভ্যসমাজে 'আর্য' নামে পরিচিত কত ব্যক্তি তো নিষ্কর্মা, আলস্যপরায়ণ। নিজে কাজ না করে অন্যের শ্রম এবং জ্ঞানলব্ধ সম্পদ তারা ভোগ করে। বহু ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতা হয়ে রাষ্ট্রের ভারসদৃশ, অপরের সম্পদের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা কি দস্যু নয়? কাপুরুষ বিলাসী রাজা কি দস্যু নয়?

কিছু তথাকথিত 'আর্য' জাতির লোক নিজ স্বার্থসাধনের জন্য হিংসা রক্তপাত লুণ্ঠন ও হত্যাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারা আর্য না দস্যু? কর্তব্য না করে যারা শুধু অধিকার ভোগ করে তারা সমাজ ও দেশের শত্রু। এরা অপব্রতা। নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী সমাজের অন্যায় দুর্নীতি, দুঃখ দারিদ্র দূর করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এটা না করা কর্তব্য বিমুখতা এবং অন্য অর্থে দেশদ্রোহিতা। এইরকম অনেক কর্তব্য বিমুখ ও স্বার্থপর আশ্রমেও আছেন কিন্তু তারা বংশ পরম্পরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করায় কিংবা পদবীধারী হওয়ায় আর্যরূপে গণ্য।

রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কর্তব্যকে অবহেলা করে যারা দেশসেবার নামে শুধুমাত্র অধিকার ভোগে উৎসাহী, তাঁরা দেশপ্রেমী না দেশদ্রোহী?

রুদ্রাক্ষ ও ঋচার দিকে তাকিয়ে এইরকম অনেক প্রশ্নের সাথে আমার মনে বিদ্রোহী ভাব জেগে ওঠে। অবশ্য আমার এই রকম ভাবনার পিছনে ভাই নারদের অবদান প্রচুর। এই ভূখণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি আমাকে অনেক তথ্য ও জ্ঞান দান করেন।

বিনা দোষে রুদ্রাক্ষ এবং ঋচা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্বীকার হয়েছে। তাদের মনে ক্ষোভ জাগা তো স্বাভাবিক।

হিংসা, যজ্ঞভঙ্গ, ঋষিসম্পত্তি নষ্ট ও নিরীহ নাগরিকদের ধনসম্পত্তি, জীবন ও সুখশান্তি বিনাশ এই বিদ্রোহের কারণ হোক্ সেটা আমি চাইনি। এর ফলে বিদ্বেষ বৈষম্য বাড়ছে বৈ কমছে না। উভয়পক্ষেরই ধনজীবন বিপন্ন। এর মধ্যে কিছু স্বার্থপর মানুষ রাজনৈতিক ফায়দা তুলছে। রুদ্রাক্ষকে বললে সে বুঝবে। পাশবিক বলপ্রয়োগ করে কিংবা হিংসার দ্বারা কি শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করা যেতে পারে? ভয় দেখিয়ে কি প্রেম ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব?

"তাহলে? কি উপায়ে আমরা আমাদের দাবি আদায় করতে পারব? কিভাবে ফিরে পাব আমরা আমাদের জন্মভূমি? আর্যদের ভয়ে কতদিন আমরা বনজঙ্গল, গিরি কন্দরে লুকিয়ে বেড়াব? একদিন এই ভূখণ্ড আমাদের ছিল একথা কে না জানে? জিজ্ঞাসা করুন, বনস্পতি অন্তরীক্ষ নদী, পাহাড় ও চন্দ্র সূর্যকে—এই ভূমি এবং মূল সংস্কৃতি আমাদের অথচ আজ আমরা সর্বতোভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিন্দিত। শান্তিপূর্ণ আপোষ আলোচনার মাধ্যমে যদি নিজের ন্যায্য দাবি হাসিল না করা যায়, তাহলে বলপ্রয়োগ ব্যতীত আর কি উপায় আছে?"

ক্রোধান্ধ রুদ্রাক্ষের মুখটা এখন যেন রাক্ষসের মত কদাকার দেখাচ্ছে। ক্রোধ, হিংসা, প্রতিহিংসা এমনই ক্ষতিকারক আবেগ যে, প্রথমে ইহা ক্রোধী এবং হিংসুকের ক্ষতি করে, পরে ক্ষতি করে অন্যের। আমার প্রিয় রুদ্রাক্ষের অসুররূপ দেখলে আমার কষ্ট হয়। রুদ্রাক্ষ এবং তার বংশধরেরা কি অসুর প্রবৃত্তি ছাড়তে পারবে না? আর্য-অনার্যের সহাবস্থান কি সম্ভব নয়?

আর্যরা যদি ভেবে থাকেন নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত অবহেলিত এই অনার্যগোষ্ঠীর সাহায্য ছাড়া তারা থাকতে পারবেন তাহলে তাদের ধারণা ভ্রান্ত। আর্যদের মধ্যে মাঝে মাঝে

অনার্য প্রবৃত্তি মাথা তোলে। ধনসম্পদ, নারী, রাজ্য এবং ক্ষমতার লোভে আর্যরা পরস্পরের মধ্যে যত যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন, আর্য-অনার্যের মধ্যে তত নরহত্যা বা রক্তপাত ঘটে নি। মানুষ, দেবতা এবং দাস—এই তিনজনের মধ্যে অহরহ সংঘর্ষ। সংঘর্ষের কারণ হল অহং প্রতিপালন, নিজ স্বার্থের প্রতিপোষণ ও শ্রেষ্ঠত্ব আরোপন।

প্রকৃতপক্ষে কি পরমাত্মার সৃষ্টিতে এইরকম তিনপ্রকার মস্তিষ্কধারী জীব আছেন? মানুষের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতাই একমাত্র দেবতা। বিশ্বাসের গভীরতা অনুযায়ী মানুষ দিব্য, অপ্য ও পার্থিব শ্রেণীতে বিভক্ত। মানুষের আত্মা যদি দীপ্ত এবং দিব্য হয়, তাহলে সেই দেবতা। মন্ত্রদ্বারা প্রকাশময় অন্তরাত্মাই দেবতার সার্থক স্বরূপ। জ্যোতি এবং দীপ্তি মানুষের আছে—দাসেরও আছে। মানুষের পক্ষে যা ভাবজ্যোতি, দাসের ক্ষেত্রে তা সেবা জ্যোতি এবং দেবতার পক্ষে তাহা মন্ত্র-জ্যোতি। মানুষের হৃদয়জ্যোতিতেই দেবতা উদ্ভাসিত—মানুষের হৃদয়মসিতেই দাস মসীকৃত। প্রকৃতপক্ষে মানুষই দেবতা ও দাসের সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুর মূলে মানুষের কৃতকর্ম।

প্রতিটি কর্ম ফলপ্রদ। সেই ফল ইষ্ট বা অনিষ্ট হতে পারে। কর্মগুণে ফল। তাই ঋচা এবং রুদ্রাক্ষ কর্মগুণে একদিন না একদিন ফল লাভ করবে। একদিন না একদিন আর্য-অনার্য সংঘর্ষ শেষ হবে। আমি ঋচা এবং রুদ্রাক্ষকে বোঝাই—ব্রহ্মচারী মাধুর্য কখন এসে আমাদের কথা শুনছেন।

আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মাধুর্য বলেন—"ভদ্রে! ইষ্ট অনিষ্ট কর্মফল সম্পর্কে আপনি যাদের বোঝাচ্ছেন, তাদের আত্মানুভব কোথায় যে তারা আত্মার স্থানে দেবত্ব স্থাপন করে দাসত্বকে 'স্বাহা'র স্থানে রাখবে।"

—"কেন তারা দাসত্বকে 'স্বাহা'র স্থানে রাখতে পারবে না মাধুর্য? নিজের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য বিদ্রোহ করার অর্থ কি দস্যুতা? বর্বরতা—অনার্যচিত ?

—"ভদ্রে! মনে হয় আপনি অনার্যদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বদ্ধ পরিকর। আচার্য আপনার অনার্য প্রীতি অনুমোদন করেন না এবং সেজন্য তিনি অসন্তুষ্ট। আচার্যের অনার্য বিদ্বেষ যুক্তিসঙ্গত। অনার্যরা ঋষিদের যজ্ঞ এবং তপস্যা ভঙ্গ করেন—মোক্ষ-পথের অন্তরায়। তারা ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত নির্মম।"

—"শুধুমাত্র দৈত্যেরা ঋষিদের যজ্ঞ ভঙ্গ করে না, দেবতারাও ঋষিদের যজ্ঞ ভঙ্গ করেন। ঋষিদের সাধনপথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য অপ্সরাদের নিযুক্ত করেন। বিশ্বামিত্রর কথা তো জানো। মেনকা রম্ভা.....।"

দেবতার কপটতা সম্পর্কে আমার মুখে মুক্ত সমালোচনা শুনে মাধুর্য শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ঋষিগণ সকাল-সন্ধ্যা যে দেবতাদের স্তুতি করেন, আচার্যগণ যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে সামগান করেন, অথচ আমি আশ্রমবাসিনী এবং আশ্রমের ছাত্রী হয়েও সেই দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করছি, একথা আচার্য জানতে পারলে ক্রুদ্ধ হবেন এবং আমাকে হয়তো আশ্রম থেকে বহিষ্কার করবেন। মাধুর্য আমার সহপাঠী। আমার প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ও

ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু আমার অকপট আচরণ তাঁকে মাঝে মাঝে শঙ্কিত করে। মাধুর্যের মনে আর কিছু থাক বা না থাক, মাধুর্য যে আমার সান্নিধ্যে আনন্দ অনুভব করেন একথা আমার সূক্ষ্ম অনুভূতি আমাকে সঙ্কেত দেয়। সেজন্য আমি উল্লসিতা নয় কি ক্ষুব্ধাও নয়। আমার সান্নিধ্যে সকলের আনন্দিত হওয়ার কথা আমি বাল্যকাল থেকেই জানি। এই অনুভব আমার নূতন নয়। তাই মাধুর্যর আদর শুভেচ্ছাকে অমি নির্মলচিত্তে স্বাগত জানিয়েছি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, আমাদের এই মেলামেশা আচার্য পছন্দ করেন না। মাধুর্য আর্য, রুদ্রাক্ষ অনার্য—আমার মাধুর্য-প্রীতি কিংবা রুদ্রাক্ষ-প্রীতি কোনওটাই আচার্যের প্রীত নয়। প্রীতি কি ঘৃণ্য? সহৃদয়তা কি অশুভ—কুৎসিৎ—অকরণীয়? এমনকি কিরাত-কন্যা ঋচার সখীত্বও আশ্রমে কেউ ভালোভাবে গ্রহণ করেন না। আমি জানি, আমি ব্যতীত কোনও শিক্ষার্থী আচার্যের বিরুদ্ধাচরণ করে না। বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এই আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু আমার পিতার পদবী এবং ক্ষমতার জন্য আমার আচরণে ক্ষুব্ধ হলেও আচার্য আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না। কিংবা আশ্রম থেকে বহিষ্কারও করেন না। আমার অনুভব বলে—মাধুর্যের মতো আচার্যও আমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে চান না। নিষ্ঠার সাথে ব্রহ্মচর্য পালন করলেও মাঝে মাঝে মাধুর্য বলে ফেলে যে, আমার সান্নিধ্য অত্যন্ত সুখপ্রদ। কিন্তু আচার্য কখনও একথা মুখ খুলে বলেননি। এটাই মাধুর্য এবং আচার্যের মধ্যে পার্থক্য। কঠোর ইন্দ্রিয় সংযমে আচার্য কৃতকার্য হয়েছেন, মাধুর্য এখনও সাধনারত। পিতার আদেশে আমি আশ্রমে শিক্ষালাভ করতে এসেছিলাম অথচ আমাকে সমিধ করে ইষ্ট সাধনের জন্য সকলেই যেন যজ্ঞরত।

দিব্যযজ্ঞের পবিত্র ভূমি হল আমার এই অদিতি পৃথিবী মাতা। আমার এই পৃথিবী দ্যুলোকের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে ঋতম্ভরা। কি নেই আমার এই পৃথিবীতে যে দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হওয়ার জন্য ঋষিদের এত সাধনা—এত তপশ্চারণ? ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল সম্পত্তি, দ্যুলোকের মহাসূর্য ভূলোকের মহাপ্রকৃতি ও মহোদধি, নভঃমণ্ডলের মেঘমালা, বিদ্যুৎ, অন্তরীক্ষের মৃদু মরুৎ—সবই এই পৃথিবীর সমৃদ্ধির জন্য স্রষ্টার বরদান। প্রেম, মৈত্রী, করুণা, সদিচ্ছা, পরোপকার, ত্যাগ ও উৎসর্গ—পৃথিবীর অন্তঃকরণে এইসব থাকা সত্ত্বেও কোন দিব্য ভাববোধের আকাঙ্খায় মানুষ পৃথিবীর উর্ধ্বে যেতে অভিলাষী? যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের পল্লীতে গিয়ে সবকিছু ভুলে যাই এবং তাদের সঙ্গে এইরকম দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করি। লক্ষ্য করি তাদের অপরিমেয় জ্ঞানলিপ্সা। তারা যদি আশ্রমে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, তাহলে তারাও একদিন শাস্ত্র রচয়িতা হতে পারত—আত্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে ঋষিদেরও আলোকিত করতে পারত। তারা কেনই বা যজ্ঞ ভঙ্গ করত!

যজ্ঞের উদ্দেশ্য কেবল দেব পূজা নয়, সংহতিকরণও। বিদ্বান, গুণী এবং দেবোপম ব্যক্তিদের প্রতিভাপূজা, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীগত বিভাজন ভুলে দেশবাসীর সাথে হৃদয়ের মিলন ও সংহতিকরণ এবং দুর্বল ও অবহেলিতদের ন্যায্য অধিকার দানের অর্থই হল যজ্ঞ।

এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে বলেই যজ্ঞ হল শ্রেষ্ঠ কর্ম। তাই 'যজ্ঞ'র অধিকার সবাইর আছে। দেবতাগণও যজ্ঞ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ড হল এক মহান যজ্ঞ। মানবও যজ্ঞ। বেদের বাণীতে ঝঙ্কৃত হয় হে মানুষ; তোমার জন্ম, তোমার দেহ যজ্ঞের জন্য নির্মিত। নিজের স্বার্থকে 'স্বাহা' করে আত্মযজ্ঞ সম্পাদন কর। এই সৃষ্টিযজ্ঞে পরমাত্মা স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ। প্রজাপতির সৃষ্টিযজ্ঞে মানব প্রজাগন যোগ্য সাধন হওয়াই মানবজন্মের সার্থকতা।

যজ্ঞের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গতকাল আচার্য আত্মযজ্ঞের উপর গুরুত্ব দিয়ে মহর্ষি দধীচির জীবন কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমি সর্বত্র দধীচির যজ্ঞস্বরূপকেই দেখছি। দধীচির সাত্ত্বিক-যজ্ঞ এই মাটিকে পবিত্র করেছে। আজ যে সকল যজ্ঞ সম্পাদন হচ্ছে তার মধ্যে সব যজ্ঞ সাত্ত্বিক নয়—ন্যস্ত স্বার্থ সাধনের জন্য বহু রাজসিক এবং তামসিক যজ্ঞও অহঃরাত্র সম্পাদন হচ্ছে।

তাই যজ্ঞাসাধন সংগ্রহ করতে এসে অমি গুরুর আদেশমত একাগ্রচিত্তে কাজ করতে পারছি না। মহাত্মা দধীচির আধ্যাত্মিক যজ্ঞের বিশাল ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে আশ্রমের অগ্নিহোত্রের সময় যে অতিক্রান্ত হয়েছে সে কথা ভুলে গেছি। আমি দেখছি, প্রাতঃ—সূর্য দধীচির আত্মযজ্ঞের অগ্নিহোত্রকে প্রকট করছে। মহাত্মা দধীচি তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে একত্র করে নিজের বিশাল সমগ্রতাকে 'হব্য' পদার্থে পরিণত করে রাষ্ট্রকল্যাণে যজ্ঞে 'স্বাহা' হওয়ার দৃশ্য সর্বদাই আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হচ্ছে। সূর্যরূপ যজ্ঞাগ্নি দধীচির সমগ্রতাকে দধীচির মহিমাকে অনু-পরমাণু করে বিভূতিসদৃশ শত্রু, মিত্র নির্বিশেষে বিতরণ করছে। কে মহান! দধীচি না সূর্যাগ্নি? দধীচি নিজেকে সূর্যাগ্নিতে হব্য করে দিলেন। সূর্য নিজে কিছু গ্রহণ না করে জগতের কল্যাণের জন্য সমস্ত বিতরণ করে দিলেন। কে শ্রেষ্ঠ—হব্য—না হোম? স্বরের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্ভাবের মত ঋতু এবং বনস্পতির ভাব, কিন্তু বয়স এবং প্রাণকোষের তো মহাভাব।

বসন্ত ঋতুতেও পাতা ঝরে, কত কুঁড়ি ফোটে না— ফোটা ফুল ঝরে যায়, পাঁপড়ি থেকে গন্ধ চলে যায়। আজকের রঙ কাল ফ্যাকাসে হয়ে যায়। কিন্তু যৌবন ঋতুতে দেহের প্রতিটি জীবকোষ ফুলের মতো পাপড়ি মেলে, সুগন্ধিত হয়ে ওঠে দেহের প্রতিটি অনু-পরামাণু। আজকের কামনা কাল আকাশ ছুঁয়ে যায়—স্বপ্নগুলি তারার মত একটার পর একটা চমকিত হয় অন্তর্মনের আকাশে। বসন্ত ঋতুতে সমগ্র অরণ্য এক ঝাঁক তারায় পরিণত হয়—যৌবন ঋতুতে সমগ্র কল্পনা মণি-মাণিক্যে রূপান্তরিত হয়। সেখানে নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে না।

কে জানে আমার ভিতরে কি পরিবর্তন ঘটে গেছে আমি জানি না। কিন্তু আমার অজান্তে আমি মাধুর্য এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করি। আমার ভাবকোষের প্রতিটি তন্ত্রী কল্পনার জাল বিস্তার করে। অধ্যয়ন অপেক্ষা মননে আমার অধিক সময় ব্যয় হয়। আমার এই পরিবর্তন আমি নিজে যতটা উপলব্ধি করি, তার চেয়ে বেশি নিজেকে সকলের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আবিষ্কার করি। আশ্রমের তপস্বী, তপস্বিনী, উপ্যাধ্যায়, উপাধ্যায়িনী, আচার্য সবাই আমার দিকে এমন ভাববিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকেন, মাধুর্য

আমাকে দেখে বেদ-উচ্চারণে ভুল করে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু আচার্য গৌতমের ভাবভঙ্গি ছিল বিচিত্র। আচার্য গৌতম ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী। এখনও তিনি গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেননি। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি সংসারী হবেন বলে সবাই আশাবাদী। আচার্য গৌতম বিবাহ-বিমুখ নয়, উপযুক্ত কন্যা দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বিবাহ করবেন, একথা সকলেরই জানা। কিন্তু তাঁকে বিবাহ করে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করা কোনও রমণীর পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সকলের মনেই সন্দেহ আছে। যে তাঁকে বিবাহ করবে, সে নিশ্চয় পুণ্যবতী, কিন্তু তাকে তরোয়ালের উপর চলতে হবে। দুঃখকে দুঃখ বলবে না, সুখে সুখী হবে না। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে না। যৌবনে স্থবিরের মতো শুষ্ক নীরস হয়ে নিষ্কাম হতে প্রয়াসী হবে। মুখে থাকবে না মাধুর্য, চোখে থাকবে না চমক। চোখ, মুখ, ভাবভঙ্গীতে লেখা থাকবে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এইরকম লোকের সাথে বানপ্রস্থে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সংসার করা সম্ভব নয়। আচার্য আমাকে হেয় করেন না ভয় পান বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং পর মুহূর্তেই আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন—কেন আমি অন্যমনস্ক হয়েছি। সাধারণত সরাসরি আমার দিকে না তাকিয়ে, ত্বয়ি, অন্বি, বার্ত্তা, নীতি এমনকি প্রথার দিকে তাকিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলেন। অথচ আমার দিকে তাকাবেন না। এটা নাকি তাঁব কঠোর সংযম ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচায়ক। কিন্তু আমার মনে হয় রুদ্রাক্ষ অধিক সংযমী ও চরিত্রবাণ। সে আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়, আমার পদধূলি মাথায় নিয়ে বলে—"তোমাকে যিনি গড়েছেন, তাঁকে দেখা তো সম্ভব নয়, তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা জানানো। রুদ্রাক্ষের মনে আবিলতা নেই, তার মনটা তার চোখের ভিতরেই স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আচার্য গৌতম আমাকে দেখে মাঝে মাঝে এমন পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন যে, তার মনের কথা জানা স্বয়ং ব্রহ্মার পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি তো ছার অহল্যা। আমাকে দেখামাত্রই তিনি এত কঠোর এত রুক্ষ এবং নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন, সে কথা আমি কি করে জানব?

আচার্যের নির্দেশে উপাধ্যায়িনীগণ আমাকে গৃহস্থ ধর্ম, বিবাহসংস্কার, নারীর বসনভূষণ, আচার ব্যবহার, গৃহকর্ম, অতিথিসেবা, বিবাহিতা নরীর কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে তালিম দিচ্ছিলেন। শীঘ্রই আমার শিক্ষা সমাপ্ত হবে এবং আমি পিতার কাছে ফিরে যাব এবং তারপর আমাকে বিবাহ করতে হবে। পিতা নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে গৃহকর্ম নিপুণা করার জন্য। আমার বিবাহের জন্য পিতা যে চিন্তিত সেকথা ভাই নারদ এসে আচার্যকে বলেছেন তা আমি জানি। আমার বিবাহ সত্যি কি একটা সমস্যা যে পিতা এত চিন্তিত?

আমি শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে যাওয়ার পরই পিতা 'সমন উৎসব'-এর আয়োজন করবেন, আমি জানি এই উৎসবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই মনোরঞ্জন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। কবি, শিল্পী, ধনুর্ধারী, বীর এবং রথী, মহারথীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রদর্শন করবেন। সারারাত এই উৎসব চলবে। নানা প্রকার নৃত্য গীতি ও বাদ্যের মাধ্যমে পতি-পত্নী নির্বাচনই এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কথা আমি উপাধ্যায়িনীদের কাছ শুনেছি। এইরকম একটি

উৎসব সকল কুমারী মনের আকাঙ্খিত স্বপ্ন। কিন্তু আমি এই উৎসব সম্পর্কে এত উৎসাহী ছিল্যম না। কারণ আমি জানতাম যে আমার বিবাহের জন্য সমন উৎসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না পিতাকে। ভাই নারদ বলছিলেন—বহু দেবতা, যক্ষ, কিন্নর, মুনি, ঋষি আমার পানিগ্রহণে উৎসুক। কিন্তু পিতা কোনও প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নয়। দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর কেউই আমার পতি হওয়ার উপযুক্ত নয়। আর তাহলে ত্রিভুবনে কে আছে যাকে পতি হিসাবে নির্বাচন করবেন? মানুষ।

কিন্তু মানুষ মাত্রেই সংঘর্ষরত। আমার অদৃষ্টে কি পিতা সংঘর্ষের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, পিতা নিশ্চয় আমার মতামত নিয়েই বিবাহ স্থির করবেন। আমার ভাবী পতির ব্যক্তিত্বের কোন দিকটির ওপর নির্ভর করে আমি পতি নির্বাচন করব জানি না। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই এ সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট হয়ে যেতে হবে। কিছুদিন যাবৎ আচার্যও চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য এবং ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে পঞ্চদশ সংস্কার বিবাহ সম্পর্কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছেন। নারীর ভূমিকা, নারী জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন। নিজে বিবাহিত না হলেও অভিজ্ঞ গৃহস্থের মত গার্হস্থ্য ধর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। আমি বুঝতে পারি, এইসব আলোচনা আমার উদ্দেশ্যেই। একদিন অসুস্থতাবশত আমি পাঠকক্ষে অনুপস্থিত ছিলাম। আচার্য সেদিন বৈদিক মন্ত্রে প্রতীকতা সম্পর্কে অলোচনা করছিলেন। মাধুর্য তখন বলে যে, পূর্ববর্ত্তী আলোচনা ছিল বিবাহ-সংস্কার সম্পর্কে এবং তা সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আচার্য স্পষ্টভাবে বলেন—"অহল্যার অনুপস্থিতির জন্য বিবাহ-সংস্কার সম্পর্কীয় আলোচনা স্থগিত রেখেছি, কারণ তার জন্য এই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাবর্তন উৎসবের পর গৃহে ফিরে যাওয়া মাত্রই তার বিবাহ সম্পন্ন হবে। পিতামহ ব্রহ্মা উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করছেন। আমার বিশ্বাস অহল্যার মতো বর নারীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবে না।" আমার উপযুক্ত পতিলাভ এবং সুখময় দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আচার্য এত যত্নশীল হওয়ায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। সকল গুরু শিষ্যদের সফল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। শিক্ষাদাতা পিতৃসদৃশ। এই শুভকামনা তাঁর কাছে আশা করা যায়। তাঁর শুভেচ্ছা আমাকে খুশী করে।

গার্হস্থ্যজীবন এবং বিবাহ সম্পর্কে আচার্যের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা সম্বলিত ব্যাখ্যা শুনে আমি একদিন প্রশ্ন করলাম—"বিবাহ বন্ধন না মুক্তি? আপনি যেরকম কঠোর নিয়মাবলী উপস্থাপিত করছেন, তাতে মনে হচ্ছে বিবাহ হল বন্ধন। মানুষ হিসাবে কোনটা কাম্য—বন্ধন না মুক্তি?

আচার্য গৌতম সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উত্তর দিলেন—"'বি' শব্দের অর্থ গতি বা মুক্তি। যে সংস্কার মানুষকে গতি ও মুক্তির দিকে অগ্রসর করায় তার নাম 'বিবাহ'। বিবাহ কখনও বন্ধন নয়। বরং অন্যান্য বন্ধন থেকে ছিন্ন করে বিবাহ মানুষকে চতুবর্গ ফল প্রাপ্ত করায়। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার সুখসাধনে বিবাহ সহায়ক হয়। তাই শুধুমাত্র দৈহিক সুখলাভ বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। যদি তুমি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনে বদ্ধ

পরিকর হও, তাহলে বিবাহ না করওে তুমি মুক্তিপথে অগ্রসর হতে পারবে, কিন্তু সকলের আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন আবশ্যক নয়। সৃষ্টি প্রবাহে বিবাহের যে ভূমিকা রয়েছে তা বিবাহ ব্যতীত বিশৃঙ্খল এবং ব্যহত হবে। বিবাহ কাম উদ্রেক করে না, বরং মানুষের কামবাসনাকে প্রশমিত করে মনকে একমুখী করে। লোকালয়ে বসবাস করলে বিবাহ সদা-স্বাগত। গৃহস্থের যে পাঁচ প্রকার যজ্ঞ করার কথা বিবাহ ব্যতীত ব্যক্তি সেই কর্মের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না। তাই বিবাহকে 'মুক্তি' মনে করে চতুঃবর্গ প্রাপ্তির পথে নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করা বিধেয়। নিয়মশৃঙ্খলা কখনও বন্ধনের জন্য উদ্দিষ্ট নয়। শৃঙ্খলাকে যাঁরা শৃঙ্খল মনে করেন, নীতি নিয়ম বহির্ভূত কাজ করাটাকে তার জন্মগত অধিকার মনে করেন শুধুমাত্র সেইরকম বিশৃঙ্খল ব্যক্তিদের জন্য শৃঙ্খলা পরিণত হয় শৃঙ্খলে, নীতি হয় শাস্তি। আচার্যর যুক্তি অকাট্য এবং হৃদয়গ্রাহী। বিবাহ সম্পর্কে আমার ভয় আশঙ্কা ও সন্দেহ ধীরে ধীরে দূরে হয়ে যায়। বলতে গেলে বিবাহ সম্পর্কে আমার আগ্রহও জন্মায়। বিবাহ শুধু সুখ দেয় না—সামাজিক সম্মান ও দেয়। সম্মানের সাথে কে না বাঁচতে চায়।

ছোটবেলা থেকেই পরিবারের কি সুখ আমি জানি না। তাই পারিবারিক জীবনের প্রতি আমার অদম্য কৌতূহল ও অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা। বলতে গেলে পারিবারিক জীবন যাপন করা আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন।

আমাকে সুযোগ্যা বধূ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আচার্য গৌতম সমস্ত কর্ম অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পাদন করতেন। ললিতকলা, কাব্যচর্চা, সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। যেহেতু পুরুষের সাথে পত্নী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিত, সেজন্য নারীকেও শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করতে হত। আমার শাস্ত্রজ্ঞান সম্পর্কে আচার্য সন্তুষ্ট ছিলেন। স্বামীর সাথে লৌকিক তথা ধার্মিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থ বলে তিনি বুঝেছিলেন। স্বামীর আধ্যাত্মিক কর্মে সমানভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি সমর্থ কি না, সে বিষয়ে আচার্য আমাকে বারম্বার পরীক্ষা করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আশ্রমে আমার শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত। শিষ্যা হিসাবে আচার্য আমার ওপর যতটা প্রসন্ন ছিলেন, গুরু হিসাবে আচার্যের প্রতি আমিও ততটা কৃতজ্ঞ ছিলাম। আর্যেতর জাতির সাথে আমার মেলামেশা আচার্য পছন্দ করতে না। আচার্য দাস পল্লীতে বেদচর্চার বিরোধিতা করলেও আমি ঋচা ও রুদ্রাক্ষকে বেদ অধ্যায়ন করাই জেনেও আমার প্রতি শাস্তিবিধান না করাটাই তাঁর উদারতার পরিচয়। আমার জন্য নিয়মশৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর হওয়া সত্ত্বেও আমি মনে মনে আচার্যকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতাম। আমাদের মধ্যে গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠেছিল। রুক্ষ, নীতিবাদী, গম্ভীর, দার্শনিক আচার্যের মনের ভিতরে থাকা কোমল তত্ত্বটি আমি পড়ার চেষ্টা করছিলাম। তাঁর কোমল আধ্যাত্মিক সত্তাটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করার কথা চিন্তা করলেই এই আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার করুণ সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছিল আমার মনে। শুধু আমি নয়, আশ্রম থেকে বিদায়ের ভাবনায় সকল শিক্ষার্থীই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। আশ্রমে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক মাত্র কয়েকবছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল

না। এই সম্পর্ক এত দৃঢ় এবং গভীর ছিল যে, জীবনে আর এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

বিদায় মুহূর্তকে উৎসব মুখর করার জন্য সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন চলছিল। কিন্তু আচার্যের মতে সমাবর্তনের অর্থ শিক্ষার সমাপ্তি নয়। গুরুগৃহে অধ্যয়নের সমাপ্তিই সমাবর্তনের সংকেত। এর পর শিষ্য-শিষ্যারা দাম্পত্য জীবনে কিংবা আজন্ম ব্রহ্মচারী জীবনে প্রবেশের পূর্ণ স্বাধীনতা পেত। দাম্পত্য জীবনেও বেদ অধ্যয়ন এবং নৈতিক শিক্ষা জীবনের এক অংশ বিশেষ। স্বাধ্যায় দ্বারা দাম্পত্য জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব। বিবাহিত জীবনে পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রত্যহ বেদগান ও নীতিনিয়ম পালন অন্যতম ছিল। আচার্য গৌতম শিষ্যদের জীবনব্যপী শিক্ষার মহত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার পরেও গুরু শিষ্যের সম্পর্ক নষ্ট হবে না বরং অধিক দৃঢ় হবে বলে তিনি সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছিলেন। বাস্তবিক বিদায়ের করুণ গম্ভীর পরিবেশকে হালকা করে দেওয়াই ছিল আচার্যর উদ্দেশ্য। সমাবর্তন উৎসবের পর ছাত্রজীবনে বিদায়ের পর্ব আসে একবার, কিন্তু আচার্যর জীবনে এই বিদায় পর্ব আসে বারবার। তাই ছাত্রগণ বিষণ্ণ হলেও আচার্য ছিলেন নির্লিপ্ত।

সমাবর্তন উৎসবে নানা প্রকার প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা হয়। দূরাগত বিদ্বান অতিথিদের এই সকল অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচারের অনুরোধ করা হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হয়ে অতিথিদের প্রশংসালাভের জন্য ছাত্ররা তৎপর হয়ে ওঠে। এই তৎপরতার মধ্যে বিদায়পর্ব সংঘটিত হয়ে যায়। কৃতিত্ব, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ছাত্রগণ স্বগৃহে ফিরে যায়। আমার সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য কেউ নেই। তার অর্থ এই নয় যে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি নিজে। আমার শ্রদ্ধা, মেধা, চিন্তা, চৈতন্য আমার সাথে কতদূর সহযোগিতা করবে, তারই উপর নির্ভর করবে আমার পরীক্ষার ফলাফল। সমাবর্তন উৎসবের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে গুরু পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষা সমাপ্তির ঘোষণা করা হয়, নাহলে আরও কিছুদিন গুরু আশ্রমে থাকতে হয়।

যদি আমাকে আরও কিছুদিন থাকতে হয় এই আশ্রমে, আমার কিছু আপত্তি নেই। আমার তো সাধারণ জীবন নয়। বাড়ীতে মা, বাবা, ভাই, বোন আমার পথ চেয়ে বসে নেই। আচার্যর আশ্রম এবং রম্যবন আমার কাছে সমান বরং আশ্রমে আছেন অনেক গুরুপত্নী ও মুনিকন্যা, বহু সঙ্গী-সাথী। নিকটেই আছে দাসপল্লী, সেখানে আছে ঋচা ও রুদ্রাক্ষ তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। ঋচা ও রুদ্রাক্ষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। তাই আমি ঋচাকে রম্যবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই না। শীঘ্রই তারা বিবাহ করবে। অনার্য গোষ্ঠীতে যুবক-যুবতীরা স্ব-ইচ্ছায় পতি-পত্নী নির্বাচন করতে পারে। অবশ্য রম্যবনে আমার ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হবে। সেই দৃষ্টিতে আচার্যর আশ্রম আমার পক্ষে ভালো, কিন্তু তাবলে কি আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে এই আশ্রমে থেকে যাব। উপরন্তু ইন্দ্রদেবের কাছে পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার ইচ্ছা করব কেন?

আমার পরীক্ষা নেবেন স্বয়ং ইন্দ্রদেব। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে আসবেন। আমার শিক্ষার ফলাফল তিনি নির্ণয় করবেন। সোমরস এবং সোমরস মিশ্রিত বিভিন্ন পানীয় প্রস্তুত করায় আমি কতটা দক্ষ হয়েছি, সেই বিচার ইন্দ্রদেব ব্যতীত আর কেউই করতে পারবে না। সোমরস প্রস্তুতিতে যদি আমি ইন্দ্রদেবক সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে আমি খুশী করতে পারব বলে প্রথা আমার কানে কানে বলে। পাকশাস্ত্র তথা সোমরস প্রস্তুতিও নারীশিক্ষার এক অঙ্গ।

তুমি যতই বিদুষী হও, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকা কিংবা সাম্রাজ্ঞীও যদি হও, পাকশাস্ত্র ও গো-দহনে তোমাকে দক্ষতা অর্জন করতেই হবে, নচেৎ তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তাই আমি নিষ্ঠা সহকারে ইন্দ্রদেবের জন্য সোমরস প্রস্তুতে ব্রতী হলাম। সোম সুমতির উৎস। শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমস্ত আবেগ দিয়ে আমি প্রস্তুত করেছিলাম সোমরস এবং সোমরস মিশ্রিত নানাবিধ পানীয়। সোমপান করলে অপূর্ব উল্লাস জাগে এবং ভাবনা হয় উধাও। এক অনির্বচনীয় প্রেরণায় প্রেরিত করে সোমাধারা। তাই ঋষিগণ সোমরস পান করতেন। সোমরস ছিল আর্যদের নিত্য পানীয়। ইন্দ্রদেব সোমরসের প্রধান উপাসক। তাই সোমরস প্রস্তুতিব শ্রেষ্ঠ বিচারক ইন্দ্রদেব ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারতেন না।

মোহময়ী সোমলতা হিমবন্ত পর্বতমালার স্নিগ্ধ শীতল মৌজবন্ত পর্বতে সুলভ ছিল। হিমবন্ত পর্বতের নিম্নদেশে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আধাত্মিক রসে পুষ্ট সোমলতা ঘন সবুজ হয়ে পল্লবিত হয়েছিল। আর্যরা সোমলতার আবিষ্কর্তা নয়, ইহা অবিষ্কার করে গরুড় উপাসক কৈকত নামক এক পার্বত্য জাতি; যাদের আর্যরা 'দাস' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর্যগণ দাস-সম্প্রদায়ের কাছেই সোমলতার সন্ধান পান অথচ সোমপানে দাসদের ছাড়িয়ে যান। বলতে গেলে দাসবর্ণের 'সোমপান' প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে প্রচুর সোমলতা পাওয়া যেত, কিন্তু আর্যগণ সোমরসকে নিত্য পানীয় হিসাবে ব্যবহার করার ফলে সোমলতা ধীরে ধীরে দুর্লভ হয়ে পড়ে। দাসদের কাছে সোমপানীয় প্রস্তুত প্রণালী জানার পর প্রচুর পরিমাণে সোমপান করার জন্য আশ্রম নিকটস্থ বন, উপবন, লতাকুঞ্জে আর সোমলতা পাওয়া যেত না। সুদূর পর্বত শিখর থেকে উপত্যকার ভিতরে স্বপ্নিল সোহাগে উজ্জ্বল সোমলতার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হওয়ার দৃশ্য ছিল অতি মনোরম। কিন্তু হাত বাড়ালে সে লতায় হাত পৌঁছায় না। শ্রম ও নিষ্ঠা ব্যতীত সোমলতাকে স্পর্শ করাও সম্ভব ছিল না।

সোমযজ্ঞের জন্য কখনও সোমলতার শাখাটিও পাওয়া যায় না। এই সুযোগে কিছু সংখ্যক 'দাস' ব্যবসায়ী সোমরসকে মদিরায় পরিণত করে আর্যদের বিক্রয় করতে শুরু করেছে। আর্যরা সোমরসে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে দাসদের কাছে সোমরস ক্রয় করছেন। আসক্তিই অপার্থিবকে পার্থিব পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে। সোমরসকে পণ্যে পরিণত করার জন্য দায়ি কে? দাস-ব্যবসায়ী না সোমাসক্ত আর্যগণ। গ্রাহক না থাকলে বণিক বা বাণিজ্য কি থাকতে পারে?

সোমলতা অন্বেষণে আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পর্বত উপত্যকায় ঘুরে বেড়াই।

তখন আমার ঋষিকা অপালার কথা মনে পড়ে। সোমরসে অপালা সন্তুষ্ট করেছিলেন ইন্দ্রদেবকে। ইন্দ্রদেব তাকে চিরযৌবনবতী ও সৌভাগ্যবতী হওয়ার বরদান করেছিলেন। ইন্দ্রদেবের আশীর্বাদে অপালার ধবল কুষ্ঠরোগ অপসৃত হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য সোমপানের সাথে সাথে ইন্দ্রদেব অপালার অধর পান ও করেছিলেন বলে ইন্দ্রদেবের নামে অপপ্রচার হয়। কতটা সত্যি কথা মিথ্যা তা একমাত্র অপালাই বলতে পারেন। তাই এই ধরনের অপপ্রচারকে আমি সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। তবুও সোমরস প্রস্তুত করার সময় মনের মধ্যে এক অবদমিত রোমাঞ্চ জাগে। সোমরস পান করে যদি ইন্দ্রদেব অপূর্ব মাদকাতায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন, তবে সেটাই আমার কৃতকার্যতা প্রমাণ করবে।

কিন্তু সেই উল্লাসে আমার প্রতি যদি ইন্দ্রদেবের অনুচিত আবেগের প্রকাশ পায়..... যে রকম করেছিলেন ঋষিকা অপালার সাথে.....।

পরমুহূর্তেই আমি নিজের অবিশ্বাসী মনকে শাসন করি। অপালার কাছে সত্যি মিথ্য জানার পরই ইন্দ্রদেব সম্পর্কে সিদ্ধান্তর সীমারেখা টানা যেতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রদেব সম্পর্কে চিন্তা করলে মনের মধ্যে এই চাঞ্চল্য ও গোপন শিহরণ কেন? সম্ভবত ইন্দ্রদেব হলেন ত্রিলোক নায়ক। তাই বহু কুমারী কন্যার কল্পিত পুরুষ ইন্দ্রদেবের রূপেই আবির্ভূত হন। আজ আমি যে চাঞ্চল্য অনুভব করছি, তা ইন্দ্রদেবের জন্য নয়, আমার কুমারী মনের স্বপ্নে উদ্ভাসিত ভাবী স্বামীর জন্য। আমার ভাবী স্বামী রূপ, ঐশ্বর্য, বীরত্ব ও দানশীলতায় ইন্দ্রসম হবেন এটাই সম্ভবত আমার অবচেতন মনের কামনা। কিন্তু ইন্দ্রদেব আচার্য গৌতমের মতো জ্ঞানী এবং দার্শনিক নয়। আমার ভাবী স্বামীর আচার্যর মতো বেদজ্ঞ তথা দার্শনিক হওয়াও আমার কাম্য। ইন্দ্রদেব এবং গৌতমের সমস্ত সারগর্ভতা নিয়ে যদি কেউ ত্রিভুবনে জন্ম নিয়ে থাকেন, সম্ভবত তাঁকেই পিতা আমার জন্য উপযুক্ত হিসাবে নির্বাচন করবেন। কিন্তু এইরকম সর্বাঙ্গ সুন্দর সর্বগুণ সম্পন্ন পুরুষ কি কেউ আছেন, যিনি অহল্যাকে সর্বান্তকরণে সুখী করতে পারবেন? সত্যি কি কেউ সর্বান্তকরণে সুখী হয়। যদি হয়, তাহলে তা পার্থিব নয়। পার্থিব সুখ তো সর্বদা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণতাই পার্থিব জীবনের প্রকৃত সংজ্ঞা। অবশ্য ইন্দ্রদেব সকলের অভীষ্ট সাধন করেন, কিন্তু মানুষের মন এমনই যে একটা অভীষ্টপূরণ হলে আর একটি অভীষ্ট পূরণের কামনা জাগ্রত হয়। ইচ্ছা নানারকম। বিষয় ইচ্ছা, ভাব ইচ্ছা, ত্যাগ ইচ্ছা, ভক্তি ইচ্ছা এইরকম কত ইচ্ছা যে মানুষের মনে নিরন্তর উৎপন্ন হয়, তা নির্ণয় করা কষ্ট। একবার আচার্যকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম—"ইচ্ছার কারণ কি?" আচার্য উত্তর দিলেন— "বস্তুর আকর্ষণ এবং অভাববোধ। ইহাই সকল প্রকার ইচ্ছার কারণ। অপূর্ণতা এবং আকর্ষণ না থাকলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না। মানব শরীরে অপূর্ণতা তথা আকর্ষণ আছে, তার সাথে আছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। এরা সবাই ইচ্ছার অধীন।"

—"এই ইচ্ছার কি বিলোপ সম্ভব?"

—"সম্ভব—আবার অসম্ভব। মোক্ষতেই ইচ্ছার বিলোপ, আবার মোক্ষের ইচ্ছাও মানুষের অধীন। তবে অসৎ-ইচ্ছা এবং সৎ-ইচ্ছার মধ্যে যদিচ্ছার অধীন হওয়া শ্রেয়।"

দার্শনিকেরা কখনও স্পষ্ট নয়। সংঘাত-ই দর্শনের মূলকথা। তবে যাই হোক, গুরুর কথায় এটুকু বুঝলাম যে, সদিচ্ছা উৎপন্ন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আজ সমাবর্তন উৎসবের অব্যবহিত পূর্বে আমি সদিচ্ছা ও সুমতির মিশ্রণে ইন্দ্রদেবের জন্য নানা প্রকার সুমিষ্ট মনোহরা সোমপানীয় প্রস্তুত করে পরীক্ষার ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করছি। নির্ধারিত সময়ে সমাবর্তন উৎসব আরম্ভ হল।

গুরুকুলের অধ্যক্ষ হিসাবে আচার্য গৌতম মুখ্য অতিথি ইন্দ্রদেবকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর স্তুতিগান করলেন। ইন্দ্রদেব নাকি অত্যন্ত স্তুতিপ্রিয়। যেহেতু আচার্য গৌতম ইন্দ্রদেবের সহপাঠী ছিলেন তাই তিনি সে বিষয়ে অবগত। অবশ্য স্তুতি করা তাঁর নীতি না হলেও সভাকার্যের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের অন্তর্গত হওয়ায় ইন্দ্রদেবের স্তুতিগানে চতুর্দিক মুখরিত করে আচার্য বলেন—"হে মহান পরমেশ্বর মঘবান, শচীনাংপতিঃ, পুরুবসুঃ, প্রচেতন, বাজানাংপতিঃ, মহিষ্টবঃ, বজ্রিন, শবিষ্ঠঃ, শকঃ বজ্রিবঃ, চিকিত্বঃ, জেতা, অপরাজিতঃ, পূর্বঃ আদ্রিবঃ, অংশু, পূতিঃ, বশা, প্রভুঃ, বৃত্রহা, সুশেবাঃ, অহ্বয়ুব, অগ্নি, পূষা, ইন্দ্র! সৎপথে সৃষ্ট বিঘ্নসমূহের তুমি সূক্ষ্ম বিনাশক। হে ঐশ্বর্যশালী প্রভো! ধন বিতরণ করা তোমার স্বভাব। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী শিষ্য-শিষ্যাদের সেই ধন দাও যা তাদের ধনাভিমুখী না করে জ্ঞানাভিমুখী করবে। যা তাদের মানবতাকে পালন ও পরিপুষ্ঠ করবে। লোভ, মোহ কাম ইত্যাদি শত্রুগুলিকে উৎসাহিত করে এমন আকর্ষণীয় মোহ উদ্রেককারী সম্পত্তিতে তাদের প্রয়োজন নেই। হে ইন্দ্র! শিক্ষার উদ্দেশ্য, তিন প্রকার অজ্ঞানতাকে দূর করা আত্মবিষয়ক অজ্ঞানতা, সৃষ্টির স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং নিজের সাথে সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা নিয়ে শিষ্যগণ গুরুকুলে এসেছিল। বিদ্যামাতার গর্ভে তিনরাত্রি যাপন করে শিষ্যগণ দ্বিজ হয়ে নব-জন্মলাভ করেছে। আচার্যর কর্তব্য হল শিষ্যকে দ্বিজে পরিণত করে অজ্ঞানান্ধকার থেকে জ্ঞানালোকময় ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করান। আমার শিষ্যদের প্রতি আমি সেই কর্তব্য পালন করেছি। ভোগের প্রলোভন থেকে মুক্ত করে আমি তাদের ভিতরে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছি। আমার বিশ্বাস, ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণ সাংসারিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেছে। জীবনে প্রলোভনকে প্রতিরোধ করার শক্তি তারা অর্জন করেছে। বর্তমান তারা তোমার আশীর্বাদ লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাদের পরীক্ষা করেছি। তবুও তুমি-ই শ্রেষ্ঠ বিচারক। তোমার উপদেশ ব্যতীত তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। হে পুরুষোত্তম ইন্দ্র! সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপন করার জন্য আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

ইতিমধ্যে সভাস্থল লোকারণ্য। কৃতবিদ্য তেজস্বী ব্রহ্মচারীদের দর্শনের জন্য দূরদূরান্ত থেকে আসা জনতা উষাকাল থেকে অপেক্ষা করছেন। পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অধিকসংখ্যক জনতার-সমাগম হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত আমি। অনিন্দ্য সুন্দরী অহল্যাকে দর্শন করার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বহু পথশ্রম করে আসার কথা আশ্রমে আলোচিত হচ্ছে। এজন্য আমি ভীষণ আনন্দ অনুভব করছি।

আনন্দময়, ঐশ্বর্যবান, প্রাণবন্ত পুরুষ নয়নাভিরাম ইন্দ্রদেব বিন্দুমাত্র অহংকার প্রদর্শন না করে মনোময় বাণীতে সংযত শব্দসম্ভারে, চিত্তমুগ্ধকারী গুরুগম্ভীর স্বরে দীক্ষান্ত ভাষণ শুরু করেন—"হে আমার পূজ্য অধ্যক্ষ, আমার অন্তরঙ্গ সতীর্থ আচার্য এবং ব্রহ্মচারীগণ!

একাকী ভোগকারী ব্যক্তি পাপ-ই ভোগ করে কিন্তু এ কথা সে জানতে পারে না। বোধ এবং অনুভব জ্ঞানের দুটি প্রশাখা জ্ঞান এবং অনুভবে পুষ্ট শাখা-প্রশাখায় কোরকিত হয় চেতনা। দিব্যতার স্পর্শে চেতনা হয় সুরভিত। ইহাই মানুষকে ক্রিয়াশীল করে ভ্রমকেও কেউ কেউ জ্ঞান ভেবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকেন কিন্তু ভ্রমে চেতনা থাকে না। এই ভ্রম-ই অজ্ঞানতা। তাই অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে ক্রিয়াশীল হলে ইষ্টর পরিবর্তে অনিষ্ট হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ভ্রম ও অজ্ঞানতা সমূহ অনিষ্টের কারণ। স্বার্থও মহৎ হতে পারে। যখন সমূহ স্বার্থ তোমার ক্রিয়াশীলতাকে প্রেরিত করে তখন স্বার্থ হয় মহার্ঘ। সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু একেকটি যজ্ঞ সামগ্রী। বস্তুমাত্রেই জগৎ কল্যাণের জন্য সৃষ্ট। তাই এগুলিকে জগৎ কল্যাণের জন্য ব্যয়িত করা জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। হলাহলও ধন্বন্তরীর সমূহ কল্যাণের সদিচ্ছায় সঞ্জীবনীতে পরিণত হতে পাবে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের নিজের পিতৃভাষা, পিতৃ-সংস্কৃতি এবং পিতৃভূমির উন্নতির জন্য অনুকূল আচরণ করা বিধেয়। মানবাত্মাব তেজ সূর্যাদি দিব্য পদার্থের চেয়ে অধিক দীপ্তিময়। তাই পরস্পর প্রীতি ও হৃদয় বিনিময়ের মাধ্যমে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই হল জীবনের প্রকৃষ্ট লক্ষ্য। তুচ্ছ সংকীর্ণতায় লিপ্ত থাকা অনার্যের লক্ষণ। ইহার দ্বারা সমাজের সংকল্প ও শক্তি হ্রাস হয়। প্রত্যেক নাগরিক সমাজের শৃঙ্খলা পালন করলে সমাজ হয় গতিশীল ও সমৃদ্ধ। ঠিক সেইভাবে রাষ্ট্রনেতার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উপদ্রবীদের দমন করে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। যজ্ঞের অর্থ মহৎ কর্ম। যজ্ঞ বা সমাজ সেবায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী ব্যক্তিই রাক্ষস। অতএব হে ব্রহ্মাচরীগণ! তোমরা মানুষ হও। তোমরা ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বিদ্যাধ্যয়ন, সত্যাচরণ, বীর্যবিগ্রহাদি শিক্ষা সমাপ্ত করছে। এখন সমুদ্রসমান গম্ভীর, বেদগর্ভ, জ্ঞানদীপ্ত, তেজস্বী, ওজস্বী হয়ে গুরুকুল থেকে সমাবর্তন কর। তোমরাই রাষ্ট্রের প্রকৃত সম্পদ। হে মনুষ্যগণ! গুরুগৃহে তোমরা আত্মীয়রূপে স্নেহপাশে বাঁধা হয়ে বহুদিন অতিবাহিত করেছ। এখান থেকে স্বগৃহে গমন করলেও চক্রের ব্যাসার্ধ কেন্দ্রস্থ নাভিতে যুক্ত থেকে গতিশীল হওয়ার মতো তোমাদের সমস্ত কার্যকারিণী শক্তিসমূহ কল্যাণরূপ নাভিতে সংযুক্ত থেকে ভিন্ন-ভিন্ন কাজে গতিশীল হোক। পুত্র হিসাবে পিতামাতার আজ্ঞাকারী হও, পতি হিসাবে পত্নীর প্রতি প্রেমময়, মার্জিত রুচি ও মধুরবাণী যুক্ত হও। বন্ধু হিসাবে ঈর্ষা ও দ্বেষরহিত হও। অহিংস ও দেশপ্রেমী নাগরিক হও। সংসারের সমস্ত প্রাণীকে মিত্রচক্ষুতে দেখ। তোমরা কর্ণের দ্বারা শুভ শোন, চক্ষু দ্বারা কল্যাণ দেখ, হস্তপদ দ্বারা শুভকর্ম কর। ইন্দ্রিয়গুলিকে ভাব ইচ্ছায় পরিচালিত করে যতদিন জীবিত থাকবে, সকলের হিতকারী হও।

ইন্দ্রদেবের সারগর্ভ দীক্ষান্ত ভাষণ সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। ইন্দ্রদেবের বাণী যদি

এত মধুর ও জ্ঞানগর্ভ তাহলে কার্য কখনও অশুভ এবং অমানবিক হবে না, অথচ তার সম্পর্কে এরূপ বিরোধাভাষ কেন? ঈর্ষা।

এইবার ইন্দ্রদেব আমার ওপর মধুময় দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। এই সমাবর্তন উৎসবে আমি একমাত্র ব্রহ্মচারিণী। আমি নির্মল চিত্তে অপলক নেত্রে ইন্দ্রদেবের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে ইন্দ্রদেব বললেন—"হে ভদ্রা, সুরূপা, সুচরিতা, বধূযোগ্যা অহল্যা! কঠোর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। তুমি রাষ্ট্রের ধ্বজাসদৃশ। তুমি পরিবারের মস্তকতুল্য। তুমি সত্যচারিণী হও। তোমার সমগ্র পরিবেষ্টনী, মধুময় হোক। জীব সৃষ্টিতে বিশ্বনিয়ন্তা তোমাকে অপূর্ণ দেহসৌন্দর্য প্রদান করেছেন। দেহের মধ্যে তুমি সহৃদয়তাকে স্থাপন কর, হৃদয়ে স্থাপন কর মৈত্রী ও প্রেম। উপযুক্ত গুরুর সংস্পর্শে এসে তুমি জ্ঞানবতী হয়েছ। জ্ঞান ও সহৃদয়তাকে একত্রিত করে তুমি বিশ্ব কল্যাণকারিণী হও। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্যরূপ পাশবিক মনোবেগগুলিকে নাশ করে দিব্য নারী হও। ঐশ্বর্যশালী, ন্যায়পরায়ণ, দানশীল অভীষ্টপূরণকারী, সন্তানোৎপাদক বিবেকবান পুরুষের কাছে নিজেকে অর্পণ করো। যৌবন, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুকে ও তাঁরই সাথে ভোগ করো। তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁকেও তোমার প্রতি বিশ্বস্ত করাও।

হে নারী! গৃহযজ্ঞে তুমি ব্রহ্মাসদৃশ। সমস্ত প্রজা তোমার সন্তান। পৃথিবীমাতার সমান্য বিচলনে যেমন ভূকম্পের ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়, তোমার চরিত্রের অনুমাত্র স্খলনে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সেইরকম দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

হে বধূযোগ্যা অহল্যা, হে স্বর্গযোগ্যা ইন্দ্রাণী! ইন্দ্র বা শাসক যেমন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেইরকম তুমিও পরিবার এবং পরিবাররূপ রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে বীরাঙ্গনা হও। হে সাধ্বী! নিজের আত্মশক্তির বলে তুমি ধর্ষণও প্রতিহত করতে পূর্ণ সমর্থ। তোমার সৎসাহস এবং মনোবলের কাছে অসদাচারী পুরুষের মাথা নত হোক্। কামের বশবর্তী হয়ে যে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, সে অভিশপ্ত হোক্।

হে ঋতা! তুমি ঋতমার্গ উলঙ্ঘন করো না। ধর্মনিষ্ঠ, তর্কনিষ্ঠ, জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক গৌতমের কাছে তুমি বাল্যকাল থেকে শিক্ষালাভ করেছ। তুমি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না। তুমি চন্দ্রমাসদৃশ। তোমার হৃদয় কলসে তোমার দেহের সৌন্দর্য প্রসারিত হোক্। আধ্যাত্মিক সোমরসে তোমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হোক্। তোমার দিব্যরূপে তোমার দর্শকদের মন থেকে পাপ-চিন্তা দূর কর। সৌন্দর্য সবাইকে আকর্ষণ করে। তাই তুমি সকলকে আকর্ষণ করে নিজের মহৎ গুণ দ্বারা ধন্য কর।

হে জননী যোগ্যা! তুমি সামাজিক বিকাশের ভিত্তিভূমি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তপস্যা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করুক। উপযুক্ত পুরুষকে স্বামী হিসাবে বরণ করার অধিকার তোমার আছে। বিবাহের পূর্বে ভাবীস্বামীর রূপ, গুণ, চরিত্র ব্যক্তিত্ব, জীবনাদর্শ ইত্যাদি বিচার করে সম্মতি প্রদান কর। অবশেষে হে হব্যা! "মানুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্" তুমি মানুষ হও এবং দৈবীসন্তান উৎপন্ন করো।" আমার উদ্দেশ্যে দেওয়া ইন্দ্রদেবের ভাষণ এত অন্তরঙ্গ ছিল

যে তাহা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন অনুরণিত হয়। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রথা বলে—"রাজা, রাষ্ট্রনায়ক এবং রাজনীতিকদের বক্তব্য এবং কার্য-কলাপের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে ইন্দ্রদেবের আজকের ভাষণে সেইরকম পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে। তিনি আজ যে নীতিবাণী আমাদের অহল্যাকে শোনালেন, দীক্ষান্ত ভাষণ হিসাবে তা উৎকৃষ্ট কিন্তু বক্তার অতীত ইতিহাস স্মরণ করলে ইহা অত্যন্ত হাস্যস্পদ।

ত্বয়ি বলে—"ইন্দ্রদেব যে আমাদের অহল্যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং আকর্ষিত সেটা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট। নিজের মনের অদম্য কামনাকে গোপন রাখার জন্য ঐরকম নীতিবাক্য শুনিয়েছেন। নেতাগণ সর্বদাই অনৈতিক ভাবনায় পরিচালিত; অথচ বলার সময়ে বিপরীত কথা বলেন। ইন্দ্রদেব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। প্রকারান্তরে সর্বসমক্ষে তিনি বলেই দিলেন যে অহল্যা স্বর্গযোগ্যা ইন্দ্রাণী। সেইজন্য ঐশ্বর্যশালী অভীষ্টপূরণকারী, দানশীল পতি বরণ করার জন্য অহল্যাকে পরামর্শ দিয়েছেন। ইন্দ্রদেব অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী এবং দানশীল সংসারে আর কে আছে?"

আমার দিকে কুটীল কটাক্ষ হেনে বার্ত্তা বলে—"অহল্যা প্রসঙ্গে ধর্ষণের অবতারণা অত্যন্ত অশোভনীয়। এতবড় সভায় এই ধরণের কথা বলা ইন্দ্রদেবের উচিত হয়নি। ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যাকে বলাৎকারের দুঃসাহস যদি কোনও কামুক পুরুষের থাকে তিনি ইন্দ্রদেব ব্যতীত অন্য কেউ নয়। আমার মন বলছে—ইন্দ্রদেবের উক্তি তাঁর নিজের জন্যই প্রযোজ্য। অহল্যার জন্য তিনি অভিশপ্ত হবেন কি?"

এই ধরনের আলোচনা আমার একদম ভালো লাগছিল না। ইন্দ্রদেবের বক্তব্যে আমি সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়েছিলাম, বিরক্ত হয়ে আমি বললাম—"ভালো কথার খারাপ মানে করাও পাপ।"

দীক্ষান্তে ভাষণের বক্তব্য এছাড়া আর কি হত? যে কেউ অতিথি হয়ে এলেই দীক্ষান্ত ভাষণে এই ধরা-বাঁধা বক্তব্য রাখেন। ধর্ষণ কথাটি সম্ভবত ইন্দ্রদেব 'দাস'দের সম্পর্কে বলেছেন। ইহা ইন্দ্রদেবের দাস বিরোধী মনের জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া ইন্দ্রদেবের চরিত্র যদি দোষদুষ্ট তাহলে আচার্য কেন তাঁকে এই উৎসবে অতিথি হিসাবে আহ্বান করেছিলেন?

আমার কথা সমর্থন করে নীতি বলে—"ঠিক সেই কথাই আমি বলতে চাই। ইন্দ্রদেবের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমি এটুকু বুঝেছি যে নিজের পরমাসুন্দরী পত্নীদের দ্বারা সোমযজ্ঞ করে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করে খুশি করা হয়। ধন, ঐশ্বর্য জল অন্ন দান করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ইন্দ্রদেব দানশীল না চাইলেও তিনি দান করেন, প্রার্থনা পূরণ করেন। তারপর ইন্দ্রদেবের নিন্দা করা হয় এবং সেই নারীগণ হয় কলঙ্কিত। নিজের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণ করার জন্য নারী আসক্ত পুরুষের কাছে নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়োজিত করা কি মুনি ঋষি ও রাজার নিন্দিত কাজ নয়? কি জানি কেন আমার মনে একটা আশঙ্কা জাগছে—ভবিষ্যতে যিনি আমাদের অহল্যার পাণিগ্রহণ করবেন, তাঁর ক্ষেত্রে ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করার জন্য অহল্যাকে নিয়োজিত করা অসম্ভব নয়।"

আমার ভিতরে বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছে। নারী কি মনোরঞ্জনের বস্তু? আমি অন্তত এই ধরণের কাজে আমার স্বামীর আজ্ঞাবহ হতে পারব না। আমার নিজেরও মতামত আছে। আমার বিবেক আমাকে যা নির্দেশ দেবে আমি তাই করব—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু কে জানত যে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য, আমার অজান্তে আমার নিয়তিও প্রতিজ্ঞা করেছিল।

সবশেষে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করে ইন্দ্রদেব প্রত্যেককে মহার্ঘ উপহার দেন। ইন্দ্রদেব হাত বাড়ালেই ঐশ্বর্য স্তূপাকার হয়ে যায়, এতে কেউই আশ্চর্য হয় না। প্রতিবার তাহাই ঘটে। নব নব ঐশ্বর্যে আশ্রম সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু এবছর উৎকণ্ঠা ছিল আমাকে ঘিরে। আমাকে কি ঐশ্বর্যে বিমণ্ডিত করবেন। আমার মনেও উৎকণ্ঠা কম ছিল না। কিন্তু গুরুকুল আশ্রমে শিক্ষালাভের পর পার্থিব বস্তুর প্রতি আমার আর আগের মতো আকর্ষণ ছিল না। আগের সময় হলে আমি হয়তো চাইতাম পুষ্পক বিমান—নয়ত মণিমাণিক্য। কিন্তু আজ এই সাত্ত্বিক পরিবেশে এক বিচিত্র নির্লিপ্ততায় আমি মগ্ন হয়েছিলাম।

এমন সময়ে ইন্দ্রদেব আমাকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেন—"কেবলমাত্র সৌন্দর্যে নয়, সোমরস প্রস্তুতিতেও অহল্যা অনন্যা। অন্ন যেমন দেহে মিশে দেহ হয়ে যায়, সেইরকম অহল্যার প্রস্তুত সোমরস অন্তরে মিশে অন্তরাত্মা হয়ে যায়। বুদ্ধি অপহরণকারী সুরা হল রাক্ষসরস। কিন্তু অহল্যা পরিবেশিত সোমরস হল সাত্ত্বিক রস—আধ্যাত্মিক রস। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এই মোহময়ী পানীয় অহল্যার স্পর্শে অলৌকিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেই মোহময় সোম সরোবরে অবগাহন করে আমি আমার অন্তর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ সোমরস আনন্দ উদ্রেক করে, কিন্তু অহল্যার দ্বারা প্রস্তুত সোমরস পরোপকার ও পুণ্যভাব জাগ্রত করেছে। এই সোমরস পান করে আজ আমার চেতনা জনহিতকর কর্মে নিয়োজিত হওয়ার প্রেরণা পেয়েছে। অহিংসাই প্রগতি এবং উন্নতির পথ। দুষ্টদমনের জন্য সোমরস পান করে বহুবার আমি হিংসাচরণ করেছি। কিন্তু অহল্যার হাতের স্পর্শে সোমরস এমন পবিত্র এবং স্নিগ্ধ হয়ে গেছে যে আমি অহিংসকে পরিণত হয়েছি। দেবতারাও মানুষ। মাঝে মাঝে দেবতাদের মনেও পাপের পদধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু আজ অহল্যার হস্তনিঃসৃত সোমধারা পান করে আমার অন্তঃকরণে পুণ্যের পদধ্বনি ঝঙ্কৃত হচ্ছে। এতে বিন্দুমাত্র কপটতা নেই। সোম সম্পাদিকা হে কল্যাণী অহল্যা! এই সাত্ত্বিক সোমরস পান করে অন্ন, ধন, যশ, দান করার জন্য আমার অন্তরাত্মা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তুমি সাধারণ নারী নও, তুমি অদিতি, অখণ্ডনীয়া দাব্য পৃথিবীমাতা কল্যাণী অহল্যা! ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠোর পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি অত্যন্ত প্রীত। তুমি যে বর চাইবে অকাতরে তা দান করার জন্য আমি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছি। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।"

ইন্দ্রদেবের এই উদাত্ত ঘোষণায় জগৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি নির্বাক, আমার চেতনা লুপ্ত প্রায়। আমি চাইলে ইন্দ্রদেব সেই মুহূর্তে স্বর্গলোক সমেত ত্রিভুবন আমাকে দান করতেন।

আমার দাসানুদাস হয়ে থাকতেন। ইন্দ্রপদ না দিতে পারলেও শচী-পদ অবশ্যই দিতেন, কিন্তু আমি কিছুই চাইতে পারলাম না।

ইন্দ্রদেব আমাকে ভীষণ সমস্যায় ফেললেন। ব্রহ্মচারীদের যেমন উপহার প্রদান করলেন সেইরকম আমাকেও না হয় দুর্লভ কিছু উপহার দিতেন, কিন্তু আমাকে পৃথিবীমাতা উপাধিতে ভূষিত করে বর চাইতে বলাটা ইন্দ্রদেবের উদারতা হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীমাতা কি কারও কাছে কিছু চায়? তিনি দাত্রী! অন্নদাত্রী, জীবনদাত্রী, আশ্রয়দাত্রী ধরিত্রী। ইন্দ্রদেবের ভাষণে আমি এমনই মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, আমার কোনও অভাববোধ নেই তাই কোনও ইচ্ছা বা আকাঙ্খার উদ্রেক হচ্ছে না। আকাঙ্খা না থাকলে কি চাইব? কিন্তু ইন্দ্রদেব বরদান না করে প্রত্যাবর্তন করবেন না। এতে তাঁর অহংকার ক্ষুণ্ণ হবে, সম্মান-হানি হবে। ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম হল ভিক্ষা। শিক্ষা এবং ভিক্ষা আন্তরিক হওয়া বিধেয়—ইহা শিক্ষার্থীর অহংকারকে নম্র করে। অহংকার পরিণত হয় আত্মসম্মানে। তাই ইন্দ্রদেবের কাছে বর চাইলে আমার অহংকার নম্র হবে। কিন্তু আমি কি চাইব? একবিন্দু জল চাইলে যিনি সমুদ্র দিয়ে দেবেন, এক কণা ধূলো চাইলে তিনি সমগ্র পৃথিবী দেবেন এবং একটি মুহূর্ত চাইলে তিনি তার সমগ্র আয়ু দান করবেন। এইরকম দানশীল অতিথির কাছে আমি কিছু চাইতেও পারছি না। কৃতজ্ঞতায় আমার ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সবাই উৎকণ্ঠার সাথে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। সভায় মৃদু গুঞ্জরণ—"এ পর্যন্ত ইন্দ্রদেব কাউকে এইরকম বর দেননি। ভবিষ্যতেও কাউকে দেবেন না। সম্ভবত অহল্যার সৌন্দর্য নারীবিলাসী পরম প্রেমিক ইন্দ্রদেবের ওপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে। কিন্তু অহল্যা কি চাইবে?

অসহায় আমি গুরু গৌতমের দিকে তাকিয়ে যেন আমি তাঁর কাছেই বর চাইছি—আমাকে সৎবুদ্ধি দিন। বরদান করা যেমন উদারতা, বর চাওয়া এক কমনীয় বিদ্যা।

তুমি কি উদ্দেশ্যে কাকে কি চাইছ তা তোমার অন্তঃকরণকে সর্বসমক্ষে উৎকীর্ণ করে দেয়। তোমার ক্ষুদ্রতা এবং মহনীয়তাকে প্রকট করে তোমার প্রার্থনা। যদিও আচার্যকে শান্ত দেখাচ্ছিল কিন্তু সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল না। তাই তাঁর দৃষ্টি আমার অন্তরকে সতর্ক করে দিয়ে যেন বলে—"অহল্যা! গুরু নির্দেশে বিদ্যার্থী ভিক্ষা করে, কিন্তু সে ভিক্ষুক নয়। বিনা পরিশ্রমে সে কোনও বস্তু চায় না। বিনা দানে সে প্রতিদান চায় না। তোমার প্রস্তুত করা সোমরসে যদি ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন—সেটা তোমার শিক্ষার এক অঙ্গ। এতে ইন্দ্রদেবের বিহ্বল দানশীলতার কোনও কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

আচার্যের দিকে তাকানো মাত্রেই আমি স্পষ্ট হয়ে গেলাম, স্থির নম্র কণ্ঠে বললাম—"হে পরমারাধ্য ইন্দ্রদেব! আপনার মতো দানশীল অভীষ্টপূরণকারীর কাছে কিছু চাইলে আপনার দানশীলতার অবমাননা হবে। আপনি ত্রৈলোক্য-পালক। তাই আমি আপনার কাছে কিছু চাইব না। আপনি সোমরস এবং অতিথেয়তায় প্রীত হয়েছেন। সেটাই আমার কাছে পরম করুণা ও বরদান স্বরূপ। আমি কৃতজ্ঞ।"

সভাস্থল আমার প্রশংসায় মুখরিত। আচার্য গৌতমের দৃষ্টিতে প্রশংসার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উচ্ছ্বসিত স্বরে ইন্দ্রদেব বলেন—"সাধু, সাধু। মহর্ষি গৌতম! ছাত্র হিসাবে তুমি ছিলে ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ ছাত্র। আজ গুরু হিসাবেও তুমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছ। ছাত্রের ব্যক্তিত্ব গুরুর মহিমাকে প্রকট করে। এই গুরুকুলের শিক্ষার মানদণ্ড কত উচ্চস্তরে তাহা অহল্যার বক্তব্যে প্রকটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারিণী অহল্যার এই মুহূর্তে অভাববোধ কোথায় থেকে আসবে যে সে বর চাইবে। সংসারে প্রবেশ না করলে কেউ অভাব অনুভব করে না। তাই হে সভাসদ্‌গণ! আপনারা জেনে রাখুন, আমি আমার বর প্রত্যাহার করছি না। গৌতম আশ্রমের সমস্ত ধূলিকণা, বায়ু, বনস্পতি, সাক্ষী রইল অহল্যা যেদিন যে মুহূর্তে আমাকে বর চাইবে, আমি তাকে সেই বরদান করে নিজেকে ধন্য মনে করব। কিন্তু দীক্ষান্ত উৎসবের উপহার স্বরূপ আমি অহল্যাকে আমার গলার রত্নহার দিয়ে তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।" এই কথা বলেই তিনি নিজের রত্মমালা আমাকে পরিয়ে দিলেন।

আমি বিস্ময়ে হতবাক্‌। প্রথা আমার কানের কাছে বলে—ব্রহ্মচারিণীর গলায় রত্নহার! উপরন্তু কুমারীর গলায় পুরুষের মাল্যর্পণ। ইন্দ্রদেবের এই কাজটি শোভনীয় হল না, আচার্য গৌতম সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু অহল্যার কি দোষ? ইন্দ্রদেবকে সাদর আমন্ত্রণ করে অহল্যার গলায় রত্নমালা দেওয়ালেন। অহল্যা কি করবে? আচার্য গৌতমের প্রথমে নিজের কাছে নিজে স্পষ্ট হওয়া উচিত। আচার্যের সাথে ইন্দ্রদেবের নীতিগত পার্থক্যের কথা জগৎ জানে। তা সত্ত্বেও তাঁকে আশ্রমে ডেকে পাদ্যর্ঘ দিয়ে পূজা করার পিছনে আচার্যের নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য আছে। তাই ইন্দ্রদেব যদি অহল্যাকে রত্নমালা পরান, সেটা তাঁকে উদারচিত্তে গ্রহণ করতে হবে" প্রথার কথা শুনে আমি আচার্যের দিকে তাকালাম, তাঁকে অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে। নম্রভাবে রত্নহারটি আচার্যের পদতলে রেখে আমি বললাম—"ইন্দ্রদেবের উপহার আমি আশ্রমকে দান করছি। এই অর্থে আশ্রমের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন হবে। তাহাই হবে ইন্দ্রদেবের দানের উচিত উপযোগ। এই আশ্রম আমার অত্যন্ত প্রিয়। আশ্রমবাসী মুনি, ঋষি, ঋষিকা, ঋষিপত্নী, ঋষি কুমার ও কুমারী এমনকি বৃক্ষলতা পশুপক্ষী এবং আশ্রম বহিঃস্থ দাস-জনতা সবাই আমার একান্ত আপন। আজ বিদায়লগ্নে তাদের উন্নতিকল্পে এই ইন্দ্রহার আমি গুরুকে অর্পণ করছি।" —এই কথা বলে আমি আচার্যের পদধুলি গ্রহণ করি, মনে হয় আচার্য কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হলেন। কিন্তু রত্নহারটি তিনি স্পর্শ করলেন না। নিষ্প্রাণ সাপের মত হারটি পড়ে রইল। ইন্দ্রদেব গম্ভীর হয়ে গেলেন, তিনি কি ক্ষুণ্ণ হলেন? এতে কি তাঁর অসম্মান হল ?

আমি এইরকম দ্বিধাগ্রস্তভাবে বসে থাকায় ইন্দ্রদেব সহজ সরল কণ্ঠে বললেন—"অহল্যা উপযুক্ত কাজ করেছে। আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী থাকা পর্যন্ত যা কিছু প্রাপ্ত হবে তা গুরুকে নিবেদন করা বিধেয়। গুরু অনুমতি দিলে সে তা পুনর্বার গ্রহণ করতে পারে, নচেৎ গুরুর ইচ্ছায় তার সদুপযোগ হয়ে থাকে।"

আমি বেঁচে গেলাম। ইন্দ্রদেবের উদার বিচারে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম। কিন্তু আচার্যের আচরণ শুধু আমার নয় সকলেরই পক্ষেই অস্বস্তিকর। তিনি রত্নমালাটির দিকে ফিরেও

তাকালেন না। প্রথা সেটা তুলে নিয়ে আশ্রমের উন্নতিকল্পে রক্ষিত নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে দেয়। আচার্য এজন্য ইন্দ্রদেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন না কিংবা আমাকে প্রশংসাসূচক একটি কথাও বললেন না তাই আমার আচরণ তিনি অনুমোদন করলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। এইরকম এক অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দিলেন ঋষিকা অপালা। ঠিক সেইসময় অপালা এবং তাঁর স্বামী কুশাশ্ব এসে উপস্থিত হলেন। দীক্ষান্ত উৎসবে সকল ঋষি ও ঋষিকাকে নিমন্ত্রণ করার পরম্পরা রয়েছে। তাই অপালা এবং কুশাশ্বকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁরা যে আসবেন সে কথা কেউ ভাবতে পারেনি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁরা কোথাও যান না। গত পাঁচ বছর তাঁরা এখানকার সমাবর্তন উৎসবেও আসেননি। আজ আসার উদ্দেশ্য কি? সবাই অপালাকে দেখে ইন্দ্রদেবের সাথে তাঁর অতীত সম্পর্কের কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমোদিত হচ্ছিলেন। এই অপালা ইন্দ্রদেবেকে সোমরস দানে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সোমরসের পরিবর্তে ইন্দ্রদেব নাকি অপালার অধর-মদিরা পান করে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং অপালাকে রোগমুক্ত করেছিলেন। ঋষি কুশাশ্ব অপালাকে গ্রহণ করলেও এই জনরবে বিশ্বাস করে অপালা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীর এই সন্দেহ প্রবণতা অপালার সমগ্র দাম্পত্যজীবনকে মেঘাচ্ছন্ন করে দেয়। আজ উত্তর যৌবনেও অপালা-ইন্দ্রদেবের সম্পর্ক সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত নয় ঋষি কুশাশ্ব। অথচ আজ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জরা-ব্যাধিকে তুচ্ছ করে ইন্দ্রদেবের সভায় এসেছেন কোন উদ্দেশ্যে?

শীর্ণকায়, শ্বেতবর্ণা, ললিতবদনা অপালা যে একদিন অত্যন্ত লাবন্যময়ী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁকে দেখামাত্রেই ইন্দ্রদেব আসনত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। অপালা এবং কুশাশ্বকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে প্রণাম করলেন। অপালা ইন্দ্রদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নির্মল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আমার অভীষ্ট পূরণ হওয়ার মতো মনে হল। হাতজোড় করে সবাইকে আশীর্বাদ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে কুশাশ্ব বললেন—"আমি জানি আমাদের উপস্থিতি আপনাদের সবাইকে চকিত করবে। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য এবং বয়সের জন্য আমরা দুজনই আশ্রমের বাইরে যেতে পারি না। এই বছর আচার্য গৌতম বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন আসার জন্য, সেজন্য তিনি রথ পাঠিয়েছেন এবং নারদকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের নিয়ে আসার জন্য। আচার্য গৌতম অপালাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর জীবনের অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীদের কিছু বলার জন্য। দ্বিতীয়ত অপালা শাপমুক্ত হয়ে পুনরায় গার্হস্থ জীবনে ফিরে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমি ইন্দ্রদেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিনি। এখানে আসার পূর্বে আমি অপালার কাছে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির প্রকৃত ঘটনা শুনেছি, এর পূর্বে নিজের মনের সংশয় হেতু অপালার আরোগ্যের পশ্চাতে নিহিত জনরবের সত্যাসত্য সম্পর্কে আমি অপালাকে সরাসরি কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করিনি, কিন্তু সমস্ত ঘটনা শোনার পর আমি ইন্দ্রদেবের সাথে সাক্ষাৎ না করে থাকতে পারলাম না। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এবং অপালা আচার্য গৌতমের কাছে কৃতজ্ঞ।"

এতক্ষণে সবাইয়ের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হল, বার্তা আমার কানের কাছে বলে—''আচার্য গৌতম কেবলমাত্র জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক নয়, তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপালাভ করার জন্য তাঁকে মুখ্য অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করেছেন উপরন্তু তাঁকে সর্বসমক্ষে নিন্দিত ও অপদস্থ করার জন্য রথ পাঠিয়ে অপালাকে এনেছেন। আচার্য গৌতম জানেন অপালা সত্যাবাদিনী। অতীতে ইন্দ্রদেব অপালার সাথে কি আচরণ করেছিলেন, তা তিনি নিজের স্বামীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। অপালার সত্যভাষণে ইন্দ্রদেব নিন্দিত এবং অপমানিত হবেন অথচ আচার্য গৌতম এজন্য দায়ি হবেন না। ইন্দ্রদেব এবং আচার্য গৌতমের মধ্যে থাকা বাল্যকালের ঈর্ষা যে এখনও অমলিন, ইহা তারই প্রমাণ। অতিথি ভগবান। অতিথি আমন্ত্রণ করে অপমানের আয়োজন করা অন্তত একজন আচার্যের পক্ষে শোভনীয় নয়। বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কাছে ইন্দ্রদেবের চরিত্রের কালিমা উপস্থাপন করাটাই সম্ভবত সমাবর্তন উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমারও সেইরকম মনে হয়, কারণ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য অপালা যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন আচার্য গৌতমের প্রশান্ত বদনে এক কুটীল সরসতা ঝলসে উঠেছিল। তীর্যক দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে তিনি ইন্দ্রদেবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে আচার্য ঋষি কুশাশ্ব এবং অপালাকে এই উৎসবে আমন্ত্রণ জানাতেন, তাহলে আমরা পূর্বেই অবগত হতাম। কিন্তু উৎসব উদ্‌যাপনের মুহূর্তে অপালাকে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য নিশ্চয় মহৎ নয়।

সবাই ভেবেছিলেন, অপালার সত্যভাষণের কথা শুনে ইন্দ্রদেব অপ্রতিভ হবেন, কিন্তু অপালাকে দেখে ইন্দ্রদেবের সৌম্য মুখমণ্ডল অলৌকিক প্রশান্তিতে অধিক সৌম্য দেখায়। তাহলে কি এই সভায় অপালা ইন্দ্রদেবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করতে পারবেন না।

ঋষিকা অপালা কিছু বলার পূর্বে আচার্য গৌতম উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে অপালার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন, শান্তকণ্ঠে তিনি বলেন—''শুধুমাত্র অহল্যার জন্য মহামান্যা ঋষিকাকে আজ এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে আসতে হয়েছে। আমার গুরুকুলে অহল্যা প্রথম ব্রহ্মচারিণী। যেহেতু আমি অবিবাহিত তাই কোনও ব্রহ্মচারিণীকে আমি শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করিনি, কারণ গুরুকুল আশ্রমে ব্রহ্মচারিণীদের দায়িত্ব মুখ্যত অধ্যক্ষের পত্নী-ই বহন করেন। কিন্তু আমার পরমগুরু ব্রহ্মার নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই ব্রহ্মাপুত্রীর শিক্ষার দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করি। এখানকার অন্যান্য আচার্যদের সাধ্বী পত্নীগণ এ বিষয়ে আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য করে আমার দায়িত্ব লাঘব করেছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সমাবর্তন উৎসবে একজন ঋষিকার বক্তব্য ব্যতীত অহল্যার শিক্ষা সমাপ্ত হবে না বলে আমার বিশ্বাস। তখন অত্রিকন্যা, কুশাশ্বপত্নী ঋষিকা অপালার কথা মনে পড়ে। অপালার সম্পর্কে লোকমুখে নানাকথা শোনা যায়। অপালার জীবন এক শিক্ষণীয় মহাকাব্য। তিনি তাঁর জীবনের কিয়দংশ এখানে উপস্থাপন করলে ব্রহ্মচারিণী অহল্যা উপকৃতা হবে। পুঁথিগত বিদ্যা এবং জীবনে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান

উভয়ের সমন্বয়ে জীবন সার্থক হয়। প্রথমত অপালা বেদমতী উপরন্তু জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে গতি করে অনুভূতি বিদগ্ধা। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী এই সমাবর্তন উৎসবকে চিরস্মরণীয় করবে।"

"আচার্য গৌতম যুক্তিবাদী দার্শনিক। তাই নিজ কার্যের যথার্থতা প্রতিপাদনে সিদ্ধহস্ত" —মৃদুস্বরে বলে নীতি। আচার্যের কথা বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী। এই অবসরে অপালা নিজের সম্বন্ধে লোকের মনের সংশয় দূর করার সুযোগও পাবেন। ইন্দ্রদেবের চরিত্র সকলেরই জানা। অপালার সাথে যা কিছু ঘটেছে, তাতে অপালার যে কোনও দোষ নেই, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। একজন সাধ্বী রমণীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ইন্দ্রদেব যদি তাঁর নারীত্বের অবমাননা করেন, সেজন্য অপালা নিন্দিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সচাচর তা হয় না। যে নারী বলাৎকারের শিকার হয়, পতিতা আখ্যা দিয়ে সমাজ তাকে পরিত্যাগ করে। সেইদিক থেকে অবশ্য অপালার স্বামী কুশাশ্ম আদর্শ পুরুষ, তিঁনি অপালাকে পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি—অপালার স্বামী বহুদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে শারীরিক সম্পর্ক রাখেননি। কারণ তাঁর বিশ্বাস সোমরস পান করার অবসরে ইন্দ্রদেব অপালার অধরপান করায় তাঁর শরীরের শুচিতা নষ্ট হয়েছে। পরে অপালা তপস্যার মাধ্যমে নিজের চরিত্রের শুচিতা প্রমাণ করেছেন।

অপালার সত্যভাষণ আমি গভীর শ্রদ্ধা-সহকারে শুনতে থাকি।

কারও উপলব্ধিকে সে নিজে ছাড়া অন্য কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, অন্যেরা শুধু প্রশ্ন করতে পারে। তা সত্ত্বেও জীবনে বহুবার অপরের কাছে সত্যপাঠ করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনগাথার এটি হল প্রথম সত্যপাঠ। ইতিপূর্বে সবাই অপালার আখ্যানকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে উপলব্ধি করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে। আমি কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিইনি এমনকি আমার স্বামী, শ্বশুর, পিতা-মাতা কারও কাছে আমার উপলব্ধি ব্যক্ত করিনি। অসংখ্য উপলব্ধির সম্পূর্ণ বর্ণনা কেউ কি দিতে পারে! বহুকথা না বলা থেকে যায়। তবুও জীবনে শব্দের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শব্দের অপব্যাবহারকে আমি পাপ মনে করি। মৌনতা বোধহয় 'ভাব' অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ এবং নিরাপদ ভাষা। এর ফলে শব্দ অপব্যাবহারজনিত পাপে জড়িত হতে হয় না। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম ওঁকার-এর পর কেউ কি মৌন থাকতে পেরেছে। এমনকি মনও কখনও মৌন নয়।

আজ আমি বহুদিনের মৌনতা ভঙ্গ করছি শুধুমাত্র অহল্যার জন্য। অহল্যা গৌতম আশ্রমকে ধন্য করেছে। অপালার আত্মকথা শুনে যদি সে পৃথিবীতে পরিণত হয়, তাহলে আকাশ-ই ধন্য হবে—অহল্যা ধন্য হবে না। অহল্যারা নিজে নিন্দিত হয়ে অপরের জীবনকে ধন্য করে, অন্যকে ধন্য করাই সৌন্দর্যের মূলতত্ত্ব। কিন্তু সব দৃষ্টি অন্তসৌন্দর্যকে চিনতে পারে না। কারণ সব চোখই সৌন্দর্য পিপাসু, কিন্তু সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতত্ত্বটি সব চোখে দেখা যায় না। দৃষ্টি হল ব্যক্তিনির্ভর, আবার ব্যক্তি হল ভাবনির্ভর। প্রকৃতপক্ষে চোখ কিছু দেখে না, দেখে মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান। তাই তোমার মন যেমন, তোমার দৃষ্টিও সেইরকম হবে।

মন অনুযায়ী সুন্দরের মধ্যে অসুন্দরের সন্ধান করা যায়, আবার অসুন্দরের ভিতরে সুন্দরতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেণু-সঞ্চয় করা যায়। জ্ঞানের তারতম্যে দৃষ্টির পার্থক্য এবং ভাবনায় প্রভেদ হয়। আমার জীবনকথা থেকে কে কি আহরণ করবে সেটা ব্যক্তি নির্ভর। কেবলমাত্র শব্দব্রহ্মের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমি আমার অনুভূতি নিঃসঙ্কোচে বর্ণনা করব। এর থেকে অহল্যা কি শিক্ষা পাবে, সেটা তার জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। আমি নীতিশিক্ষা দেব না। অকপটভাবে আমার অনুভূতিকে উপস্থাপন করব।

আমি অপালা, অত্রিমুনির একমাত্র কন্যা। আমার পিতা ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মবাদিনী বাক্‌দেবীর সার্থক সন্তান। মানুষের মনকে ভোগরাজ্য থেকে ভাবরাজ্যে পরিচালিত করে এক আদর্শ প্রেমময় পৃথিবীর পরিকল্পনা করেছিলেন পিতা। সেই উদ্দেশ্যে পিতা রচনা করেছিলেন অত্রিসুক্ত। আমার মা অনুসূয়া ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী। তিনি যেমন বিদুষী, তেমনই স্নেহময়ী। শত্রুর প্রতিও তার অসূয়াভাব আমি লক্ষ্য করিনি। আমার পিতা ছিলেন লোকসত্তার উদ্‌গাতা এবং সংস্থাপক, স্বভাবতই তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের বিরোধী। এই এক সাত্ত্বিক পরিবেশে আমার বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত হওয়ায় আমি ভোগময়ী না হয়ে ভাবময়ী হয়ে উঠেছিলাম। তাই সমগ্র জগৎ যখন আমার শরীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ, তখন আমি সেই সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরিবর্তে অন্তঃসৌন্দর্য বিকাশের দিকে সচেষ্ট হলাম। এই সাধনায় আমার মা অনসূয়া ছিলেন আমার সহায়িকা।

আমার পিতা জ্ঞানগর্ভ অত্রিমুনির হৃদয় ছিল অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন অথচ পাপীকে ক্ষমা করতেন। কোনও ভয়ঙ্কর অপরাধীকে তিনি বলতেন—"তুমি মহাপাপ করেছ, তার জন্য বিব্রত হওয়ার কিছু নেই, কারণ তুমি এই পাপকে সংশোধন করতে পারবে। সংসারে এমন কোনও পাপ নেই যার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তাই একটা পাপ করে নিজেকে পাপী মনে কর না। নিজেকে অজ্ঞান, অবোধ ভেবে প্রায়শ্চিত্ত কর, তখন আর পাপের মুখ দেখা যাবে না। এই উপায়ে পিতা সমাজ থেকে অপরাধ দূর করার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু পিতার সার্বজনীন প্রেম, সাম্য, মৈত্রী-নীতি তথা জনগণকে রাজতন্ত্র বিরোধী শিক্ষাদানের ফলে বারম্বার তিনি রাজা কর্তৃক তিরষ্কৃত হতেন। পিতার নিজের জন্য চিন্তা ছিল না, একমাত্র আমিই ছিলাম পিতার চিন্তার কারণ। জীবনের স্বাভাবিক গতিতেই আমি যৌবনে উপনীত হলাম। আমার বিবাহ কোনও সমস্যা নয়। আমার সৌন্দর্য, মাতার সদাচার, পিতার আদর্শ যশ, কীর্তি যে কোনও গুণী, জ্ঞানী যুবককে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময় আমার পৃষ্ঠদেশে দেখা দেয় দুরারোগ্য ধবল কুষ্ঠরোগ। পিতা সমাজসেবায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে, আমার রোগ প্রতিকারে তাঁর নজর ছিল না। মাতা বহুদিন পর্যন্ত ভেবেছিলেন, আমার পৃষ্ঠদেশ সর্বদা বস্ত্র তথা ঘনকেশে আবৃত থাকে বলে সেই অংশ অধিক ধবল বর্ণ ধারণ করেছে। পিতা এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার মধ্যে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ঠিক সেই সময় রাজা পিতাকে বন্দী করেন এবং পিতার কারাবাস আমার

চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করে। কোনও উপায় নেই। কারামুক্ত-হওয়ার পর পিতা ভাবলেন, উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিবাহ হলে আমার পতিদেবই আমার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

আমার সৌন্দর্যের জন্য যেমন আমার কোনও গর্ব ছিল না, সেইরকম এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য আমার মনে কোনও হতাশা ছিল না। শরীরের সৌন্দর্য এবং রোগ উভয়ের ক্ষেত্রে তোমার কিছু করার নেই; যে কর্মের কর্তা তুমি নও, সেই কর্মের সুখ বা দুঃখ কেন করবে? তাই আমি ছিলাম চিন্তাহীনা।

জ্ঞানী, গুণী, সৌম্যদর্শন যুবা কুশাশ্বের সাথে পিতা যখন আমার বিবাহ স্থির করলেন আমি প্রতিবাদ করিনি। তিনি চেয়েছিলেন, শল্য চিকিৎসা বিশারদ অশ্বিনীকুমারদের সাহায্যে ঐ স্থানের চর্ম শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অপসারণ করার পরই আমার বিবাহ হোক।

একথা সত্য যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় শল্য চিকিৎসায় অসাধ্য সাধন করতে পারতেন, সেইজন্যই ইন্দ্রদেব তাঁদের মর্তলোক থেকে সসম্মানে স্বর্গলোকে নিয়ে গেছেন। দেববৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয় সূক্ষ্ম শল্যচিকিৎসায় এমনই দক্ষ ছিলেন যে, অকেজো, রোগগ্রস্ত পা পরিবর্তন করে লোহার পা স্থাপন করতেন। চক্ষু এবং মস্তিষ্ক স্থাপনেও সফলতা লাভ করেছিলেন। তাই আমার পৃষ্ঠদেশের ধবলকুষ্ঠ আক্রান্ত চর্মকে শল্যচিকিৎসার দ্বারা অপসারণ করে নূতন চর্মস্থাপন করা তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু চিকিৎসার জন্য অশ্বিনীকুমাদের মর্তে আসার জন্য ইন্দ্রদেবের অনুমতি প্রয়োজন। ইন্দ্রদেব দানশীল ও স্তুতিপ্রিয়। আমার পিতা-মাতা তাঁর স্তুতিগান করলে তিনি নিশ্চয় করুণা করতেন। আমার চিকিৎসার জন্য অশ্বিনীকুমারদের মর্তে প্রেরণ করতেন। কিন্তু আমার পিতা রাজতন্ত্র বিরোধী হওয়াও ইন্দ্রদেব তাঁর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হবেন না এবং অশ্বিনীকুমারদেরও অনুমতি দেবেন না—এ ব্যাপারে পিতা নিঃসন্দেহ ছিলেন। আত্মমর্যাদা হানির ভয়ে তিনি নীরব থাকলেন এবং কুশাশ্বের সাথে আমার বিবাহসম্পন্ন হল। আমার রোগ সম্বন্ধে কুশাশ্বকে কিছুই জানানো হল না। সেই সময় আমি মাকে বলেছিলাম—"কুশাশ্ব আমার শরীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিবাহে সম্মত হয়েছে। তিনি আমার শরীরের অসুন্দরতা দেখেননি, সেটা দেখার পর তিনি যদি বিবাহ করেন তাহলেই আমি সুখী হব। নচেৎ আমার দাম্পত্যজীবনে বিঘ্ন ঘটবে। পিতা এত জ্ঞানী হয়েও এইরকম কাজ কি করে করেছেন? তুমি প্রতিবাদ করছ না কেন?" আমার মা ছিলেন বিদুষী এবং ব্রহ্মবাদিনী, তথাপি কন্যাস্নেহে তিনি সাধারণ মাতায় পরিণত হলেন। আমাকে আদর করে চতুরতার সাথে কথা ঘুরিয়ে বললেন—"বিবাহের পূর্বে ভাবীস্বামীকে কিভাবে অঙ্গপ্রদর্শন করবি মা? ইহা বৈদিক মর্যাদা বিরোধী। যদি তোর রোগসম্পর্কে তাঁকে বলা হয়, সে তোর পিঠে কুষ্ঠরোগের চিহ্ন দেখতে চাইবে, তোর সৌন্দর্য ও গুণে সে এমনই মুগ্ধ যে সে কারও কথা বিশ্বাস করবে না। তাই তাকে সত্যিকথা বললে আমরা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়ব। যদি তোর পৃষ্ঠদেশের আক্রান্ত স্থানটি আমরা তাকে দেখাই এবং তারপর যদি সে বিবাহে রাজি না হয়, তাহলে অন্যত্রও তোমার বিবাহ সম্ভব নয়। একজন পুরুষের সম্মুখে উন্মুক্ত পৃষ্টদেশ প্রদর্শনকারী মেয়েকে বিবাহ করার জন্য ক'জন

সুপুরুষ অগ্রসর হবে বলত! মেয়েদের পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। সত্য প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও সত্যকে আড়াল করতে হয়। এখানে তোর দোষ নেই আমাদেরও দোষে নেই—দোষ এই সমাজের, যেখানে পুরুষ এবং নারীর জন্য পৃথক নিয়ম। পুরুষ এবং নারীর জন্য পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞাও যেখানে সমাজ নিজের সুবিধামত নির্ধারণ করে সেই সমাজ আজ এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। তুই নির্মলচিত্তে কুশাশ্বকে বিবাহ করে দাম্পত্যজীবন শুরু কর। আমার বিশ্বাস, শুধু রূপ-গুণে মুগ্ধতা নয়, কুশাশ্ব তোর প্রেমে পড়েছে, তাই কুষ্ঠরোগের চিহ্ন তোর শরীরে আবিষ্কারের পরও তার প্রেম ঘৃণায় পরিণত হবে না। সমবেদনা এবং সহানুভূতিতে পরিণত হবে। ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে অশ্বিনীকুমারদের সাহায্যে সে নিশ্চয় তোকে সুস্থ করে তুলবে। কিন্তু তুই নিজে তোর রোগ সম্পর্কে কিছু বলবি না। প্রথমে বলে দিলে তার প্রেম ও অনুরাগ নৈরাশ্যে পরিণত হবে। তার মন ভেঙ্গে যাবে। সে হয়তো সহানুভূতিশীল নাও হতে পারে। কিছুদিন দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করার পর তার প্রেম যখন গভীর হবে, তখন সত্য প্রকাশে বাধা নেই। আমার বিশ্বাস, কুশাশ্বর ভালবাসায় তুই রোগমুক্ত হবি। প্রেম হল অমৃত, সর্বরোগের মহৌষধ। কুশাশ্বের প্রেমভাজন হওয়া তোর কর্তব্য। মায়ের কথা এত যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, আমার মনে কোনও দ্বিধা রইল না। আমি বসন্তের কুসুমিত উদ্যানসম হৃদয়ে সুখস্বপ্ন এবং প্রেমানুরাগের সুরভিত ফুল ফুটিয়ে কুশাশ্বের ঘরে বধূ হয়ে এলাম।

কুশাশ্বের সাথে আমি অত্যন্ত প্রেমময় অথচ সংযমপূর্ণ দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে থাকি। আমাকে বিবাহ করে কুশাশ্ব অত্যন্ত সুখী ছিলেন। আমার শ্বশুর, শাশুড়ী অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন আমার প্রতি। আমি সর্বান্তকরণে সুখী ছিলাম। দিবালোকে কুশাশ্বের সম্মুখে আমি অত্যন্ত সংযতভাবে থাকতাম। তাঁর সম্মুখে আমি বস্ত্রও পরিবর্তন করতাম না। কুশাশ্ব ভাবতেন আমি অত্যন্ত লজ্জাশীলা, তাই তার সম্মুখে বস্ত্র পরিবর্তন করি না। যারফলে, আমার কুষ্ঠরোগ আমাদের দাম্পত্যজীবনের প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার রোগ বৃদ্ধি পায় এবং আমি পিঠে যন্ত্রণা অনুভব করি। শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষা মানসিক যন্ত্রণা আমাকে অধিক পীড়িত করে। আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীর কাছে এই কথা গোপন করার যন্ত্রণা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে, উপরন্তু আমার চিন্তা হয় এই রোগ আমার স্বামীর শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহলে আমি কি করব? আমি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব? স্বামীর সাথে এতবড় প্রবঞ্চনা করে কি আমি ঠিক করছি? আবার ভাবি—এখন যদি সত্য প্রকাশ করি। কুশাশ্ব সেটা কিভাবে গ্রহণ করবে? নিজের জন্য আমার ভয় বা দুঃখ ছিল না। আমার চিন্তা হচ্ছিল স্বামীর জন্য। আমার মিথ্যাচারের ফলে যদি কুশাশ্ব ব্যধিগ্রস্ত হয়, সম্ভবত সেই মানসিক যন্ত্রণায় আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমার মৃতু কুশাশ্বকে আরোগ্য করতে পারবে না। সেইরকম মৃত্যুতেও মুক্তি নেই।

কুশাশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে আমার ভয় করে। নানা অজুহাতে কুশাশ্বের প্রেমালিঙ্গন থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখি। তা সত্ত্বেও কুশাশ্বের প্রেমপাশ থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখতে পারি না। মিলন মুহূর্তের পর আমি শোকে ভেঙ্গে পড়ি। অথচ আমার অশ্রুর উৎস

কোথায় সেকথা আমি কুশাশ্বকে জানাতে পারি না। আমার আচরণে কুশাশ্ব আশ্চর্য হয়ে যান, উপরন্তু ব্যথিত ও লজ্জিত হন, তিনি ভাবতেন, তিনি বোধহয় বলাৎকার করেছেন আমার সাথে। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার বিরাগেব কারণটা কি সেকথা বুঝতে না পেরে নানা সন্দেহে তাঁর মন ভারাক্রান্ত ও বিচলিত হচ্ছিল। তিনি আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু আমি মন খুলে উত্তর দিতে পারতাম না। এইরকম কদাকার সত্য এবং এতবড় প্রবঞ্চনা তিনি যদি সহ্য করতে না পারেন?

একদিন আমাকে আদর সহকারে পাশে বসিয়ে কুশাশ্ব বলেন—"অপালা! তোমার যদি আমার প্রতি প্রেমভাব নেই, তোমার পিতামাতা যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছেন, তাহলে বিয়ের পরই তোমার আচরণে সেটা প্রকাশ পেত, কিন্তু প্রথমে তো তুমি এরকম ছিলে না। তুমি যেমন আমাকে সুখী করেছ, তেমনই নিজেও সুখী হয়েছ বলে আমার ধারণা। এখন কি এমন হল যে তুমি আমার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছ? আমি কি তোমায় সুখী করতে অক্ষম বলে তুমি অনুভব করছ? তুমি কি অন্য কারও প্রতি....."

কুশাশ্বের কথা শেষ হওয়ার পূর্বে আমি আগুনের মতো জ্বলে উঠলাম—"স্ত্রীর কি নিজের কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই? তার ইচ্ছা কি সবসময় কোনও পুরুষের সাথে জড়িত? তোমার সাথে মিলনের ইচ্ছায় যদি ব্যতিক্রম লক্ষ কর, তাহলেই আমার ইচ্ছা অন্য কোনও পুরুষে কেন্দ্রীভূত। পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর শরীর ও মন নারীর নিজের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কি আর কোনও কারণ থাকতে পারে না? আমার প্রতি এত অনাস্থা? অবিশ্বস্ততা নারীর রক্তকোষে থাকে না অবিশ্বাস থাকে পুরুষের প্রাণকোষে? এ সম্পর্কে নিজের মনকে আগে প্রশ্ন কর, তারপর আমি আমার মনের কথা বলব।" এইটুকু বলে আমি কুশাশ্বের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে দূরে গিয়ে বসি এবং অপ্রকাশ্য ক্ষোভে কাঁদতে থাকি। কুশাশ্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। আমার মনে ভাবনার কি ঝড়ঝঞ্ঝা প্রবাহিত তার আদি অন্ত না পেয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী বলে—"অপালা! আমার মনে হয় তুমি মা হতে চাইছ। অথচ লজ্জাবশত বলতে পারছ না। এখন আমরা পুত্র কামনা করব। তুমি মা হওয়ার পর তোমার মনের সমস্ত আন্দোলন শান্ত হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে যে একটা সেতুর প্রয়োজন, সেটা আমি বেশ অনুভব করতে পারছি। দেহভোগ বাসনাকে প্রশমিত করার পরিবর্তে প্রজ্জ্বলিত করে, কিন্তু সন্তান কামনায় দেহভোগ পুণ্যমার্গে পরিচালিত হয়। তাই তুমি শুদ্ধচিত্তে পুত্রকামনা কর। আমাদের দাম্পত্যজীবন অমৃতময় হবে। কুশাশ্বের সন্তান কামনার ঘোষণায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আমার ভয় ও আশঙ্কা কদাকার রূপ ধারণ করে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি যেন দেখতে পাই আমার সন্তানের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শরীর। আমার যে সুস্থ-সন্তান জন্ম হবে, সে বিশ্বাস আমার নেই। আমি চমকে উঠে দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদকরি—"আমি মা হতে চাই না, যদি আমি মা না হই তাহলে কি তোমার কাছে আমি মূল্যহীন হয়ে যাব? তোমার কাছে আমার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না?" স্তব্ধ হয়ে

কুশাশ্ব আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। সংসারে এমন কোনও নারী নেই, যে মা হতে চায় না। সম্ভবত আমি মানসিক রোগগ্রস্তা, কিংবা আমার অন্য কোনও প্রেমিক আছে। কুশাশ্বের মনে এইরকম কিছু সন্দেহ জাগে। বিষণ্ণ মনে তিনি উঠে চলে গেলেন। সেইদিন থেকে আমার গতিবিধির উপর কুশাশ্ব তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। পাপমন সতত সন্দিগ্ধ। কুশাশ্বের মনে পাপের ছায়া পড়েছে। তিনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন, তাই আশ্রমের যেকোনও লোকের সাথে কথা বললেই তিনি তার ভিন্ন অর্থ করে নিজে কষ্ট পেতেন, আমাকেও কষ্ট দিতেন। একাধারে শরীরের রোগযন্ত্রণা, তার উপর মনের বিদ্রোহ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও সর্বোপরি অসহায়তা আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। আমি পিতামাতার ওপর ক্ষুব্ধ হতাম, কেন তাঁরা আমার রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা করাননি, যদিও না করালেন তাহলে রোগগ্রস্তা কন্যার দায়িত্ব নিজেরা বহন করতেন, তা না করে নিজেদের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন উপরন্তু বিবাহ-প্রসঙ্গে সত্য গোপন করাটা মহাপাপ নয় কি? কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধি বরপক্ষের নিকট গোপন রেখে বিবাহ দেওয়া বরপক্ষের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কি? এতবড় প্রতারণা কুশাশ্বের পিতামাতা কেন বরদাস্ত করবেন? কুশাশ্বের ওপর প্রচণ্ড অভিমান হয়। আমার যে শরীর তাঁর এত প্রিয়, যে শরীর তাঁকে এত সুখ দেয়, সেই শরীর নিয়েই আজ তাঁর সাথে আমার ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সেই শরীর কি শুধু তাঁকে সুখ দেওয়ার জন্য? সেই শরীরের নিজের কি দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা নেই? যে শরীরের প্রতিটি মধুকোষ থেকে তিনি অমৃত উপভোগ করেন—সেই শরীরের প্রতিটি কোষে যে দুরারোগ্য ব্যধির যন্ত্রণা হয়, সেটা কি তিনি কোনওভাবে জানতে পারেন না? তিনি কি শুধু আমার সুখের দিকেই কান পেতে থাকেন, দুঃখে নয়!

কতবার ভেবেছি কুশাশ্বের কাছে সম্পূর্ণ বিমোচিত হয়ে যাব। আমার সুন্দরতা, অসুন্দরতা, আমার সুখ এবং দুঃখ, স্বপ্ন এবং নিয়তি সবকিছু উন্মুক্ত করে দেবে তাঁর কাছে, কিন্তু বহু বছরের কুণ্ঠা আমার কণ্ঠরোধ করে। আমার কৈশোরের মধুর চপলতাকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি তার কঠোর হাতে শাসন করেছে। সেইদিন থেকে পিতামাতার নির্দেশে আমি সত্য গোপন করতে শিখেছি। আমার রোগ সম্বন্ধে আমার বান্ধবীরাও কেউ জানার সুযোগ পায়নি। তাই প্রতিদিন সত্য প্রকাশের সংকল্প করলেও আমার সঙ্কোচ আমাকে মূক করে দেয়।

সূর্যোদয়ের পূর্বে নদীতে স্নান করা আমার বহুদিনের অভ্যাস, কারণ সহচরীদের স্নানের পূর্বে আমাকে স্নান সমাপন করতে হবে, এটাই ছিল পিতামাতার নির্দেশ। তা না হলে আমার পিঠের রোগাক্রান্ত স্থান সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। সেইজন্য কিশোরী অবস্থা থেকেই আমার স্নানপর্ব কেউ দেখার সুযোগ পায়নি, এমনকি সূর্যদেবও। সেই অভ্যাসবশত শ্বশুর বাড়িতে আসার পরেও আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করতাম, তাছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না।

প্রতি মুহূর্তে নিজের রোগকে গোপন রাখার প্রয়াস শীতকালেও আমাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করতে বাধ্য করত। যেন আমি নিজেই নিজেকে ভয় করতাম। আমার শরীরের কুষ্ঠরোগ

কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। কারণ তা ছিল আমার পৃষ্ঠদেশে। কিন্তু চতুর্দিকে আমার পিঠের সেই শ্বেতলোহিত ব্যধির বীভৎস রূপ দেখতে পেতাম। নবোদিত অরুণ, অস্তায়মান চন্দ্রকেও আকাশের পৃষ্ঠদেশে কুষ্ঠরোগের চিহ্নের মতো মনে হত আমার। গাছপালা, পাখি, মরুৎ পাছে আমার রোগ আবিষ্কার করে ফেলে সেই ভয়ে আমি আতঙ্কিত। একমাত্র অন্ধকারই আমাকে সেই ভয় থেকে রক্ষা করত। তাই অন্ধকারে অরণ্যের নির্জন নদীতীরে আমি স্নান করতাম। প্রচণ্ড ঠান্ডায় এইভাবে স্নান করার জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কুশাশ্ব নিজে আমায় বারণ করেন—"এত রাত্রে তুমি নদীতে স্নান করতে যেও না। রাত্রি স্নান তোমাকে অসুস্থ করছে। এখন তুমি সূর্যোদয়ের পব স্নান করবে। বৈদ্যরাজ আমাকে সেই পরামর্শ দিয়েছেন।"

আমি প্রতিবাদ করি—"রাত্রি স্নান আমার বহুদিনের অভ্যাস বৈদ্যরাজের বারণ করা উচিত নয়। সূর্যোদয়ের পর নদীতে এত ভীড়ের মধ্যে আমি স্নান করব কি করে? নারী হোক বা পুরুষ, সর্বসমক্ষে স্নান করা আমার দ্বারা হবে না।"

আমার দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুশাশ্ব কি যেন ভাবেন—তারপর দৃঢ়স্বরে বলেন—"আমাদের বাড়ির পিছনে নদীর জল অত্যন্ত পরিষ্কার, সেখানে আমার মা স্নান করেন, তুমি সেখানে স্নান না করে এতদূরে যাও কেন? নির্জন রাস্তায় একা একা যাচ্ছ, তোমার সাথেও কাউকে যেতে দেখিনি। ভয় করে না?"

"না, না ভয় করবে কেন? সেই রাস্তায় ঋষিদের দু'তিনটি আশ্রম আছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্রহ্মচারীরা বেদপাঠ করেন, তাই ভয়ের কোনও কারণ নেই। মা যেখানে স্নান করেন, সেখানে স্নান করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করি, কারণ মা স্নান করার পূর্বে আমি ঐ জলে পা দেব কি করে?" কুশাশ্বর মনের সংশয় দূর করার জন্য বলি।

অকস্মাৎ কুশাশ্ব গম্ভীর হয়ে গেলেন, চিন্তিত মনে হল। আমাকে প্রশ্ন করেন—"অপালা! তুমি শ্বেতকেতুকে জান? তিনি সৌম্যতীর্থ বেদজ্ঞ—এখনও ব্রহ্মচারী। তাঁর আশ্রমের রাস্তা দিয়ে তুমি যাও নিশ্চয়। তার পরেই ব্রহ্মচারী নীলধ্বজ ঋষির আশ্রম। তিনি তো রুদ্রের মতো সুন্দর। তাঁকে দেখলে মুনিকুমারীরা প্রায় পাগলিনী হয়ে যায়। তুমি কি যাওয়ার পথে তাঁকে প্রতিদিন দেখছ?" এইরকম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে পারলাম না। ছিঃ কুশাশ্বের মতো একজন ভদ্রলোকের মুখে এইরকম কুৎসিৎ প্রশ্ন কি শোভা পায়? যেন প্রশ্ন নয়, সেটা ছিল কুশাশ্বের উত্তর—তিনি যেন বলেছেন—এই ঠান্ডায়, নির্জন পথে, দূরস্থ নদীতে কেন তুমি স্নান করতে যাও, আমি তা জানি অপালা! তোমাকে আমি সন্দেহ করি..... তুমি পরপুরুষে আকৃষ্ট। সেই আকর্ষণেই তুমি.....।

কুশাশ্বের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এইটুকু বললাম—"আমি যখন নদীতে স্নান করতে যাই তখন পশুপাখীরও ঘুম ভাঙ্গে না, মানুষের তো দূরের কথা—আমার দুর্ভাগ্য আমি কখনও কোনও মুনি ঋষির দর্শন পাইনি, নচেৎ তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতাম।" সম্ভবত

কুশাশ্ম আমার কথা বিশ্বাস করেননি। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর থেকেই কুশাশ্ম আমাকে অনুসরণ করছেন বলে আমি জানতে পারি।

সেই অন্ধকারের মধ্যে আমাকে অনুসরণ করে তিনি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন। অন্ধকার হেতু স্নানের সময়েও তিনি আমার রোগচিহ্ন দেখতে পেতেন না। কিন্তু কুশাশ্মর এই অনুসরণ ও সন্দেহ আমার হৃদয় বিদীর্ণ করত। তাঁর অনুসরণের কথা যে আমি জানি সে কথা আমি তাঁকে জানাতে চাইছিলাম। তাঁর সন্দেহ যে, আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে সে কথা জানাবার জন্য স্থির করে একদিন আমি বললাম—"স্বামী, এখন না হয় আমি সূর্যোদয়ের সময়েই স্নান করতে যাব। এত কষ্ট করে আমাকে অনুসরণ করবেন না। এটা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়।"

কুশাশ্ম তৎক্ষণাৎ বলেন—"তোমার নিরাপত্তার জন্য আমি তোমাকে অনুসরণ করি। অরণ্যপথে জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব লেগেই আছে, তোমার জন্য আমার আশঙ্কা হয়। কখনও যদি কোনও পশুর সামনে পড় তাহলে তো আমার সংসার ভেসে যাবে।"

আমি অপলক নেত্রে কুশাশ্মের দিকে তাকিয়ে থাকি। সত্যি কি তিনি আমাকে এত ভালোবাসেন? তাহলে আমার ব্যাধিকেও সহৃদয়ে গ্রহণ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। আমি তাহলে এত কষ্ট পাচ্ছি কেন? আর কেনই বা আমার স্বামী মিথ্যা সন্দেহে জর্জরিত হচ্ছেন?

সেদিন আমি ইচ্ছা করেই সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে শয্যাত্যাগ করে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করি, তারপর স্নানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই, কুশাশ্মের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু তিনি শয্যাত্যাগ করেন নি। আমি আজ শুচিস্নান করে স্বামীকে আমার পিঠের কুষ্টরোগ দেখাব। সব দোষ স্বীকার করব। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন ধরে এইরকম অপরাধ করার জন্য তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্রই আমার সকল ভয় দূর হয়ে গেল। আমার অন্তরের সকল দ্বন্দ্বের অবসান হল।

নদীর নির্মল জলে আমি ভালোভাবে স্নান করলাম। ততক্ষণে সূর্যের প্রথম কিরণ চারপাশে আবির ছড়াচ্ছে। সিক্তবসন পরিবর্তনের সময় আমার পিঠ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেল। সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। কারণ আমি জানি সূর্যদেবের প্রথম কিরণ ছাড়া আর কারও এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

বসন পরিবর্তন করে কলসীতে জল নিয়ে উঠতেই দেখি সম্মুখে আমার স্বামী কুশাশ্ম। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দুঃখ, ক্ষোভ, রাগ এবং ঘৃণায় তিনি স্থানুবৎ।

আত্মগ্লানিতে জড়সড় হয়ে আমি তার পায়ের তলায় পড়ে গেলাম। তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব বলে হাত বাড়াতেই তিনি দূরে সরে গেলেন, বললেন—"আমাকে স্পর্শ করো না অপালা! তোমার রোগ আমাকে যত না দুঃখ দিয়েছে তার চেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে তোমার প্রতারণা। তোমার পিতামাতার যশ, খ্যাতি সবকিছুই যে এই প্রবঞ্চনায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সে কথা আজ যে শুনবে সেই বলবে। কথাটা প্রকাশ না করে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে

চলে যাও। যদি কখনও আরোগ্যলাভ কর, তখন ফিরে আসবে। তোমার রোগ যদি বিবাহের পর দেখা দিত তাহলে তার প্রতিকারের দায়িত্ব ছিল আমার, কিন্তু তোমার এই রোগ বহুদিনের। তাই এই রোগ প্রতিকারের দায়িত্ব তোমার পিতার।" এইটুকু বলে তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেন। আমি নীরবে অশ্রুমোচন করে তাঁর পিছনে চলতে শুরু করি। মনে মনে ভাবি, আমার শরীরও পিতার রক্ত এবং অন্নে পুষ্ট হয়েছে। তাহলে এই শরীর আবার আপনার অধীন হল কি ভাবে? অবশ্য পিতার ওপরও রাগ হয়। তবুও শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে তাঁদের করুণালাভের আশায় কুশাশ্বকে অনুসরণ করে অমি কুটীরদ্বারে উপস্থিত হই। কিন্তু আমাকে কুটীরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল না। কুশাশ্বের কাছে সবকথা শুনে শ্বশুর শাশুড়ীও নির্দয়ভাবে আমাকে পিতার কাছে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। কুষ্ঠ রোগাক্রান্তা কন্যাকে তাঁদের পুত্রের সাথে বিবাহ দিয়ে প্রতারণা করার জন্য তাঁরা পিতার নিন্দা করতে থাকেন। আমার আর কিছু করার ছিল না। স্বামী পরিত্যক্তা পতিগৃহ হতে বিতাড়িত আমি পিতৃগৃহে ফিরে এলাম। ব্যাধিমুক্ত হয়ে পতিগৃহে ফিরে যাওয়ার আশা আমার ছিল না।

আমার এই অবস্থা দেখে পিতা বিচলিত হলেন না। স্থির কণ্ঠে তিনি বললেন—"ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করে তুই এবার সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হতে পারবি। কারণ এখন তুই অত্রিকন্যা নয় কুশাশ্ব পত্নী। ইন্দ্র তোর প্রতি বিমুখ হবেন না। অত্রিকন্যা হওয়ায় তুই এত দুঃখ ভোগ করলি। স্বাভিমানী, নীতিবাদী লোকেদের নিজের তথা তাদের সন্তান সন্ততিদের জীবনে এইরকম বহু দুঃখ কষ্ট দেখা দেয়। তুই ইন্দ্র আরাধনা কর। আমার বিশ্বাস তুই রোগমুক্ত হয়ে সসম্মানে পতিগৃহে ফিরে যাবি।"

"ইন্দ্রদেবকে কিভাবে সন্তুষ্ট করব?" —ব্যাকুল হয়ে আমি প্রশ্ন করি। "সোমদান করে, ইন্দ্র সোমপ্রিয়। মৌজবত পর্বতে সোমলতা এখন অত্যন্ত দুর্লভ। তাই সোমরসে ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি নিশ্চয় তোকে রোগমুক্ত করবেন।"

"তাহলে তো আমার আরোগ্যের প্রশ্ন নেই। মৌজবত পর্বতে সোমলতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে আসছে। সোমলতা আমি কোথায় পাব যে সোমরসের দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করব?" "নিষ্ঠা এবং তপস্যার দ্বারা সবই সম্ভব।" নীতিবাক্য শোনালেন পিতা। মাও এই ব্যাপারে একমত। আমি স্থির করলাম কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করব। ব্যাধিতে যদি মৃত্যু নিশ্চিত, তাহলে তপস্যা করে মোক্ষলাভ বরং শ্রেয়।

এই তপস্যার স্বরূপ ছিল সোমলতা সন্ধান। সমস্ত অহংকার ত্যাগ করে, ইন্দ্রদেবকে পরমাত্মা মনে করে শুদ্ধচিত্তে আমি ধ্যান করতে লাগলাম। তপস্যার সময় আমি অত্রিকন্যা বা কুশাশ্বপত্নী নই। অপালাও নই, নিজের মধ্য থেকে আমি নিজে অপসৃত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে সমগ্র সংসারের রোগী, দুঃখী সমাজ পরিত্যক্তা মানুষ একাকার হয়ে গেছে। আমার মধ্যে আমার কারুণ্য ছিল না, ছিল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আর্তদের কারুণ্য। কত বছর ধরেই না আমি সোমলতার সন্ধান করেছি। কিন্তু সোমলতা বলে যখন হাত বাড়িয়েছি, তখন তা

পরিণত হয়েছে ভ্রমে। ধীরে ধীরে আমি নৈরাশ্যের সমুদ্রে ডুবে যাই মনে হয় সোমলতার নাগাল অমি পাব না—আমার রোগই আমার শরীরকে গ্রাস করবে। আমার তপস্যা ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু সোমলতার সন্ধান করতে করতে আমি যখন মৌজবত পর্বতের শিখর থেকে উপত্যকা পর্যন্ত প্রতিটি বনস্পতির লতাপাতাকে স্পর্শ করে জীবনের সন্ধান করছি, তখন আমার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। আমি ইন্দ্রদেব, জীবন এবং নিজেকে ভিন্নরূপে আবিষ্কার করি। আমার উপলব্ধি হয়—আমি এই শরীরের অন্তর্গত বলে মনে করলেও আমি এ শরীরের দাস নয় এবং এ শরীর আমার নয়। তাই এই শরীরের ব্যাধিও আমার নয়। পঞ্চভূতের এ শরীর ব্রহ্মাণ্ডের রোগ যন্ত্রণা ব্যাধির জন্য চিন্তিত হলাম। ইন্দ্রদেবকে পরমাত্মা মনে করলাম। যে পৃথিবীর কণিকামাত্র উপকার করেন। তাঁর মধ্যে পরমাত্মা বিদ্যমান। তাই ইন্দ্রদেবকে পরমাত্মা জ্ঞানে জগৎকে দুঃখমুক্ত করার জন্য তপস্যা শুরু করলাম।

কারণ আমার চোখের সামনে অরণ্যের কোণে কোণে বৃক্ষলতা, পশুপাখী এবং মানুষের যন্ত্রণা ছড়িয়ে রয়েছে। যখন আমি জগতের যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে গেলাম, তখন আমার শরীরে যে ব্যাধি আছে এবং তাব যন্ত্রণাও আছে সেকথা আমি ভুলে গেলাম। চতুর্দিক আমার আনন্দময় সোমময় মনে হল। যন্ত্রণার মধ্যেই আনন্দ খুঁজতে হবে, যন্ত্রণাকে আনন্দে পরিণত করতে হবে অহংকারকে নম্রতায় পরিণত করতে হবে। এইরকম এক অনুভূতিতে আমার অন্তর উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই আমি নির্ভয় এবং মোহমুক্ত হয়ে গেলাম। আমার ব্যাধি গোপন রাখার প্রয়াস থেকে বিরত হলাম। সেদিনের সূর্যাস্ত আমার সূর্যোদয়ের মতো মনে হল। দিন রাত্রির মধ্যে আর কোনও তফাৎ রাখলাম না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কর্তব্য তপস্যা এবং উপলব্ধির মুহূর্ত বলে ভাবলাম। সেদিন সন্ধ্যাস্নান করে অরণ্যপথে কুটীরে ফেরার সময় মনে হল আমি অমৃত সরোবরে স্নান করেছি। নিজের জন্য আর ইন্দ্রদেবের স্তুতি করব না। নিজের অন্তঃকরণে সোমলতাটি অঙ্কুরিত হলে জীবন ধন্য হত বলে আমি প্রার্থনা জানাই। ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত অন্বেষণ সমাপ্ত হল। অরুণাভ গোধূলির সাথে স্বর্ণাভ জ্যোৎস্নার মধুর মিলন বেলায় অরণ্যের অবগুণ্ঠন তুলে আমার সম্মুখে প্রকাশিত হয় উজ্জ্বল অরুণ রঙের লাবণ্যময়ী কিশোরী লতাটি।

চন্দ্ররেখার মতো স্বর্ণাভ শাখা প্রশাখায় নীললোহিত পত্রগুলি স্বর্ণাভ বৃন্তে সজ্জিত করেছে কোন অদৃশ্য কারিগর। কোনও অনুঢ়া কিশোরীর চম্পক অঙ্গুলিসম বর্তুলাকার কোমল চম্পকবর্ণ শাখা প্রশাখা নৃত্যরতা অপ্সরার মতো লীলায়িত ভঙ্গীতে লতায়িত হয়েছিল সেই পবিত্র তপোবনের এক নির্জন অরণ্যকীর্ণ স্থানে। আমার চক্ষু জ্যোতিষ্মান হয় সেই দিব্যলতিকার দিব্যপ্রকাশে।

আমি রোমাঞ্চিতা হলাম। মনে মনে বলি, হে প্রভু! যখন সকল সংকীর্ণ অভীপ্সার অন্ত হয় তখনই কি তুমি অভীষ্ট পূরণ কর! এই পথে আমি কতবার নদীতীরে যাই, অথচ এই দিব্যলতাটি অঙ্কুরিত হয়ে এমনকি পল্লবিত হয়েও কিভাবে আমার দৃষ্টির অগোচরে ছিল? আবার আজ যখন আমি নিজের অন্তরে সোমলতার সন্ধান করছি, তখন নিজেই আমায় ধরা দিল।

প্রভুর দান অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতে হবে। আমি হাত বাড়িয়ে সোমলতার কোমল পাতা এবং শাখা প্রশাখাকে আলিঙ্গন করি। কয়েকটি পাতা এবং অগ্রমুকুল আপনা থেকে আমার অঞ্জলিতে ঝরে পড়ে। আমি চিন্তা করলাম—সোমলতা অরণ্যের যে কোনও স্থানে অঙ্কুরিত হয় না। সোমলতার সন্ধান পেতে হলে পর্বত শিখরে যেতে হয়। সেইজন্য সবাই সোমলতা পায় না। আজ এত সহজে হাতের কাছে আমি পেলাম কি করে? তাহলে কি এটি সোমলতা নয়? কিন্তু আমি জানব কি করে? সোমরসের হৃদয় আলোড়নকারী সুরভি আমি চিনি। পিতার আশ্রমে যখন সোমযজ্ঞ হয়, তখন পরিষ্কার প্রাব্য (পাথর)-র সাহায্যে সোমলতাকে থেঁতো করে রস বার করা হয়, সেইসময় এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সুবাসে সমগ্র অরণ্য পুনর্জীবন পাওয়ার মতো সতেজ হয়ে ওঠে। বাল্যকাল থেকেই সোমের সুরভি আমার পরিচিত। তাই আজ এত বছর পরেও আমি সোমের সুরভি ঠিক চিনতে পারব। কিন্তু সোমলতার রস নিষ্কাষণ করব কি করে? আমার কাছে প্রাব্য নেই আশেপাশে কোথাও পাথরখণ্ড নেই। পাথর খুঁজতে গিয়ে যদি আবার সোমলতাকে হারিয়ে ফেলি এই বিস্তীর্ণ অরণ্যে। ঠিকভাবে না জেনে আমি সোমলতা আশ্রমে নিয়ে যাব কি করে? ইন্দ্রদেবকেও কি করে সমর্পণ করব? তাই প্রথমে সোমের সত্যতাকে যাচাই করতে হবে। দু'তিনটি পাতা ঠোঁটে স্পর্শ করে দাঁতে চিবিয়ে রস বের করতে যাচ্ছি, দেখি একটা মৌমাছি সেই লতার অগ্র মুকুলে বসে মধু আহরণের প্রয়াস করা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে ভস্ম হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। চোখের সামনে অমৃত-আশায়ী মৌমাছির এই পরিণতি দেখে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তাহলে কি এ অমৃতময়ী সোমলতা নয়—বিষবৃক্ষ। সম্ভবত অগ্রমুকুল ভেদ করে ফলটি নির্গত হচ্ছিল, সেই বিষফলের দেহে হুল ফোটাতেই মৌমাছিটির মৃত্যু হল। এই পাতা চিবানো মাত্রেই আমি মৃত্যুবরণ করব, এতে কোনও সন্দেহ নেই। হে পরমাত্মা! হে ইন্দ্রদেব! কি ভীষণ পরীক্ষা! আমি অমরত্ব চাইনি, চেয়েছিলাম এক যন্ত্রণামুক্ত পৃথিবী, রোগব্যাধিমুক্ত সমাজ। আমার হাতে কেন বিষের পাত্র ধরিয়ে দিলে প্রভু?"

পরমুহূর্তেই সোমলতার আলোকে আমার অন্তর আলোকিত হল। আমার মনে আর কোনও দ্বিধা দ্বন্দ্ব রইল না। আমি ফলের আশা করি না। 'তপস্যা'-ই আমার লক্ষ্য। ফল যাই হোকনা কেন তপস্যা থেকে বিচ্যুত হতে পারব না। ফলাসক্তিতেই মৌমাছির মৃত্যু ঘটেছে। তপস্যা অমৃত—ফলাসক্তিই মৃত্যু। এই উপলব্ধি হওয়া মাত্রই মৃত্যুভয় থেকে আমি অমৃতসাধনার পথে পা বাড়ালাম। সোমলতার পাতা ও কোমল শাখা দাঁতে চিবিয়ে সেই রসের সুরভি আঘ্রাণ করে বিমোহিতা হয়ে গেলাম। সোমরস আমি পান করিনি। সোমপানের উদগ্র কামনা থেকে নিবৃত্ত হলাম। ইন্দ্রদেবকে সোম অর্পণ করাই ছিল আমার তপস্যার লক্ষ্য। তাই একবিন্দু সোমরসও আমি আত্মসাৎ করতে পারব না। কিন্তু সোমরস পরিশ্রুত করার জন্য মুঞ্জবাসে প্রস্তুত সোমপবিত্র এবং সোমরস সংগ্রহ করার জন্য দ্রোণকলসও ছিল না আমার কাছে। আমি আমার দন্ত পংক্তিকে করলাম প্রাব্য, জিহ্বা এবং অধরকে করলাম যথাক্রমে সোমপবিত্র এবং দ্রোণকলস। রোগহেতু আমার রক্তহীন শ্বেতাভ অধর সোমরঙে

রঞ্জিত হয়ে অরুণাভ হয়ে যায়। সোমের সুবাসে সমগ্র পৃথিবী আমার কাছে এক সুবাসিত পুষ্পকাননে পরিণত হল। আমি আমার দুই অধর চেপে সোমরসকে সুরক্ষিতভাবে কুটীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছি, সহসা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন আমার মুক্তিদাতা স্বয়ং ইন্দ্রদেব।

আমি বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। অধর, খুললে সোমরস নির্গত হয়ে ভূমিতে পড়ে যাবে। তাই সেই মুহূর্তে কি করা উচিত বুঝতে না পেরে আমি দৃষ্টির মাধ্যমে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানালাম।

মধুর স্বরে ইন্দ্রদেবে বললেন—"সাধ্বী অপালা সোমপান করার জন্য আমি উপস্থিত। তোমার পবিত্র অন্তঃকরণ থেকে নির্গত মধুর আনন্দময় সোমরস দান করে আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।" এইটুকু বলে ইন্দ্রদেব আমার অধরের নিকট নিজের অধর রেখে সোমভিক্ষা করেন, আমি জানি ইন্দ্রদেব সোমপ্রিয়, কিন্তু তা বলে কি আমি তাঁকে আমার উচ্ছিষ্ট দেব! এতবড় পাপ কি করে করব? আমি অধর উন্মুক্ত না করে অসহায় দৃষ্টিতে ইন্দ্রদেবের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ইন্দ্রদেব আমার অন্তরও পড়তে পারছিলেন। বরাভয় দিয়ে তিনি বললেন—"সোম তো সাত্ত্বিক আনন্দ রস। দিব্যানন্দ কখনও উচ্ছিষ্ট হয়? অপালা—আমাকে সাত্ত্বিক আনন্দে ভাসিয়ে দাও, পৃথিবীকে প্লাবিত কর প্রেমানন্দে।" এই কথা বলে ইন্দ্রদেব আমার অধর দেশে তাঁর সুশোভন অধর পেতে দিলেন, আমার অনায়ত্ব অধর থেকে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ল স্বর্ণবিন্দু সম সুবাসিত সোমরস ইন্দ্রদেবের অধরে। ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমি অধর নিঃসৃত সোমরস ঝরিয়ে ছিলাম অকাতরে।

প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেব আমাকে বর চাইতে বললেন। প্রথম বরে আমি আমার পিতার স্বাস্থ্য ভিক্ষা করলাম। কারণ পিতা সেই সময় অসুস্থ ছিলেন। ভেবেছিলাম, ইন্দ্রদেব এই বর প্রত্যাখ্যান করবেন। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ইন্দ্রদেব বললেন—"অপালা! সংসারে অনেক দুঃখ কষ্ট মানুষের ভাবনা থেকে জাত, তোমার পিতা রাজতন্ত্রের বিরোধী, তাই তিনি ভাবলেন যে, আমি ত্রিলোকের রাজা হওয়ায় তোমার পিতার আদর্শের বিরোধী। যেহেতু তুমি তাঁর কন্যা সেইজন্য আমি তোমাকে ব্যাধিমুক্ত করব না। কত ভ্রান্ত তোমার পিতার ধারণা! প্রথমত আমি রাজা হলেও রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে নই। আমি প্রথমে রাজা ছিলাম না, আমার কিছু সৎকার্যের জন্য আর্যগণ আমাকে নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করেন। আর্যনেতা থেকে আমাকে আবার রাজার সম্মান দিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমি রাজতন্ত্রের প্রবর্তক বা সমর্থক। আমি চাইনা রাজার ছেলেই রাজা হোক। রাজা সেই হোক যার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে। সেই কারণে ইন্দ্রপুত্রের কখনও ইন্দ্রপদ লাভের দৃষ্টান্ত নেই। আমার অন্তে সেই ইন্দ্রপদ লাভ করবে, যে ইন্দ্রপদে যোগ্য বিবেচিত হবে। সেই নীতিতে ইন্দ্রপদের অভিষেক উৎসব চলেছে। তাই আমি তোমার পিতার বা তোমার বিরোধী হব কেন? কুমারী কন্যাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সমবেদনা চিরকালীন। তুমি আমাকে জানালে আমি কুমারী অবস্থাতেই তোমাকে রোগমুক্ত করতাম। এত দুঃখ পেতে কেন?" এইটুকু বলে তিনি প্রথম বরের জন্য তথাস্তু বললেন।

আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা ছিল আমার পিতার তথা অন্য সকলের, এমনকি পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা করার জন্য—ইন্দ্রদেব স্বীকৃত হলেন। তৃতীয় বর কি চাইব? আমার ব্যাধিমুক্তি? এখন তো আমার রোগ আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে না। নিদাঘদগ্ধ পৃথিবী শস্যবতী সন্তানপ্রসবা নারীর মতো পরিপূর্ণা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সম্মুখে, আমার অন্তরে।

আমার অভাব কি? এরপর যদি আমি আর না বাঁচি, তাহলেও আমার জীবন অপূর্ণ নয়। হ্যাঁ, আমার স্বামী কুশাশ্বের জীবন অপূর্ণ থাকবে যদি আমি তাঁর পত্নীপদে পুনর্বার অধিষ্ঠিতা না হই। তিনি এখনও একাকী জীবন কাটাচ্ছেন। আমার ব্যাধির জন্য আমাকে পরিত্যাগ করে তিনি ব্যথিত, অনুতপ্ত মর্মাহত। তিনি আর কি-ই বা করতেন? এটাই সমাজের নিয়ম। পত্নী চরিত্রহীনা, পরপুরুষ ভোগ্যা হলেও পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তা হলে পরিত্যাজ্য। কারণ কুষ্ঠ ব্যাধি নয়—অভিশাপ-অভিশপ্তা নারীকে অভিশাপ ভোগ করতে হবে। সেই বিচারে কুশাশ্ব আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি অপেক্ষা করে আছেন—আমার সাধনার সিদ্ধির জন্য। আমি শাপমুক্তা হয়ে পুনরায় তাঁর প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে ফিরে যাব, এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়। আমার বৃদ্ধা শ্বশুর শাশুড়ীও আমার সেবা শুশ্রূষার অপেক্ষায় আছেন, আমি ব্যাধিমুক্ত হলে তাঁরা আমাকে গ্রহণ করবেন।

এইতো সমাজের ন্যায়-নীতি। সুখের সাথি এই সমাজ। রোগ ব্যাধির জন্য চিকিৎসা, সমবেদনা নেই, কিন্তু রোগমুক্ত হলে পুনরায় গ্রহণ করবেন। গ্রহণ করবেন নিজের জন্য না, আমার জন্য? আমি কি পুনরায় ফিরে যেতে পারব আমার সেই ঘরে, যে ঘর আমার বলে ভাবলেও আমার নয়। আমার দুঃখ দুর্দশায় যে ঘর আমার আশ্রয়স্থল হয়নি, সেই ঘরকে আমার বলে বলাটা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি হতে পারে? অবশ্য আমাকে ফিরে যেতে হবে। সমাজের প্রথা মেনে নিতে হবে। তাছাড়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠছে কোথায়? সমাজের চেয়ে কি আমি বড়? সমাজের আবশ্যকতা অনুযায়ী আমি গ্রহণীয়া কিংবা বর্জনীয়া হতে পারি। কিন্তু আমি সেই মন নিয়ে ফিরে যেতে পারব? ফিরে যেতে পারব পূর্বের সেই অপালা হিসাবে। আমি তো আর পূর্বের অপালা নই। আমি এখন অত্রিকন্যা অপালা বা কুশাশ্বপত্নী অপালা নয়। পিতা পতির করুণা আশ্রয়ে আমার প্রয়োজন নেই। আমি বিভূ করুণা লাভ করেছি। সমগ্র পৃথিবী আমার আশ্রয়দাত্রী। আমার ভিতরে স্বামীসুখ প্রার্থিনী সেই নারীটি নেই। দেহসুখ, পার্থিব প্রণয়ের সকল অভীপ্সা আমার মধ্যে সমাহিত হয়েছে। এই দেহও আজ আমার কোনও ক্ষুদ্র কামনার অধীনা নয়। আমি তপস্বিনী অপালা। বাকি জীবনটা তপস্যা ও যজ্ঞ করে কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আজ। তবুও আমাকে সমাজে থেকেই তপস্যা করতে হবে। পরিবারের মধ্যে থেকে আত্মযজ্ঞে মগ্ন হতে হবে। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মুহুর্মুহু আত্মযজ্ঞে 'স্বাহা' করতে হবে সমূহ কল্যাণের জন্য। আমার স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী সেই সমূহর প্রতিনিধি। হ্যাঁ আমি ফিরে যাব। তাই আমার শারীরিক সুস্থতা প্রয়োজন।

ইন্দ্রদেব আমার দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করলেন। মন্দ্রমধুর স্বরে তিনি বলেন—"সুচরিতাসু! তোমার তৃতীয় বর সর্বপ্রথম পূর্ণ হয়ে গেছে। যখন তোমার অন্তঃকরণ থেকে সোমরস নির্ঝরিত হল সেই মুহূর্তে তোমার সমস্ত ব্যাধি, অবসাদ, বিষাদ নৈরাশ্য অপসৃত হল। তোমার শরীরে আর কুষ্ঠরোগের চিহ্ন নেই। সোমরসের স্পর্শে তোমার রক্তশূন্য অধর কিরকম রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।" এই কথা বলে ইন্দ্রদেব তার রত্নমুদ্রিকা আমার সম্মুখে তুলে ধরলেন। আমি তাঁর অঙ্গুরীতে আমার মুখশোভা দেখে মুগ্ধ হলাম। আমার মনের সব দ্বন্দ্ব অপসৃত হল। আমি ইন্দ্রদেবের পদধূলি নিলাম। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার ছিল না। আমার আনন্দাশ্রুই আমার কৃতজ্ঞ হৃদয়কে ইন্দ্রদেবের কাছে উপস্থাপিত করেছিল।

সোমপান করে ইন্দ্রদেবকে অত্যন্ত প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। স্বর্ণ বিন্দুর মতো কয়েক বিন্দু সোমরস লেগেছিল ইন্দ্রদেবের ধূসর স্বর্ণিম শ্মশ্রুতে। তিনি শিশুর মতো জিভ দিয়ে মুছে নিচ্ছিলেন সেই সোমমধু। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম সোমপ্রিয় ত্রৈলোক্যনাথকে। বিদায়ের পূর্বে স্নেহভরা কণ্ঠে ইন্দ্রদেব বললেন—"অপালা, শরীর সব কিছু নয়, আবার শরীর তুচ্ছও নয়। তুমি সংসারে ফিরে গিয়ে এটুকু সবাইকে জানাও যে, কুষ্ঠরোগী ঘৃণ্য নয়—এই রোগ অভিশাপও নয়, দুরারোগ্যও নয়। তপস্যায় তুমি এমনই মগ্ন ছিলে যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমার নির্দেশে তোমার শরীরে শল্য চিকিৎসার দ্বারা তোমাকে রোগমুক্ত করেছেন, তুমি জানতে পারনি। তপস্যার ফলে তোমার অন্তরের শক্তি অশ্বিনীকুমারদের চিকিৎসায় সাহায্য করেছে, তুমি জানতে পারনি। তাই কুষ্ঠরোগী পরিত্যজ্য নয়। কুশাশ্বের মতো আর কোনও স্বামী যেন কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অসহায়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করেন। সকলে তো আর দৃঢ়মনা পবিত্রা অপালা নয়।"

ইন্দ্রদেব নিজের রথে বসে অন্তর্ধান করলেন। নবজীবন, নবযৌবন, নবীন আশা নিয়ে আমি পিতার গৃহে ফিরলাম। তার পরদিন কুশাশ্ব এসে সাদরে আমাকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। আমি স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার জীবন আর গতানুগতিক ভাবে চলতে পারল না। কারণ কুশাশ্বের মনে ছিল দুটি গ্লানি। প্রথমত আমাকে পরিত্যাগ করার গ্লানি। আমাকে পরিত্যাগ না করে সহানুভূতি সহকারে আমার চিকিৎসা করালে, আমি তপস্যার বলে ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করে আরোগ্যলাভ করতে পারতাম, এতে কুশাশ্বের খ্যাতি বৃদ্ধি হত। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করলেন যেজন্য তার মনে গ্লানি দেখা দেয়। দ্বিতীয় গ্লানির কারণ ছিল তাঁর পুরুষমনের চিরাচরিত কুৎসিৎ সন্দেহ। ইন্দ্রদেবের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর মধ্যেকার স্বামীত্ব ঈর্ষান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। সর্বোপরি ইন্দ্রদেবের নারীলোলুপতা সম্পর্কে নানা জনরব। তাই আমার অধর থেকে কেবলমাত্র সোমপান করে যে ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সন্দিহান। আশ্রম থেকে আশ্রমে ইন্দ্রদেব এবং আমার সম্পর্কে নানা কুৎসা রটনা হয়েছিল।

"গৌতমের আশ্রমেও জনরব শোনা যায় যে, ইন্দ্রদেব অপালার সাথে....." এর চেয়ে অধিক আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। সংকোচ এবং লজ্জা আমার কণ্ঠরোধ করে।

আমার কথায় অপালা অপমানিতা হলেন না তো? হোক পাছে সে সুদূর অতীতের কথা অতীতকে তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না। নিজের বয়সের মতো অতীতের স্মৃতি নিয়ে মানুষ বেঁচে তাকে চিরদিন। অপালার তিমিরাচ্ছন্ন অতীতের উপর আঘাত করে আমি ভুল করলাম না তো?

অন্ধকারের মধ্যে অপালা হাসলেন। সহজ কণ্ঠে বললেন—'এত কুণ্ঠাবোধ করছ কেন অহল্যা? জনরব তোমার কানে পড়ার আগে আমার কানে সহস্রবার পড়েছে। ইন্দ্র-অপালা উপাখ্যান প্রতিবার নতুন রূপে বিচিত্র স্বরে আমার শ্রুতিপটে ঝঙ্কৃত হয়েছে, তাই তুমি যা শুনেছ তা নতুন কথা নয়।'

সাহস পেয়ে আমি বলি—দেবী অপালা! আমি আপনার কন্যা-সদৃশা। মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি। সত্য যত নিষ্ঠুর হলেও আমি সত্যকে সম্মান দিই। ইন্দ্রদেব এবং আপনার সম্বন্ধে আমি বহুকথা শুনেছি। কিন্তু আপনার মুখ থেকে সত্যাসত্য জানার জন্য আমার আগ্রহ জন্মেছে। আজ সেই সুযোগ এসেছে, দয়া করে আমার কাছে সত্য স্বীকার করুন। আমি সত্যকে সম্মান দেব। অপালা ক্ষণিক নীরব থাকেন। সম্ভবত সত্য স্বীকার করার জন্য সাহস সঞ্চয় করছেন। তাহলে কি অপালার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ইন্দ্রদেব এবার স্পষ্টকণ্ঠে অপালা বলেন—শোন অহল্যা, তোমার কাছে সত্য স্বীকার করা আমার কর্তব্য। শিক্ষা সমাপ্ত করে তুমি সংসারে প্রবেশ করতে চলেছ। তুমি অত্যন্ত সুন্দরী তাই সংসারে জটিল পথে নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে। সমাবর্তন উৎসবের উদ্‌যাপন রাত্রে আজ তোমাকে আমার জীবনের সত্য শোনানো আমার কর্তব্য। ভবিষ্যতে তুমি মিথ্যা অপবাদের স্বীকার হবে না বলে কে বলতে পারে? সুন্দরী নারীর অপবাদ থাকবে না, এরকম মনুষ্য-সমাজ কোথায়?

"তাহলে ইন্দ্রদেব কি আপনার অধর.....", "হ্যাঁ, ইন্দ্রদেব আমার অধর নিঃসৃত সোমরস আকণ্ঠ পান করেছিলেন, বাকি সব কথা মিথ্যা—কুৎসা। প্রতি সমাজেই কুৎসা রটনাকারী আছেন। বিনা কারণে কারও নিন্দা করতে তারা ভালোবাসে। আমার অধর নিঃসৃত সোমপান করার অর্থ কি আমার অধর পান করা? কেবল অধর পান নয়, ইন্দ্রদেব যে আমার সতীত্ব হরণ করেছেন—সে অপবাদও প্রচারিত হয়েছে। ইন্দ্রদেবের প্রতি ঈর্ষাহেতু মাঝে মাঝে এইরকম কুৎসিৎ আলোচনা হয়ে থাকে। তবে যদি আমাকে বিশ্বাস করো, তাহলে আমি বলব ইন্দ্রদেব আমার প্রতি কোনও অসদাচরণ করেননি। তিনি যথেষ্ঠ সংবেদনা ও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন আমার প্রতি। আমার কাছে তিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ইহা দিবারাত্রির মতো সত্য।"

কিন্তু আপনি সর্বসমক্ষে একথা ব্যক্ত করেননি কেন? মিথ্যা কলঙ্ক কেন মাথায় নিয়েছেন? এর দ্বারা কি আপনি ইন্দ্রদেবের অপমান করেননি? অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে আমি একথা বলি।

স্মিতহেসে অপালা বললেন—"অহল্যা! আমি মনে মনে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি। সত্যের অনুসন্ধানের জন্য আত্মাকে খুঁজতে হবে। বিন্দুমাত্র মিথ্যা না রেখে

সর্বান্তকরণে সত্যচিন্তন ও বাণীতে সত্যপ্রকাশ করাই হল দুরুহ তপস্যা। আত্মজ্ঞান বিনা এ তপস্যা সম্ভব নয়। আত্মজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রকে চিনতে হয়। ইন্দ্রকে চিনতে হলে ইন্দ্রিয়দের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে আত্মাকে খুঁজলে আত্মদর্শন হয় না। অহল্যা! নিজের আত্মাই হচ্ছে ইন্দ্র বা ঐশ্বর্যময়। সেই ঐশ্বর্যকে না চিনে মানুষ তার দুর্লভ জীবনকে ভোগময় করার লক্ষ্যে দুঃখময় করে তোলে। তাই সৎপথে সৃষ্ট হওয়া বিঘ্নগুলির সূক্ষ্ম বিনাশক ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা কর—'হে ইন্দ্র, ধন বিতরণ করা তোমার স্বভাব। তোমার কাছ থেকে ধনলাভ করে মানুষ নিজেকে ধনী মনে করে, অন্যকে তুচ্ছ মনে করে। লোভ, কাম, মোহ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর শত্রুগুলিকে পালন পোষণ করে মানবতারূপী বন্ধুকে হেয় জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই হে ইন্দ্র! আমাকে সেই ধন দাও, যা আমার মানবতাকে পালন করবে।" এইটুকু প্রার্থনা করলে কোনও কুৎসা, নিন্দা তাকে স্পর্শ করবে না। তুমি নিজেকে তথা ইন্দ্রকে চিনতে পারবে। কপোল-কল্পিত ইন্দ্র-অপালা উপাখ্যান আজ এমনই দৃঢ় যে সেখানে সত্যপাঠের অর্থ সত্যের অপলাপ। আমার আত্মা যদি নিষ্কলঙ্ক, ইন্দ্রদেব যদি আমার কাছে পরমাত্মা,' তাহলে আর কারও কাছে সত্যভাষণের আবশ্যকতা নেই। আমার আত্মাকে কি আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি না, সেজন্য সমাজের দর্পণের প্রয়োজন।" এইকথা বলার সময়ে শীর্ণকায়া বৃদ্ধা অপালার মুখমণ্ডল এক অনির্বচনীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সহসা আমার সম্মুখে সত্যের রূপ সাকার হয়ে ওঠে। আমি অপালার পদধূলি মাথায় নিলাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের বুকের উষ্ণতা আমার কাছে অজানা। সেই মুহূর্তে জননীর বুকের উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, গভীরতা, উদারতা, পবিত্রতা, মহানতা উপলব্ধি করি।

ভোরের পাখির কূজনের মধ্যে বৃদ্ধা অপালা ও বৃদ্ধ কুশাশ্ব পরস্পরকে নতুনরূপে দেখছিলেন অমৃতদৃষ্টি মেলে—তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আনন্দময়, ঐশ্বর্যবান, প্রেমময় পুরুষ ইন্দ্রদেব সহসা আমার বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে উদ্ভাসিত হলেন। আমার শ্রুতিপটে ঝঙ্কৃত হল বাল্যকাল থেকে শোনা সবাইয়ের মুখে আমার স্তুতি—অহল্যা তুমি ইন্দ্রযোগ্য, তুমি ইন্দ্রপূর্বা।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে গৌতম আশ্রমে প্রাতঃহোম আরম্ভ হল। হবন-ধূমে আশ্রমের আকাশ যেন উদাসীন দেখায়। হবন-ধূম আশ্রমবাসী সকল গুরু শিষ্যের মুখে বিষাদের মলিনতা এঁকে দিচ্ছে।

শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর আজ শিষ্যদের বিদায় পর্ব। আচার্য গৌতমের পায়ের কাছে বসে মাধুর্য অশ্রুমোচন করছিল আর বলছিল—"গুরুদেব আমাকে আপনার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমি এখনও অবোধ, অজ্ঞান। আমাকে সারাজীবন শিষ্য হয়ে থাকার অনুমতি দিন।"

কেবলমাত্র মাধুর্য নয়, এই অনুনয় সকল বিদায়ী শিষ্যের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়। বাল্যকালে পিতামাতাকে ছেড়ে আসা শিষ্যেরা গুরুকুল আশ্রমে বহুদিন অতিবাহিত করেছে। এখানে তারা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে, জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। গুরু এবং গুরু-পত্নীদের কাছে পিতৃস্নেহ এবং

মায়ের মমতা লাভ করে নিজের জন্মিত পিতামাতার অভাব ভুলেছে, উপরন্তু পিতামাতা এবং গৃহের মহিমা বুঝেছে এতদিনের অন্তঃরঙ্গতাকে ছিন্ন করে যাওয়ার সময়ে সকলেই ভাবপ্রবণ হওয়া স্বাভাবিক। এই বিদায়পর্ব প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। গুরুর কাছে এই বিদায়পর্ব পাঠ্যক্রমের একটি পর্যায় হতে পারে কিন্তু শিষ্যদের ক্ষেত্রে এক আবেগ-প্রবণ মুহূর্ত। মাধুর্য ছলছল নেত্রে গুরুদেবের পদতলে বসে আছে, আমি ও ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছি। আচার্য গৌতম আমার প্রিয় না হতে পারেন, কিন্তু গৌতম আশ্রম আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই আশ্রমের পশুপাখী. গাছপালা, নদী, ঝরণা বিশেষ করে আশ্রম নিকটস্থ অনার্যপল্লী। সব মিলে এই সমগ্র মহাপ্রকৃতি আমার অন্তর, বাহির মন আত্মা ও চেতনাকে আবৃত করেছে আমি যেন এই মহাপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অন্তঃরঙ্গতা কি করে গড়ে উঠল এই পাঁচ বছরে?

সম্ভবত এই জন্য যে এই মহাপ্রকৃতির কোলে আমি কেবল ঋতুমতী হইনি, নিজেকে ঋতম্ভরা মনে করছি। এই আকাশে আমার জন্য অনুভবের আকাশ এবং এই পৃথিবী আমার জন্য উপলব্ধির পৃথিবীতে পরিবর্তিত হয়েছে। রম্যবনের কোকিল ছিল আমার কাছে শুধু পাখি, কুহুতান ছিল মধুর কূজন। কিন্তু এই আশ্রমের কোকিল আমার অন্তরঙ্গ সখী, আর কুহুতান যেন আমার হৃদয়ের আবেগ। রম্যবনের মলয় ছিল বসন্তের মৃদু সমীর। গৌতম আশ্রমের মলয়, মধুর রোমাঞ্চ-স্বরূপ রম্যবনের স্রোতস্বতী শুধুমাত্র নির্মল জলধারা—কিন্তু এই মহাপ্রকৃতির মধ্যে নদী, ঝরণা সকলেই যেন অভিসারিকা।

রম্যবনের পুষ্পবটিকা ছিল সুরভিত উদ্যান আশ্রমের পুষ্পবাটিকা আমার কাছে স্বপ্নবিভোর হৃদয় ব্যতীত অন্য কিছু নয়। রম্যবন নিকটস্থ অনার্যপল্লী ছিল আমার অবসর বিনোদনের ক্রীড়া প্রাঙ্গণ। এখানকার অনার্যপল্লী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং অন্তিম আহ্বান। আমার জীবনের লক্ষ্যধার্য করেছে এখানকার অনার্যবসতি। কি করে বিচ্যুত হব গৌতম আশ্রম থেকে। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর এখানে থাকবই বা কি করে!

শিক্ষা কি কখনও সমাপ্ত হয়? প্রকৃতপক্ষে কি আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে? তাহলে আচার্য কেন আমার শিক্ষা সমাপ্তির ঘোষণা করলেন সমাবর্তন উৎসবে ইন্দ্রদেবের উপস্থিতিতে।

এই রকম কত কথা আকাশ পাতাল ভাবছি। আমার কত কথা অপূর্ণ রয়েছে। কত স্বপ্ন অর্ধবিকশিত, বৃত্রাসুরবধ, দধীচি উপাখ্যান ইত্যাদি আখ্যান তাদের বলব বলব করে বলা হয়নি। অরণ্য থেকে সমিধ ও সোমলতা সংগ্রহকালে সামান্য সুযোগ পেলেই যতটা সময় তাদের কাছে কাটিয়েছি, সেটা যথেষ্ঠ নয়। তাদের আমি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কিন্তু আশ্রমের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা তদুপরি সময়াভাবে সব প্রতিশ্রুতিই কথার কথা হয়ে থেকে গেছে। আবার সামাজিক অন্যায়, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা অন্ধবিশ্বাস, দ্বেষ, প্রতিহিংসা তাদের জীবনকে দুর্বিবহ করেছে, তার প্রতিকারের স্বপ্নও অপূর্ণ। আশ্রমের কঠোর নীতিনিয়ম পালন করে ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপ্ন সাকার করার সুযোগই-বা কোথায় ছিল। পিতার ইচ্ছায় এই আশ্রমে এসেছিলাম আচার্যের ইচ্ছায় পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি। একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ যেন আমার পা-দু'টি নয়, আমার আত্মাকেও আঁকড়ে ধরেছে এই মহাপ্রকৃতির মহিমাময় বিস্তারের মধ্যে।

আমি ও আচার্যের পাদস্পর্শ করলাম, তিনি কিঞ্চিত পিছনে সরে গেলেন। অথচ মাধুর্য আচার্যের পা ধরে পড়ে আছে, অনুনয় করছে বিদায় না দেওয়ার জন্য। আমার স্পর্শে গুরুদেবের অনাদর না কুণ্ঠা। তিনি কি এখনও আমাকে কন্যা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি?

মাটির প্রতিমার মতো অবোধ অজ্ঞান একটি বালিকা হিসাবে আমি এসেছিলাম এই আশ্রমে। আচার্য গৌতম, গুরুপত্নীগণ এবং অন্যান্য সকল আচার্যগণ আমার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বকে দিব্যস্পর্শ দিয়ে আমাকে তেজস্বিনী এবং মনস্বিনী করেছেন। আজ আমি যতটুকু শিক্ষালাভ করেছি তা আচার্যের আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতির জন্যই সম্ভব হয়েছে। এখানকার সমস্ত স্নেহ, মায়া, মমতাকে পিছনে ফেলে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে। আমার মন অত্যন্ত ব্যকুল। মাধুর্য এবং অন্য সকল শিষ্যের মনের অবস্থা আমারই মতো।

সমাবর্তন উৎসবের অন্তিম আহুতির স্বর্ণশিখা উর্ধ্বে উঠছে। সকলে সমস্বরে গুরুদেবের কাছে নিবেদন করছে—"আচার্য! আপনি আমাদের চরণে স্থান দিন" —আমি ও মন্ত্রবৎ সেই বাক্যটি উচ্চারণ করে চলেছি। আচার্য গৌতম গম্ভীরস্বরে বলেন—"পুত্র! তোমাদের শক্তি ও সুগন্ধকে আশ্রমের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখাটা হবে স্বার্থপরতা। বর্তমানে সমস্ত জগত তোমাদের ব্যক্তিত্বের সুগন্ধে মধুময় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজের পুরুষার্থ দ্বারা জগতে শান্তি, মৈত্রী, অহিংসার পথ প্রদর্শন করাই হল এই আশ্রম জীবনলব্ধ শিক্ষার লক্ষ্য। তোমরা সবাই একেকটি জ্যোতি। জগৎ সেই জ্যোতির প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তাই এই বিদায়ের উদ্দেশ্য মহৎ। মহৎকার্য যত বেদনাদায়ক হলেও অশ্রুমোচন বিধেয় নয়।"

এবার আমাকে লক্ষ্য করে আচার্য বললেন—"সুচরিতাসু! সর্বদা উদ্‌যোন্মুখী হও—মানুষের মন পতনোন্মুখ। মনকে সদাই উর্ধমুখী করো। বিফলতায় হতোৎসাহ হও না। জীবনে ভুলভ্রান্তি এবং আঘাতে বিচলিত হবে না। প্রত্যেক বিফলতা মানুষের চরিত্র শোধন করে থাকে। প্রত্যেক স্খলন মানুষকে সতর্ক করে দেয়। প্রতিটি আঘাত মানুষের সহনশীলতার মানদণ্ড। প্রতিটি ভুল মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। প্রত্যেক পতন উত্থানের দিক্‌নির্দেশক। প্রত্যেক বিদায় মিলনের মাঙ্গলিককে অপেক্ষা করে থাকে। তাই পতনকে পতন এবং বিদায়কে বিদায় মনে করা তোমার কাছ থেকে আশা করা যায় না। তুমি ব্রহ্মাপুত্রী নারদভগ্নী, গৌতম শিষ্যা এবং....."

'এবং ইন্দ্রযোগ্য.....' আচার্যের বাক্যংশ সহসা প্রথা পূরণ করে এবং আচার্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। প্রথার এই অযথা হস্তক্ষেপে আমি আশ্চর্য হলাম না। অনিন্দ্যসুন্দরী গুণবতী নারীকে বরনারী বলা যেমন প্রথা, সেইরকমই বরনারীকে ইন্দ্রযোগ্যা বলাও প্রচলিত। কোনও যুবতীর প্রশংসাকালে 'ইন্দ্রযোগ্যা' বলাটা নতুন কিছু নয়। আমার ক্ষেত্রেও 'ইন্দ্রযোগ্যা' এক বিশেষণ অথবা অলংকারে পরিণত হয়েছে। বাল্যকাল থেকে যে আমাকে দেখেছে, ইন্দ্রযোগ্যাই বলেছে। এতে আচার্যের গম্ভীর হওয়ার কোনও কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। আচার্যের

বিদায়কালীন উপদেশ আমার জন্য ভিন্ন কেন?-এ উপদেশ না, অভিশাপ! পতন, স্খলন, বিফলতা, ভুলভ্রান্তিই আমার জীবনের মাপকাঠি। বিরাজ সফলতা যশ, খ্যাতি—পুরুষের পুরুষার্থের পরিচয় অথচ নারীর নারীত্বের পরিচয় হল পতন থেকে উত্থান, বিফলতা থেকে সফলতা, পাপ থেকে পুণ্যের শঙ্খধ্বনি.....।

কেন জানি না আচার্যের উপদেশে আমি বিমর্ষ হয়ে গেলাম। আমার কানের কাছে আমার নিয়তিই যেন ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করছে.....। আমি নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করলাম—"জীবনের সুখ কোথায় নিহিত?"

ক্ষুণ্ণ হওয়ার মতো আচার্য উত্তর দিলেন—সুখ! তুমি সুখের সন্ধান কেন করছ নারী? সুখ তো শরীরগত। 'সু'-র অর্থ হল সুন্দরতা, সুস্থতা, সুষ্ঠুতা। 'খ'-র অর্থ ইন্দ্রিয়। শরীর ইন্দ্রিয়ের অধীন। শারীরিক সুখ পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা সম্ভব। কিন্তু শারীরিক সুখ তোমার শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল আনন্দ। আনন্দ হল আত্মাগত। আনন্দ প্রাপ্তির জন্য ভৌতিক ঐশ্বর্য নয়, আত্মিক ঐশ্বর্যের সন্ধান করতে হবে। সুখ ও আনন্দের মধ্যে এটাই পার্থক্য। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে বহুলোক পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্য নিজের সমস্ত শক্তিক্ষয় করে ভৌতিক ঐশ্বর্য লাভ করলেও আত্মানন্দের পরিবর্তে দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তাই ভোগ করে। সুপথই আত্মিক ঐশ্বর্য লাভ করবার পথ। তুমি সুখোন্মুখী না হয়ে আনন্দোন্মুখী হও।"

সুখ এবং আনন্দের ব্যাখ্যা শুনে আমি সামান্য বিচলিত এবং চিন্তিতা হয়ে পড়লাম। কারণ এরসাথে শরীরও আত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আমি প্রশ্ন করি—"শরীর এবং আত্মা কি বিপরীত মুখী? তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি? শরীর কি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়?"

আচার্য ও সামান্য বিব্রত মনে হল। কারণ এই পাঁচ বছরের মধ্যে শরীর এবং আত্মা সম্পর্কে বহু দার্শনিক ব্যাখ্যা তিনি আমার সামনে করেছেন। অথচ আজ সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপনের পর আমি শরীর ও আত্মার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র পাচ্ছি না। আমার-বা দোষ কোথায়? আমার শরীর সম্পর্কে জগৎ মুখর—আমার আত্মা কারও কাছে দৃশ্য নয়। এমনকি আমার কাছেও আমার আত্মা স্পষ্ট নয়। আচার্যও কি আমার আত্মাকে চিনেছেন? তাই আমার মনে এরকম সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক নয় কি?

আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে সম্ভবত আচার্য আমার আত্মার স্বরূপকে দেখার চেষ্টা করছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"অহল্যা! শরীর এবং আত্মার সংযোগই জীবন। শরীর এবং আত্মার বিয়োগই মৃত্যু। কিন্তু শরীর মরণশীল আত্মা অবিনশ্বর। জীবনের ভিতরে এরা অভিন্ন এবং পরস্পরের প্রতি প্রভাবশীল। তাই আত্মশুদ্ধির জন্য শরীরের শুচিতা অপরিহার্য। আত্মা যদি ঈশ্বর হয়, শরীর হল আস্থান। আস্থান অপবিত্র হলে ঈশ্বর বিমুখ হন। আত্মা বিমুখ হলে দুরাত্মাই আস্থান জমায়।"

আত্মা এবং শরীর সম্পর্কে আমার সন্দেহমোচন হওয়ার পরিবর্তে ঘনীভূত হল। কিন্তু বিদায় বেলায় এ সম্পর্কে অধিক বাক্যালাপ করা আমার উচিত মনে হল না। কিন্তু আমার

মনে হল, আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। ব্রহ্মচারীগণ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত গুরুকুলে থাকেন। কমপক্ষে বারবছর শিক্ষালাভ করেন। অথচ মাত্র পাঁচবছর শিক্ষালাভ করে ষোলো বছরে পদার্পণ করা মাত্রই আমি গুরুকুল থেকে বিদায় নিচ্ছি। তাই অনেক কথা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেছে। পিতা আমাকে শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন, না বিবাহের বয়সে পদার্পণ করা পর্যন্ত গৌতম আশ্রমে সুরক্ষিতভাবে থাকার জন্য পাঠিয়েছিলেন!

সম্ভবত শেষ কথাটিই সত্যি। আমার শারীরিক সৌন্দর্য-ই আমার বিপদের কারণ হতে পারে, পিতার আশঙ্কা। দেবতা, দানব, যক্ষ. কিন্নর, মানব যে কেউ রম্যবনের নির্জন পরিবেশে আমার পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। 'শিক্ষা' ছিল আমার জন্য একটা অজুহাত। ব্রহ্মাপুত্রী হলেও আমি তো পুত্র নয়, পুত্রী! শিক্ষা আমার সুরক্ষা নয়, গুরু আমার সুরক্ষা, কারণ তিনি পুরুষ।

আচার্য সকল শিষ্যকে হাসিমুখে বিদায় জানালেন। বিদায় দেওয়ার পূর্বে গুরুদক্ষিণার ছলে শিষ্যর ব্যক্তিত্ব এবং মনোবৃত্তি অনুযায়ী সঙ্কল্প করিয়ে নিলেন। কাউকে বললেন—গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তুমি অকারণ ক্রোধ করবে না। আবার কাউকে বললেন—অযথা হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ ও রক্তপাত করবে না। শিষ্য কোনও অনুচিত কাজ না করুক এই উদ্দেশ্যে গুরুদক্ষিণার ছলে শিষ্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নেন আচার্য। প্রত্যেক শিষ্য আচার্যের পাদস্পর্শ করে গুরুর শর্ত অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করে ও বিদায় নেয়। মাধুর্য আচার্যের অত্যন্ত প্রিয়শিষ্য ছিলেন। মাধুর্যকে বুকে জড়িয়ে আচার্য আশীর্বাদ করলেন। সজলকণ্ঠে মাধুর্য প্রশ্ন করে—"আমার যদি কখনও আপনার সান্নিধ্যলাভের ইচ্ছা হয়, তাহলে কি আমি পুনর্বার আপনার আশ্রমে আসার অনুমতি পাব?"

"মোহবশত যদি আমার দর্শন ইচ্ছা কর তাহলে গৌতম-আশ্রম তোমার জন্য রুদ্ধ। জ্ঞানচর্চার জন্য যদি আসতে চাও তাহলে গৌতম-আশ্রম সদা উন্মুক্ত। এই আশ্রম যে কোনও শিষ্যের জন্য তপস্যাস্থল। চিত্তবিনোদনের স্থান নয়। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে মাধুর্য চলে গেল। যাওয়ার সময় আমার দিকে বিষাদভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—"অহল্যা! তোমার মঙ্গল হোক্। সম্ভবত তোমার সঙ্গে পুনর্বার দেখা হবে এই আশ্রমে....., সেই আশা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু এই আশ্রমে কি করে দেখা হবে? আমিও আজ আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি"—অবাক হয়ে আমি বলি। মৃদু হেসে মাধুর্য বলে—গৌতম আশ্রম হল তপস্যার পীঠস্থান। গুরুদেব তো তোমাকে তপস্যা নিষেধ করেননি। তাছাড়া বিদায়ই মিলনের মাঙ্গলিক গায়....., এই বলে মাধুর্য বিদায় নিয়ে চলে যায়। মাধুর্য যেন আমার নিয়তিকে নিজের কণ্ঠে আমাকে শুনিয়ে গেল।

বিদায়ের সেই মহামুহূর্ত উপস্থিত। অরণ্য পথে আমাদের কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য আচার্য আমাদের সাথে চলেছেন। আমার ইচ্ছা অনার্যপল্লীতে ঋচা, রুদ্রাক্ষ ও অন্যান্যদের সাথে দেখা করে বিদায় নেব। সেই অনুসারে ভাই নারদ অরণ্যের প্রান্তে আমার জন্য একটি

রথে অপেক্ষা করবেন। ত্বয়ি, আনিক্ষিকা, বার্ত্তা এবং নীতিকে নিয়ে প্রথা এগিয়ে গেছে। সম্ভবত বিদায়বেলায় গুরুশিষ্যকে একান্তে ছেড়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য। বিদায়বেলায় আচার্য আমাকে গলায় লাগাবেন। আদর-পূর্বক আর্শীবাদ করবেন। যেমন মাধুর্যকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছিলেন, ঠিক সেইরকম। কিন্তু শিষ্যা হলেও আমি নারী। হয়তো আমার সখীদের সম্মুখে আচার্য সংকোচবোধ করবেন। আশীর্বাদ ও সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তাই,প্রথা তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে। আমি মনে মনে হাসি। গুরুদেবের কথা অনুযায়ী শরীর তুচ্ছ—আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মার ক্ষেত্রে নারী পুরুষে ভেদ থাকে না। শরীরই নারী পুরুষের ভেদ এবং আকর্ষণের মুল কারণ। অথচ শরীরের এই প্রভেদ সৃষ্টি প্রবাহের জন্য কত প্রয়োজনীয়! শরীর যদি তুচ্ছ, নশ্বর, পতনশীল, অলীক মরণশীল, তাহলে স্রষ্টা শরীরকে আত্মার আধার করলেন কেন? আত্মা ও আত্মার মিলনে সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সম্ভব করলেন না কেন? যদি তাই হত সম্ভবত শরীরকে অবজ্ঞা করে নারী পুরুষ পরস্পরের আত্মাকেই খুঁজত। স্পর্শ করত। আত্মার সাথে আত্মাকে মিলিয়ে বেঁচে থাকত। নারী পুরুষের সম্পর্ক হত অপার্থিব—চির মধুময়। অমৃতের সাথে অমৃত মিশে সৃষ্টি হত অনন্ত অমৃতময় পৃথিবী।

অরণ্যের মধ্যভাগে এসে দাঁড়ালেন আচার্য। অনার্যপল্লীর কোঁলাহল শোনা যাচ্ছে। আচার্য জানেন, অনার্যপল্লী থেকে বিদায় না নিয়ে অমি যাব না। এতে তিনি সন্তুষ্ট না হলেও আজ আমাকে বাধা দিতে পারবেন না। তাই হাত তুলে তিনি আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। আমি তাঁর চরণধূলি নিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করলেন না। গলায় লাগিয়ে অলিঙ্গন করা তো দূরের কথা, তিনি আমার মাথায়ও হাত রাখলেন না। আচার্যের কাছে আমি শিষ্যা নয়, আমি নারী। আমার শরীরই আমার পরিচয়। শরীরই সম্পর্কের সীমা নির্ণয়কারী—তাহলে আমার আত্মা কোথায় আছে? শরীরের মধ্যে আত্মা থাকার মূল্যই বা কি? শরীর কি আত্মার চেয়ে বলবান? এত শক্তিমান যে, আচার্যও তাকে অতিক্রম করতে পারছেন না।

অনার্যপল্লীর দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে অন্যমনস্কতা হেতু আমার পা একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর পড়ায় আমি শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাই হাত বাড়িয়ে তিনি আমাকে এই পতন থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাকে কোনও রকম সাহায্য করলেন না। আমার শরীরের ধুলো ঝেড়ে দিলেন না। এমনকি আমার পা ও কপাল থেকে ঝরে পড়া রক্তও মুছে দিলেন না! নিষ্ঠুরের মতো আমার পতনের দৃশ্য দেখছেন এবং শুষ্ক উপদেশ বর্ষণ করছেন—"মানুষ নিজেই নিজের পতনের কারণ। তাই পতন থেকে উত্থানের কর্তা সে নিজে। যত সতর্ক হলেও পৃথিবীর ওপর বিপত্তি আসে। যে অসাবধান, তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অবধারিত। নারীর চালচলন, আচার ব্যবহার সম্পর্কে বহু উপদেশ তুমি গুরুপত্নীদের কাছে শুনেছ। আজ বিদায়বেলায় মাত্র তিনটি আচরণ সম্পর্কে আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। চলার সময়ে নারীর দৃষ্টিনত করে চলা উচিত, তাহলে পতনের সম্ভাবনা কম। লজ্জা, শালীনতা ও নম্রতা নারীর ভূষণ। উগ্রভাব, উদ্ধত আচরণ নারীকে কুৎসিৎ এবং বিকৃত করে।

আর একটি কথা, চপলতা নারীর পক্ষে বিপদজনক। মনের গতির সাথে পায়ের পাতার সম্পর্ক আছে। পুনরায় মনে শৃঙ্খলা না থাকলে পা বিশৃঙ্খল হয়। মন চঞ্চল হলে মনে স্থিতি দুর্বল হয়। নারীর স্খলন মনুষ্য সমাজের ভিত্তিকে বিচলিত করে। কারণ নারী হল মানুষের জন্মদাত্রী ও পালন কর্ত্রী। অধীর চিত্ত শরীর ও আত্মার সংযোগকে শিথিল কবে এবং পতন ডেকে আনে। কিন্তু পতন নিয়তিব দিগন্ত নয়। উত্থানের সূর্যোদয় আকাশের কোনও কোণে হলেও অপেক্ষা করে থাকে। অহল্যা ওঠো—নীতি এবং প্রথা তোমাকে সাহায্য করার জন্য আসছেন। রক্তক্ষরণকে ভয় করো না। রক্ত সঞ্চয় নয়, রক্তক্ষরণই প্রকৃত জীবন।"

আচার্য ফিরে যাচ্ছেন। প্রথা ও নীতি আমাব দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ভাবছি—আমার গুরু এবং আমার আত্মা আমাকে রক্ষা করল না। তাহলে তো জ্ঞান লাভের জন্য আমাকে আশ্রমে ফিরে আসতে হবে! অনার্যপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা অশ্রুজলে আমাকে বিদায় জানায়। মলিন ধূলি-ধূসরিত হাতে তারা আমার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে নেয়। স্নেহ আদবের মহৌষধি স্নিগ্ধ করে ক্ষতস্থানের যন্ত্রণাকে। তাদের কাছে আমি নারী নয়, আর্যকন্যাও নয়, আমি ছিলাম তাদেরই একজন—যার পরিচয় মানুষ, একটি আহত প্রাণী। সকলের একটাই প্রশ্ন—"কবে আসবে?" আমাদের শিক্ষা যে অসমাপ্ত রয়েছে...., তোমাকে ছেড়ে আমরা কি করে থাকব? কেন দু'দিনের মায়ায় জড়ালে?" সহসা আমার মুখ থেকে আমার অদৃষ্টের ভাষা উচ্চারিত হল—"খুব শীঘ্রই আমি ফিরে আসছি, তোমাদের ছেড়ে আমিও-বা কি করে থাকব? আমাদের সকলের শিক্ষা, সাধনা, তপস্যা অর্ধ সমাপ্ত হয়ে রয়েছে....., আমি আসব—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সমাবর্তন উৎসব হল জ্ঞানযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। কিন্তু আমার জন্য বিদ্যাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি আরও বাকি আছে। গুরুকুল থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে সবাই স্নান করে। স্নাতক হওয়ার সময়ে কেন কে জানে আমার এই স্নানপর্বটি সংঘটিত হল না। অর্থাৎ আমি স্নাতক নই। কঠোর তপস্যার অগ্নিকুণ্ডে নিজের সমস্ত উগ্র আবেগকে আহুতি দিয়ে শুদ্ধ পবিত্রও তেজস্বরূপ সকলে স্বগৃহে ফিরে গেল। আমি ভাই নারদের সাথে রম্যবনে ফিরে এলাম। গুরুকুলে আমি যে কঠোর তপস্যা করেছি, সে রকম অনুভূতি আমার হল না। সব যেন অপূর্ণ। জীবন কি এইরকম অপূর্ণ!

ফেরার পথে ভাই নারদকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম—"আমার বিদ্যাযজ্ঞ কি সমাপ্ত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? স্নাতক হিসাবে আচার্য আমাকে বিদায় দিয়েছেন বলে মনে হল না। গৌতম আশ্রমে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় বললে কি আমার অপরাধ হবে?

ভাই নারদ মৃদুহেসে বলে—শোন অহল্যা। গৌতমের আশ্রমে বালিকা এবং শূদ্রকে গ্রহণ করা হয় না। পিতার অনুরোধে প্রথমবার তোকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছুদিন গুরুকুলে থেকে কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা শেখা তোর জন্য আবশ্যক ছিল। সেইটুকু শিক্ষা তোর জন্য যথেষ্ঠ। তাই ধরে নিতে হবে যেটুকু শিক্ষা তোর জন্য আবশ্যক ছিল, তা তুই সমাপ্ত করেছিস।" পুরুষ

দ্যুলোক, নারী পৃথিবী। দ্যুলোক এবং ভূলোকের সাহচর্যে সমাজ, সংসার, সংস্কার, পরম্পরা, সভ্যতা এবং মানব সংস্কৃতির উন্মেষ এবং উত্তরণ।

পুরুষ সত্য, নারী শ্রদ্ধা। উচিত মুহূর্তে সত্য নিষ্ঠুর হতে পারে কিন্তু শ্রদ্ধা নিষ্ঠুর নয়। সত্য এবং শ্রদ্ধার সংযোগে এই পৃথিবী শুভঙ্করী ঋতম্ভরা। সত্য থেকে শ্রদ্ধাকে বিচ্ছিন্ন করলে সত্য হয় বিকট এবং শ্রদ্ধা পরিণত হয় মোহতে। পুরুষ অভিমান, নারী ক্ষমা। অভিমান এবং ক্ষমা পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। শুধু অভিমান বা কেবলমাত্র ক্ষমার দ্বারা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ কারও উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পুরুষ নারীর মিলনেই সংসার বিদ্যমান। সভ্যতার প্রসার সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নারী পুরুষের মিলনের অর্থ স্বেচ্ছাচার নয়। শুভ সংকল্প নিয়ে সমাজ নারী পুরুষের যে শুভঙ্করী মিলনকে অনুমোদন করেছে, তার নাম বিবাহ। সৌম্য ও তেজের সাহচর্যকেই সমাজ বিবাহ আখ্যা দেয়। সূর্য দ্বারা চন্দ্রের উদ্ভাসিত হওয়ার মতো বিবাহ দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সদগুণ উদ্ভাসিত হয়। বিবাহ কামনাবাসনাকে প্রজ্জ্বলিত করে না, প্রশমিত করে। পুরুষকে দেয় পিতার গৌরব, নারীকে করে কল্যাণী জননী। মানুষের মনের কাম এবং অর্থ বাসনাকে মোক্ষপথে পরিচালিত করা বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য। তাই বিবাহ একটি ধর্মীয় সংস্কার। ব্রহ্মচর্যের শেষে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশের প্রথম পবিত্র সংস্কার হল বিবাহ। তাই ব্রহ্মচারিণীর জীবন অতিবাহিত করে রম্যবনে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে আমার বিবাহের প্রথম এবং প্রধান পর্যায় আমার পিতার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। পিতা আমার পতি নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। আমি রম্যবনে পৌঁছানো মাত্রই পিতা আমাকে বললেন—"অহল্যা! তুই বালিকা হিসাবে গৌতম আশ্রমে গিয়েছিলি, নারী হয়ে, সুরক্ষিতভাবে শিক্ষালাভ করে আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে স্বগৃহে ফিরে এসেছিস, তাই আমি তোর উপর সন্তুষ্ট ও গৌতমের প্রতি কৃতজ্ঞ। তুই ছাত্রীর কর্তব্যে ত্রুটি করিসনি, গৌতম গুরুর কর্তব্যে ত্রুটি রাখেন নি।"

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ জীবনের এই চার তত্ত্ব সম্পর্কে তুই গৌতম আশ্রমে শিক্ষালাভ করেছিস। তাই এখন তুই "চতুষ্কপর্দা" হয়ে এই চতুঃবর্গ ফল প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাভ করেছিস। তুই এখন হব্যা—স্বীকারযোগ্যা, রমণীয়া কাম্যা। তুই জ্ঞানযুক্তা প্রতীচী। তুই এখন কুলসংবর্দ্ধিনী দূর্বা হবি বলে আমার আশীর্বাদ। তোর জন্য বহু প্রার্থী অপেক্ষারত। কিন্তু সবদিক চিন্তা করে আমি তোর উপযুক্ত পাত্র মনোনয়ন করেছি। বিয়ের জন্য তুই মনকে প্রস্তুত করা মাত্রই আমি তোর ভাবী স্বামীর নাম ঘোষণা করব এবং কালবিলম্ব না করে তোর বিবাহ সম্পন্ন করব।

আমি জানি, তুই গুরুকুলে বিবাহ সম্পর্কে গুরুপত্নীদের কাছে কিছু জ্ঞান আহরণ করেছিস, কিন্তু তা যথেষ্ঠ নয়। তাই বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে তোর আরও অধিক জ্ঞান আহরণ আবশ্যক। নারী জীবনের বৈদিক আদর্শ সম্পর্কে আরও একবার সচেতন হওয়া আবশ্যক। এই দায়িত্ব তোর আজন্ম তত্ত্বাবধায়িকা প্রথার ওপর আমি ন্যস্ত করেছি। প্রথা কেবল বয়স্কা নয়, সে অভিজ্ঞাও। তাই তার সাথে কিছুদিন নির্জনে রম্যবনে

থেকে নিজেকে বিবাহোন্মুখী কর। আমি উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মালোক থেকে আসব এবং অনাড়ম্বর সাত্ত্বিক পরিবেশে তোর বিবাহ সম্পন্ন হবে। সেইজন্য আমি ত্রয়ি, আন্বিক্ষিকা, বার্ত্তা ও নীতিকে আমার সাথে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাচ্ছি। তারা তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে। আমার বিশ্বাস তাদের শিক্ষা তোর আত্মদীপকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখবে।"

এইটুকু বলে পিতা ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন আমি এতদিন পরে ফিরে এলাম, আমার সাথে একদিনও রম্যবনে থাকলেন না, উপরন্তু বিবাহের মতো আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন এবং আমি আসামাত্রই ঘোষণা করে দিলেন এবং আমার মনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। আমার জীবনের ওপর এতবড় হস্তক্ষেপ করা যেন তাঁর অধিকার। আমি যেন সজীব অহল্যা নয়, নিষ্প্রাণ প্রতিমা। আমাকে যেখানে খুশী সেখানে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। ত্রয়ি, আন্বিক্ষিকা, বার্ত্তা এবং নীতি পিতার বিদ্যানুগামিনী শিষ্যা। তারা আমাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন, কিন্তু আমার হৃদয়ের ভাষা তাদের কাছে অশ্রুত রয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। অথবা তাঁরা সব জেনেও অজানা। তাঁরা যেন আমার সহচরী নয়, পিতা কর্তৃক নিযুক্ত চারবিদ্যা। কার্যকাল সমাপ্ত হওয়া মাত্র স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা আমার জন্য ভাববেন কেন? ন্যায়, ধর্ম, নীতি, শৃঙ্খলা কাম্য হলেও কঠোর নয় কি? কঠোরতাই তাঁদের করে নিবপেক্ষ এবং চিরন্তন। কিন্তু সেকথা বুঝবার বয়স আমার তখন হয়নি। তাই পিতার ঘোষণার পর তাদের নির্লিপ্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়াটা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। তাই নিরূপায় হয়ে আমি "প্রথা"কে আঁকড়ে ধরেছিলাম। তার বুকে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করি। নীরবে শুনি তার সব আদেশ, উপদেশ। এছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল।

আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত, স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় স্বরে প্রথা বলে—"মা, অহল্যা! এবার অন্তর্মুখী হও। তুমি সুন্দরী আকর্ষণীয়া, চন্দ্রিকাসম সুখদায়িনী। কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্যে নারী মহতী ও পূজ্যা হয় না। অন্তঃকরণের পবিত্রতাই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য। সাত্ত্বিক সোমরস তোমার হৃদয়ে দিব্য ভাবনার মন্দাকিনী হয়ে প্রবাহিত হোক্। তাহাই তোমাকে ব্রাহ্মী করবে—তোমাকে দেবে দিব্য সৌন্দর্য। পাপধ্বংস-কারী সৌন্দর্য তোমার মধ্যে প্রকটিত হোক। প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানের কিছু না কিছু মহৎ উদ্দেশ্য আছে। পারিবারের ধর্মপালনের জন্য বিবাহ সংস্কার নারীকে করে ধর্মপত্নী। পত্নীর সতীত্ব কর্মদক্ষতা, সুশীলতাই গৃহ, পরিবার এবং সমাজের সর্বস্ব.....।"

প্রথা আরও কত উপদেশ দিতে থাকে। কিন্তু আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবি, পিতা আমার জন্য কাকে যোগ্য মনে করেছেন—কে আমার ভাবী পতি? অদম্য কৌতূহলবশত প্রথার উপদেশে কান না দিয়ে আমি প্রশ্ন করি—"প্রথা, তুমি কি জান কে আমার ভাবী স্বামী। আমার জন্য কাকে উপযুক্ত মনে করে পিতা আমার বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? উপরন্তু আমার জীবনের এতবড় সিদ্ধান্তে আমার মতামতের কি কোনও মূল্য নেই?"

এইরকম একটা প্রশ্ন যেন প্রথা আশা করছিল। তার দীর্ঘ জীবনে মানবসন্তানের তত্ত্বাবধায়িকা হিসাবে এইরকম বহু প্রশ্নের সম্মুখীন সে হয়েছে, এবং তার উত্তরও রয়েছে। তাই অবিচল কণ্ঠে সে বলে—"অহল্যা! বিবাহ হল সমাজের মূল সংস্কার। ভিত্তিপ্রস্তরহীন প্রাসাদ এবং বিবাহবিহীন সমাজ ক্ষণস্থায়ী। বিবাহ হল এক পবিত্র যজ্ঞসদৃশ। ইহা কল্পতরু সম কামদ। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ক্ষণিক কামভাব বিবাহ সৃষ্টি করে না—পতি-পত্নীব মধ্যে কামভাবকে অতিক্রম করে রামভাব অর্থাৎ রমণীয়ভাব ও নিঃস্বার্থ প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত করাই হল বিবাহের উদ্দেশ্য। স্বার্থের পথ থেকে পরমার্থের পথে নিয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র বিবাহ। তা না হলে বিনা বিবাহে নারী ও পুরুষের ইন্দ্রিয় বাসনার অবাধ তৃপ্তি সাধনে সমাজ বাধা দিত না। তাই বিবাহ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমার মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তোমার পতি নির্বাচন করে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বিবাহ-নীতি বহির্ভূত কোনও কাজ করেন নি। উচ্চকুলসম্ভবা, রূপগুণসম্পন্না, সম্ভ্রান্ত কন্যার পক্ষে এইরূপ বিবাহ শোভনীয়। ইহা ব্রাহ্মবিবাহ। এখানে ব্রহ্মচারিণীকে তার পিতা উপযুক্ত বিদ্বান, সুশীল পতির হাতে দান করেন। অবশ্য গান্ধর্ব বিবাহও সমাজ স্বীকৃত। চপলমতি যুবক যুবতীগণ কামভাবে উদ্বেল হয়ে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে। কিন্তু তুমি ব্রহ্মাপুত্রী, এইরকম বিবাহ তোমার পক্ষে শোভন নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তোমার জন্য যাঁকে উপযুক্ত মনে করেছেন, তাঁকে বরণ করাই শোভনীয়।"

"কিন্তু স্বয়ম্বরা কন্যাদ্বারা নির্বাচিত পতিকে পিতামাতার অনুমোদন করাটাও সমাজে গ্রহণীয়। পিতা আমার জন্য স্বয়ম্বরের আয়োজন করতে পারতেন। আমি পিতার অনুমোদন সহ পতি নির্বাচন করতাম—আমার মাতা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি আমার মনেব কথা বুঝতেন। মা না থাকায় আমি তোমাকে আমার মনের কথা জানালাম। আমি বালিকা নই যৌবন প্রাপ্তির পরই আমার বিবাহ হচ্ছে। পিতা যাকে নির্বাচন করেছেন সে যদি আমার মনোমত না হয় তাহলে আমার দাম্পত্যজীবনের পরিণতি কি হবে ভাবতে পারছ প্রথা?"

আমার এই স্পষ্টোক্তিতে প্রথা জিভ্ কামড়ে কানে হাত চাপা দিয়ে বলে—"পুত্রী! এইরকম কথা বলতে নেই। তুমি এখন বরপূর্বা, অন্য চিন্তায়ও নারীর সতীত্বে আঁচ আসতে পারে। গুণবান ও রূপবান পুরুষকে বরণ করার অধিকার কন্যার আছে। অবশ্য গুণ, কর্ম, স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয় হলে বিবাহ সফল হয়। সমধর্মী পুরুষ জীবনসঙ্গী হলে বিবাহিত জীবন সুখময় হয়। কিন্তু এখন আর সে কথা কেন? পিতা যাকে নির্বাচন করেছেন তিনি ছাড়া তোমার অন্যগতি নেই। ব্রহ্মাবাক্য অনড়। পিতার নির্বাচনই তোমার নিয়তি। জন্মের পর তুমি সোম দেবতার দ্বারা পালিত হয়েছ, তাই তুমি সৌমা। তারপর সোমদেবতা তোমাকে গন্ধর্ব দেবতার নিকট অর্পণ করেছেন। তাই তুমি সুকণ্ঠী এবং প্রিয়ংবদা। গন্ধর্ব দেবতা তোমার কণ্ঠ স্বয়ংমাধুর্যে ভূষিত করার পর তোমাকে অগ্নি দেবতাকে অর্পণ করেছেন। যার ফলে তোমার অঙ্গে-অঙ্গে যৌবনের বৈভব দেখা দিয়েছে। বর্তমান অগ্নি দেবতাকে সাক্ষী রেখে সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করে পিতার মনোমত পাত্রকে বিবাহ করে পিতার সম্মান বৃদ্ধি

করাই তোমার কর্তব্য। এখানে আমার অস্তিত্ব পিতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে স্বামীর সাথে সাথে যুগ্মভাবে জীবনকে যজ্ঞময় কর। তুমি সুলক্ষণা, তেজস্বিনী সংযত ও সাধনাময়ী হয়ে গুরুকুল থেকে ফিরে পিতার যশ বৃদ্ধি করেছ। এবার তোমার সদ্‌গুণ সদাচার ও কর্তব্যবোধ তোমার স্বামীর এবং পরিবারের যশ, ঐশ্বর্য এবং পুণ্য বৃদ্ধি করবে। সদ্‌গৃহিনী হওয়ার জন্য তোমার কাছে আছে সৌন্দর্য স্ফূর্তি, —এর সাথে সুশীলতা এবং সৎচরিত্রের সংযোগ হলে তোমার স্বামী এবং পিতার খ্যাতি বৃদ্ধি হবে। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বাঁচার অধিকার আছে। কিন্তু সবাই যদি এইরকম করে তাহলে সমাজ থাকবে কি? শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নীতিনিয়ম সৃষ্টি হয়েছে, তাই সেটা পালন করতে হবে।" প্রথার উপদেশ উপাদেয়। কিন্তু উপাদেয় কথা হৃদ্য নয়। বেদে নারীর বহু সৎগুণ, যশ, কীর্তি ও মহিমার ব্যাখ্যা শুনেছি। কিন্তু বেদের সর্ব বাণী কি সব বয়সে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে? শৃঙ্খলা যখন শৃঙ্খলে পরিণত হয় তখন তাকে দৃঢ়হস্তে অবশ্যই ছিন্ন করতে হবে। লোহার শিকল ছিন্ন করা সহজ। কিন্তু সমাজের শিকল ছিন্ন করতে বহু জন্ম কেটে যায়। আমার এই বিবাহ আমার জন্য সংস্কার না হয়ে যদি বন্ধনে পরিণত হয়, তাহলে আমি কি করব?

অবশ্য প্রথার কথা অনুযায়ী এত চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। পিতা কি পাষণ্ড যে আমাকে যার তার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু কে সেই দিব্য পুরুষ, যাকে পিতা নির্বিবাদে আমার জন্য মনোনীত করেছেন? সে কথা প্রথাও জানে না। প্রথার চিন্তা ও জ্ঞানের বাইরে অনেক কিছুই ঘটে প্রতিদিন। আমিও কিছু চিন্তা করতে পারছি না। আমার ভাবনায় কারও রূপরেখা স্পষ্ট হচ্ছে না। একটা বিচিত্র অস্থিরতা ও চরম কৌতূহল আমাকে বিচলিত করছে। একটা বিষাদভাব এবং অহেতুক আশঙ্কা সন্তর্পণে আমার অন্তঃকরণকে বিদীর্ণ করতে থাকে। সমস্ত কল্পনা-জল্পনা স্বত্ত্বেও আমি আমার স্বামীর সন্ধান করতে পারছি না। আমার পতি নির্বাচন চূড়ান্ত হয়ে গেছে অথচ আমার চিন্তায় তিনি স্পষ্ট নয়। নিয়তির মতো সহসা আমার পতি উপস্থিত হবেন এবং আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দকে অগ্রাহ্য করে আমাকে কায়মনোবাক্যে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। বরপূর্বা কুমারী কন্যার পক্ষে এর চেয়ে ভীষণ পরিস্থিতি আর কি হতে পারে?

সাতদিন যাবৎ রম্যবনে আম পাগলির মতো ঘুরেছি। পর্বত, কানন, গিরিশৃঙ্গ, নদ-নদী, গাছপালা, পশুপাখী কাকে না জিজ্ঞাসা করেছি আমার ভাবীপতির নাম, ঠিকানা, পরিচয়—কিন্তু সবাই মুখ টিপে হেসেছে। কেউ আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। আমার জন্য যেন কারও কোনও দায়িত্ব নেই। আজ আমি তীব্রভাবে মায়ের অভাব অনুভব করি। একথা সত্যি যে পিতা আমার জন্য বিদ্বান গুণবান, খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষকেই মনোনীত করেছেন। কিন্তু তাঁর বয়স কত, কিরকম তাঁর রূপ, বেশভূষা। তিনি কি দেবাদিদেব মহাদেবের মতো সুন্দর, কামদেবের মতো রসিক এবং প্রেমিক হবেন। পিতা কি কন্যার হৃদয় বুঝতে পারেন?

আমার সুখ ও আনন্দ গৌণ, আমার পিতা এবং স্বামীর খ্যাতি এবং গৌরব মুখ্য। আমার

নবীন যুবতীমন প্রতিবাদ করে ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ জানাবার সাহস হয় না। আমি মনকে সান্ত্বনা দিই, এ পর্যন্ত পিতা আমার ভাবী স্বামীর নাম প্রকাশ করেননি। নিশ্চয় কোনও উপযুক্ত ব্যাক্তিকেই তিনি মনোনীত করেছেন। না জেনেশুনে আমার এরকম বিব্রত হওয়া উচিত নয়। প্রথাও আমাকে সান্ত্বনা দেয়। ব্রহ্মা হলেন এই সমগ্র সৃষ্টির প্রজাপতি নির্বন্ধকারী। নিজের কন্যার পতি নির্বাচনে তাঁর ভুল হবে না। "পিতাদের কি ভুল হয় না?" আমার উদ্বেল মনের প্রশ্ন প্রথা শুনতে পায়—সে বলে—হ্যাঁ, পিতাদেরও মাঝে মাঝে ভুল হয়, কারণ তাঁরা মানুষ। সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে মাঝে মাঝে পিতাও বিরাট ভুল করে থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মার মতো বেদগর্ভ, অভিজ্ঞ, বিচারশীল পিতার ক্ষেত্রে তাঁর কন্যা বরনারী অহল্যার জন্য ভুল করা কি সম্ভব?

"সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে পিতা যদি ভুল করেন তাহলে আমার জীবন অন্ধকারময় হয়ে যাবে" —আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি। প্রথা দৃঢ়স্বরে বলে—ব্রহ্মার দিব্যদৃষ্টি চতুর্দিকে প্রসারিত, দুটো চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও অন্য চোখ দিয়ে সব কিছু দেখতে পাবেন। তুমি তোমার পিতা সম্পর্কে সন্দিহান হও না, তাছাড়া ধরে নাও তুমি এখন বিবাহিতা। পিতার মনোনীত পতি ব্যতীত তোমার অন্যগতি নেই। ব্রহ্মাবাক্য অপরিবর্তনীয়। ব্রহ্মা যেখানে কথা দিয়েছেন সেখানে বিবাহ করা ছাড়া তোমার আর কিছু করার নেই। তাই তুমি আর কোনও কল্পিত পুরুষকেও মনে স্থান দিও না। তার ফলে তোমার সতীত্ব বাধাপ্রাপ্ত হবে। সতীত্বই বৈদিক নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। ত্রিলোকে তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, সবাই তোমার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। শরীরের সৌন্দর্য অন্তরের সৌন্দর্যের প্রতিবন্ধক বলে অনেকে মনে করেন। তাই তোমার সম্পর্কে রোমাঞ্চকর সতীত্বনাশের কাহিনী শোনার জন্য জগৎ উৎকণ্ঠায় কান পেতে আছে। মনুষ্য জগতের এটাই চরিত্র। অপরের দুর্নাম এবং অখ্যাতি মানুষকে যত সুখ দেয়, নিজের সুনাম এবং সুখ্যাতি তত সুখ দেয় কি না সন্দেহ। উপরন্তু তুমি ত্রিলোকমোহিনী হওয়ায় বহু রূপবতী নারী তোমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা এবং বহু শৌর্যবান পুরুষ তোমাকে পাওয়ার জন্য উন্মুখ। তুমি সবাইকে মোহিত করতে পার, কিন্তু সবাইকে তো বিবাহ করতে পারবে না। বিবাহ একজন পুরুষকেই করবে। তাই ত্রিলোকের কত পুরুষের প্রাণে যে তুমি হতাশা সৃষ্টি করবে তার হিসাব নেই। সেই হতাশ পুরুষ এবং ঈর্ষাপরায়ণ নারীগণ তোমার নিন্দা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। তোমার অপযশই তাদের হতাশ প্রাণের একমাত্র মহৌষধি। অতএব অহল্যা, —ত্রিলোকমোহিনী হওয়ায় তুমি কিরকম বিপন্ন বুঝতে পারছ তো! কিরকম কঠোর নীতি নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে তোমাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে, ভেবে দেখ। এমনকি তোমাকে বিয়ে করে তোমার স্বামীও নিশ্চিন্ত দাম্পত্য সুখ উপভোগ করতে পারবে না। যত বিজ্ঞ, নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত পুরুষ হোক না কেন, নিজের স্ত্রীর প্রতি অন্য পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তাকে বিক্ষুব্ধ করবে। তোমার প্রতি আকর্ষিত হবে না, এমন দম্ভ কোন্ পুরুষের আছে! অতএব তোমার স্বামী সততই সন্দেহপ্রবণ হবেন। যদি তোমার রূপের সাথে তাঁর রূপ তুলনীয় না হয় তাহলে তো মহাবিপদ। এ ক্ষেত্রে

তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। সেইজন্য পতি-পত্নী উভয়েরই রূপ, গুণ, স্বভাব সমান হওয়া শুভ সূচক। কিন্তু সংসারে নরনারীর মিলনে সব কিছু মেলে না। তাই সব দাম্পত্য সুখময় হয় না। তাই সুখ ও আদর্শ দুটি ভিন্ন কথা। দাম্পত্যজীবন সুখময় না হোক্, কিন্তু আদর্শ হওয়া উচিত। সমাজের পক্ষে ইহা মঙ্গলকারক। ব্যক্তি নিজের জন্য বাঁচে সত্যি কিন্তু সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারলে যশস্বী হয়। অতএব অহল্যা তুমি যশোমতী হও। সমাজের প্রচলিত আদর্শ মেনে পিতার মনোনীত পাত্রের কাছে নিজেকে নির্বিবাদে সমর্পণ কর। অহল্যা নামের সার্থকতা প্রতিপাদন কর.....।"

প্রথার অভিজ্ঞ উপদেশ শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, তাত্ত্বিকও। মনে হয় যেন মুখস্থ করা প্রবচন। একবার কথা আরম্ভ হলে প্রবচনে পরিণত হয়ে যায়। আমি আর তর্ক করলাম না। মনে জাগা প্রশ্নগুলো প্রথাকে জানালাম না। পিতার প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করি। আমি বুঝতে পেরেছি যে পিতার সিদ্ধান্তই আমাব নিয়তি আমি যদি বরপূর্বা না হয়ে স্বয়ংবরা হতাম। তাহলে কাকে আমি আমার স্বামী হিসাবে নির্বাচন করতাম? পিতা যদি তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করে বলতেন—"অহল্যা, তুই এখন আর বালিকা নয়, যুবতী। ষোলো বছরের তরুণীর নিজের পতি নির্বাচনে কোনও বাধা নেই। এছাড়া তুই উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিস, তুই বিদুষী এবং বেদমতী। তাই তোর পতি তুই নির্বাচন কর আমাব কর্তব্য শুধু নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করা।"

আমি কাকে দিতাম বরণমালা? আমার রূপগুণ এবং চিত্তবৃত্তির সাথে কোন শৌর্যবান পুরুষ সমধর্মী? না, সেইরকম কোনও পুরুষ আমার চোখে পড়েনি। অর্থাৎ আমি এ পর্যন্ত কারও প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিনি। কোনও পুরুষের স্বপ্ন দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ সম্পর্কে আমি কখনও চিন্তা করিনি। আমি যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছি গৌতম আশ্রমে। তাই আমার যৌবনের প্রথম কুহুতান ছিল গুরুকুলের মন্ত্রধ্বনি ও মুনিকণ্ঠের প্রণব ওঁকার। আমার যৌবনের প্রথম আকাশ হোমাগ্নিতে আলোকিত ছিল। যৌবনের প্রথম ভাববেদী ছিল যজ্ঞবেদী। প্রথম কামনাগ্নি ছিল যজ্ঞাগ্নি। যৌবন ঋতুর সব অভিলাষ ফুল যজ্ঞ সমিধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল আশ্রম ভূমিতে। মুহুর্মুহু স্বাহা হচ্ছিল আমার যৌবনের স্বপ্ন। আশ্রমের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, বেদনির্ধারিত সংস্কার এবং পরম্পরার মধ্যে আমার যৌবন ঋতুর আদ্যউষা আহুতিই প্রত্যক্ষ করেছিল। ব্রহ্মচারিণীর সাত্ত্বিক শৃঙ্খলার মধ্যে মোহময়ী যৌবন পরিবর্তিত হয়েছিল গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনীতে। বাস্তবিক আমার মনে কারও ছায়া পড়েনি। তাই পতি নির্বাচন আমার পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। আমার কাছে উপযুক্ত গুণবান পুরুষদের তালিকা নেই যে আমি স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে উপযুক্ত পতি নির্বাচন করতে পারব। কিন্তু এই ব্যাপারে পিতা এবং আমি দু'জনে আলোচনা করে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে সেটাই সমীচীন হত বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিবাহের পূর্বে ভাবী পতির সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয় কি? না দেখে না জেনে পিতার পছন্দ আমি মেনে নিতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয় যে তাঁকে গ্রহণ করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। পিতার চোখ ও মন তো আমার চোখ

মন নয়। পিতা আমার জন্য কাকে মনোনীত করেছেন হে পরমাত্মা, তিনি যেই হন, আমার হৃদয় মন আত্মা তাঁকে গ্রহণ করুক—এই প্রার্থনা করতে থাকি।

আগামীকাল পিতা আসবেন। আমার জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কাল ঘোষণা হবে। সন্ধ্যা আরতির পর আমি ধ্যানে বসি অনেকক্ষণ। কেবল ওঁ ব্যতীত আর কারও রূপ দৃশ্য হল না। য়দিও আমার মনের ভিতরে অবিরাম অনুরণিত হচ্ছিল আমার ভাবী স্বামীর রূপ সাকার হওয়ার প্রার্থনা।

প্রথা আমাকে লক্ষ করছিল। কোমল স্বরে সে বলে—"বালিকা বয়সে তুমি যখন রম্যবনে ছিলেন তখন তুমি এত চঞ্চল ছিলে যে, তোমার জন্য নির্ধারিত সব নীতি নিয়মকে উলঙ্ঘন করার জন্য যেন তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে। কিন্তু গৌতম আশ্রম তোমার মনকে শৃঙ্খলিত করেছে, তা সত্ত্বেও তোমার ভিতরে একটা চঞ্চল প্রজাপতি মাঝে মাঝে ডানা মেলে উড়ে যায় কোনও অগম্য স্থানে। সেসব আমার অভিজ্ঞ চোখে ঠিকই ধরা পড়ে। কিন্তু এই সাতটি দিন তোমাকে এমন শান্ত, গম্ভীর এবং মননশীল করেছে যে, মনে হচ্ছে তুমি অন্য এক অহল্যা। সম্ভবত সেই কারণেই পিতা তোমাকে একান্তে ছেড়ে দিয়েছেন সাতদিন।

ধর্মপত্নী এবং গৃহিণীর গুরুদায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে এইরকম চিন্তন, মনন, আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক ছিল। পিতামহ তোমাকে দেখে খুশী হবেন। আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি বলে তিনি বুঝতে পারবেন। পিতামহ নিশ্চয় তোমার জন্য কোনও দিব্যপুরুষ অর্থাৎ দেবতাকে মনোনীত করেছেন। এই মর্তভূমিতে অহল্যার মতো দুর্লভা নারীর যোগ্য পুরুষ কে বা আছে? আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে তো কেউ নেই।" প্রথার কথা শুনতে শুনতে আমি সহসা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। বিরক্ত হয়ে তীব্র স্বরে বলি—থাক্ থাক্ দেবতা স্বামীর লোভ নেই আমার। স্বামী হিসাবে আমার মানুষই প্রয়োজন। আমার মর্তভূমিই আমার জন্য স্বর্গ। মানুষ আমার বরণীয়। আমি আমার মাতৃভূমি; মর্তভূমি ছেড়ে থাকতে পারব না বা দেবতাদের আড়ম্বরপূর্ণ স্বর্গরাজ্যে শান্তি পাব না। দেবতা সুখভোগী প্রশস্তি প্রিয়। দেবতা ঐশ্বর্যের মহিমাময় সিংহাসনে বসে মানুষের দৈন্যকে দাতার আসন থেকে বিচার করেন। প্রিয়তম, বন্ধু, সখা, হৃদয়েশ্বর হিসাবে মানুষের বেদনা উপলব্ধি করেন না। সেখানে প্রেম কোথায়! ভক্তি তো ভয়ের রূপান্তর মাত্র। তাই ভক্তির কাছে প্রেম গৌণ হয়ে যায়। দেবতাও মাঝে মাঝে মানুষের প্রতি ক্রুর এবং অসহিষ্ণু। অভিশাপে রসাতলগামী করতে পারেন মানুষকে। অথচ মানুষ দেবতাকে সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান দেয়। হ্যাঁ, ভ্রমণের জন্য স্বর্গরাজ্য অতি উত্তম স্থান। একবার আমি স্বর্গরাজ্য ঘুরে এসেছি। ঐশ্বর্য আমার ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তোমার মনে নেই!

আমার এই মাতৃভূমি অদিতি, অখণ্ডনীয়া। বিবিধ বনস্পতি এবং শষ্যভারে সুজলা সুফলা। স্বর্গের অমৃতে আমার লোভ নেই। অমৃতের মোহ থেকে বিষ উদ্গীরণ হয়। বিষ থেকে বৈষম্য। দেবতা আমার বরণীয় নয়, কারণ তিনি অভিশাপ দিতে পারেন, প্রশস্তিতে কান পেতে থাকেন। একবার দেবতার আসনে বসলে মানুষের কাছে থেকে পূজা উপাচার

পাওয়ার লোভ জাগে। নিজের মাতৃভূমি, মর্তভূমি থেকে উর্ধ্বে আছেন বলে মাতৃভূমিকে ভিক্ষাপাত্র মনে করেন, বরদান করে কৃতার্থ করেন মানুষকে। আমার চোখে মানুষই শ্রেষ্ঠ। কারণ সে অভিশপ্ত হয় অথচ অভিশাপ দিতে পারে না। পিতা যদি আমার জন্য দেবতা-পতি মনোনীত করে থাকেন, তাহলে বরং পিতার অবাধ্য হব.....। অভিশপ্তা হয়ে জন্ম-জন্মান্তর পড়ে থাকব পাছে কিন্তু আমি আমার মাতৃভূমিকে ত্যাগ করব না।" আমার কথা শুনতে শুনতে প্রথার অনাদি কালের অভিজ্ঞ মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়। সে জিভে কামড়ে বলে— "ছিঃ এরকম অলক্ষুণে কথা কেন মুখে আনছ? কে কেন তোমাকে অভিশাপ দেবে? তোমার রূপ লাবণ্যে অভিশাপও বিমোহিত হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হবে। তাই তুমি দেবতাকে বরণ নাই কর তা বলে বিফলতা, পরাজয়, নিন্দা, অভিশাপের কথা মুখে আনবে না কিংবা দেবতাদের সমালোচনা করো না। বেদে দেবতাদের প্রশস্তিই অধ্যয়ন করলে, সারাজীবন তাই কর। তুমি দেবতাদের কটাক্ষ করছ বলে যদি কেউ জানতে পারে তাহলে তোমার বিপদ হবে। কখন কি ভাবে প্রতিশোধ নেবে তুমি জানতে পারবে না। আমার বিশ্বাস যে তুমি পরমাত্মা বিরোধী নয়। নিজেকে পরমাত্মার প্রতিনিধি মনে করা এবং নিজের দৈবীশক্তির অপব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বিরোধী। পরমাত্মাই প্রকৃত দেবতা। তাই তুমি দেবতাকে দোষারোপ কর না।"

প্রথাব শঙ্কাকুল মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার করুণা হয়। বাইরে থেকে প্রথাকে যত কঠোর এবং নির্ভীক দেখায় ভিতরে সে ততটাই ভয়াতুর এবং দুর্বল। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুখ বুজে তার কথা শুনবে, নির্বিচারে তার নির্দেশ মানবে, সে তোমার ওপর নানা অত্যাচাব করবে। কিন্তু যখন দৃঢ়ভাবে তুমি তাকে অস্বীকার করবে তখন কাঁচের পুতুলের মতো সে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তখন সে নিজেই নিজেকে চিনতে পারবে না। তাই প্রতি মুহূর্তে সে আঘাত এবং প্রতিরোধের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। নিজের অসুরক্ষিত স্থিতিকে চাপা দেওয়ার জন্য তার এত মুখের জোর। বেচারা! সে জানতে পারে না যে, যার লালন পালন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে সে থাকে তাকেই চেপে ধরে দমবন্ধ করে দেয় এবং অবশেষে একদিন আঘাত পায়—মুখ লুকিয়ে দূরে চলে যায়। হারিয়ে যায় অনাদৃত ইতিহাসে।

অজ্ঞতা অথবা না জানার ভান। আমি প্রথাকে সান্তনা দিলাম যে আমি মুখে প্রতিবাদ করব না। পাছে দেবতার অভিশাপ পড়ে। কিন্তু মন কি নীরব থাকে?

একি অনাহূত, অবাঞ্ছিত অতর্কিত স্বপ্ন! স্বপ্ন অভাবিত, অকল্পিত না স্বপ্ন ভবিতব্য? স্বপ্ন কি বিদ্রোহ না নিজের অদেখা মনের স্বীকারোক্তি? এইরকম স্বপ্ন তো কোনও দিন দেখিনি, আজ কেন দেখলাম? উপরন্তু দেখলাম সেই রাত্রে যেদিন আমি প্রকাশ্যে দেবতা এবং স্বর্গলোককে অস্বীকার করে মর্তভূমি এবং মরণশীল মানুষকে স্বীকার করে নিলাম। তাহলে এটা কি আমার অবচেতন মনের ঘোষণা। কে স্বপ্ন দেখায়—অতীত না ভবিষ্যৎ। স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত হয়?

ভোর রাতের স্বপ্নটা আমার শান্তি নষ্ট করে দেয়। পিতার কণ্ঠে আমার স্বপ্ন যদি আমার

নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। আমি কি আমার গতরাত্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে পিতার অবাধ্য হতে পারব? ইন্দ্রদেব যদি পিতার মনোনীত পাত্র হয়ে থাকেন, তাহলে আমি কি তাঁকে অস্বীকার করতে পারব?

হ্যাঁ, আমি স্বপ্নে ইন্দ্রদেবকে দেখেছি, দেখলাম মণিময় রথ থেকে তিনি বরবেশে নেমে আসছেন। বিদ্যুতের ধাক্কায় চমকে ওঠার মতো ইন্দ্রদেবের তেজস্বী রূপে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এইরকম স্বপ্নের আদি অন্ত পেলাম না। হ্যাঁ, ইন্দ্রদেবকে বরণীয় বরের মতো দেখাচ্ছিল, কিন্তু কে তাঁকে বরণ করার জন্য অপেক্ষা করে আছে স্বপ্নে সেটা স্পষ্ট হল না। প্রথাকে সব কথা বললাম। আমি কেন এরকম স্বপ্ন দেখলাম, সেকথাও জিজ্ঞাসা করলাম। প্রথা অত্যন্ত সহজভাবে বলে—এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? 'ইন্দ্রযোগ্যা অহল্যা' এই কথাটা তুমি কতবার কত লোকের মুখে না শুনেছ! 'ইন্দ্রযোগ্যা' শব্দটি তোমার জন্য একটা বিশেষণে পরিণত হয়েছে। বরনারী যে ইন্দ্রযোগ্যা সে কথা শাস্ত্রের মতো সর্বজন স্বীকৃত। সম্ভবত এই কথা তোমার অবচেতন মনে স্থান করে নিয়েছে। তাই এর ওপর গুরুত্ব দিও না। অবশ্য বিবাহ এক শুভ সংস্কার হলেও বিবাহের স্বপ্ন শুভ নয়। ইন্দ্র আর্যবীর, ত্রিলোক নায়ক হলেও সম্ভবত তোমার জন্য শুভপ্রদ নয়। স্বপ্ন মাঝে মাঝে সতর্ক করে দেয়। ঈশ্বরের অপার করুণা যে তুমি ইন্দ্রদেবকে কেবল বরবেশে দেখেছ। বিবাহ মণ্ডপে বিবাহ সংস্কারের মধ্যে দেখনি। তাই সতর্ক থাকলে অশুভ অবস্থা এড়ানো যেতে পারে। অবশ্য এটাও হতে পারে যে তুমি ইন্দ্রদেবকে বরবেশে দেখনি, ইন্দ্রবেশে দেখেছ। ইন্দ্রবেশই বরবেশ। বরপুরুষ-ই ইন্দ্র। তাই শুভকর্মের অবসরে মনে অশুভ ভাবনাকে স্থান দিও না। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরে তোমার কৌতূহল দূর হবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক। কিন্তু সত্যি যদি পিতামহ তোমার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে.....।"

আমি চমকে উঠে বলি—"একবার তো বলেছি দেবতার প্রেমে আমার ভরসা নেই, স্বর্গলোকের প্রতি আমার লোভ নেই। কখন যে স্বর্গচ্যুত অভিশপ্তা হব, কে বলতে পারে? কিন্তু আমি হয়ত কখনও অভিশপ্তা হতে পারি, কিন্তু পৃথিবী চ্যুত হব না। অদিতি পৃথিবীমাতা আমাকে জন্মে, মৃত্যুতে, জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর কোলে স্থান দেবেন।"

"কিন্তু ইন্দ্রদেব সেইরকম নয়। তিনি দেবতা অপেক্ষা মানুষ বেশি। আর্যবীর ইন্দ্র কনিষ্ঠতম দেবতা। তাই পৃথিবীর প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও আকর্ষণ। পৃথিবীকে নিদাঘ থেকে রক্ষা করার জন্য জলদানে বাধা সৃষ্টিকারী দাসরাজা বৃত্তকে হত্যা করেছিলেন। তাঁর বীরত্বের তুলনা নেই। তাই ইন্দ্রদেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য না করাও যেতে পারে।" এই কথা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় প্রথা। সে কি আমার মন বুঝছিল?

আমি দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করি—দেবতা এবং দেবতাদের চোখ ঝলসানো স্বর্গলোক, অনন্ত ঐশ্বর্য, অমৃত, অমরত্ব অনন্ত যৌবন, চিরবসন্ত—আমি এসব কিছুই চাই না। আমি এই পৃথিবীর কন্যা; তাই ইন্দ্র বরপুরুষ হলেও ইন্দ্রবর আমার ঈপ্সিত নয়। কিন্তু এইরকম স্বপ্ন আমি কেন দেখলাম? একথা সত্য যে, ইন্দ্রের রূপ, ব্যক্তিত্ব, বেদে ইন্দ্রস্তুতি আমার পূজাগুরু

পিতা এবং ভাই ও অন্যান্য সকলের মুখে ইন্দ্রের প্রশংসা, সর্বোপরি অপলার কাছে ইন্দ্র মাহাত্ম্য শুনে আমার কিশোরী মনে ইন্দ্র এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছেন। এই বয়সে নারী পুরুষ সবার মনেই ওইরকম এক ব্যক্তিত্ব পূজা পেয়ে থাকেন। আমি ও তার ব্যতিক্রম নই। উপরন্তু ভাই নারদের সাথে গৌতম আশ্রম থেকে ফেরার পথে আমরা যেখানেই বিশ্রামের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছি, সেখানে আমার ওপর দৃষ্টি পড়া মাত্রেই সকলেই একটি বাক্য উচ্চারণ করেছেন—"কে এই ইন্দ্রযোগ্যা বরনারী?" ভাই নারদ সকলকে একই উত্তর দিয়েছেন—"এই ইন্দ্রযোগ্যা বরনারী হল আমার আদরণীয়া ভগিনী ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যা।"

প্রশ্ন এবং উত্তর আমার মনে দুটি ধারণাকে দৃঢ় করেছে—আমি এখন বালিকা নই, নারী এবং বরনারী উপরন্তু আমি ইন্দ্রযোগ্যা।

সম্ভবত ইন্দ্রযোগ্যা শব্দটি আমার প্রশংসাসূচক হওয়ায় আমার পক্ষে সুখপ্রদ, শ্রুতিমধুর এবং হৃদ্য। এইসব মিলে মিশে আমার অবচেতন, ইন্দ্রদেবকে স্বপ্নায়িত করেছে আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে।

সেই বহু প্রতিক্ষিত মুহূর্তটি আমার স্বপ্ন এবং কল্পনাকে নিমেষে বিধ্বস্ত করে দিল। পিতার ঘোষণা আমার জন্য ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ ছিল। বাস্তব আমাকে এত বিক্ষুব্ধ করল কেন? আমি কি আমার অপূর্ণ স্বপ্নকে মনে মনে স্বাগত জানাচ্ছিলাম!

হে অন্তর্যামী পরমাত্মা! মানুষের মনকে এইরকম অন্ধকার গুহা করে রাখার পিছনে তোমার কি শুভ সংকল্প আছে? এমনকি মানুষ নিজের মন-বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাষকেও স্পষ্ট দেখতে পারে না, চিনতে পারে না। তাই মানুষ নিজের মধ্যে বহুভাবে বিভক্ত এবং নিজের কর্মের জন্য সতত আহত—অনুতপ্ত।

পিতার ঘোষণা আমাকে যত না ব্যথিত করল তার চেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ করল। কারণ পিতার মনোনীত পুরুষ যতই গুণী, জ্ঞানী এবং জিতেন্দ্রিয় সাধক হলেও স্বামী হিসাবে আমার খণ্ডিত স্বপ্নের বিক্ষিপ্ত কণিকাতেও স্থান পাননি। কি চিন্তা করে পিতা এইরকম সিদ্ধান্ত নিলেন? আজ আমি প্রতিবাদও করতে পারব না যে, কোনও অজানা, অদেখা, অচেনা পুরুষের সাথে পিতা আমার বিবাহ স্থির করেছেন। কারণ আমি তাঁকে জানি, চিনি, তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি। এমনকি তাঁর সম্বন্ধে আমি কোনও প্রতিকূল মন্তব্যও দিতে পারব না। তাঁর সাথে আমার বিবাহ সম্পর্কে জগতও প্রশ্ন করতে পারবে না। আমার কাছে এমন কোনও যুক্তি নেই, যার সাহায্যে আমি পিতার এই ঘোষণাকে অসিদ্ধ করব। পিতা যে আমার মতামত না নিয়ে বিবাহ স্থির করেছেন, সে কথাও বলতে পারব না। কারণ প্রকারান্তরে পিতা আমার মতামত নিয়েছেন।

আজ পিতা একা আসেননি। তাঁর সাথে এসেছিলেন স্বর্গলোক এবং অন্তরীক্ষলোকের অনেক দেবতা, যক্ষ, কিন্নর। এসেছিলেন ভূলোকের বিশিষ্ঠমুনিগণ। সর্বসমক্ষে পিতা ঘোষণা করলেন—'অহল্যা! সাতদিন পর তোর বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। এই সাতদিনের মধ্যে তোর ভাবী স্বামীর প্রতি তোর মন, চেতনা এবং আত্মাকে সমর্পণ করার জন্য তপস্যারত থাকবি।

আজ সর্বসমক্ষে সানন্দ-সগর্বে আমি তোর ভাবী স্বামীর নাম ঘোষণা করছি। তিনি হলেন মহান দার্শনিক মহর্ষি গৌতম, তোর শিক্ষাগুরু, তোর ব্যক্তিত্বের নির্মাতা। তোর ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক—।"

পৃথিবী ফেটে গেল, আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, মরুৎগণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, চন্দ্র-সূর্য একত্রে অস্তমিত হলেন, নক্ষত্রগণ অন্তরীক্ষ থেকে কক্ষচ্যুত হল। বায়ু দিক্‌ভ্রষ্ট হল, সমুদ্র উত্তাল হল, পর্বত ভূমিসাৎ হল, বনস্পতি পত্রশূন্য পাণ্ডুর হয়ে গেল.....। নিমেষে মহাপ্রলয় ঘটে গেল আমার চোখের সামনে। কিন্তু সেইরকম দাঁড়িয়ে রইলাম। কেবল সদেহ নয়, সচেতন ভাবে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিদ্রোহের তীব্রতায় আমার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল—কিন্তু ভাবরুদ্ধ হতে পারলাম না।

চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে মানুষের যখন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায় তখন ভাবরুদ্ধ হয়ে যায় না কেন? তাহলে মানুষ ভাগ্যবান হত। বিদ্রোহ শুধু আগুন হয় না—জলধারা হয়ে বয়ে যায়, অসহায় বিদ্রোহ, নিষ্ফল ক্ষোভ, গুরুত্বহীন প্রতিবাদ। আমার বিস্ফারিত দুই চক্ষু থেকে অনায়ত্ত অশ্রু ঝরে পড়ে। পিতা আমাকে আদর করে সান্ত্বনা দেন—একদিন না একদিন তোকে পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে যেতে হত। এটাই নারী জীবনের ধর্ম। এতে অশ্রুমোচন করা স্বাভাবিক। কিন্তু সুখের কথা এই যে, তোকে অপরিচিত জায়গায় যেতে হচ্ছে না। রম্যবনেব মতো গৌতম আশ্রমও তোর অত্যন্ত প্রিয়। আমি শুনেছি, তুই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় গাছপালা, নদ-নদী, পশুপাখী, আর্য-অনার্য সকলে রোদন করছিল, তুইও অশ্রুমোচন করেছিলি। তুই তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে খুব শীঘ্রই তুই তাদের কাছে ফিরে যাবি। তাই তোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি শুধু আনন্দিত নয় গর্বিতও।"

আমি পিতার বুকে মুখ রেখে কাঁদতে থাকি। সকলে আমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রথা আমাকে কুটীরের ভিতরে নিয়ে গেল, কিন্তু আমার কান্নার অবসান হচ্ছিল না।

গৌতম আদর্শ পুরুষ, জ্ঞানবান গুরু, সুশীল এবং জিতেন্দ্রিয় তপস্বী। তিনি সর্বজন পূজ্য। আমি তাঁকে ভক্তি করি, সম্মান করি, তাঁর জ্ঞানের কাছে আমি নিজেকে ধূলিকণা মনে করি। কিন্তু গৌতমকে 'গুরু' ব্যতীত অন্য কোনও সম্পর্ক আমার কল্পানাতেও স্থান পায়নি। ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক কি হবে কে জানে? আমি আকাশ পাতাল ভাবতে থাকি এবং আমার অন্তরের বিদ্রোহ সেইরকম জেদ ধরে কাঁদতে থাকে। পিতা বুঝতে পেরেছিলেন এই কান্না বিদায়ের কান্না নয়, এ বিদ্রোহের কান্না।

শান্ত কণ্ঠে পিতা বললেন—'তোর মনে আছে অহল্যা! তুই যেদিন গুরুকুল থেকে ফিরে এলি, সেদিন তোর সাথে আমার কিছু কথা হয়েছিল এবং তারপরই আমি ব্রহ্মালোকে চলে যাই।'

—'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'আর একবার মনে কর তুই আমাদের আলোচনা' —পিতা গম্ভীর স্বরে বলেন।

পিতার নির্দেশে অশ্রু মুছে আমি সাতদিন পূর্বের বার্তালাপকে আবার স্মরণ করি। সেদিন পিতাকে প্রণাম করতেই পিতা আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"যশস্বিনী হও অহল্যা। গৌতম আশ্রমে মাত্র পাঁচ বছরের ব্রহ্মচারিণীর জীবন তোর ব্যক্তিত্বে যে পরিবর্তন এনেছে। সেটাই কাম্য ছিল। গৌতম ছিল আমার প্রিয় শিষ্য, তুই গৌতমের শিষ্যা। তাই তুইও আমার শিষ্যা হলি। গুরুকুলে তোর কিছু অসুবিধা হয়নি তো? অবশ্য আশ্রমের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা শুরুতে তোর শ্বাসরূদ্ধ করে থাকবে, কিন্তু জীবনে শৃঙ্খলারও আবশ্যকতা আছে।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে আমি বললাম—"গৌতম আশ্রমে আমার আবার অসুবিধা কি হবে? গুরুগণ পিতাসদৃশ ও গুরুপত্নীগণ মাতাসদৃশ স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আমার জীবনকে ধন্য করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সংস্পর্শে না এলে আমার জীবনের একটা অংশ অপূর্ণ থেকে যেত। অবশ্য গুরু হিসাবে আমার প্রতি আচার্য গৌতমের অধিক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য মাঝে মাঝে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে মনে হত, কিন্তু ধীরে ধীরে আমি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি।"

আমার মুখ থেকে কথা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রথা বলে—"তুমি নারী এবং অপরূপা হওয়ায় তোমার প্রতি গৌতমের অধিক সতর্ক দৃষ্টি দেওযা স্বাভাবিক। ইহা গুরুহিসাবে গৌতমের দক্ষতার পরিচয় দেয়।

পিতা পুনরায় প্রশ্ন করেন—"গৌতম সংযমী হওয়ায় তাকে কঠোর মনে হয়। তাছাড়া, তোর জন্য সতর্ক থাকা ছাড়া তার অন্যগতি ছিল না। তবে যাই হোক, একজন ব্যক্তি এবং ঋষি হিসাবে গৌতমে সম্পর্কে তোর মতামত কি?"

"—উত্তম, অতি উত্তম।"

গৌতম আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ তোকে রম্যবন ভুলিয়ে দিয়েছিল তো? —পিতা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন।

আমি সহাস্যে উত্তর দিই—এমনই ভুলিয়ে দিয়েছিল যে বিদায় নিয়ে আসার সময় আমার মনে হচ্ছিল গৌতম আশ্রমই আমার গৃহ, রম্যবন প্রবাস। তাই আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারছিলাম না।"

আমার উত্তর শুনে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে পিতা বলেছিলেন—"আমার কতবড় চিন্তা তুই দূর করে দিলি অহল্যা! এখন আমার আর কোনও দ্বন্দ্ব নেই।" তখন এই কথার গুরুত্ব আমি বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি। গৌতম অতি উত্তম পুরুষ এবং গৌতম আশ্রম আমার গৃহের মতো মনে হচ্ছিল বলে আমি পিতাকে বলেছি, তাই আজ কি করে বলব যে, পিতা আমার মতামত না নিয়ে আমার বিবাহ স্থির করেছেন।

কিন্তু, একজনকে গুরু, ঋষি এবং মানুষ হিসাবে উত্তম বলার অর্থ কি স্বামী হিসাবে তাকে পেয়ে সুখী হওয়া? মোটকথা, আমি গৌতমের প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব করতে পারছি না। গৌতমের কাছে নারীমনলোভা, পুরুষোচিত সৌন্দর্য খুঁজলে যে কেউ হতাশ হবে। একেকটি শ্মশ্রু এবং কেশ ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে, সেটা তাঁর জ্ঞানের পরিপক্কতা প্রমাণ করে।

তপোদগ্ধ খর্বকায় শরীর অত্যন্ত শীর্ণ। শুষ্ক কঠোর দার্শনিক ব্যক্তিত্ব নীরস করে দেয় মনকে। গুরু ব্যতীত তাঁর সাথে অন্য কোনও সম্পর্ক মনে স্থান পায় না। গৌতমের বয়সও আমার তুলনায় যথেষ্ঠ অধিক, প্রায় কুড়ি বছর। কিন্তু একথা কি পিতাকে বলা যায় যে, "আমি গৌতমের প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব করছি না, গৌতমের রূপ আমাব স্নায়ুতে কোনওদিন উন্মাদনা সৃষ্টি করেনি, ভবিষ্যতেও করবে কি না সন্দেহ, তাই আমি তাকে বিবাহ করব না।" এইরকম কথা কি পিতাকে বলা যায়?

পিতা এর কি উত্তর দেবেন আমি জানি। পিতা বলবেন—"কি প্রকার আকর্ষণ? দেহের মনের না আত্মার? তারপর দেহের অসারতা, আত্মার চিরন্তনতা সম্পর্কে দার্শনিক যুক্তি খাড়া করবেন ঠিক গৌতমের মতো। আজ এইসব শোনার অবস্থায় আমি নেই। তাই আমি নীরব থাকলাম। কিন্তু আমার মনের উদ্বেগ পিতার কাছে গোপন রইল না। সাতদিনের অবসরে পিতা এবং প্রথা অনবরত আমার কানে বিবাহের উদ্দেশ্য এবং পবিত্রতা সম্পর্কে উপদেশ বর্ষণ করে চলেছেন। মানব জীবনে বিবাহ সংস্কার এক পবিত্র সংস্কার। বিবাহের অর্থ হল বিশেষ কর্তব্য বহন করা। এখানে বাহ্যরূপ, সামান্য গুণ কর্ম ও স্বভাবের সমতা গুরুত্বপূর্ণ নয়, উত্তমগুণাবলী, কর্ম ও স্বভাবের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সেটুকু না হলে বিবাহিত জীবন অভিশাপে পরিণত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি প্রথাকে প্রশ্ন করেছিলাম—পত্নী পতিকে কি উপায়ে অতিশয় প্রেম করতে পারবে?

প্রথা হাসতে হাসতে বলে—জোর করে প্রেম চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। তাই সমাজে স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা প্রচলিত। যে নারী পুরুষের সুব্যবহার, সৌন্দর্য এবং সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বরণ করে, সেই স্বামীকে অতিশয় প্রেম করে থাকে।

"স্বামী হিসাবে গৌতমকে অতিশয় প্রেম করা আমার পক্ষে সম্ভব কি? —আমি স্বগতোক্তি করি।

পিতা আমার স্বগতোক্তিও শুনতে পান। দৃঢ়স্বরে তিনি বলেন—"কিন্তু স্বয়ম্বরেও পতিবরণ করার সময়ে শুধুমাত্র নেত্রের সাহায্যে বাহ্য-রূপলাবন্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পতিবরণ করা উচিত নয়। মন এবং জ্ঞান নেত্রে পুরুষের গুণ এবং স্বভাব অবলোকন করে পতিবরণ করা বিধেয়। শুধু সুদর্শন পতি পেলে কেউ সুখী হয় না। স্বামী জ্ঞানী তথা তপস্বী হলে স্ত্রী সুখী হয়। বিবাহ শুধু পার্থিব উন্নতি করে না। পরস্পরের সহযোগ দ্বারা দম্পতি উভয়ে উভয়ের অভিবৃদ্ধি করে থাকেন। তাই সবকিছু বিচার করেই আমি গৌতমকে তোর উপযুক্ত পতি হিসাবে নির্বাচন করেছি। তোর সাথে পাঁচবছর সময় অতিবাহিত করার পরও একদিনও গৌতম তোর প্রতি কামনাপূর্ণ কটাক্ষপাত করেনি, তোর অঙ্গ স্পর্শ করা দূরের কথা, তোর ছায়াও স্পর্শ করেনি। এইরকম জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যে কোনও নারীর কাম্য। সংসারের নিয়ম-শৃঙ্খলা সে কঠোরভাবে পালন করে। সুখী হওয়ার জন্য একজন নারীর এর চেয়ে অধিক কি আবশ্যক?"

অবশ্য আমি জানি না, সুখের জন্য সমাজের নিয়মের বাইরে আর কিছু আছে কি না—

কিন্তু আমার অনুভব বলছে, গৌতমের মতো শাস্ত্রসর্বস্ব পুরুষ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর সুখ-শান্তির সহায়ক হবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বেচ্ছায় নয়, পিতার ইচ্ছায় পিতৃতুল্য গুরু গৌতমের স্বামীত্ব আমাকে স্বীকার করতে হবে। সাতদিন যাবৎ পিতার উপদেশ এবং গৌতমের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমি বলে ফেলাম—"পিতা! গৌতম আমার গুরু। তাই তিনি পিতৃতুল্য। উপনয়নের সময়ে আমাকে গর্ভে ধারণ করে তিনি আমাকে নতুন জন্মদান করেছেন। তাই তাঁকে স্বামী হিসাবে কি করে গ্রহণ করব?"

পিতা যেন এইরকম প্রশ্ন আশা করেছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"পতি হলেন পত্নীর পরমগুরু। পতি ব্যতীত পত্নীর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ হয় না। তাই গুরু পতি হওয়া অনৈতিক নয়, বরং পরম সৌভাগ্য।"

নীতি অনীতি, যুক্তি এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। এবং যুক্তির জোরে নীতি অনীতির সংজ্ঞাও বদলে যেতে পারে। মোটকথা, গুরুজনদের কথার উত্তর নেই। ব্রহ্মার মুখে থেকে যা প্রকাশ পায়—তাহা ব্রহ্মবাক্য, তাই অকাট্য। আমার প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কি লাভ? আচার্য গৌতমের বয়স আর আমার বয়সের মধ্যে পিতাপুত্রীর তারতম্য। প্রথা আমার মন থেকে এই দ্বন্দ্বটিকেও দূর করে দেয়। পুরুষের জ্ঞান ও খ্যাতি এবং নারীর রূপ যৌবন এবং চরিত্র বিবাহ স্থির করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। তাই আমার বয়স ষোলো হলেও আচার্যের বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অনুচিত।

রাত্রি প্রভাত হলেই আর্যমতে আমার বিবাহ সম্পন্ন হবে। কোনও ঋষিকে নিজের কন্যাদান করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এই আর্য-বিবাহ বৈদিক বিধানের বর্হিভূত নয়। বরং রাজাকে কন্যাদান করা অপেক্ষা ঋষিকে কন্যাদান কার অধিক প্রশংসনীয়। রাজা এবং ঋষি ব্যতীত যে সকল সাধারণ মানুষ নিজের শ্রম, স্বেদ ও মেধার সাহায্যে নানাভাবে সমাজের উন্নতি ও সেবা করে চলেছেন তাঁরা কি উপযুক্ত স্বামী হতে পারবেন না? সাধনা ও তপস্যার বলে তারাও রাজা, ঋষি এবং ইন্দ্রও হতে পারেন। কিন্তু সবাই রাজা কিংবা সবাই ঋষি এবং ইন্দ্রও হতে পারেন। কিন্তু সবাই রাজা কিংবা সবাই ঋষি হলে রাজ্যের সামগ্রিক সুখ সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। অথচ পিতার দৃষ্টিতে তারা কেউই অহল্যার সমকক্ষ নয়—তাই গৌতমই আমার ভবিতব্য। সারারাত আমি বিনিদ্র। সেদিন প্রথা একেকটি করে আমার পাণি প্রার্থীদের নাম আমাকে বলেছিল।

পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে অগ্নি, সোমদেব, বৃহস্পতি। অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রদেব, রুদ্র, বায়ুবাত, পর্জন্য, আপঃ এবং মাতরিশ্বান, দ্যুস্থান দেবতাদের মধ্যে দৌস্, বরুণ, মিত্রসূর্য, সবিতৃ, পুষণ, বিষ্ণু, অশ্বিন দেবগণ একান্তভাবে অহল্যাকাঙ্খী ছিলেন এবং স্বয়ম্বরের জন্য যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নির্বিশেষে অপেক্ষা করেছিলেন। সমস্ত মুনিগণও অহল্যাকাঙ্খী ছিলেন। তাঁরা নারদের মাধ্যমে পিতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। মানবগণ অহল্যাকাঙ্খী ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু একমাত্র বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র সরাসরি পিতামহের কাছে নিজের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। অন্য কারও মাধ্যমে নয় নিজে পিতামহর সাথে দেখা করে

তোমার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ এবং প্রেমভাবকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পিতামহ স্পষ্ট ভাষায় ইন্দ্রদেবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অহল্যার উপযুক্ত স্বামী তিনি বহুপূর্বেই মনোনীত করেছেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আজ না হোক যে কোনও সময়ে ইন্দ্রদেব কিছু অঘটন ঘটাবেন। কে জানে কোনওদিন তোমাকে বলপূর্বক পৈশাচ মতে বিবাহ করবে কি না সে কথা কে বলতে পারে? ইন্দ্রদেব যা কামনা করেন তাহা তার সিদ্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। তাই পিতামহ, আচার্য গৌতমের হাতে তোমাকে প্রদান করে ইন্দ্রদেব এবং গৌতমের মধ্যে থাকা অতীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিদ্বেষকে দৃঢ় করে দিলেন। গৌতম না হয়ে অন্য কেউ হলে ইন্দ্রদেব ব্যাপারটা সহ্য করে নিতেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আচার্য গৌতম কিন্তু কোনওদিন কারও কাছে তোমার প্রতি প্রণয়বাসনা প্রকাশ করেননি। প্রথার কথা আমাকে আশ্চর্য করে—যে পুরুষটি আমার প্রতি আকৃষ্ট নয়, তাকেই বিবাহ করতে হবে।

প্রাতঃকাল থেকে বহু মুনি-ঋষি এবং দেবতাগণ আমাকে আশীর্বাদ করতে আসছেন। বিবাহ সংস্কারের পূর্বে আমি তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করছি। সকলের সেই একটি আশীর্বাদ আমাকে চকিত করে—"যজ্ঞমতি মহতি! তুমি ইন্দ্রযোগ্যা নারী। তোমার স্বামী ইন্দ্রপদ লাভ করুন। তাঁর ইন্দ্র সাধনায় সহায়িকা হয়ে তুমি ইন্দ্রলোকের রানি হও।" বিজ্ঞ ঋষিদের কথার গূঢ়তত্ত্ব কি? আমি জানি না। কিন্তু পিতা যখন আমাকে একই বাক্য উচ্চারণে আশীর্বাদ করলেন, তখন আমি সর্বসমক্ষে অনায়াসে পিতাকে প্রশ্ন করি—"আমি যদি ইন্দ্রযোগ্যা, তাহলে আমাকে ইন্দ্রকে অর্পণ না করে আচার্য গৌতমকে অর্পণ করছেন কেন?" বাক্‌দত্তা অহল্যার মুখে এইরকম পাপবাক্য শুনে ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এইরকম অশ্রুতপূর্ব বাক্যে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। বিবাহের মাঙ্গলিক সংস্কারের মধ্যে পবিত্র অন্তঃকরণে প্রবেশ করার অব্যবহিত পূর্বে আমার মন এবং আত্মাকে স্বামীতে কেন্দ্রীভূত না করে, ইন্দ্রকে পতিরূপে কায়মনে চিন্তা না করলেও মুখে উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

আমার এই পাপ এত ভয়ঙ্কর ছিল যে মুনি ঋষি দেবতাদের আশীর্বচন স্তব্ধ হয়ে গেল। গুরুগম্ভীর স্বরে পিতা বলেন—"হ্যাঁ, তুই ইন্দ্রযোগ্যা নারী, কিন্তু ইন্দ্র অহল্যাযোগ্য পুরুষ নয়। গৌতম অহল্যাযোগ্যা পুরুষ। কারণ গৌতম জিতেন্দ্রিয়। তপস্যার বলে গৌতম ইন্দ্র হতে পারেন এবং তুই ইন্দ্রযোগ্যা কথাটি প্রমাণিত হতে পারে। আজ এই পবিত্র মুহূর্তে তুই যে একটা পাপবাক্য উচ্চারণ করেছিস তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এক জন্ম নয়, তোকে সহস্র জন্ম তপস্যা করতে হবে।"

প্রকৃতপক্ষে যে আমি ইন্দ্রকে বিবাহ করতে চাই তা নয়—পিতার একমুখী বিচারের জন্য গত কিছুদিন যাবৎ যে প্রতিবাদ আমার মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছিল তাহাই আমাকে এইরকম এক পাপ বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য করে। তার পরিণাম যে এত ভয়াবহ হবে এবং একটি পাপবাক্য উচ্চারণের জন্য আমাকে জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করতে হবে বলে আমি কি জানতাম?

কাতর কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি—'পাপ কি? আমি কি পাপ করলাম।'

গম্ভীর কণ্ঠে পিতা বললেন—"যে কর্মে মন অশান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়—যে কর্মে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না, তারই নাম পাপ।" সুমিষ্ট ফলের মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে একটি কীট প্রবেশ করলে যেমন ফলটি কীটদ্রংষ্ট হয়ে যায়, সেইরকম একটি পাপবাক্য দিয়ে তোর মনে যে পাপ ভাবনা প্রবেশ কবল তা তোর সমগ্র জীবনকে উদ্বিগ্ন ও পাপবিষ্ট করে তুলবে। একমাত্র গুরু হলেন গৌতম যে তোর পতিদেবতা হিসাবে পুণ্যের শঙ্খধ্বনিতে তোর পাপকাতর মনকে অভিমন্ত্রিত করবেন। পিতার বাক্য শেষ না হতেই সহস্র মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি আমার অন্তবাত্মাকে মন্দ্রিত করার পরিবর্তে পাপ ভাবনায় মন্থিত করে দেয়।

প্রথা আমার অন্তঃকরণ পড়তে পারে। আমার মনোভাব জেনে সে আমার কানের কাছে সতর্কবাণী শোনায়—"তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হোক যাকে পতিরূপে তোমার ইহকাল পরকালের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল, তাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ না করার নাম কেবল পাপ নয়, মহাপাপ অহল্যা! বিবাহে ভোগ মুখ্য নয়, ত্যাগ মুখ্য। তাই গৌতমের প্রতি তোমার দৈহিক আকর্ষণ থাক বা না থাক নীতির দৃষ্টিতে গৌতমই তোমার কাম্যপুরুষ। ইহা ব্যতীত অন্যচিন্তা মাহাপাপ।"

আমি যূপকাঠের বলির মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বধূবেশে। চতুর্দিক থেকে আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল পুষ্প নয়, যেন পাপ বৃষ্টি হচ্ছে আমার উপব হে আমার অন্তরতম তাপ! আমাকে দগ্ধ কর, আমাকে সমাপ্ত কর।

তিন প্রকার তাপ দ্বারা সন্তপ্ত এই জীবন। কাম, ক্রোধ লোভ ইত্যাদি আত্মিক তাপ, হিংস্র জীবজন্তুর ক্রুরতা থেকে সৃষ্ট আধি ভৌতিক তাপ এবং বজ্র বর্ষা বিস্ফোরণ ইত্যাদি দৈবী দুর্বিপাকেব আধিদৈবিক তাপ দ্বারা দগ্ধ এই মানুব। মানুষ হয়ে যখন পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি, তখন তাপদগ্ধ হওয়াটা জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে মেনে নিতে হবে। দগ্ধ না হয়ে জীবন কি সম্ভব!

বিবাহ সংস্কারের হোমাগ্নি আজ আমাকে মোহমুগ্ধা করার পরিবর্তে তাপদগ্ধা করছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক বলে আমি মেনে নিয়েছি। এই অভাবিত প্রাপ্তি আমাকে পাথর করে দিয়েছে। আমার সমস্ত স্বপ্নকে আমি বিবাহযজ্ঞে আহুতি দিয়েছি।

ব্রাহ্মমুহূর্তে আচার্য গৌতম ববেবেশে এবং আশ্রমের অন্যান্য আচার্যগণ বরযাত্রী হিসাবে রম্যবনে এসে পৌঁছালেন। আচার্যকে বরবেশে দেখে আমি উল্লাসিতা হলাম না, কে জানে কেন শঙ্কিতা এবং সংকুচিতা হয়ে গেলাম। আচার্যর এই বেশ আমার কল্পনায় কখনও চিত্রিত হয়নি। তাঁকে হোমানলের মতো পবিত্র অথচ কঠোর দেখাচ্ছিল। পিতা, ভাই নারদ এবং অন্যান্য দেবগণ কন্যাপক্ষের তরফে বর এবং বরযাত্রীদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। পিতা বরপক্ষকে যজ্ঞ সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করে স্বয়ং পুরোহিত কর্ম শুরু করলেন। এরপর কন্যাপক্ষের "ইন্দ্রাণী কর্ম"। আমি এখন ইন্দ্রাণী রূপে সজ্জিতা। প্রত্যেক বর ইন্দ্র এবং প্রত্যেক বধূ নাকি ইন্দ্রাণী।

জীবনে অন্তত একটি দিন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সবাই আনন্দিত হয়। আজ গৌতম 'ইন্দ্র' এবং আমি ইন্দ্রানি। আটজন সধবা নারী ইন্দ্রাণী কর্মের সময় আমাদের দুজনের প্রশস্তি গেয়ে নৃত্য করছিলেন। তাদের নৃত্য-গীত চলাকালীন আচার্য গৌতম বররূপে আমার কাছে এলেন। বিধিপূর্বক তাঁর আমাকে বিবাহবস্ত্র, অঙ্গরাগ, পুষ্পমাল্য এবং দর্পণ ইত্যাদি উপহার দেওয়ার কথা। আচার্য গৌতম কি অভিনব উপহার আমাকে দেবেন তা দেখার জন্য প্রথা সমেত উপস্থিত নারীগণ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বরপক্ষের বিবাহ উপহার সর্বদাই উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে রোমাঞ্চিত করে।

বিবাহের সময়ে বরপক্ষের তরফে এটাই কন্যাকে প্রথম উপহার। তাই কন্যার রূপ ও রুচি অনুযায়ী তদুপরি তার পছন্দসই এবং তাকে অধিক আকর্ষণীয়া করার জন্য স্বর্ণজরির বুননে চিত্রিত হিরন্ময় অধোবাস ও অধিবাস উপহার দেওয়া সম্ভ্রান্ত আর্য পরিবারের বিধি ছিল। পশম কাপড়ের পাড়ে সোনার জরির সূক্ষ্ম কারুকাজ করায় বৈদিক নারীরা ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তাই বিবাহে উপহার দেওয়ার জন্য বরপক্ষ বহু পূর্বেই সোনার জরির বস্ত্র "পেশস" বরাদ দিয়ে প্রস্তুত করাতেন। এর সাথে অত্যন্ত রমণীয় কারুকার্যময় বক্ষোবাস 'প্রতিধি' আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার জন্য গৌতমের উপহার ছিল 'মৃগাজিন' (মৃগছাল)। মৃগাজিন এক শুদ্ধ পরিধান হিসাবে গণ্য। যজ্ঞের সময়ে যাজ্ঞিকদের স্ত্রীরা মৃগাজিন পরিধান করতেন এবং মৃগাজিন সহজলব্ধ ছিল না বলে যাজ্ঞিক পরিবারে ইহা দুর্লভ বস্ত্ররূপে পরিগণিত হত। দীক্ষা গ্রহণের সময় মৃগাজিন অপরিহার্য ছিল। তাই গৌতম নিজের পত্নীর জন্য স্বর্ণজরি নির্মিত পেশস (পশমবস্ত্র) না এনে 'মৃগাজিন' উপহার দিয়ে উচিত কাজ করেছেন বলে বয়স্কা রমণীরা যখন সাধুবাদ জানাচ্ছিলেন তখন যুবতীরা বলাবলি করছিল—'ইন্দ্রযোগ্যা অহল্যা ব্রহ্মচারিণী জীবনে মৃগাজিন পরিধান করতেন, এতে কারও কিছু বলার নেই, কিন্তু মৃগাজিন পরে সন্ন্যাসিনীর বেশে বাসরঘরে যাওয়া কি যথার্থ? আচার্য গৌতম কি ফুলশয্যার রাত্রেও অহল্যাকে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে বাধ্য করবেন? অঙ্গরাগের পেটিকা খুলে প্রথা হতবাক হয়ে যায়। সুরভিত অগুরু চন্দন, হলুদ, কুঙ্কুম ইত্যাদির পরিবর্তে সেখানে ছিল যজ্ঞভস্ম। এবং দর্পণের পরিবর্তে একটি কৃষ্ণশিলা। এইসব পদার্থের পিছনে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব আছে বলে উপস্থিত মুনিঋষি এবং দেবগণ মত প্রকাশ করলেও আমি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলাম।

আমার উদাসভাব লক্ষ করে প্রথা চুপিচুপি আমাকে বলে—"স্বামী সত্য হলে স্ত্রী শ্রদ্ধা, স্বামী ভাব হলে স্ত্রী বাণী, সত্যের সাথে শ্রদ্ধার এবং ভাবের সাথে বাণীর সম্পর্কের মতো স্বামী সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক নিত্য। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক প্রীতিই দাম্পত্যকে মধুময় করে। তাই এই উপহারের ঔপচারিকতার ওপর গুরুত্ব দিও না। আচার্য গৌতম ন্যায়নিষ্ঠ দার্শনিক। তাই তাঁর প্রতিটি আচার ব্যবহারের গূঢ় অর্থ বোঝার চেষ্টা করলে তুমি সুখী হবে। অর্থ না বুঝে তাঁকে দোষারোপ করলে তুমি অযথা দুঃখী হবে অহল্যা। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় এই কারণেই। নারী হল মঙ্গলময়ী। তুমি বরনারী এবং আজ তুমি বধূ। 'ব'

অর্থাৎ আনন্দকে প্রবাহিত করে গৌতমের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারলে 'বধূ'র যথার্থ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবে। প্রথা ক্রমাগতভাবে আমার কানের কাছে বিধি বিধান উচিত অনুচিত করণীয় এবং বর্জনীয়র তালিকা দিয়ে চলেছে, আমি শুনছি কিনা সে ব্যাপারে তার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

কন্যাদানের সময় উপস্থিত হয়। আমার সুখী দাম্পত্যজীবনের কামনা করে পিতা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন—"হে সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমার এই কন্যা অহল্যাকে আমি জগতের শ্রেষ্ঠ নারী হিসাবে সৃষ্টি করেছি। শুধু শরীরেই আমি তাকে অহল্যা রূপ দিইনি, নিয়ম এবং সংস্কার প্রদান করে অতি যত্নে আমি তাকে বিদুষী এবং ব্রহ্মবাদিনী করিয়েছি। উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করে সংযমপূর্বক নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচারিণীর জীবন অতিবাহিত করেছে। গৌতমের মতো তপঃনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষির সে উপযুক্ত পত্নী হতে পারবে। আমার কন্যা অহল্যার হৃদয় মধুময় এবং ভাবনা প্রেমময়। বেদ থেকে আমি তাকে মধুবিদ্যাই শিক্ষা দিয়েছি। আখ পেষণ করলে যেমন মধুর রস নির্গত হয় তেমনই আমার মধুমতী কন্যা অহল্যা যত দুঃখ বিপদ, অশ্রদ্ধা ভোগ করলেও প্রতিশোধ পরায়ণা এবং হিংস্র না হয়ে মাধুর্যের স্রোতই প্রবাহিত করবে। কখনও যদি তাকে অন্যায় অবিচারের শিকার হতে হয়, তাহলে রূঢ় আচরণ না করে নিজের দেহ মন ও আত্মা থেকে মধুর স্রোতের মন্দাকিনী প্রবাহিত করে অন্যায়কে ন্যায়ে এবং বিপদকে সম্পদে পরিণত করবে।

হে প্রভু! আজ আমার পরম সৌভাগ্য, সুশীল কর্মঠ জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মবাদী পুরুষ, মহর্ষি গৌতমের হাতে আমি আমার কন্যাকে সম্প্রদান করছি। এই দুর্লভ দান গৌতম সহৃদয়ে গ্রহণ করায় আমি কৃতজ্ঞ। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের আশায় এই নবদম্পতি আজ পবিত্র গৃহযজ্ঞের শুভারম্ভ করতে যাচ্ছে। হে বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় দাম্পত্যজীবনে আপনি তাদের সহায় হন। হে পরমাত্মা! তাদের মেধাবী পরোপকারী দীর্ঘায়ু পুত্র জাত হয়ে পৃথিবীর অশেষ কল্যাণসাধন করুক, এই প্রার্থনা করে পিতা নবদম্পতিকে পবিত্র জলে অভিষিক্ত করলেন। কি জানি, কোন ভাবনায়, অভিষেক কলসের জলধারার সাথে আমার অশ্রুধারা অনায়াসে মিশে গেল। কারণ পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে যাওয়ার সময় কন্যার অশ্রুমোচন স্বাভাবিক। অশ্রুপাত না করা নারীসুলভ আচরণ নয়। তাই আমার অশ্রু অন্যদের আনন্দের পথরোধ করে না। গৌতম কিন্তু নির্বিকার নির্লিপ্ত। কারণ তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয়। নির্বিকার হওয়াটা জ্ঞানীসুলভ আচরণ। সাত্ত্বিক অনাড়ম্বর পরিবেশে পাণিগ্রহণের মুহূর্ত উপস্থিত হল।

আমার দক্ষিণ হস্ত ধরে ভাবগম্ভীর স্বরে আচার্য গৌতম বললেন—"দেবী, আমি নিজেকে সৌভাগ্যশালী এবং তোমাকে সৌভাগ্যশালী করার উদ্দেশ্যে তোমার পাণিগ্রহণ করছি। দেবী! তুমি আমার যৌবন, জরা এবং ব্যাধির সহচরী হয়ে থাকবে বলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করছি। যৌবনকালে পতি পত্নীর মধ্যে ভোগই ব্যবধান হয়ে থেকে যায়, কিন্তু জরাবস্থায় দু'জনের মধ্যে নির্মল সাত্ত্বিকতাই দুটি আত্মাকে একাকার করে দেয়। আকাশ ও ধরণীর মতো আমাদের সম্পর্ক চিরন্তন হোক। তোমার ভাগ্যশালী ন্যায়পরায়ণ বেদজ্ঞ পিতা

তোমার ব্রহ্মচারিনী জীবন পালন করার জন্য তোমাকে আমার কাছে অর্পণ করেছিলেন। আজ গৃহস্থাশ্রম নির্বাহ করার জন্য তিনি তোমাকে সমর্পণ করছেন।

ভগ, আর্যমা, সবিতা, পুরন্ধি ইত্যাদি দেবগণ তোমাকে আমাকে অর্পণ করছেন। তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। হে দেবী! তুমি বহু গুণে বিভূষিতা। আমি ঋক্ মন্ত্র হলে তুমি হলে সাম্ মন্ত্র। হে দেবী! তুমি আমার গৃহকে শোভন কর, তোমার কমনীয় রমণীয় স্পর্শে আমাকে ধন্য কর।"

আচার্য গৌতমের জ্ঞানগর্ভ মধুর বাণীতে কি সম্মোহন ছিল কে জানে তাঁর প্রতি উৎপন্ন হওয়া বিরোধ আমার মন থেকে সহসা অপসৃত হয়। হয়তো বিবাহ সংস্কারের পবিত্র প্রভাব আমার অবচেতন মনে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু গৌতমের স্পর্শ আমার রক্তে উদগ্র উষ্ণতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমি শান্ত স্নিগ্ধ পূর্ণিমা রাত্রিতে পরিবর্তিত হয়েছিলাম। ঋত্বিকগণের দ্বারা উচ্চারিত বিবাহ মন্ত্রসকল বরবধূ একসাথে উচ্চারণ করাই বিবাহের বিধি। কিন্তু গৌতমের মতো বেদজ্ঞের সম্মুখে কোন ঋত্বিজই বা মন্ত্রপাঠ করবেন। তাই গৌতম নিজেই মন্ত্রপাঠ করলেন আমি যন্ত্রবৎ তাঁর সাথে স্বব মেললাম "প্রাণবায়ু যেমন দেহের নিঃস্বার্থ সেবক সেইরূপ আমরা উভয়েই নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সেবা করে পরস্পরের অভিবৃদ্ধিতে সহায়ক হব। শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ কবব না। বৃক্ষ যেমন ভূমিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে আমারও পরস্পরকে আশ্রয় করে প্রীতিপূরক বেঁচে থাকব। সংসার হল বাধাবিঘ্নে ভরা প্রস্তুপূর্ণ নদী সদৃশ। পার্বত্য নদীর প্রবলস্রোতে একাকী নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য। তাই পথিকেরা একে অপরের হাত ধরে নির্বিঘ্নে নদী পার হয়। সংসাররূপ নদী পার হওয়ার জন্য আমরা একমন এক প্রাণ হব। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি আবেগরূপী ভারবহন করে সংসার রূপী নদীর খরস্রোত অতিক্রম করা কষ্ঠসাধ্য, সেই জন্য প্রথমেই এই ক্ষতিকারক আবেগগুলিকে আমরা ত্যাগ করব.....।

কে যেন পরিহাসচ্ছলে বলে ওঠে—"আচার্য গৌতম বোধহয় ভুলে গেছেন যে তিনি এখন আর অহল্যার গুরু নয়, তিনি এখন তার স্বামী। অথচ পাণিগ্রহণের সময় থেকে তিনি যেভাবে বেদমন্ত্র পাঠ করে চলেছেন, ফুলশয্যার রাত্রের অবস্থা কি হবে, তাই ভেবে বেচারা অহল্যা চিন্তায় পড়েছে।" এইটুকুতেই মৃদু হেসে চুপ করে গেলেন গৌতম।

'হস্তগ্রাভ'র পরে অনুষ্ঠিত হল সপ্তপদী। আচার্য গৌতম আমার হাত ধরে যজ্ঞাগ্নির চারপাশে সাত পাক হাঁটলেন। উভয়ে প্রস্তরখণ্ডের ওপর চললাম এবং অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করলাম, এরপর দু'জনে অগ্নিতে খই অর্পণ করলাম। সংসার জীবনে প্রস্তরখণ্ডের ওপর চলতে হয় এবং অপবকে খুশী করার জন্য অনেক প্রিয় জিনিস উৎসর্গ করতে হয়। এই ইঙ্গিত দিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন হল। গৌতম গুরুকুলের আচার্য হয়েই রইলেন, কিন্তু আমি রম্যবনের মুক্ত বিহাঙ্গিনী অহল্যা থাকলাম না। আমি এখন গৌতমপত্নী অহল্যা। আমার বাসভূমি আর রম্যবন নয়— গৌতমাশ্রম। বিদায়ের পূর্বে পিতা আমাদের বুকে জড়িয়ে

বললেন—"হে দম্পতি। গৃহ হল, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত স্বপ্নের উদ্যান। গৃহ উভয়েরই সাধনক্ষেত্র। উভয়েই হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমের আহুতি প্রদান করে গৃহযজ্ঞকে প্রজ্জ্বলিত কর। প্রীতিলাভের জন্য পরস্পর শোভন ব্যবহার প্রদর্শন করে এবং আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে গৃহাঙ্গনকে শোভাময় কর। হে দম্পতি! আদর্শে প্রেমে তোমাদের দাম্পত্য পবিত্র ও প্রীতিপূর্ণ হোক্। তোমরা একে অপরের অলঙ্কার হয়ে গৃহের শোভাবর্ধন করো। দাম্পত্যপ্রেমের রহস্যভেদ করে তাকে মহৎ কর। তোমাদের গৃহ ও পরিবার স্বর্গে পরিণত হোক্।"

সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ 'পুত্রবতী ভবঃ, যশস্বিনী ভবঃ পতিব্রতা ভবঃ সৌভাগ্যবতী ভবঃ ইত্যাদি আশীর্বাদে আমাকে নিমজ্জিত করলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের এখনও পর্যন্ত দেখা নেই। পিতা তাঁকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে গৌতমের সাথে কলহ এবং মতান্তরের জন্য ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার অর্থ হল ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করা। ইন্দ্রদেবের এইরূপ অসৌজন্যতার পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। ইন্দ্রদেব অহল্যাকাঙ্খী ছিলেন, একথা কারও অজানা নয়। ইন্দ্রদেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গৌতমের সাথে বিবাহসম্পন্ন হওয়ায় ইন্দ্রদেবের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। ইচ্ছা করলে বজ্রপাত করে ইন্দ্রদেব গৌতমকে ধ্বংস করতে পারতেন, কিন্তু বজ্রাঘাত অহল্যাকেও পীড়িত করতে পারে, সম্ভবত সেই ভয়ে ইন্দ্রদেব নীরব রয়েছেন। এইরকম নানাপ্রকার সম্ভাব্য গুঞ্জন চলাকালীন নিজস্ব সম্ভ্রান্ত ভঙ্গীতে ইন্দ্রদেব বিবাহ সভায় উপস্থিত হলেন। উপহার স্বরূপ তিনি এনেছিলেন, স্বর্গের পারিজাত মালা এবং নানা অলঙ্কার। প্রথমেই তিনি পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন—'পিতামহ ব্রহ্মা, আমি বহুপূর্বেই উপস্থিত হতে পারতাম, কিন্তু জলবন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গের মধ্যে এক বিষম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্যার সমাধান না করে চলে এলে আজ দাস আর্য সংঘর্ষে রক্তপাত হত, ঘটনা গুরুতর আকার ধারণ করলে আজ বিবাহ বিভ্রাটও ঘটত না বলে কে বলতে পারে? দাসবর্ণের লোকেরা অধিক জলব্যায় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আমার দ্বারা বন্টন করা জলধারা আর্যদের সাথে সমভাবে পাওয়ার অধিকারী কি না সেটা বিচার করার জন্য একটা জরুরি সভার আয়োজন করেছিলাম। সভায় প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হল। যাইহোক, সেইসব সমাধান করে তবেই আসতে পারলাম। তাই আমার অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমি আপনার কাছে, বন্ধু গৌতম এবং দেবী অহল্যার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

ভাই নারদ হাসতে হাসতে বললেন—"দেবরাজ! আপনি শীঘ্র এসে পৌঁছোলেও যে ফল পাওয়া যায়, বিলম্বে এলেও সেই ফল পাওয়া যায়। "শুভস্যশীঘ্রম্—বিলম্বে অভীষ্ট সিদ্ধি" এই দুটি বাক্য কেবলমাত্র আপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যাইহোক আমার বোনের প্রতি আপনার করুণা এবং আশীর্বাদ থাকলেই সে সুখী হবে। আপনি তো জানেন বৈদিক বিবাহের দুটি লক্ষ্য। প্রথমটি হল পুত্রবতী হয়ে স্বামীর বংশরক্ষা করা এবং দ্বিতীয়টি হল "সুরত" বা দাম্পত্য সুখ লাভ করা। অবশ্য বংশরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদন হল মুখ্য এবং সুরত

তারপর। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা", 'পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্', অর্থাৎ পুত্রলাভের জন্য ভার্যাকে আনা হয় এবং পিণ্ডদানের জন্য পুত্রের আবশ্যকতা আছে। একথা আমার পূর্বেও অনেকে বলেছে, আজ আমি বলছি এবং আমার পরে বহু মহর্ষি একথা বলবেন।

বহু আর্যঋষি যৌন কামনা দমন করে যৌবনকালে ব্রহ্মচর্য পালন করে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁচেছেন অথচ বংশরক্ষার উদগ্র কামনার উর্ধে যেতে না পেরে জরাগ্রস্ত-অবস্থায়ও বিবাহ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ঋষি অগস্ত্যের কথা তো আপনি জানেন। সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে মহর্ষি পদে উন্নীত হলেন, কিন্তু পিতৃপুরুষকে নরক থেকে উদ্ধার করার বাসনায় বৃদ্ধাবস্থায় বিদর্ভ রাজকন্যা ষোড়শী সুন্দরী লোপামুদ্রাকে বিবাহ করলেন। বৃদ্ধ ঋষি চব্যন পশ্চিম আর্যাবর্তের রাজা শর্যাতির কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। বৃদ্ধ ঋষির ষোড়শী কন্যাকে বিবাহের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার্য গৌতম বৃদ্ধ না হলেও পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছেন, তিনি আমার ষোড়শী অপরূপা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেছেন। তাকে দাম্পত্যসুখ দেওয়া গৌতমের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বংশরক্ষার জন্য আমার ভগিনীর কমপক্ষে দশটি পুত্রসন্তানের জননী হওয়াটা সকল আর্যঋষির মতো ঋষি গৌতমের লক্ষ্য হয়ে থাকবে। তাই আজ বিবাহমণ্ডপ থেকে ওঠা বরকন্যাকে আপনি এই আঁশীর্বাদ করুন—"দশ অস্যাং পুত্রান্ আধেহি।" এই কন্যাকে দশটি পুত্র প্রদান করো। অবশ্য আপনি শুধু আশীর্বাদ করবেন, মহর্ষি গৌতম কয়টি পুত্রের জনক হবেন সেটি নির্ভর করে তাঁর ওপর। আশীর্বাদ ব্যতীত তাদের জীবনে কোনও ব্যাপারে আপনি বা কেন হস্তক্ষেপ করবেন! যত হলেও গৌতম আপনার বন্ধু এবং গুরুভাই, অহল্যা আপনার গুরুকন্যা। এইকথা বলে মৃদু হেসে ভাই নারদ পর্যায়ক্রমে গৌতম এবং ইন্দ্রদেবের মুখের দিকে তাকালেন। শ্যালক মহাশয়ের এই পরিহাসে গৌতম খুশী হলেন না, বিরক্তই হলেন, কিন্তু খুশী হলেন, ইন্দ্রদেব।

ইন্দ্রদেব হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর আশীর্বচন কাউকে শোনাবার মতো ছিল না, তাই আমিও শুনতে পারলাম না। কেবল নীরবে গ্রহণ করে ইন্দ্রদেবের পাদস্পর্শ করার সময়ে তিনি বললেন—"দেবী অহল্যা, আজকের আশীর্বাদের সঙ্গে আমার সমাবর্তন উৎসবে তোমাকে প্রদান করা বরের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই 'বর' তোমার জন্য সেইরকম আছে। জীবনকালের মধ্যে যখন ইচ্ছা তুমি তা চেয়ে নিতে পার। অবশ্য আমার 'ইন্দ্রপদ' থাকার মধ্যে, না হলে তুমি যা চাইবে আমি হয়তো তা দেওয়ার অবস্থায় থাকব না। আমি শুনতে পাচ্ছি, বহু ঋষি এখন ইন্দ্রপদ লাভের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনায় রত। ইন্দ্রপদ আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, বা আমি সেজন্য লালায়িত নয়। কারণ ইহা এমন এক পদ যেখানে আসীন হওয়ার পর তুমি সবাইর ভুলবোঝার শিকার হতে বাধ্য। তার একমাত্র কারণ হল ইন্দ্রপদের বিশাল ক্ষমতা এবং তার প্রতি অপরের ঈর্ষা। সেদিন রত্নমালাটি তুমি গ্রহণ করোনি, আজ এই পারিজাতমালা তোমার বিবাহের উপহার সদৃশ প্রদান করছি। এই পুষ্প দিব্য ভাবনায় এমনই সুবাসিত যে স্বর্গচ্যুত হলেও মলিন হবে না। পর্থিব নীতিনিয়মে প্রেমীযুগল পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে থাকা অপার্থিব প্রেম কি মরে যায়!" এই কথা বলে

ইন্দ্রদেব এমন মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন যে আমি সম্মোহিতা হয়ে গেলাম। ইন্দ্রদেবের মুগ্ধকারী দৃষ্টিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আমি বাহ্যজ্ঞান হারালাম। এমন সময়ে প্রথা আমার কানে কানে বলে—'ইন্দ্রজাল—অহল্যা, ইন্দ্রদেবের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হওয়া, অতি সহজ—কিন্তু সেই জালমুক্ত হওয়া দুঃসাধ্য। এই কথায় আমি প্রকৃতিস্থা হলাম। হঠাৎ আমি ইন্দ্রদেবকে প্রশ্ন করি—"জলের সমবন্টন নিয়ে আর্য-অনার্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে আপনি তার কি মীমাংসা করলেন। অনার্যগণ তাদের কৃষিকাজ ও ব্যবসায়ের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাবেন তো?'

আমার এই ধরণের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে সবাই অবাক হয়ে যায়—ভাই নারদ তার স্বভাবসুলভ রসিকতায় বলে ওঠেন অহল্যা, তোর ব্যবহার দেখে আশ্চর্য লাগছে। তুই এখন ঋষিপত্নী। বরং তোর একথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, আর্য ঋষিরা তাঁদের আশ্রমে যে পরিমাণ জল ব্যয় করে থাকেন ভবিষ্যতেও তাঁরা সেই পরিমাণ জল পাবেন কিনা? গৌতমাশ্রম ইন্দ্রদেবের করুণা থেকে, বঞ্চিত হবে না তো? অথচ বিবাহ লগ্নেও তুই সেই উপদ্রবী অনার্যদের কথা চিন্তা করছিস? আমরা মনে হচ্ছে তোর মনেব অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে তোর অনার্য বন্ধু বান্ধবী, ঋচা, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি। বেচারা আর্যঋষি গৌতমের অবস্থা তো অনার্যদের চেয়েও খারাপ।"

ভাই নারদের এই মন্তব্যকে সকলেই শ্যালক মহাশয়ের স্বাভাবিক রসিকতা মনে করে হেসে ওঠে, কিন্তু গৌতমকে রুক্ষ এবং কঠোর দেখাচ্ছে গৌতম আশ্রমের ঋষিদের চিন্তিত দেখাচ্ছে, কিন্তু ইন্দ্রদেবকে মার্তন্ডের মতো চিরপ্রসন্ন মনে হচ্ছে। ইন্দ্রের ইঙ্গিতে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ পারিজাতমালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিতে উদ্যত হলে গুরুগম্ভীর কন্ঠে গৌতম বলেন—"ধন্যবাদ ইন্দ্রদেব! আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার এই পারিজাতমালা গ্রহণ করার অনুমতি আমি আমার স্ত্রী অহল্যাকে দেব না। কারণ মরণশীল পৃথিবীতে প্রতিদিন সেখানে অসংখ্য ফুল ঝরে যাচ্ছে, সেখানে অমলিন পারিজাতমালার অধিকারিণী হলে আহল্যার মধ্যে অহংকার জাত হবে। অন্যদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার ফলে তার মধ্যেকার সৎগুণগুলি নষ্ট হবে। আত্মজ্ঞান থেকে সে দূরে চলে যাবে—সেটা তার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। তাই আপনার আশীর্বাদ সে গ্রহণ করছে—কিন্তু পারিজাতমালা নম্রতার সাথে ফিরিয়ে দিচ্ছে। অহল্যা অনন্যা নয়—রক্তমাংসের শরীরধারিণী সাধারণ নারী, তাঁর জন্য পারিজাতমালা কেন?"

গৌতমের এই অনুদার চিন্তা এবং সৌজন্যহীন ব্যবহারে কেবলমাত্র ইন্দ্রদেবই ক্ষুণ্ণ হলেন না, আমিও ক্ষুণ্ণ হলাম, প্রায় সবাই ক্ষুণ্ণ হলেন। এর দ্বারা ইন্দ্রদেবকে অপমান করা হল বলে অনেকেই অনুভব করে। আমি মনে মনে ভাবলাম—রত্নমালা এবং পারিজাতমালা দুটো থেকেই গৌতম আমাকে বঞ্চিত করল। তাহলে কি আমার জন্য সর্পমালা রেখেছে। গৌতমের দৃষ্টিতে আমি তাহলে অনন্যা, অসামান্যা শ্রেষ্ঠা নারী নয়—রক্তমাংসের শরীরধারিণী সাধারণ এক নারী। হ্যাঁ, যখন বিনা পরিশ্রমে দুর্লভ বস্তু লাভ হয় তখন তার মূল্য

হ্রাস পায়। পিতা গৌতমের কাছে আমাদের মূল্য-হ্রাস করে দিয়েছেন। গৌতম আমার জন্য পিতার কাছে প্রার্থী ছিল না। পিতাই নিজের কন্যার জন্য গৌতমের কাছে প্রার্থী হলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা যার কাছে প্রার্থী সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাকে সাধারণ কেনই বা না ভাববে। কাল সকালে সে বলতেই পারে যে তোমার পিতা যেচে তোমাকে আমাকে দিয়েছেন, আমি তোমাকে চাইনি। শুধু ব্রহ্মার অনুরোধ এড়াতে না পেরে.....উঃ পিতা কেন এমন করলেন? আমার মধ্যে থাকা অসামান্য নারীর অহংকারকে চূর্ণ করার জন্যই কি পিতার এই পরিকল্পনা!

নির্বিকারভাবে পুনরায় আশীর্বাদ জানিয়ে দাসদাসীসহ ইন্দ্রদেব ফিরে গেলেন। শুধু পিতার কাছে রেখে গেলেন একটি সুসজ্জিত রথ। সেই রথটি পিতার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বরকন্যা সেই রথে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। সম্ভবত পিতা পূর্বে এই ইচ্ছাপ্রকাশ করে 'রথ' আনিয়েছিলেন। উপরন্তু পিতা নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি দিব্য 'তল্প' (পালঙ্ক)। সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে তাহা নির্মিত হয়েছিল। মধুযামিনীতে এই পালঙ্কে শয়নপূর্বক মধুর দাম্পত্য আরম্ভ করাই নিয়ম। এর ফলে মেধাবী সন্তানলাভ হয় বলে বিশ্বাস। গৌতম দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন ইন্দ্রদেব প্রদত্ত রথ এবং পিতার প্রদত্ত তল্প (পালঙ্ক)। দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন—"আমি একজন আদর্শ শিক্ষক। কন্যাপক্ষের কোনও উপঢৌকন গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই উপঢৌকন প্রথা ভবিষ্যতে এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে কন্যার পিতার ক্ষেত্রে ভারসদৃশ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া অহল্যা এখন ঋষিপত্নী, গুরুকুল আশ্রমের অধ্যক্ষের পত্নী। বিলাসব্যসন থেকে দূরে থাকা সে অভ্যাস করবে। তাই সে পায়ে হেঁটে আমার সাথে আমার আশ্রমে যাবে, এবং সেখানে ভূমিতে তৃণশয্যায় মধুযামিনী যাপন করবে। এতে যদি সে সুখী না হয় তাহলে আমার সাথে দাম্পত্য জীবনেও সুখী হওয়া সম্ভব নয়। সুখ বস্তুগত নয়, আত্মাগত। আমার স্ত্রী হিসাবে অহল্যার একথা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।"

সেই মুহূর্তে আমার তাপদগ্ধ জীবনযাত্রা শুরু হল যে মুহূর্তে আমি প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে গৌতমকে অনুসরণ করে কণ্টকিত বন্যপথে আমার কর্মভূমি গৌতম আশ্রমের দিকে পা বাড়ালাম। বিদায়বেলায় পিতা আমাকে গলায় জড়িয়ে বললেন—যাও মা, প্রসন্ন চিত্তে পরীক্ষার সম্মুখীন হও। অহল্যা নাম সার্থক কর। নিজে যজ্ঞ এবং নিজে স্বাহা হয়ে আমার সার্থক সৃষ্টি হিসাবে নিজেকে প্রমাণ কর।

আমার হৃদয় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল পিতার কথায়। ভস্ম মেখে তৃণশয্যায় মধুযামিনী যাপন করে গৌতমপত্নী হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করব আমি—আবার যজ্ঞ ও স্বাহা হয়ে ব্রহ্মাপুত্রী হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করব আমি। কিন্তু এই 'আমি' কে? কার অধীন এই 'আমি'। গৌতমের না ব্রহ্মার? এই 'আমি'র কি কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই? কারণ এই 'আমি'টি এক নারীদেহকে আশ্রয় করেছে। সেই মুহূর্তেই আমার স্বাধ্যায় আরম্ভ হল। আমি নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম। পিতার পায়ের ধূলি নিতে গিয়ে প্রথমবার পিতা আমাকে কোলে নিলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমি বললাম—"মাতৃহীনা কন্যার প্রতি এমন

কঠোর দণ্ডবিধান কেন করলেন পিতা? আমি কি করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব? গৌতম আশ্রমে আমি কি নিজের 'স্ব' কে খুঁজে পাব? অনায়াসে পিতার চোখ সজল হয়ে ওঠে। সংযতস্বরে তিনি বলেন—পিতৃকেন্দ্রিক আর্যসভ্যতায় একা তুই নয়—প্রত্যেক মেয়েই তোর মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়—আবার উত্তীর্ণও হয়। গৌতম বিচারশীল। সে তোর প্রতি অবিচার করবে না। তোর অহল্যাত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি কখনও কঠোর রুক্ষ হয়, তাহলে বুঝবি সেটা তোকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার বাহানা। বাহ্য রূপে গৌতম সুন্দর যুবক না হতে পারে, কিন্তু সে কামুক, দুঃশ্চরিত্র, বিলাসী বা ভ্রষ্টাচারী নয়। তাকে নিয়ে সুখী হওয়ার চেষ্টা করবি। পতিব্রতা নারীর যা করণীয় তাই করবি।"

বিদায়ের অন্তিমপর্বে পিতা পুনর্বার আমাকে বললেন—"হে অশেষগুণশালিনী কন্যা, তুই আজ মঙ্গলময়ী বধূ। গৃহস্থজীবন এক মহাযজ্ঞ। গৃহযজ্ঞে মুখ্য পুরোহিত হল নারী। বিবাহযজ্ঞ থেকে অগ্নি বহন করে তুই নূতন গৃহে স্থাপন করবি। প্রাতঃ এবং সায়ংকালে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে আত্মসৌরভকে যজ্ঞসৌরভে পরিণত করে গৃহকে সুরভিত কববি। তুই হবি বিশ্বের যজ্ঞবেদী। সেই যজ্ঞবেদী থেকে উৎপন্ন হবে লোকাহিতকারী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রজাগণ। তাই তোর স্নেহ ও পবিত্রতা ব্যতীত গৃহযজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না—একথা তুই মনে রাখিস। গৌতম মহর্ষি হয়েছে, ব্রহ্মচর্যের শক্তিতে শক্তিমান, কিন্তু মহর্ষি থেকে দেবর্ষি এবং দেবর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য তাঁর যে সঙ্কল্প—সেটা তোর ধর্ম কর্ম প্রেম ও সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব হবে না, কাবণ তুই গৌতমের অর্ধাঙ্গিনী।

হে অভিমানিনী অহল্যা! আজ গৌতমাশ্রমে তুই অতিথি কিংবা শিক্ষার্থিনী হয়ে যাচ্ছিস না গৃহরূপী বিশাল সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হয়ে তুই যাচ্ছিস, মহির্ষ গৌতমের সদাচারিণী সচিব হয়ে ত্যাগ এবং প্রেমের অনুশাসনে গৃহরাজ্য শাসন করবি। তোর গৃহ কোনও সাধারণ সাম্রাজ্য নয়, তোর গৃহ একটি গুরুকুল আশ্রম। তাই সেটা এক অভিনব সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যের প্রজাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন হয় এবং তার ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত। তাই গৃহসাম্রাজ্ঞীর বিশ্রাম বিলাস এবং আলস্যের সময় কোথায়? তোর গৃহসাম্রাজ্যে তুই-ই শাসিকা, তুই সেবিকা তুই পরিচারিকা। নিরপেক্ষ এবং নম্র আত্মীয়তার মনোভাব নিয়ে সাবইর সেবা করা তোর কর্তব্য। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহ, অনুরাগ অতিথিদের প্রতি নিষ্কাম সেবা, সাহায্যকারীদের প্রতি কোমল করুণা, পশুপাখীর প্রতি অহিংসাভাব, বনস্পতির প্রতি যত্নশীলতা, অন্যায়কারীদের প্রতি মঙ্গলদায়ক শাস্তি এবং মধুসিক্ত কঠোরতা, মাতৃভূমির প্রতি রাষ্ট্রভাবনা, সমাজের প্রতি গভীর আস্থা, সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ, সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধনের সঙ্কল্প এবং সর্বোপরি স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সহযোগই তোর গৃহযজ্ঞের মন্ত্র হোক্। শুধু এই সব ভাবনায় যে তোর হৃদয়কে পবিত্র ও মন্ত্রিত করায় সহায় হবে সেই পরমাত্মার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণই হোক তোর গৃহযজ্ঞ এবং জীবনযজ্ঞের মহামন্ত্র। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত যজ্ঞের স্বাহা বা সিদ্ধি কিছুই সম্ভব নয়, তাই সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করে গৃহযজ্ঞ শুরু কর।"

প্রত্যেক সিদ্ধি স্বাহার অপেক্ষা করে—স্বাহা ব্যতীত সিদ্ধি কোথায়?

সুদূর কোশল রাজ্যের সীমায় পবিত্র গঙ্গা নদীর অনতিদূরে মনোরম তপোবনের মধ্যে রমণীয় গৌতম আশ্রম। সেটাই আমার শ্বশুরবাড়ি আমার কর্মভূমি—আমার সিদ্ধিস্থল।

আজ থেকে সিদ্ধির মহাযজ্ঞ শুরু। রম্যবন থেকে পদব্রজে গৌতম আশ্রমে যাওয়ার সময় থেকেই প্রতিমুহূর্তে আমার নিজেকে 'স্বাহা' করা শুরু হয়েছে। রম্যবনে সকাল থেকে সন্ধ্যা চপলা কুমারীর মতো ঘুরে বেড়াতাম—কিন্তু পথশ্রম কি জানতাম না—রৌদ্রে তাপ অনুভব করিনি, শরীরের ক্লান্তি কি তা বুঝিনি, কারণ নিজের রুচি ও ইচ্ছা অনুসারে আমি মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতাম। আজ গৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার সময়ে পদে পদে কণ্টকবিদ্ধ হচ্ছে, রক্ত ঝরছে ক্লান্ত বোধ করছি, আকাশ যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে।

গৌতম আশ্রমে পৌঁছাবার পর আমার শরীর ছিল কিন্তু প্রাণ আছে বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। পূর্বে গৌতম আশ্রমে এসেছি পিতার সাথে রথ চেপে, ফিরেছি রথে ভাই নারদের সাথে। তাই ক্লান্ত বোধ হয়নি। বরং রম্যবন থেকে গৌতম আশ্রম পর্যন্ত কোশল রাজ্যের মনোরম বনভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করে অপার আনন্দলাভ করেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে পায়ের তলার পৃথিবী কত রুক্ষ এবং কর্কশ, মাথার ওপরের আকাশ কত হৃদয়হীন এবং তাপদগ্ধা—সবুজ অরণ্য—এক প্রহেলিকা, কারণ তার মধ্যে লুকিয়ে আছে অসংখ্য হিংস্র জন্তু। এই বনভূমি এত সরল স্বচ্ছ নয়, এখানেও আছে কুটীলতা, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা। আজ গৌতমকে অনুসরণ করে চলার সময়ে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার সামনে। তবে কি গৌতম আশ্রম আমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হবে। সুন্দর অসুন্দর কি শুধু মনের প্রতিফলন—বাস্তব নয়।

গৌতম পুরুষ হিসাবে আকর্ষণীয় না হলেও গুরু হিসাবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর দিকে তাকালে দৃষ্টি আহত হত না। অথচ স্বামীরূপে গৌতমকে দেখামাত্রই তাঁর বাহ্যরূপ এবং অন্তঃচেতনা উভয়ই কষ্ট দিচ্ছে। গৌতমের চেহারার প্রতিটি বিরূপতা চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আচার্য গৌতমকে এত বয়স্ক মনে হত না। আচার্যর বয়সের সাথে ব্রহ্মচারিণীর বা কি সম্পর্ক? তখন আচার্যকে সৌম্যদর্শন মনে হত না সত্যি কিন্তু তাঁর জ্ঞানদীপ্ত ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁর চেহারা ছিল সম্ভ্রম উদ্রেকারী। কিন্তু আজ পতিদেব গৌতম আমার চোখে অধিক বয়স্ক মনে হচ্ছে, তাঁর চেহারায় সুন্দরতার লেশমাত্র নেই। পিতা আমার জন্য এইরকম বয়স্ক স্বামী মনোনয়ন করলেন কেন? পিতা কি আমার বয়স ভুলে গিয়েছিলেন। ষোলোবছরের মেয়ে.....গৌতমের বয়স কত? বয়স যাই হোক না কেন গৌতম প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে পৌঁছেচেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য অনেক প্রাতঃস্মরণীয় আর্য ঋষির বৃদ্ধাবস্থায় ষোড়শী রূপসী রাজকন্যাকে বিবাহ করার দৃষ্টান্ত আছে। আজ একের পর এক সেই ঋষিপত্নীদের কথা মনে পড়ছিল। সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে গিয়ে অর্বাবত সমুদ্র উপকূলে মনোরম আশ্রম প্রতিষ্ঠাকারী আর্যঋষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ঋষি এবং সুকন্যার বিবাহ আখ্যান আমি যখনই শুনেছি ক্ষুব্ধ হয়েছি—কেন জানি না। অবশ্য এই আখ্যান যে শুনবে সেই ক্ষুব্ধ হবে।

ঋষি চ্যবন বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করে একজন বিশিষ্ঠ ঋষি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। আর্যাবর্তের রাজা শর্যাতি একদিন ঋষি চ্যবনের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ ঋষির তপোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা শর্যাতি তাঁকে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম জানালেন। কিন্তু রাজার কিছু যুবক অনুচর ঋষি চ্যবনকে অপমান করে। ক্রুদ্ধ ঋষি অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে রাজা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষি চ্যবন একটি শর্তে অভিশাপ প্রদান থেকে বিরত হবেন বলে ঘোষণা করলেন। শর্তটি রাজা শর্যাতির পক্ষে ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক। রাজকুমারী ষোড়শী সুকন্যাকে ঋষির হাতে অর্পণ করতে হবে। রাজকুমারী পিতা তথা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে নিজের কুমারী জীবনের মধুর স্বপ্নসকল জলাঞ্জলি দিয়ে বৃদ্ধ চ্যবনকে বিবাহ করলেন। এই কথা আমি প্রথার কাছে শুনেছিলাম। তখন ঋষির প্রতি আমার সম্মান হ্রাস পেয়েছিল। রাজা শর্যাতিকে ভয়ভীত করে তিনি কন্যাসমা সুকন্যাকে লাভ করেন। সুকন্যার স্থানে আমি হলেও তাই করতাম। তাছাড়া আর উপায় কি? কেই-বা চায় নিজের পিতৃকুল, রাজ্যবাসী ঋষি শাপে ভস্ম হয়ে যাক।

আজ সুকন্যা পতিব্রতা হিসাবে পূজ্য কিন্তু বৃদ্ধ কুৎসিৎ চব্যন ঋষিকে স্বামীরূপে পেয়ে তিনি কি সর্বান্তকরণে সুখী হতে পেরেছিলেন? যদি তাই হত তাহলে নিজের পাতিব্রত্যে অশ্বিনীকুমারদের সন্তুষ্ট করে চিকিৎসার দ্বারা স্বামীর যৌবন ফিরিয়ে এনেছিলেন কেন? সত্যি কি মানুষের বয়স ফিরে আসে? সুকন্যার আখ্যান মানুষকে দুঃখ দেয় বলেই বোধহয় এইরকম কাহিনী প্রচার করা হয়েছে। সুকন্যার মতো পতিব্রতা হওয়ার চেষ্টা করলে আমি শ্রেষ্ঠ সতী ও পতিব্রতা হতে পারব, কিন্তু চেষ্টা করলে কি আমি দাম্পত্য সুখ লাভ করতে পারব?

পথশ্রম আমাকে ক্লান্ত করে তোলে। আমি ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় বসে পড়ি। গৌতম ও অন্যান্য ঋষিগণ দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন। আমি একা বসে আছি। প্রথা কি মরে গেল নাকি? সে কতদূরে যে আছে, আমি একা একা নানারকম প্রথাবিরোধী কথা চিন্তা করছি। পতিব্রতা নারী সুখ খোঁজে না, যশ খোঁজে, আমার যশস্বিনী হওয়াই বিধেয়।

হঠাৎ অরণ্যের ভিতর থেকে এক ভীষণ গর্জন শোনা গেল। আমি চমকে উঠি—ভয়ে কেঁপে উঠলাম। এই গর্জন হিংস্র জন্তুর নয়—কোনও দস্যুর হবে বোধহয়। হিংস্রজন্তু হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আর যদি দস্যু হয় তাহলে মৃত্যুর চেয়েও অধিক দুর্ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর্য অনার্য সংঘর্ষ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, একাকী কোনও আর্য নারীকে অরণ্যের মধ্যে পেলে কোনও দস্যু কি তাকে 'দেবী' সম্বোধন করে পুজো করবে? রম্যবন এবং গৌতম আশ্রমের নিকটবর্তী অনার্য-গোষ্ঠীর লোকেরা আমাকে চেনে, জানে আমার অনার্যপ্রীতি। কিন্তু অপরিচিত দস্যুর কাছে তো আমি আর্যনারী। উপরন্তু গৌতমপত্নীর পরিচয় পেলে দস্যুর কবল থেকে আমার আর রক্ষা নেই, কারণ গৌতমের অনার্যবিদ্বেষ আর্যবর্তে কারও অজানা নয়। হিংস্র পশু বা দস্যু যদি আমাকে হত্যা করে গৌতম কি আমাকে পুনর্জীবন দিতে পারবে? হয়তো গৌতমের সেই অলৌকিক শক্তি থাকতে পারে। যদি না

থাকে তাহলে ঋষি গৌতম কি যুবকঋষি রুরুর মতা নিজ আয়ুর অর্ধেক দান করে জীবন্ত করবে এবং অবশিষ্ঠ জীবন দাম্পত্য সুখে অতিবাহিত করবে?

রুরুর মতো প্রেমিকস্বামী সকলের ভাগ্যে থাকে না। রুরু পত্নী প্রমোদবরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। তিনি স্বামীর অগাধপ্রেমের অধিকারিণী ছিলেন। সে প্রেম শুধুমাত্র দৈহিক ছিল না—ছিল আত্মাগত। তাই সর্পদংশনে নববিবাহিতা পত্নীব অকালমৃত্যুতে রুরু কেবলমাত্র মর্মাহত হলেন না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যমালয় থেকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। বহু কষ্ট স্বীকার করে রুরু যমালয়ে পত্নীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মৃত্যুদেবতাব নিকট স্ত্রীর জীবনভিক্ষা করেন। কিন্তু যমরাজ নিষ্ঠুরবাণী শোনালেন—"প্রমোদবরার পরমায়ু শেষ হয়েছে। আমি কোথা থেকে পরমায়ু এনে তাকে জীবন্ত করব? এ আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। রুরু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, দ্বন্দ্বে প্রশ্ন নেই। রুরু উত্তর দিলেন—'মৃত্যুরাজ! পরমায়ুর অভাব নেই, আমার অবশিষ্ঠ পরমায়ু থেকে আমি অর্ধেক দান করছি। আমার প্রাণপ্রিয়া পত্নী প্রমোদবরাকে সেই পরমায়ু দান করে তাকে পুনর্জীবন দেন। অবশিষ্ঠ সময় আমরা একত্রে দিনযাপন করব এবং একদিন একসাথে পরলোকগমন করব। আমরা কেউ কারও বিয়োগ সহ্য করতে পারব না। যদি সর্পদংশনে আমার মৃত্যু হত তাহলে এতক্ষণ প্রমোদবরার মৃত্যু হত, আমি তো তাব মৃত্যু অবলোকন করেও নিষ্ঠুরের মতো বেঁচে আছি। দয়া করে আমার পরমায়ুর অর্ধাংশ গ্রহণ করুন প্রভু!" চমৎকৃত হয়েছিলেন যমরাজ। পৃথিবীতে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা তিনি অনেক দেখেছেন কিন্তু পতিপ্রেমের এই অপূর্ব পরকাষ্ঠা অনন্য। যমরাজ রুরুর অর্ধেক পরমায়ু নিয়ে প্রমোদবরাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং রুরু দম্পতি অবশিষ্ঠ জীবন আদর্শ দম্পতি হিসাবে সুখে অতিবাহিত করেন। রুরুর প্রেম স্মরণ করে আমি রোমাঞ্চিত হই। যুবক রুরু অনেক সুন্দরী নারী পেতেন, এমনকি বহুপত্নীও গ্রহণ করতে পারতেন। আর্যপুরুষের বহুপত্নী গ্রহণে বাধা কোথায়? অথচ রুরু পত্নীর জন্য নিজের অর্ধেক আয়ু দান করলেন! আমার স্বামী কি রুরুর মতো আমাকে ভালবাসবেন? না—ঋষি গৌতমের জীবনের লক্ষ্য প্রেম নয়—যোগ। তাই এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর যোগসাধনার পথের কাঁটা দূর হবে। পিতা নিজেই আমাকে গৌতমকে সমর্পণ করেছেন।

আমি একা বসে শঙ্কিত হয়ে উঠি মৃত্যুভয়ে নয়, প্রেমহীন দাম্পত্যের আশঙ্কায়। আমার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হলেই ভালো হয় কিন্তু সেই ভীষণ গর্জন কোনও 'দস্যু' বা হিংস্র পশুর নয়, সেটা ছিল মেঘের বজ্র নিনাদ। আকাশের একদিকে প্রখর সূর্য, অপরদিকে ঘনঘোর মেঘের কৃষ্ণভিসার। এটাই কি জীবন?

এই সুযোগে যদি কোনও দস্যু আমার সতীত্ব অপহরণ করে, তাহলে গৌতম কি আমাকে গ্রহণ করবে? তাঁর পুন্যস্পর্শে মুছে দেবে আমার শরীরের অবাঞ্ছিত কলঙ্ক? এই সতীত্ব পদার্থটি কি, যা প্রতি পদে নারীর জীবনকে বিপন্ন করে। সতীত্ব দেহগত না আত্মাগত? যে স্বইচ্ছায় পরপুরুষকে দেহ অর্পণ করে তা কি সম্পূর্ণ দেহগত? আত্মার অনুমোদন না থাকলে কি দেহসুখের উপলব্ধি হয়? যদি হয় তা সুখ হতে পারে, আনন্দ নয়। স্বামীর সাথে প্রতারণা

করে দেহের সুখের লালসায় গোপনে পরপুরুষকে দেহদান করা অসতীর কাজ। কিন্তু অসহায় অবস্থায় যদি কেউ কামুক হিংস্র পুরুষের বলাৎকারের শিকার হয়, তাহলে সে কেন অসতী হবে। আজ নয়, এই প্রশ্ন আমার মনে বহুবার জেগেছে, কারণ আর্য-অনার্য সংঘর্ষে উভয়পক্ষেরই বহু কুমারী কন্যা পতিব্রতা নারী বলাৎকারের শিকার হয়ে সমাজচ্যুতা রক্ষিতা, দাসী হয়ে রয়েছে পত্নীপদ থেকে বঞ্চিতা হয়েছে। গৌতমের ভাবায় যদি দেহ তুচ্ছ—আত্মা শ্রেয়, তাহলে নারী দেহের অনাকাঙ্খিত অপব্যবহারের জন্য নারীই সব সম্মান প্রতিষ্ঠা হারায় কেন? তাহলে নারী কি শুধু আত্মাবিহীন দেহধারিণী জীব।

আমি যে কি ভাবছি, তার কুলকিনারা নেই। প্রথার হাতে থাকে আমার ভাবনার লাগাম। কখনও নিয়মশৃঙ্খলার লঙ্ঘন করলে প্রথা আমাকে শাসন করে। সে পাশে থাকলে রম্যবন থেকে বিদায়ের দুঃখ ক্লান্তি এবং পথ শ্রম সত্ত্বেও পতির পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে বিরত হতে দিত না আমাকে। পা' তো ছার, হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হলেও সমাজ নির্ধারিত রাস্তা ভুলতে দেয না প্রথা। কি হবে, যদি আজ রাস্তা ভুলে আমি অন্য কোনও আশ্রমে চলে যাই। ছিঃ কেন যে আজ আমি আবোল-তাবোল ভাবছি, তা নিজেও জানি না।

যাই হোক ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রথাব শুভ্রকেশ ক্ষীণ আশার মতো দৃষ্টিগোচর হয়। শীঘ্রই সে আমার কাছে এসে পৌঁছাবে, আমি অন্ধের মতো তাকে জড়িয়ে ধরব—অসহায়ের মতো নিজেকে সমর্পণ করব তার কাছে। সে যেরকমভাবে রাস্তা দেখাবে সেটাই বিধিব নির্দেশ বলে মেনে নেব। সবাই তাই করে আমি অন্যথা করব কোন সাহসে!

প্রথা আমার কাছে এসে পৌঁছাবার মধ্যে চোখের জলে আমি আমার বসন ভিজিয়েছি। তাকে দেখামাত্রই জড়িয়ে ধরে আমি কান্নাভেজা গলায় বলি—"প্রথা, রুরুর মতো কোনও প্রেমনিষ্ঠ যুবক ঋষির সাথে বিয়ে না দিয়ে গৌতমের মতো নীতি সর্বস্ব প্রৌঢ় ঋষির সাথে পিতা আমার বিবাহ কেন দিলেন? গৌতম কি রুরুর মতো প্রেমিক হতে পারবে?

প্রথা আমার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। সে বলে—"ঋষিরা যুবক অবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন করে জ্ঞানলাভের জন্য সাধনা করে। জ্ঞানের সাধনায় বহুকাল কেটে যায়। কেউ কেউ ঋষি থেকে মহর্ষি, মহর্ষি থেকে দেবর্ষি হওয়ার সাধনা করেন। স্বাভাবিকবাবেই তখন তারা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। তারপর তারা বিবাহ করেন ষোড়শী রাজকন্যাদের। দশপুত্রের জনক হওয়ার পর তারা উপলব্ধি করেন যে, জীবন ভোগ্য নয়, ভোগে সিদ্ধিলাভ হয় না, ত্যাগেই সিদ্ধিলাভ হয়। তাই স্ত্রী সন্তান পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থে গমন করেন। সিদ্ধিলাভের পথে স্ত্রী পুত্র তুচ্ছ মনে হয়। তারাই সিদ্ধপুরুষ হিসাবে পরিচিত। তাঁরা জগতে পূজ্য। তাঁদের পত্নীগণও সমাজে পূজিত হন। স্বামীর সম্মান ও খ্যাতির মধ্যে স্বামী বিরহের দুঃখ প্রকাশ করাও হাস্যকর মনে হয়। গৌতম বরং প্রৌঢ়াবস্থায় তোমাকে বিবাহ করেছেন তার বানপ্রস্থের বয়স আসন্ন নয়, তাই তোমার ভাগ্যে অন্তত কিছুদিন স্বামীসুখ আছে। তুমি যদি মহর্ষি সৌভরির উপাখ্যান শোন তাহলে মহর্ষি গৌতমকে বিয়ে করেছ বলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করবে।"

আমার আর কোনও উপাখ্যান শোনার আগ্রহ ছিল না। কিভাবে গৌতমের কাছে পৌঁছাব, সেটাই ছিল চিন্তা। আমার মন্থরগতির জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হবেন না তো? আশ্রমে আচার্য গৌতমের ক্রোধ আমি দেখেছি। আর দেখেছি বলেই তাঁর ক্রোধকে আমার ভীষণ ভয়। সম্ভবত ক্রোধ দমন করতে পারেন না বলেই তিনি মহর্ষি থেকে দেবর্ষি হতে পারেননি।

প্রথা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পথশ্রম লাঘব করার জন্য সে মহর্ষি সৌভরির উপাখ্যান বর্ণনা করতে করতে হাঁটতে থাকে। আমিও উপাখ্যান শুনতে শুনতে তাকে অনুসরণ করি। প্রথার গর্ভে মহাকালের ইতিহাস সঞ্চিত আছে। মাঝে মাঝে মানুষের ইতিহাস নিষ্ঠুর মনে হলেও তা যতটা কৌতূহলপ্রদ তার চেয়ে অধিক উৎসাহজনক। মাঝে মাঝে ইতিহাস আমার সম্মুখে আহ্বান হয়ে দাঁড়ায়।

আমার সম্মুখে সাকার হলেন মহর্ষি সৌভরি। "যমুনা নদীর তীরে কন্ববংশীয় মহর্ষি সৌভরির মনোরম আশ্রম।" ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বাল্যকাল থেকেই তার মনে এই ধারণা দৃঢ়ভূত হয়েছিল। তাই তিনি ছিলেন সংসার বিরাগী সাধক। পার্থিব কামনা বাসনা থেকে তিনি ছিলেন বহু উর্ধ্বে। তাই পিতামাতার কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হননি। বহু রাজকন্যার সাথে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

যমুনা নদীর তীরে বসে তিনি নিবিষ্টচিত্তে ব্রহ্মার ধ্যান করছিলেন। এই সময় গরুড় যমুনা নদীতে জল পান করতে আসায় তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়, তখন তিনি গরুড়কে অভিশাপ দেন। যমুনা নদী গরুড়ের কাছে নিষিদ্ধ হল। এইবার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মার সাথে লীন করে দেওয়ার জন্য মহাত্মা সৌভরি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

একদিন যমুনা নদীর জলতরঙ্গে ব্রহ্মার স্বরূপ অবলোকন করে বৃদ্ধ সৌভরি ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে যাওয়ার সময়ে মৎস্যগোষ্ঠীর এক বিলাসী ধনী ব্যক্তি তাঁর যুবতী স্ত্রীদের সাথে জলকেলির উদ্দেশ্যে যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন। মৎস্য দম্পতির জলকেলি অবলোকন করে কামনা বাসনায় তাঁর স্থবির অবয়ব দগ্ধ হতে থাকে। যোগের মতো ভোগও যে জীবনের একটা সত্য ক্ষণিকের জন্য হলেও তিনি অনুভব করেন। ভোগের শক্তি যোগশক্তিকে পরাস্ত করে। বৃদ্ধ সৌভরি জরাজীর্ণ অবস্থায় যুবতী পত্নীর অন্বেষণ শুরু করলেন। তিনি খবর পেলেন পুরুদের রাজা এসদস্যুর পঞ্চাশজন সুন্দরী কন্যা এখন অবিবাহিতা আছে। "এসদস্যু" অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং বহুবার শত্রুদের আক্রমণ থেকে আর্যদের রক্ষা করেছেন। দস্যুরা তাঁর নাম শুনলেই ভয়ভীত হয়ে উঠত। এসদস্যুর রাজদানী ছিল যুবাস্তু নদীর তীরে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সৌভরি এসদস্যুর রাজধানীতে উপস্থিত হলেন এবং রাজার কাছে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন।

নিজের থেকে বয়স্ক সৌরভির এ বয়সে বিবাহের ইচ্ছা শুনে এসদস্যু যতটা আশ্চর্য হলেন, ততটাই সন্ত্রস্ত হলেন। যদি তিনি সৌভরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে ঋষির শাপে তার রাজ্যসম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু কি করে তিনি নিজের রূপবতী কন্যাদের এই

বৃদ্ধের হাতে অর্পণ করবেন? সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেই কন্যাদের এইরকম অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এখানেও তাই হল। এসদস্যু কন্যাদের ওপর ছেড়ে দিলেন সমস্যা সমাধনের ভার। এই পরিস্থিতিতে কন্যাদের যা করা বিধেয় তা না করে অন্যকিছু করার বিশেষ দৃষ্টান্ত কোথায়? অহল্যা, তুমি কি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করছ? গৌতম প্রৌঢ় হওয়া সত্ত্বেও তুমি কি পিতার কথা অমান্য করতে পেরেছ? তাই এসদস্যুর পঞ্চাশজন যুবতী কন্যা দেশযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে বৃদ্ধ সৌভরিকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। একসাথে পঞ্চাশটি কন্যা বিবাহ করায় আর্যঋষিদের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। এটি সামাজিক নিয়মভঙ্গ করে না।

"নিয়ম কে গড়ে?" —আমি অনায়াসে প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রথা বলে—নিয়ম যেই তৈরি করুক, তুমি কখনও নিয়ম গড়ার অধিকার পাবে না অহল্যা। বরং কখনও নিয়ম ভাঙলে ভাঙতে পার। হ্যাঁ, তারপর কি হল শোনো—সৌভরি একসাথে পঞ্চাশটি রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন।"

উঃ—আমি হোঁচট খেলাম রাস্তার পাথরে। প্রথা আমার হাত ধরে তুলে বলে— "শোনো, এইটুকুতেই হোঁচট খাচ্ছ! পূর্ণমাত্রায় দাম্পত্যসুখ উপভোগ করার জন্য সৌভরি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যৌবন ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানালেন। তুমি তো জানো অহল্যা, তাছাড়া একথা সর্বজন-বিদিত যে, কুমারী কন্যা ও নারীদের প্রতি ইন্দ্রদেব অত্যন্ত সংবেদনশীল। ইন্দ্রদেব সৌভরিকে চিরযৌবন লাভের উপায় বলে দিলেন। ইন্দ্রদেবের বরলাভ করে যৌবন প্রাপ্ত হয়ে পঞ্চাশ পত্নীর সাথে সৌভরি দাম্পত্যসুখে মগ্ন হলেন, কিন্তু—"

আবার কিন্তু কেন? আমি আবার হোঁচট খেলাম। —"কিন্তু সৌভরির কামবাসনা প্রশমিত হল না। উত্তরোত্তর কামবাসনা আগুনের মতো অধিক মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল। কামতৃপ্তি অতৃপ্তিকে অধিক বৃদ্ধি করে। তিনি মাঝে মাঝে অস্থির অশান্ত হয়ে উঠলেন। কামের তৃপ্তি এবং অতৃপ্তির মধ্যে সীমারেখা তাঁর কাছে স্পষ্ট হল না। তাঁর মনে হল তৃপ্তিই অতৃপ্তির মূল কারণ। তিনি অনুভব করলেন যে, 'প্রেয়ঃর সেবা অপেক্ষা শ্রেয়ঃর সেবাতেই প্রকৃত সুখ নিহিত। পত্নীদের বন্ধন ছিন্ন করতে তাঁর এক মুহূর্তও লাগল না। পঞ্চাশজন যুবতী পত্নী ও শতাধিক শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করে তিনি গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন তপস্যা করতে। পবিত্র জীবনের জন্য তিনি সকলের কাছে পূজ্য। তিনি দেবর্ষি পদেও উন্নীত হয়ে থাকবেন। তার এই ত্যাগের জন্য তিনি সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন বলে আমি জানি।

মহর্ষি সৌভরির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আমার অন্তরকে প্রকম্পিত করে। তাঁর পঞ্চাশজন পত্নী ও শতাধিক সন্তানের ব্যাকুল কান্না আমার হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রী নাড়া দেয়। কিন্তু প্রথা নির্বিকার আমি ব্যতীত অন্য কেউ এই কান্না শুনতে পায় না। আমি বললাম "প্রথা। সেই নারী ও শিশুদের আর্তনাদ তোমার মনে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।" প্রথা হাসে। সে বলে

"প্রতিটি যশ প্রতিষ্ঠা সম্মানের পিছনে বহু আর্তনাদ অশ্রুত থেকে যায়। আমার কান বধির—চোখে ছানি হৃদয় জড়বৎ, তাই আমার কোনও কষ্ট হয় না। তুমি সেদিকে কান দিও না। সম্ভবত আকাশ কাঁদছে। মেঘ ঢেকে এসেছে। গৌতম ইন্দ্রদেবের রথ প্রত্যাখ্যান করায় তোমার এই পথশ্রম। কিন্তু ইন্দ্রদেব নারীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তোমাকে রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন করেছেন। আর ভয় নেই। কোশল রাজ্যের সীমায় গৌতম আশ্রম আর বেশি দূর নয়। গৌতম নিশ্চয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কত সংযমী, সদাচারী পুরুষ গৌতম—তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকায় তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন। তিনি কি করে জানবেন যে আমি তোমার সাথে পা মিলিয়ে চলতে না পারায় তুমি একাকিনী অরণ্যের মধ্যে রোদন করছ বলে। যাই হোক, তুমি এবার ধীরে ধীরে এসো, আমরা শীঘ্র গৌতম আশ্রমে পৌঁছে যাব।

প্রথা কোথায় থেকে এত শক্তি পেল কে জানে? আমাকে পিছনে ফেলে অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত গৌতম আশ্রমে নববধূকে বিধিপূর্বক অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জানার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুভকর্মে বিধিরক্ষা করার ব্যাপারে প্রথা অত্যন্ত রক্ষণশীল। পিছন থেকে তাকে ডাকাও নিয়ম বিরুদ্ধ। তাতে নাকি শুভ কাজে বাধা পড়ে। তাই গৌতম যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছিলেন, প্রথা তাকে ডাকতে বারণ করে। আমারও গৌতমকে ডাকতে অভিমান হল—তিনি এখন আর গুরুদেব নয়—পতিদেব। নববিবাহিতা বধূর পথশ্রম অনুভব করেও যদি তিনি তাকে পিছনে ফেলে চলে যান, তাহলে কার না অভিমান হয়।

"ইন্দ্রদেব হলে অহল্যার মতো নারীকে ফুলের মতো হাতে তুলে নিয়ে দুর্গম অরণ্য পার করে দিতেন।" —কে যেন আমার কানের কাছে বলে। কে? প্রথা? প্রথা তো এইরকম সংস্কারবিরোধী কথা বলবে না। আর্যপুরুষ একই সময়ে একাধিক পত্নী গ্রহণ করেও মহর্ষি, দেবর্ষি, এমনকি দেবরাজত্ব প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। কিন্তু আর্যনারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা চিন্তাও করবে না। অবশ্য আমিও ইন্দ্রদেবের এইরকম কাজ অনুমোদন করি না। কিন্তু কথাটা বলল কে? প্রথা কোথায়? সে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। কে জানে বোধহয় আমিই ভুল শুনেছি। বাতাসের শিরশির শব্দ পাখির ঘরে ফেরার গান পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা টিপ্‌টিপ্‌ বর্ষার নূপুর ধ্বনি আমার মনে ভ্রম জাগায়।

আকাশের মেঘ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে সাতরঙা রামধনু। কালো মেঘের মধ্যে কে যেন এঁকে দিয়েছে মনোরম বঙ্কিম রেখাটি। সেই দৃশ্যে নিরাশ হৃদয়ও রঙীন হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে সেই সাতরঙের একটি রঙের সামান্য স্পর্শেও জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। তাহলে কি আমার পথশ্রম লাঘবের জন্য ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছেন? আমার মনে হচ্ছে আমার মাথার ওপর কে যেন মেঘের চাদর টেনে দিয়েছে—মরুৎদের নিয়োজিত করেছে স্নিগ্ধ সমীরস্পর্শে আমার ক্লান্তি-বিষাদ মুছে দেওয়ার জন্য। অমনোযোগী মেঘমালাকে আদেশ দিয়েছেন ঝির ঝির বর্ষায় আমার পায়ের তলার উত্তপ্ত মাটিকে শীতল

করার জন্য। তাহলে কি আমি রম্যবন ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই দয়াপরবশ হয়ে ইন্দ্রদেব আমার সাথে চলেছেন? যদি একথা সত্য হয় এবং মেঘকে ধনুকে বিদীর্ণ করে ইন্দ্রদেব আমার সম্মুখে উপস্থিত হন? সহসা মন্ত্রমধুর স্বরে কে বলে—"অহল্যা, কেন এই অকারণ পথশ্রম? গৌতম অহঙ্কারী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। সে আমার ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে না, তোমার রূপও সহ্য করতে পারছে না। তাই আমার উপহার প্রত্যাখ্যান করে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। সাধারণত বিবাহের উৎসবে আমি কন্যার পিতাদের রথ উপহার দিয়ে থাকি। বহু কন্যার পিতা কন্যার বিদায়ের জন্য রথের ব্যবস্থা করতে পারেন না। কোমল কন্যাগণের পথশ্রম লাঘবের জন্য আমি এই ধরনের উপহার দিয়ে থাকি। তোমার জন্যও আমি আরামদায়ক রথ নির্মাণ করিয়েছিলাম। কিন্তু গৌতমের হীনমন্যতাটা লক্ষ্য করো নারীজাতির প্রতি আমরা সংবেদনশীলতাকে গৌতম মনে করে তাহা নারীর প্রতি আমার দুর্বলতা। অকারণে নারীর প্রতি রূঢ় আচরণ করা কি চরিত্রবানের পরিচয়? তুমি তো বৈদিক নারী, ব্রহ্মাপুত্রী নিজের বিবাহে মতপ্রকাশের অধিকার তোমার ছিল, অথচ তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও তুমি তা মেনে নিলে কেন? গৌতম কি তোমার যোগ্য পুরুষ? হতে পারে সে জিতেন্দ্রিয় যোগী। তার তো বিবাহের আবশ্যকতা ছিল না, তোমার মতো ত্রিলোক সুন্দরী নারীকে সে কি সুখ দেবে? সে যদি বেদজ্ঞ, তাহলে সে নিজেব ক্ষমতা জানে না?

অহল্যা, আমি দেবতা হলেও আর্যপুরুষ এবং একদিন মর্তবাসী ছিলাম। আমার তপস্যা বীরত্ব, শৌর্য এবং সিদ্ধি আমাকে দেবত্ব করেছে। আমার শরীর আছে, কামনা বাসনাও আছে। পিতামহ ব্রহ্মার মুখে তোমার রূপের বর্ণনা শুনে আমি বহুদিন থেকেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তোমার জন্য বারম্বার পিতামহের দ্বারস্থ হয়েছি। বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ার বদলে বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে হয়েছে তোমাকে না পেলে আমার ইন্দ্রত্ব অপূর্ণ প্রমাণিত হবে। সেই অপূর্ণতা ত্রিভুবনকে শ্রীহীন করবে। ত্রিভুবনে হাহাকার জাগবে। সেজন্য একদিন তোমাকেও দায়ি হতে হবে। তাই এসো অহল্যা—আমি তোমাকে স্বর্গের পারিজাত বনে নিয়ে যাব। না না তোমার প্রতি কোনও অসদাচরণ করব না। তুমি এখন বিবাহিতা। আমি আর্যনায়ক হয়ে আর্যধর্ম কি করে লঙ্ঘন করব? আমি শুধু তোমাকে বন্দিনী করে রাখব পারিজাত বনে। এর ফলে পারিজাতের সৌন্দর্য কমে যাবে—আমি জানি। তোমার পায়ের নিচে পারিজাতের আশ্রয় নেওয়ার দৃশ্য কি মনোরম হবে বলত! তোমাকে ইষ্টদেবীর মতো প্রতিষ্ঠা করে আমি পূজো করব। আমি চিরদিন সৌন্দর্যের উপাসক।

গৌতম আর্যপুরুষ। বাহুবলে সে আমার কাছ থেকে তোমাকে জয় করে নিয়ে যাক। বাহুবলে না হলে জ্ঞানবলে তোমাকে উদ্ধার করুক। তা না হলে তপস্যালব্ধ অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করুক। আমার কোনও আপত্তি নেই। তাহলে অন্তত আমি জানব যে গৌতম তোমার যোগ্যপুরুষ। যদি সে তোমাকে উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে কাল সকালে দস্যুর হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার করবে। আর্যকরণের যে প্রহসন এখন চলেছে—তাতে আর্য-অনার্য বৈরীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গৌতমের রক্ষণশীলতা ও রূঢ়

নীতিনিয়মের জন্য বহু প্রতিভাবান দাস এবং শুদ্রবালক গৌতমের গুরুকুলে শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দাসগণ গৌতমবিরোধী এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এবার তারা তোমাকে হরণ করে গৌতমের ওপর প্রতিশোধ নেবে। এটা আমি দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষের বৈরীতায় নারী নির্যাতিতা হয়, তুমি সে কথা জানো। তাই ঋষি গৌতমের কাছে তোমার জীবন, সম্মান সুরক্ষিত কি না তার প্রমাণ সে দিক—আমি অবাক হয়ে চারদিকে তাকাই, কে বলল একথা—আমার অবচেতন মন না অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রদেব।

আমি আর্যনারী, ব্রহ্মাপুত্রী, গৌতমপত্নী অহল্যা। সুখের জন্য আমি সংস্কারকে বলি দিতে পারব না। প্রলোভনে পড়ে উভয়কুলের মর্যাদা লঙ্ঘন করতে পারব না। মানুষ নিজের জন্য বাঁচলেও সমাজের মধ্যেই বাঁচে। আমি সমাজের নিয়ম গড়িনি সত্যি—ভাঙ্গার সাহসও আমার নেই। সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার সিদ্ধান্তই আমার ভাগ্য। আমার ভাগ্য, আমি ভোগ করতে পারব, কিন্তু লঙ্ঘন করার অধিকার আমার নেই। তাই স্বামীর অনুমোদন আছে কি না, তা না জেনে আমি ইন্দ্রদেবের দান বা করুণা গ্রহণ করতে পারব না। তাই ইন্দ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাকে রথে বসিয়ে গৌতম আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেও আমি তা গ্রহণ করতে পারব না।

সহসা বজ্রের হুঙ্কারে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল মেঘের অভিমান। বিদ্যুতের মধ্যে ঝলসে উঠল ইন্দ্ররূপ এক অজানা আশঙ্কায় সেই বালিকা বয়সের মতো ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য বনপথে দৌড়াতে লাগলাম। মাঝপথে প্রথা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার জ্ঞানগর্ভ পতিদেব প্রশান্ত চিত্তে উদ্বেল সমুদ্রের এক নির্ভরশীল পোতাশ্রয়ের মতো আমার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মনে হল—আমি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি।

পত্রপুষ্পশোভিত তপোবনের সীমান্ত। দুইদিকে দুটি সুশোভিত তোরণ। বরবধূকে স্বাগত জানাবাব জন্য তোরণের দু'পাশে শুভেচ্ছুগণ অর্ঘথালা হাতে অপেক্ষারত। আর্য এবং অনার্য উভয় গোষ্ঠীই উপস্থিত। অনার্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধি রুদ্রাক্ষ এবং ঋচা। তারা এখন পতি-পত্নী। তারা কল্পনা করতে পারেনি যে আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। উপরন্তু ফিরে এসেছি ঋষিপত্নী হিসাবে। এবার অনার্য-পল্লীতে না যাওয়ার জন্য আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। বর্তমানে রুদ্রাক্ষ ও ঋচা অনার্যগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই ওদের গৌতম আশ্রমে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পূর্বেকার স্নেহ-ভালবাসা অটুট রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা ভিন্নগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাই পূর্বের ভাবোচ্ছাস সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। আমার পা দুটি স্থির। আমার ইচ্ছা করছে, কিছুক্ষণ অনার্যপল্লীতে উপস্থিত থেকে তাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বাগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। এখন আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আমি গুরুকুল আশ্রমের অধ্যক্ষের পত্নী। শ্রদ্ধায় নয়, তারা আমাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখছে। গৌতমকে বিয়ে করে আমি যেন তাদের থেকে দূরে সরে গেছি। আমাদের পূর্ব সম্পর্ক আর বোধহয় ফিরে আসবে না। ওরা দূর থেকে ফুল, দুর্বা, চাল ইত্যাদি আমাদের দুজনের ওপর বর্ষণ করছে। দেবতার মতো অভীষ্ট সিদ্ধ করার ভঙ্গীতে হাত তুলে আশীর্বাদ করে গৌতম।

আমি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করি। কিন্তু মাটি আকাশ ও মনোরাজ্যে একথা লিপিবদ্ধ হয়ে গেল যে আমার দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। আমি শ্রেষ্ঠ—তারা নিকৃষ্ট। আমি তাদের দাসদাসী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারি। ঋচা আমার দাসী হবে। ঋচার কোমল মুখটি দেখে মনে হচ্ছে যেন আমার দাসী হওয়ায় তার কোনও আপত্তি নেই। বিনা কারণে তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের এই বিনীত কৃতজ্ঞভাব আমাকে দুঃখে ম্রিয়মান করে। আমাদের মধ্যে গৌতম যেন এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর।

পতিদেবকে অনুসরণ করে আশ্রমে প্রবেশ করতে করতে ঈঙ্গিতে আমি ঋচাকে জানিয়ে দিলাম—"আমি সেই আগের অহল্যা, ঋষিপত্নী হলেও ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের গোষ্ঠীর বিরোধী নয়। আমি তাদের বন্ধু কারণ আমি তাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি না।"

চতুর্দিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। আশ্রমের বনস্পতি পরম সোহাগে পুষ্পবৃষ্টি করছে, পাখিরা মাঙ্গলিক গাইছে। নবদম্পতিকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রকৃতি নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। এই কি সেই গৌতম আশ্রম যেখানে পাঁচবছর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে আমি ঋষি গৌতমের আস্থাভাজন হতে পেরেছি? তখন আশ্রম ছিল দীক্ষাভূমি, আজ পরিণত হয়েছে জীবনভূমিতে। তাই মনে হচ্ছে সব কিছুই অভিনব, সুন্দর, অন্তরঙ্গ।

আশ্রমবাসী ঋষিগণ আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন—"হে বনদম্পতি! স্বাগতম, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে গৃহাভিমুখী হও এবং গৃহযজ্ঞ প্রজ্জ্বলিত কর। উভয়ে ব্রতনিষ্ঠ হও। স্বেচ্ছাচার বা ক্ষণিক বাসনার বশবর্তী হয়ে ব্রতভ্রষ্ট হও না। পরমাত্মা তোমাদের সহায়ক হন। হে নবাগতা বধূ! পতিই তোমার গতি এবং মুক্তি। পতিই তোমার সিদ্ধি এবং মোক্ষ। পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শও করবে না। গৃহের সুনাম রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট হও। এই আশ্রমের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে পতির সহায়িকা হও। গৌতম অশ্রমের মর্যাদা, সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য তুমি এখানে পদার্পণ করেছ। এই আশ্রমে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, গাছপালা, পশুপাখী, মাটি-আকাশ সবাই তোমার প্রজা। সেই প্রজাদের কল্যাণসাধনই তোমার গৃহযজ্ঞের লক্ষ্য হোক। হে কল্যাণী, অহল্যা নামের সার্থকতা প্রতিপালন কর। আশীর্বাদ তোমার প্রতি সদয় হোক। অভিশাপ তোমার সম্মুখে আসামাত্রই অভিশপ্ত হোক। কিন্তু মনে রেখ সিদ্ধির জন্য সহস্র স্বাহার আবশ্যক।"

নিজের শাস্ত্রীয় স্বামীত্বের অহংকারে বিভূষিত গৌতমকে দেখাচ্ছিল সুদূর পর্বতের মতো মহিমাময়। দৈব ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে আমি স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। সমর্পিত করেছিলাম আমার শরীর, মন ও জীবনকে। এটাই বিবাহের রীতি। এই নিয়মকে মেনে নেওয়ার সময় আমার মধ্যে কোনও ছলনা ছিল না। বিবাহের পূর্বেকার বিদ্রোহ, বিবাহকালীন দ্বন্দ্ব এবং বিবাহোত্তর বিষাদ আমার মন থেকে অপসৃত হয়েছিল বধূ হিসাবে গৌতম আশ্রমে পদার্পণের মুহূর্তে। এই আশ্রমের সবাই আমার প্রজা। আশ্রমরূপী বিশাল গৃহরাজ্যের আমি সাম্রাজ্ঞী এবং গৌতম এই রাজ্যের সর্বময় কর্তা—এই আশ্রমরাজ্যের সে ইন্দ্র। এই রাজ্যে বসবাসকারী সকল প্রজার অভীষ্টদাতা। সে আমারও অভীষ্টদাতা কারণ আমি তার

আশ্রমরাজ্যের অন্তর্গত। গৌতমের এই তপোভূমি হবে আমার সত্যের সিদ্ধিভূমি। তাই আমি অসত্যকে প্রশয় দেব না। অসত্যকে অভিশপ্ত করে সত্যকে বরণ করব।

আমি নববধূ, আজ নবদম্পতির মধুযামিনী। মধুযামিনীকে মধুময় করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব। গৌতমের তপঃভঙ্গ করতে আমি বদ্ধ পরিকর। আজ আমি গৌতমের শিষ্যা নই—আমি তার পত্নী, প্রিয়া। আমি জানি আমার প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ মাত্রেই গৌতমের জিতেন্দ্রিয়তার বাঁধ ভেঙ্গে যাবে—তার সংযমের সেতু ভূলুণ্ঠিত হবে। সে পরিবর্তিত হবে স্বাভাবিক মানুষ—নিছক পুরুষে। আচার্য গৌতমকে আমি দেখেছি, উপলব্ধি করেছি তার অন্তরের দোদুল্যমান তারুণ্যকে। তিনি অধিকসময় আমরা দিকে তাকাতে পারেন না। আমার শরীরের ছায়াও তিনি স্পর্শ করতেন না। আমার জন্য তাঁর শৃঙ্খলা ও সংযমের দম্ভ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে আমার প্রতি অস্বাভাবিক কঠোর হয়ে তিনি নিজের মনকে শাসন করেন। আজ আর সেই সকলের কোনও আবশ্যকতা নেই। আজ গৌতম আমার দেহ মন ও আত্মার অধিকারী। সমাজ স্বীকৃত আমাদের দেহসম্পর্ক—মনের মেলামেশা—আত্মার মিলন। তাই আজ বাসরশয্যায় বধুবেশে আমাকে দেখে গৌতম ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রেমিককেও পদানত করবে, সেটাই হবে আমার গৌতম বিজয়ের প্রথম সোপান। পৃথিবীতে এমন কোনও যোগীশ্রেষ্ঠ নেই, যে আমার রূপে মোহিত হবে না। তাই গৌতমকে বিমোহিত করা আমার পক্ষে কোনও অসাধ্য কর্ম নয়। কিন্তু হে বিজয়! মাঝে মাঝে তুমি এত কদাকার নিষ্ঠুর কেন হও? বিবাহ কামবাসনাকে প্রজ্জ্বলিত করে না—প্রশমিত করে—সংযত করে, কিন্তু তা সম্ভব হয় দেহ ভোগের মাধ্যমে। ভোগই ত্যাগের কষ্টিপাথর। তাই আজ স্বামী গৌতম ভোগের তীব্রতার মধ্য দিয়ে ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করবে। হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেই যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয় এবং সিদ্ধিলাভ হয়। তাই আজ আমাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা হতে হবে। সেটাই স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনকে করবে দৃঢ় এবং স্পষ্ট।

এইসব কথা অমার কানে কানে বলে প্রথা আমাকে বাসরঘরে ছেড়ে এল। গৌতমের সেই চিরাচরিত সাধনার কুটির আজ আমার বাসরঘর। ফুলশয্যা নয়, আজ আমার ভূমিশয্যা। আমার বাসরঘরে পালঙ্ক নেই—কোমল শয্যাও প্রস্তুত হয়নি আমার মিলনরাত্রির জন্য। ভূমির উপর তৃণশয্যা প্রস্তুত হয়েছে। তৃণশয্যার ওপর ফুলের পাপড়িও নেই। এমনকি কোমল কিশলয়ও কেউ বিছিয়ে দেয়নি। কর্কশ ভূমির ওপর শুষ্ক কণ্টকিত তৃণশয্যাই আজ আমার পত্নীত্ব এবং নারীত্বের পরীক্ষা নেবে।

তবুও আমার মনে দুঃখ নেই। পতিপ্রেমই মধুযামিনীকে করে মধুময়। অতএব প্রতিপ্রেমই আমার কাম্য। তৃণশয্যাকে অগ্রাহ্য করে আমি গৌতমের অপেক্ষায় বসে থাকলাম এবং প্রথার কথাগুলো আর একবার স্মরণ করলাম। দম্পত্যজীবন সম্পর্কে প্রথা বলেছিল—"দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভ মুহূর্তে পত্নী এক নীরব হোমকুণ্ড, সেখানে পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন পতিদেব। তাই পত্নীর চেয়ে পতি অধিক সংযত, যত্নশীল এবং সহৃদয় হয়ে নববধূর সাথে মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে তার দেহ মন ও আত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। স্বামীর

কোমল মধুর সম্ভাষণে নববধূ স্বামী তথা পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হয়। মিলনের এই মধুর মাহেন্দ্র মুহূর্ত সমগ্র দাম্পত্যজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। নববধূর নবকিশলয় সদৃশ রাগারুণ মনের ওপর প্রথম মুহূর্তে যে সংস্কারের প্রভাব পড়ে, তাহা দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু বহু সুপুরুষ প্রথমেই নববধূর হৃদয়ে হোমাগ্নির পরিবর্তে বাড়বাগ্নি জ্বেলে দেন কামভোগের প্রবণতায়। পত্নীর মন হৃদয় আত্মাকে অগ্রাহ্য করে দেহকেই করেন সর্বাগ্রে। এরফলে নববধূর মনে ক্লেশ জাত হয়। মনের মধুকোষ শুষ্ক হয়ে যায়। পরবর্তী জীবন সেই মুহূর্তের স্মৃতিতে ক্লেশদায়ক হয়ে যায়। ঋষি গৌতম অত্যন্ত জ্ঞানী, দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা না থাকলেও আছে অগাধ জ্ঞান।”

তাই আজকের এই মধুযামিনীকে মধুর বাণীদ্বারা মধুসিক্ত করবে গৌতম। আমি শুধু মনের মধুকোষ উন্মুক্ত করে অপেক্ষা করব। বাকি কর্তব্য গৌতমের। বাস্তবে প্রথার পরামর্শ আমাকে অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ করে তুলেছিল। স্রষ্টার দ্বারা যাহা পূর্ব নির্দিষ্ট, তাহাই হল মানুষের ভাগ্য। ব্রহ্মার দ্বারা যে আমার জন্য মনোনীত, তিনি হলেন আমার জন্য বিধিনির্দিষ্ট পতি, সেই আমার নিয়তি।। তাই সে ব্যতীত অন্য কাউকে মনে স্থান দেওয়া নিষেধ। লাভ-ই বা কি? তাই কায়মনোবাক্যে গৌতম ব্যতীত অন্য কারও চিন্তা না করে তারই প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

গৌতম তাপসরূপে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চিত্তচাঞ্চল্যের কোনও লক্ষণ নেই। আমার প্রসাধিত দেহসৌন্দর্যের কোনও মুগ্ধ-স্বীকৃতি তার দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম না। যেন আমি সেই ব্রহ্মচারিণী অহল্যা এবং তিনি আশ্রমের অধ্যক্ষ আচার্য গৌতম। তাহলে কি আমার অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং অফুরন্ত যৌবনের কোনও দাম নেই গৌতমের কাছে! আমার আত্মনিবেদন এবং বিশ্বস্ত প্রেমের কোনও মর্যাদা গৌতমের কাছে আশা করব না!

আমি কিছু বলার আগে শান্ত কণ্ঠে গৌতম বলে—“অহল্যা, আজ পথশ্রমে তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত, সুনিদ্রা তোমার ক্লান্তি দূর করবে—তুমি বিশ্রাম কর। আত্মশুদ্ধির জন্য আমি এখন ধ্যানে বসব। মধুযামিনীর শুরুতেই আমরা সংযত নৈতিক জীবনের শুভারম্ভ করব। বিবাহের উদ্দেশ্য কামভোগ নয় কারণ কামভোগে কামজ্বালা বাড়বাগ্নির মতো সমগ্র জীবনে ব্যপ্ত হয়ে যায়। কামদমনেই চিরন্তন শান্তি পাওয়া যায়। ঈশ্বর আরাধনা কামাগ্নিকে নির্বাপিত করে, জীবনকে পবিত্র ও নির্বিকার করে। কাম সংযম দ্বারাই পুরুষার্থ সার্থক হয়। দেহযজ্ঞে ইন্দ্রিয় যদি কেবলমাত্র কামবাসনা চরিতার্থ করে, হোতা না হয়ে গ্রহীতা হয়, তাহলে ইন্দ্রিয় আত্মার অঙ্গ না হয়ে শুধুমাত্র দেহের অঙ্গ হয়েই থেকে যায়। আত্মার অপর নাম ইন্দ্র। যারা ইন্দ্রের সহায়ক তারাই ইন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এবং মন ও বুদ্ধি আত্মবিকাশে সহায়ক হলে, ইন্দ্রিয় পদবাচ্য হয় ও মানুষকে মুক্তি দেয়। অতএব অহল্যা, ইন্দ্রিয় হল বন্ধন এবং মুক্তির দ্বার। বিবাহ বন্ধন নয়—মুক্তি। আমরা উভয় পরস্পরের মুক্তির সহায়ক হব। আজ ফুলশয্যার রাত্রে আমি তোমাকে আমার মনের কথা বলছি—ভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা মেটে না। বরং ভোগ করতে করতে ভোগ লালসা এত তীব্র হয় যে, মানুষ বৈধ অবৈধের

সীমারেখা লঙ্ঘন করে অবশেষে দুঃখী হয়ে যায়। এই পৃথিবী অমৃতময়ী। ঈশ্বর আমাদের অমৃত সমুদ্র দান করেছেন। অথচ ভোগ এবং বিষের অন্বেষণে মানুষের চিত্ত অস্থির এবং অসন্তুষ্ট। সেইজন্য আমি তোমাকে রথ, পালঙ্ক পারিজাত এবং ধনরত্নের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকার ঈঙ্গিত দিয়েছি প্রথমেই। বর্তমানে এইসব তোমার খারাপ লাগবে, কিন্তু পরে বুঝবে, আমি তোমার শুভাকাঙ্খী। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু যজ্ঞসামগ্রী। জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর সেইসকল সৃষ্টি করেছেন। তাই যা কিছু সুন্দর, দুর্লভ তাহা জগৎ কল্যাণের জন্য ব্যয় হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য ইন্দ্রের দান এবং তোমার পিতার উপহার আমি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য গ্রহণ করিনি। আমি জানি সেজন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ, কিন্তু আমি নিরূপায়।"

আমি অপলক্ক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার উপদেশ শুনছিলাম, সহসা আমার মনে প্রশ্ন জাগে—"আমিও সুন্দর এবং দুর্লভ, তাই আমারও জগত কল্যাণের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত। আমিও গৌতমকে পিতার এক দান। গৌতম আমাকে গ্রহণ করল কেন? বিবাহের প্রথম রাত্রি থেকেই যদি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রত পালন করার ছিল তাহলে গৌতমের বিয়ের প্রয়োজন কি ছিল? একথা সত্যি যে গৌতমের উপদেশগুলি সত্য, শাস্ত্রসম্মত এবং গ্রহণীয়; কিন্তু এটা কি বাস্তবে সম্ভব? অবশ্য গৌতমের মতো জিতেন্দ্রিয় সাধক, সত্যের উপাসকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু আমার মতো চপলা তরুণীর পক্ষে তা কতটা সম্ভব!

মহর্ষি গৌতমের আধ্যাত্মসাধনের দুঃসহ তপস্যার মধ্যে আমাদের দাম্পত্যের পরিণতি অবশেষে কি হবে? প্রণয়ের মাধুর্য এবং সকাম অনুরাগের কি কোনও মূল্য নেই পতি পত্নীর সম্পর্কে?

গোপন ব্যাথা এবং অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব অশ্রু হয়ে বয়ে গেলে আমার বুকের ভার কম হত, কিন্তু আমার চোখও আমার সাথে অসহযোগিতা করে। গৌতমের প্রভাবে তারই মতো শুষ্ক, রুক্ষ ও নির্বিকার হয়ে গেছে। আমার মনে হল, আমি না হয় কাঁদতে পারছি না, সমগ্র পৃথিবী যেন আজ আমার জন্য কাঁদছে। বাইরে বর্ষার সকরুণ সমারোহ অনুকম্পায় ভিজিয়ে দিয়েছে তপোবনের মাটি ও বনস্পতি।

এখন গৌতম যোগাবিষ্ট আর আমি তাপদগ্ধা অহল্যা।

কোন শিল্পীর অমর চিত্রকলার মদবিহ্বল প্রতিবিম্ব আমি অহল্যা! কোন কবির অশ্রুত ছন্দে আমি বিমুগ্ধাচারিণী অহল্যা! কোন প্রেমিকের রোমাঞ্চিত স্পর্শের আকর্ষণে উন্মাদিনী আমি অহল্যা! প্রকৃতির অনন্ত সম্ভারের মধ্যে কার হৃদয়ের অন্বেষণে স্বপ্নবিলাসিনী আমি অহল্যা!

রাত্রির অন্তিম প্রহরে আমি কাকে খুঁজছিলাম চুপি চুপি? সে কে? সে কিরকম? সে নিশ্চয় অত্যন্ত মনোহর, সে চিন্ময়, সে দেবতা না হলেও দিব্য, সে সুন্দর না হলেও সৌন্দর্যের সারবত্তা। সে সূর্য না হলেও সূর্যের প্রকাশক, সে চন্দ্রমা না হলেও চন্দ্রমার প্রতিফলক। তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বর্গ, মর্ত, অন্তরীক্ষের সীমা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত—সে শুধু অহল্যার জীবনসাথি নয়, সে অহল্যার জীবনাধার। সে কে? সে কিরকম? কবে হবে তার সাথে সাক্ষাৎ এবং মিলন!

প্রভাতকালের ওঁকার ধ্বনিতে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ওঃ এই স্বপ্ন তো আমি বহুদিন ধরে দেখছি—বসন্তের প্রথম স্পর্শ থেকে—বিবাহযোগ্যা হওয়ার দিন থেকে এবং পিতা আমার জন্য পতি নির্বাচন করেছেন শোনার পর থেকেই শয়নে জাগরণে আমি এই স্বপ্ন দেখছি। অথচ আজ ফুলশয্যার রাত্রির অন্তিম প্রহরে পুনরায় আমি এই স্বপ্ন কেন দেখলাম? তাহলে কি গৌতম আমার সেই কল্পিত মনের মানুষ নয়! অথবা মধুযামিনীতে গৌতমের কাছে শাস্ত্র উপদেশ শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় আমার যে বিবাহ হয়েছে একথা স্বপ্নে বিস্মরণ হয়েছিলাম—তাই এই অনূঢ়া স্বপ্ন!

বিবাহিত বৈদিক নারীর পক্ষে এ স্বপ্ন নিষিদ্ধ—অবৈধ। একবার বিবাহের গ্রন্থিবন্ধন হয়ে গেল পতি পত্নীর মধ্যে প্রেম অঙ্কুরিত হয়—শত ঝড়ঝঞ্ঝাতেও সেই প্রেম ব্যহত হয় না। নারীর প্রেম আবার অদ্ভুত এবং অভাবিত। সে শুধু দিতে জানে—তার কোনও প্রত্যাশা নেই। সেই প্রেমে অপরপক্ষ নেই—তাই দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন কোথায়? প্রত্যাশারহিত এই প্রেমে মাঝে মাঝে অশ্রু দীর্ঘশ্বাস, ব্যাথা বেদনাও প্রাপ্য হয়। সেটুকুই নারীর প্রাপ্য। অশ্রু নাকি নারীকে পবিত্র করে, নারীর দীর্ঘশ্বাসে থাকে অমৃতের নিঃশ্বাস। অনুরক্তি এবং অনুরাগই নারীর আত্মরাগ। স্বামী দরিদ্র হোক বা রোগগ্রস্ত, তিনি পত্নীর গুরুসদৃশ। বাস্তবে গৌতম তো আমার গুরু। তাই আমি তোর প্রতি অনুরক্ত হব না কেন? শচীদেবী যেমন ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা, অরুন্ধতি যেমন বশিষ্টের প্রতি অনুরক্তা, আমিও কি গৌতমের প্রতি অনুরক্তা হতে পারব না?

প্রথা বলছিল—নারীর পতিপ্রেম চিরন্তন ঈশ্বরীয় এবং কাম বিবর্জিত। এই প্রেম দৈহিক নয়, আত্মিক মিলনের জন্য অভিপ্রেত। স্ত্রী স্বামীর কর্ম সহচরী, ধর্ম সহচরী ও নর্মসহচরী পতিপত্নী আবার দুটি ভিন্ন শরীরধারী অভিন্ন আত্মা। এইরকম প্রেম কি সম্ভব? যৌবনকালে কি কাম বিবর্জিত প্রেম সম্ভব? বসন্ত ঋতুতে কি পুষ্পবিবর্জিত বানানী সম্ভব? না বর্ষাকালে নির্ঝর বর্জিত পর্বতমালা সম্ভব? যদি সম্ভব, তাহলে দুটি দেহের মিলনের জন্য কেন আকাঙ্খা জাগে মনে? উর্ধ্বমুখী জলচক্র পুনরায় কেন নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে। সম্ভবত গৌতম আদর্শ পুরুষ এবং আমি আদর্শ নারী নয়। তাই আমার মধ্যে এই ব্যকুলতা, দ্বন্দ্ব অস্থিরতা। প্রথার সব কথা উচিত মনে হলেও সত্য মনে হচ্ছে না।

যে সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের জন্য একদিন নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করতাম এবং যে রূপের জন্য আজও মনে আত্মগর্ব আছে সেই-রূপ লাবণ্য যে কত যন্ত্রণাদায়ক সে কথা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? কাল রাত্রে গৌতম আমার সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দেয়নি এর ফলে আমার রূপের অহমিকা আহত হয়েছে। আজন্ম শোনা নিজের রূপের প্রশস্তি মিথ্যা মনে হচ্ছিল। নিজের রূপের দুর্বার আকর্ষণী শক্তির সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ হচ্ছিল। কিন্তু আমি হেরে যেতে চাই না। আমি বিজয়িনী হতে চাই। গৌতমের সংযম পরীক্ষা করতে চাই। গৌতম কি ভেবেছে আমি উপযাচক হয়ে নিজেকে সমর্পণ করব? কাঙ্খিত প্রেমিকের কাছেও কোনও নারী উপযাচক হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে না। যে সমর্পণ করে সে পুরুষের কাছে ঘৃণ্য হয়ে

ওঠে। ফুল ফুটে ঝরে গেলেও ভ্রমরের কাছে যায় না—ভ্রমর আসে ফুলের আকর্ষণে। আমি আমার আকর্ষণ শক্তির পরীক্ষা করতে চাই—পরীক্ষা চাই গৌতমের সংযম শক্তির। অতীতে বহু মহর্ষির তপোভঙ্গ করেছে রম্ভা, মেনকা, উবর্শী প্রভৃতি অপ্সরারা। সেই অপ্সরাদের তুলনায় আমি অধিক সুন্দরী—একথা সর্বজনবিদিত। গৌতম কি সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়? একটা গোপন আহ্বান আমার মধ্যে দৃঢ় রূপ ধারণ করেছিল। একটা রাত্রি আমার বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। বোধহয় বিয়ের একটা আশ্চর্য প্রভাব আছে নারীর ব্যক্তিত্বের ওপর। চপলা বালিকাকেও পরিপক্ক বিচারশীল নারীতে পরিণত করে বিবাহ। আজ আমি একজন দায়িত্ব সচেতন ঋষিপত্নী।

আমার পূর্বে গৌতম শয্যাত্যাগ করায় আমি লজ্জিত হলাম। পথশ্রমের জন্য শয্যাত্যাগে বিলম্ব হয়েছে বলে গৌতমের কাছে ক্ষমা চাইলাম। গৌতম উদার ভঙ্গীতে ক্ষমা করার ভাবমুদ্রায় বসে রইল। এইটুকুতেই আমি কৃতজ্ঞ গৌতমের কাছে।

বিবাহের পর গৌতম ও আমি আজ একসাথে হোমাগ্নি স্থাপন করলাম। বসন্ত ঋতুর পূর্ণিমা তিথিতে শুভ সংকল্প করে গার্হপত্য এবং আহ্বনীয় অগ্নি স্থাপন করলাম। কোমলকণ্ঠে গৌতম বলে—দেবী! আমাদের দাম্পত্য জীবনের শুভলগ্নে স্থাপিত এই গার্হপত্য অগ্নিকে সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে। ইহা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকবে। এই অগ্নিকে বিশ্বস্তার সাথে প্রজ্জ্বলিত রাখার অর্থ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততাকে চিরভাস্বর করে রাখা। ইহাই আদর্শ দাম্পত্যের মূলকথা।

এই গার্হপত্য অগ্নি থেকে প্রতিটি শ্রৌতযজ্ঞে আবাহনী অগ্নিকে প্রণয়ন করতে হয়—অর্থাৎ বিশ্বস্ততা রূপক অগ্নি থেকে প্রেমাগ্নিকে প্রণয়ন করতে হয়। এই অগ্নিকে চির প্রজ্জ্বলিত রাখা যেমন পত্নীর কর্তব্য পতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকাও তার প্রধান কর্তব্য। পত্নী বিশ্বস্তা হলে পতির পথভ্রষ্টা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।"

আমি একমনে স্বামীর কথা শুনছিলাম এবং তা পালন করব বলে প্রতিজ্ঞাও করলাম।

অগ্ন্যাধ্যান অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সন্ধ্যাবেলা অগ্নিহোত্র হোম শুরু হল। এখন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় অগ্নিহোত্র হোম করতে হবে। সকালে এবং সন্ধ্যায় সূর্য তথা অগ্নির উদ্দেশ্যে দুগ্ধ হোম করার জন্য বিশেষ যত্নের সাথে এক গাভী পালন করা হবে আমার কাজ। গৌতম আমাকে সুন্দর সুলক্ষণযুক্তা একটা গাভী উপহার দেয়—তার নাম নিষ্কামিনী। মনে মনে ভাবলাম এই গাভীটির জন্য কোনও বিশ্বামিত্র গৌতমের সাথে শত্রুতা করবে না তো! ঋষিদের কি ভরসা! একাধারে জিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য সাধনা কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার.....প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন না। গৌতম অবশ্য ক্রোধী, কিন্তু কামুক বা লোভী নয়।

গৌতমের উপযুক্ত পত্নী হওয়ার জন্য আমি হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি শীঘ্র শিখে নেব বলে প্রতিজ্ঞাও করলাম।

অগ্ন্যাধ্যান অনুষ্ঠিত না হওয়ায় গতরাত্রে গৌতম আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়নি বলে জানার

পর আমার অভিমান দুর হয়ে যায়। বৈদিক নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে রতিসুখে নিমজ্জিত হলে সম্ভবত তার প্রতি সম্মান হ্রাস পেত। আজ সে আমার চোখে আদর্শ পুরুষ হিসাবে বিদ্যমান। তার পত্নী হিসাবে আমি গর্বিত।

সন্ধ্যাবেলা অগ্নিহোত্র, দুগ্ধ-হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর আমি পুনর্বার গৌতমকে জয় করার কামনায় আত্মমগ্ন হলাম। সেদিন বসন্তের গোধূলি লেপন করলাম সর্বাঙ্গে। বাতাসের চঞ্চলতাকে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত করলাম। কোকিলের সান্ধ্য কুহুতানের মাধুরিমাকে কণ্ঠস্বরের ছন্দে ছন্দে মধুর রাগিণীতে পরিণত করলাম। সান্ধ্য কুসুমের উতলা সুরভিতে কেশ সুরভিত করলাম। উন্মুক্ত কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে দিলাম ঝরা বকুলের মালা। নিজেকে গৌতমের মনোলোভা করার জন্য সেদিন আমি কি না করেছি!

যুগে যুগে নারীর সৌন্দর্যে পুরুষের তপস্যাভঙ্গ হয়েছে। তপোভঙ্গ করে ঋষির অভিশাপ বরণ করে নেওয়াতেই নারীর গৌরব। তাতেই তার জয়। আজ গৌতমের তপোভঙ্গ করে যদি আমি শাপগ্রস্তা হই, তাহলে সেটি আমার সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করবে। যদি আমার সৌন্দর্য এবং যৌবন গৌতমের তপোভঙ্গ না করতে পারে, তাহলে আমার সৌন্দর্য এবং নারীত্বের মূল্য কি?

আজ গৌতমও চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করছেন, সেকথা ব্যক্ত করতে আজ তাঁর কোনও কুণ্ঠা নেই। তাই আশ্রমের মুনিকুমারী ও ঋষিপত্নীদের ইঙ্গিত দিয়েছেন আমাকে বিশ্বমোহিনী রূপে সজ্জিতা করে আমাদের মধুচন্দ্রিমা রচনা করার জন্য।

ইন্দ্রদেবকে সোম অর্পণ করে আজ গৌতম সোমপান করেছেন। সোমের মোহময় প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। কোমল চন্দ্রালোকে তাঁকে ততটা বয়স্কও লাগছে না। তাঁকে মনে হচ্ছে কাম্য, মনোহর, ইপ্সিত পুরুষ।

তাহলে আমার দাম্পত্য ব্যর্থ নয়। কঠোর সংযমী হলেও গৌতম স্বাভাবিক পুরুষ। তাই আমাদের দাম্পত্য অস্বাভাবিকতার অভিশাপে বিধ্বস্ত হবে না বলে আজ আমার মনে প্রত্যয় জন্মেছে।

তপোবনের সেই নিভৃতকুঞ্জ কার জন্য রচিত হয়েছিল? আমি পূর্বে কখনও সেই কুঞ্জে পদার্পণ করিনি। তাহা ছিল গৌতমের কুটির সংলগ্ন সুন্দর উপবনের এক মনোরম অংশ। ব্রহ্মচারীদের জন্য তা নিষিদ্ধ ছিল। আজ আমি গৌতমপত্নী। এই বিশেষ কুঞ্জে প্রবেশ করার অধিকার আমি লাভ করেছি। সম্ভবত এতদিন ধরে এই কুঞ্জটি আমার জন্যই রচনা করেছিলেন আমার আদর্শ স্বামী গৌতম।

এই কুঞ্জে আমাদের মধুচন্দ্রিমা অনুষ্ঠিত হবে। মালতী কুঞ্জের শেষপ্রান্তে বয়ে যাচ্ছে একটা শাখা নদী। নদীর ঘাট নেই—ঘাট না থাকলেও কলধ্বনির অভাব নেই নদীর জলে। ঋষির আশ্রম হলেও মালতী কুঞ্জের প্রেমকুঞ্জে পরিণত হওয়ার বাধা নেই। ইহাতে বৈদিক বিধানের বিরোধ হয় না। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পতিপত্নীর মিলন অবশ্যম্ভাবী।

সম্মুখে গৌতম চলেছেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করছি। আজ গৌতমকে আচর্যের মতো ভাবগম্ভীর দেখাচ্ছে না—প্রেমিক পুরুষের মতো বিহ্বল মনে হচ্ছে।

লতাকুঞ্জে আমাকে বসিয়ে তীক্ষ্ণ মধুর দৃষ্টিতে আমার সর্বাঙ্গ অবলোকন করে ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসেন, আমার মনে হল লজ্জায় আমি মূর্চ্ছা যাব! এতদিন যাকে আচার্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতাম আজ প্রেমিক হিসাবে কি করে সমর্পণ করব আমার সমগ্রতাকে।

আমাকে সম্পূর্ণ উতলা করে সহসা গৌতম যোগমগ্ন হয়ে যান। যোগমুদ্রায়ও আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মদিরকণ্ঠে বলতে থাকেন—"সুনয়না, সুকেশী অহল্যা! তুমি মধুসেবী হও, ফুলের মাধুর্য, স্নিগ্ধতা, সুগন্ধ এবং সতেজ কোমলতা তোমার স্বভাব এবং আচরণে মিশে থাক। যেমন জলে দুধ মিশে যায়, বাতাসে মিশে যায় বকুলের গন্ধ, গোধূলিতে মিশে যায় সন্ধ্যার হোমশিখা, দৃষ্টিতে দৃষ্টি আর হৃদয়ে হৃদয় মিশে যায়। অহল্যা তোমার দৃষ্টি হোক মধুদৃষ্টি, তোমার বাণী হোক মধুর তুমি হও মধুসম সারগ্রাহী সুমিষ্ট। মধুরতা কেবল তোমার রূপের বিশেষণ না হয়ে তোমার প্রকৃতিতে পরিণত হোক।"

প্রথমে গৌতমের কথাগুলো প্রশংসার মতো অত্যন্ত মধুর মনে হচ্ছিল। রোমাঞ্চ জাগছিল দেহ মনে। কিন্তু ক্রমশ গৌতমের কথাগুলো গুরুকুল আশ্রমের নীতিবাক্যের মতো শোনায়—গৌতমকে যাজ্ঞিকের মতো লক্ষ্যবদ্ধ এবং যোগনিষ্ঠ দেখায়। অথচ গৌতম বারম্বার বলছিলেন—"এসো অহল্যা আমাকে স্পর্শ করো, আমাকে উন্মত্ত করো, আমাকে আলিঙ্গন করো, আমাকে যোগভ্রষ্ট করো.....।" গৌতমের কথা আচরণ এবং ভাবমুদ্রায় এমন অসামঞ্জস্য ফুটে উঠছিল যে আমি মাঝে মাঝে বিচলিত হচ্ছিলাম। লজ্জাত্যাগ করে আমি গৌতমের কণ্ঠলগ্না হয়ে গৌতমকে যোগভ্রষ্ট করার জন্য উন্মত্তা হয়ে উঠলাম। কিন্তু গৌতম হিমালয় পর্বতের মতো অচল এবং চির তুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গের মতো হিমশীতল হয়ে উঠছিলেন।

আমি আমার আকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি জানতাম ধ্যানের আকর্ষণের চেয়ে আমার আকর্ষণ শতগুণে বেশি। এমনকি পৃথিবীতে এমন কোনও পুরুষ নেই, যে আমার আকর্ষণ এড়িয়ে যেতে পারে। এটা আমার রূপের গর্ব। অবশ্য আমার এই রূপের গর্বের জন্য আমি একা দায়ি নয়। আজ গৌতমের যোগনিষ্ঠতা আমার সেই অহংকারের ওপর কুঠারাঘাত করে চলেছে। যদি আজও গৌতম ধ্যানমগ্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাহলে আমাকে উতলা করার এই প্রহসন কেন? এইভাবে কি নিজের পৌরুষ আমার কাছে সাব্যস্ত করতে চান? এটা কি আমার সাথে প্রতারণা নয়? তাঁর এই ধরনের ছলনাপূর্ণ আচরণ আমার নারীত্বকে অপমানিত করছিল। গৌতম কি আমার সংযমশক্তির পরীক্ষা করছেন না আত্মশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনের জন্য আমাকে কষ্টিপাথর ভেবেছেন? গৌতমের সাথে আমার দীর্ঘ পাঁচবছরের গুরুশিষ্যার সম্পর্ক। আমার সংযম ও নিজের আত্মশক্তি পরীক্ষা করার জন্য সেটা কি যথেষ্ট নয়? আজ যদি পত্নী হিসাবে স্বামীর কাছে রতিভিক্ষা করি, তাহলে সেটা কি আমার চিত্তবিকারের পরিচয়? অবশ্য একথা সত্যি যে আমি পাথরে পরিণত হব, কিন্তু স্বামীর কাছে রতিভিক্ষা করব না। গৌতম নির্বিকার পুরুষ হয়ে থাকুন, কিন্তু পত্নীকে সুসজ্জিতা করে পূর্বরাগের বর্ণচ্ছটায় তার দেহমনকে রঙিন করে যোগাবিষ্ট হওয়াটা কি ধরনের পৌরুষ?

সারা রাত আমি অন্তর্দহে জ্বলছিলাম এবং গৌতম কঠোর যোগসাধনায় ধ্যানস্থ ছিলেন। আমি সমিধের মতো দগ্ধ হচ্ছিলাম সারারাত—গৌতম যাজ্ঞিকের মতো পুণ্যের পূর্ণাহুতি দিচ্ছিলেন। একইভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমার রাতের পর রাত।

ভাবলাম গৌতমের কোনও ব্রত আছে, সেইজন্য আমাকে পেয়েও গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু একদিন নয়, রাতের পর রাত আমাকে সম্মুখে বসিয়ে গৌতম যখন যোগাবিষ্ট হতে থাকলেন, তখন আমি বুঝলাম নিজের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি আমাকে নিমিত্ত করেছেন। প্রতিদিন সকালে প্রথা যখন আমার আহত নারীকে নিরীক্ষণ করত তখন সে নিজেও গৌতমের আচরণে ক্ষুণ্ন হত। গত ছমাস যাবৎ আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আশ্রমের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছি, কিন্তু আমি এখনও অনূঢ়া—স্বামী সঙ্গসুখ এখনও আমার অননুভূত। প্রতিরাত্রে প্রথা আমাকে অপূর্বভাবে সজ্জিত করেছে—গৌতমের সংযমের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার জন্য পূর্বরাগের সমস্ত কৌশল শিখিয়েছে, কিন্তু গৌতমের কাছে সবই ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে কি পিতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে গৌতম নামেমাত্র আমাকে বিবাহ করেছেন? তাঁর জীবনে কি অন্য কোনও নারী আছে? কে সেই নারী? যে অহল্যার আকর্ষণীশক্তিকে খর্ব করে অহল্যার সম্মুখে গৌতমকে হিমশীতল করে দেয়। এইরকম অনেক প্রশ্ন জাগে আমার মনে—প্রথার মনে। কামজ্বালায় আমি যতটা না পীড়িত ছিলাম, অধিক পীড়িত ছিলাম প্রত্যাখ্যানের অপমানে। কামসুখ কি আমি জানতাম না। তাই সে জ্বালা এত তীব্র ছিলনা আমার কাছে, পরাজয়ের গ্লানিই ক্ষুব্ধ করত আমাকে প্রতি রাত্রে। একদিন প্রথা সরাসরি গৌতমের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার প্রথার আছে। যাকে ইচ্ছা সে কৈফিয়ৎ চাইতে পারে। গৌতমকে মালতীকুঞ্জের দিকে যেতে দেখে প্রথা তার পথরোধ করে দৃঢ়স্বরে বলে—"মহর্ষি গৌতম অহল্যার অপরাধ কি? আপনি তাকে গ্রহণ করেন না কেন? স্ত্রী হিসাবে যদি তাকে আপনার পছন্দ নয় তাহলে বিবাহের প্রহসন করেছিলেন কেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?

—"বন্ধনমুক্তি।" গৌতম উত্তর দেন।

বন্ধন কে? মুক্তি কোথায়? —প্রথা জেরা করে।

—"অহল্যার আকর্ষণই সবচেয়ে বড় বন্ধন। তার থেকে মুক্তিই আমার শ্রেষ্ঠ সাধনা।"

রুষ্ট হয়ে প্রথা প্রশ্ন করে—আপনি অহল্যার কাছ থেকে মুক্তি চাইছেন? তাহলে বিবাহের প্রহসন করে অহল্যার জীবনকে তাপদগ্ধ করলেন কেন? আপনি তাকে মুক্তি দেওয়ার পর তার জীবনে আর কি সম্ভাবনা থাকবে? অবিচল কণ্ঠে গৌতম বলেন—অহল্যাকে মুক্তি দেওয়ার আমি কে? আমি আমার নিজের মুক্তির পথ খুঁজছি। আমার 'ব্রহ্মর্ষি' হওয়ার লক্ষ্যপথে অহল্যা প্রাচীর সদৃশ। অহল্যার আকর্ষণ অতিক্রম না করতে পারলে আমি মহর্ষি থেকে দেবর্ষিও হতে পারব না, ব্রহ্মর্ষি হওয়া তো দূরের কথা।"

গৌতমের স্পষ্টোক্তিতে ক্ষুব্ধ প্রথা বলে—"অহল্যার আকর্ষণ যে দুর্বার, অনতিক্রমণীয় একথা জেনেও অহল্যাকে বিবাহ করেছিলেন কি উদ্দেশ্যে—অহল্যাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য?"

—"অহল্যার আকর্ষণ দুর্বার জেনেই আমি তাকে বিয়ে করেছি। আগুনের থেকে দূরে থেকে যদি কেউ বলে যে সে দহনীয় নয় তাহলে দহনীয় বলে ধরে নিতে হবে। আগুনের মধ্যে থেকে অদহনীয় থাকাই প্রকৃত পরীক্ষা। অহল্যা যে কোনও পুরুষের জন্য শুধু অগ্নি নয় বাড়বাগ্নি। তাই অহল্যারূপী বাড়বাগ্নির বলয়ের মধ্যে থেকে আমি কামরূপী রিপুর দমন করতে চাই। অহল্যা হল আমার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই আমার সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব। আমার ব্রহ্মর্ষি হওয়ার লক্ষ্যপথে অহল্যারূপ প্রতিবন্ধক স্থাপন করে গুরুদেব ব্রহ্মা আমার পরীক্ষা নিতে চান। আমি অহল্যার স্বামীত্ব থেকে মুক্তি চাই না—আমি কামবাসনা থেকে মুক্তি চাই।"

গৌতমের কথায় প্রথা সন্তুষ্ট হল না। সে আজ তর্ক করতে বদ্ধ পরিকর। সে যুক্তি দেখায়—"তাহলে এটা আপনার স্বার্থপরতা মহর্ষি। অহল্যাকে নিজের সিদ্ধির সোপান করা আপনার পক্ষে অন্যায়। তাকে পত্নীত্বের সমস্ত অধিকার দেওয়া আপনার কর্তব্য। বৈদিক রীতিতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ জীবনের চারটি লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। জীবনে কাম বা ভোগবাসনার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাৎসায়ানের কামকলার বর্ণনাকে আপনি কি অশাস্ত্রীয় বলবেন? কামতৃপ্তি ব্যতীত আপনি পিতৃঋণ পরিশোধ করবেন কিভাবে? আপনার মতো ত্যাগীর কাছে কামের গুরুত্ব না থাকতে পারে। কিন্তু অহল্যার মতো সাধারণ নারীর কাছে 'কাম'-এর গুরুত্ব মোক্ষের উর্ধ্বে। কামভোগের মাধমে আত্মিক শান্তি লাভ করলে সে ত্যাগের মহত্ব বুঝতে পারবে। তখন সে মোক্ষপথে অগ্রসর হবে। তাছাড়া শুধুমাত্র কামভোগের জন্য নয়, মাতৃত্বলাভের জন্যও অহল্যার হৃদয় একদিন ব্যাকুল হবে। মাতৃত্বের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করলে আপনি স্বামীর কর্তব্যে ত্রুটি করবেন। এই ত্রুটি ক্ষমণীয় নয়। অহল্যা সাধারণ নারী, অনন্তযৌবনা। আপনার এই শীতল স্বামীত্বের জন্য ক্ষণিকের জন্যও অহল্যার অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রক্তমাংসের নারীর পক্ষে এইরকম কঠোর ইন্দ্রিয়সংযম কি বাস্তবে সম্ভব?

প্রথার দুঃসাহস কিছু কম নয়। গৌতমের মতো নীতিবাগীশ মহর্ষির মুখের ওপর কাম সম্পর্কে তর্ক করা, উপরন্তু তাঁরই পত্নী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে পারে—একথা শুধু প্রথাই বলতে পারে।

অদূরে দাঁড়িয়ে আমি নীরবে সব কথা শুনছিলাম। প্রথার এই যুক্তিতে গৌতম কি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবেন তা ভেবে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ভাবলাম গৌতম অভিশাপ দেবেন কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে উত্তর দিলেন—"তোমার যুক্তি অকাট্য, আমি অহল্যাকে মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করব না। পুরুষ হিসাবে প্রজা সৃষ্টি করে পিতৃঋণ পরিশোধ করা আমারও লক্ষ্য। কিন্তু তার পূর্বে আমি আমার এবং অহল্যার ইন্দ্রিয় সংযমের শক্তিকে দৃঢ় করতে চাই এর জন্য আমিও তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। এই কারণের জন্য যদি অহল্যা পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে সে জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

অহল্যা নিজেও নিজের পরীক্ষা। তার রূপের আকর্ষণ তীব্র। কোনও পুরুষ না তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু অহল্যা যদি সেই রূপলোভী পুরুষদের কামনা জর্জরিত দৃষ্টির উর্ধ্বে না যেতে পারে তাহলে সে নিজেই নিজের জীবনযজ্ঞের প্রতিবন্ধক হবে। তাই তাকেও সংযমী হতে হবে। প্রজাসৃষ্টির উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হলে অহল্যাকে কামের উপলব্ধি দানের সাথে আমি সন্তানও দান করব। তুমি নিশ্চন্ত হও এবং আমাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি কর না।" এইকথা বলে গৌতম সেই কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হলেন, কিন্তু কেন জানি না, প্রতিদিনের মতো আমি তাঁকে অনুসরণ করতে পারলাম না। আজ আমার মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য উষ্ণতা সৃষ্টি হল না। আমি বুঝতে পেরেছি যে, গৌতমের তপোভঙ্গ নাটকে আমি মেনকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অভিপ্রেত। আজ তাই করব। অভিনয়ের দ্বারা আমাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হোক।

কবে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রজাসৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনের এক সূক্ষ্ম কোমল মধুর অনুভূতি উপলব্ধি হবে, ফলস্বরূপ নারী জীবনের চরম পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি সন্তান— অমৃতের সন্তান।

তিথি নক্ষত্র বিচার করে কি মনে আবেগের জোয়ার আসে! নির্দেশ অনুযায়ী শুকনো কাঠে পছন্দসই আসবাব প্রস্তুত করা যেতে পারে, কিন্তু বৃক্ষের সবুজ শাখায় কি ফুল ফোটানো যায়? আমি তো নির্জীব কাঠ নয় যে, গৌতমের প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছার সাথে সামিল হব। আমি তো জীবন্ত মানুষ। প্রেমের অমৃত স্পর্শেই নারীর মনে ফুল ফোটে। আত্মায় মিশে যায় সুগন্ধ। গৌতম জ্ঞানী হতে পারেন কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর যখন ভোগের ইচ্ছা হবে তখন অহল্যাকে গ্রহণ করবেন। যখন যজ্ঞের ইচ্ছা হবে তখন অহল্যাকে আহুতি দেবন। গৌতমের প্রতিটি আচরণের বিরুদ্ধে আমার অবচেতন মনে যে এক প্রতিজ্ঞা দৃঢ়রূপ ধারণ করছিল তা আমি নিজেও জানতাম না, কিন্তু গৌতমের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হওয়ায় এবং গুরু হিসাবে তাঁর প্রতি যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম হেতু আমি কোনও প্রতিবাদ করতে পারছিলাম না। কিন্তু স্থির করেছিলাম, গৌতমের উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক না কেন আমি তার ইচ্ছার ক্রীড়নক হব না। আমারও যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সেকথা কালক্রমে গৌতমকে বুঝিয়ে দেব। এমনকি এটাও বুঝিয়ে দেব যে নারীও জিতেন্দ্রিয় হতে পারে।

রাজ্যজয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয় বিজয় অধিক কষ্ঠসাধ্য। রাজ্যজয়ের জন্য সমগ্র রাজ্যের সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র তদুপরি প্রজারাও রাজাকে সাহায্য করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করে মানুষ একা। আত্মশক্তিই ইন্দ্রিয়জয়ের একমাত্র সহায়ক। তাই ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য আত্মশক্তিকে অন্তর্মুখী করে কৃচ্ছ্রসাধনায় রত ছিলেন গৌতম। আমিও স্বামীর অনুগামিনী হওয়ার চেষ্টা করি। ইন্দ্রিয়সংযম আমার পক্ষে কষ্টকর হলেও মানুষের পক্ষে কোনও কাজই অসাধ্য নয় বলে আমি মনকে আশ্বাস দিই। স্বামীর অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীর ধর্ম। স্বামী ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য সাধনারত, আমিও ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার জন্য সাধনা করব বলে স্থির করলাম। স্বামীর সাধনায় আমি হলাম নিমিত্ত, আমার সাধনার নিমিত্ত কে? ইন্দ্রিয় সকলকে বিচলিত করে আবার আয়ত্তে করার দ্বারা যদি ইন্দ্রিয়সংযমের পথ সুগম হয়, তাহলে আমার এই সাধনার সিদ্ধি

সম্ভবত দিবাস্বপ্নে পরিমত হবে। স্নায়ুকে বিচলিত না করে কি ইন্দ্রিয়সংযম সম্ভব নয়? শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন? অহিংসার জীবন্ত মূর্তি হওয়ার জন্য তোমার চারপাশে কি হিংসার তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক? প্রেম নিবেদনকে পদাঘাত করলেই পাতিব্রত্য এবং সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদিত হয়? সাধনার সিদ্ধির জন্য প্রতিবন্ধক কি অপরিহার্য?

যদি একথা সত্য হয়, তাহলে মানুষের মনই একটা যুদ্ধক্ষেত্র, যেঁখানে প্রতি মুহূর্তে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ঝনৎকার শোনা যায়—মানুষের চিন্তাব মধ্যে অহরহ নির্দয় হিংসা মাথা তোলে—কখন কার রক্তক্ষরণ ঘটায মানুষের হিংস্র মন! নিজের দীনতা ও অপ্রাপ্তির জন্য সর্বদা আর্ত হাহাকার গুঞ্জরিত হয় মানুষের মনে। আত্মরতিতে মগ্ন মানুষের কামুক মন প্রতিমুহূর্তে নিষিদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে উষ্ণ উচাটন অনুভব করে। মানুষের নিজের মধ্যে এক প্রতিপক্ষ সদা জাগ্রত রয়েছে তাকে বিপথগামী করার জন্য। তাই আত্মশুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য কোনও প্রতিপক্ষের প্রয়োজন নেই। অবশ্য নিজের ভিতরের প্রতিপক্ষটিকে অন্যে দেখতে পায় না। তাই অন্যের কাছ থেকে সিদ্ধিলাভের প্রমাণপত্র পেতে হলে দৃশ্যমান প্রতিপক্ষ প্রয়োজন। প্রয়োজন সকলের কাছে দৃশ্য এমন প্রতিবন্ধক। তবেই তোমার সাধনা অন্যের দ্বারা স্বীকৃত হবে। ব্রহ্মা সমেত অন্যান্য দেবতারা গৌতমের জিতেন্দ্রিয়তা এবং সাধনার পরাকাষ্ঠা সতর্কভাবে লক্ষ্য করছেন। তাঁরাই গৌতমকে, "ব্রহ্মর্ষি" ঘোষণা করবেন। তাই গৌতমের জন্য 'অহল্যা'র মতো এক চিত্তচাঞ্চল্যকারী প্রতিবন্ধক আবশ্যক। কিন্তু আমার ব্রহ্মবাদিনী হওয়া অন্যের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না। আমি নিজেকে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাই। তাই অন্তঃশত্রুদের দমন করে নিজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মন স্থির করেছি। অবশ্য জানি না, এর জন্য কি কি বাধা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, আমরা তপস্বী স্বামী গৌতমই আমার সাধনাপথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। আমরা ব্রহ্মসাধনা তাঁকে সুখী করে না।

প্রতি সন্ধ্যায় পুণ্য তোয়ার পবিত্র জলে স্নান সেরে অগ্নিহোত্র হোম সমাপন করা মাত্রই গৌতমের নির্দেশে আমাকে পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত শৃঙ্গার করতে হত। আশ্রম জীবনে শৃঙ্গার নিষিদ্ধ হলেও পতি যদি চান তাহলে পতীর পক্ষে তা আর নিষিদ্ধ হবে না।—পরম কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হবে। তাই স্বামীর নির্দেশে শরীর নানাবিধ গন্ধদ্রব্যও অঙ্গরাগ লেপন করতাম কর্ণযুগলে পরতাম সুগন্ধিযুক্ত নবকলিকা। সুবিন্যস্ত কেশরশি কখনও খোঁপা করতাম কখনও নবমেঘের কৃষ্ণ আড়ম্বরের মতো উন্মুক্ত করে দিতাম পৃষ্ঠদেশে। বিভিন্ন সুরভিত ফুলের মালা দুলিয়ে দিতাম গলায় অনুরাগের বর্ণিল ছটার মতো।

নারীর শৃঙ্গার পুরুষকে উন্মত্ত করে একথা কে না জানে? কিন্তু পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত আত্মশৃঙ্গার নারীর স্নায়ুতে উন্মাদনা সৃষ্টি করে—তার রক্তকণায় সৃষ্টি করে উদগ্র কামনা।

প্রতি সন্ধ্যায় সুসজ্জিতা হয়ে স্বামীকে বিচলিত করতে গিয়ে আমি নিজের রূপে মুগ্ধ হই এবং আত্মসুখে নিমগ্ন হয়ে বসে থাকি। আমাকে উতলা করেছেন ভেবে স্বামী আনন্দ অনুভব

করেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি নিজেও স্নায়ুতে উষ্ণপ্রবাহের তীব্রতা অনুভব করেন। যখন তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য কামবাসনায় পরিণত হয়, তখন ক্রমশ তিনি তপমগ্ন হয়ে যান। তাঁর অপলক দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ থেকে অর্ধনিমীলিত অবস্থায় চলে যায়। গুরুকুল আশ্রমের আচার্যের মতো গম্ভীরকণ্ঠে তিনি উপদেশ দেন—"হে প্রিয়ে! তোমার শরীর সুন্দর এবং আকর্ষণীয়, তোমার যৌবন পূর্ণ কলসের মতো সরস এবং গ্রহণীয়, কিন্তু তুমি ভোগময়ী হও না, এবং আমাকে ভোগজীবনে টেনে নিয়ে যেও না। ভোগ অশেষ, দুঃখের কারণ। ভোগে আত্মতেজ মলিন হয়ে যায়। তাই ভোগকে যজ্ঞে পরিণত করে আমাকে দেহৈশ্চর্য দান না করে আত্মৈশ্চর্য দান কর। অন্তর্মুখী হয়ে তুমি আমার উর্দ্ধগতিতে সহায়ক হও।

পুনরায় নিম্নকণ্ঠে তিনি নিজেকে বলেন—"হে লোভময়ী, তোমার লোভনীয় আবেগে আমাকে বশ করো না, বরং তুমি আমার বশীভূত হও.....তোমার মোহসৃষ্টিকারী প্রবর্তনা আমাকে বিপন্ন করছে। তাই তোমার হীন প্রবর্তনা থেকে তুমি ক্ষান্ত হও..... ।"

আমাকে কামদগ্ধ করে তপোমগ্ন হওয়াকেই তিনি তাঁর পৌরুষের বিজয় বলে ধরে নিয়েছেন; এটা বুঝতে আর আমার বাকি নেই। তাঁর তপোস্নিগ্ধ মূর্তি দেখে আমিও ক্রমশ ধ্যানমুদ্রায় থেকে চিত্তস্নিগ্ধতা অনুভব করি। আমার অন্তরেব কামনা-বাসনা প্রতিবাদের প্রতিজ্ঞায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। আমি ব্রহ্মসাধনায় নিমজ্জিত হয়ে যাই। এতে আমার বিশেষ কষ্ট হয় না। কারণ আমি মনে করি পুনরায় আমি আচার্য গৌতমের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ফিরে এসেছি। গৌতমের আচরণ তাঁর নিজের জন্য সত্য হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য কপটতা ছাড়া আর কি হতে পারে? স্ত্রীকে সুসজ্জিতা করে স্বামী যদি তার সাথে দীক্ষাগুরুর মতো আচরণ করেন—তাহলে আর কি বলা যায়?

আমি একথা জানি যে আমার এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর। এর কোনও অংশ আমার নয়। আমার যৌবন ক্ষণস্থায়ী, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর দিকে প্রতিমুহূর্তে আমি অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দেহের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা কি সত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়?

স্বামীকে গুরু মেনে আমিও ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকি স্বামীর ধ্যানভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত। যোগনিদ্রা থেকে উঠে চোখ খোলামাত্রই আমাকে ধ্যানমুদ্রায় নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখে খুশী হওয়ার পরিবর্তে তিনি ক্ষুণ্ণ হন। আমার আধ্যাত্মসাধনা পাছে তার সাধনাকে অতিক্রম করে তাই তিনি ভয় পান। আমি তাঁর ধ্যানভঙ্গকারী মেনকা না হয়ে সাত্ত্বিক সোমরসে অবগাহন করে পাপ বিধ্বংসকারী দিব্যনারীতে পরিণত হলে তাঁর ব্রহ্মর্ষি হওয়ার সাধনা ব্যহত হবে বলে তিনি উদ্বিগ্ন। যাই হোক, আমি যে প্রতি পদে তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করছি, সেটা তিনি তাঁর আচরণে বুঝিয়ে দেন।

দাম্পত্য গোলাপের শয্যা নয়—কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ। গৃহস্থধর্মাচরণে স্বামী স্ত্রী একমন একপ্রাণ না হলে সে পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। গৃহস্থধর্ম পালনে গৌতম এবং আমি কি সহযোগী হতে পেরেছিলাম?

আমাদের মধ্যে বোঝাপড়ার অবসর সৃষ্টি হল কোথায়? কখনও স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ

আলাপের সুযোগ আমি পাইনি। যখন আলাপের অবসর সৃষ্টি হয়েছে তখন শুধু তর্কই হয়েছে। গৌতম তর্কে পারদর্শী। তাই তাঁর সাথে যে কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক করলেই তিনি খুশী, কারণ তর্কে তিনিই জয়লাভ করেন। আমাদের মধ্যে যখন তর্ক হয়, তখন সর্বসমক্ষেই হয়, কারণ গৌতমের মতে তর্ক থেকেও শিক্ষা লাভ করা যায়। সেদিন আশ্রমের এক শ্রেণীকক্ষেই আমাদের তর্ক শুরু হয়েছিল। তর্কের বিষয়বস্তু ছিল দেহাত্মবাদ। অন্য সকলেও ঐ তর্কে অংশগ্রহণ করেছিল। অবশেষে তর্কের মাধ্যমে গৌতম প্রতিপাদন করেছিলেন যে—শরীর তুচ্ছ, আত্মা সত্য—আত্মা শরীরের ঊর্ধ্বে। বিবাহ শরীরের বন্ধন নয়, আত্মার বন্ধন। দুটি আত্মা এক হওয়ার জন্য শরীরের মিলন অপরিহার্য নয়। ইতিমধ্যে মাধুর্য গুরুকুল আশ্রমে ফিরে এসে আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি শরীরের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি পেশ করলেও অবশেষে গৌতমের বশ্যতা স্বীকার করলেন। কিন্তু গৌতমের যুক্তিকে আমার মন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আমি কয়েকটি অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করতে চাইছিলাম, কিন্তু সর্বসমক্ষে কুণ্ঠাবোধ হচ্ছিল। তাই নিভৃতে স্বামীকে প্রশ্ন করলাম—"শারীরিক সৌন্দর্যের যদি কোনও মূল্য নেই তাহলে শুধুমাত্র দেহসম্ভারের সাহায্যে নারীরা তপস্বীদের তপোভঙ্গ করেন কি ভাবে? কোনও কুৎসিৎ নারী তপস্বীর তপোভঙ্গ করার দৃষ্টান্ত কোথায়?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গৌতম উল্টে প্রশ্নে করেন—শরীরের সৌন্দর্যই যদি সবকিছু, তাহলে মানুষ সাপকে গলার হার করে না কেন? বাঘ সিংহকে আলিঙ্গন করে না কেন? তারাও তো অত্যন্ত সুন্দর। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, অহল্যা। —"কারণ তাদের গুণ, কর্ম ও স্বভাবের মধ্যে হিংস্রতা আছে তাদের আত্মা তাদের শরীরের মতো সুন্দর নয়—আমি উত্তর দিই।

—"বেশ, এবার তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছ যে, সুন্দর শরীর সবসময় সুন্দর আত্মার আধার নয়, আত্মার সুন্দরতাই শ্রেষ্ঠ।"

—"তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে অসুন্দর শরীর সুন্দর আত্মার আধার। তবে মহর্ষি, দেবতা ও রাজাদের কুৎসিৎ নারী বিয়ে করার দৃষ্টান্ত কোথায়? অপ্সরাগণ সুন্দরী না হলে স্বর্গরাজ্যের মনোরঞ্জন করতেন কি ভাবে? আমি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করি দ্বন্দ্বহীন কণ্ঠে গৌতম বলেন—রাজারা বিলাসী এবং ভোগবাদী, তাই তাঁরা দেহসৌন্দর্যকে গুরুত্ব দেন। দেবতারা সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের যোগ্য, তাই তাঁরা সুন্দরী নারী লাভ করেন।" গৌতমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম—"তাহলে দেহ সৌন্দর্যের ভিত্তিতে নারীকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলা যায়? কুৎসিৎ নারীমাত্রেই নিকৃষ্ট এবং সেই কারণেই তারা দেবভোগ্যা হতে পারবে না?"

—"মানুষেরা কাছ থেকে হবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করে দেবতাগণ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন যে, কুরূপা নারীর আত্মার সৌন্দর্য আবিষ্কার করার ধৈর্য কোথায় তাঁদের? বিনা পরিশ্রমে যদি দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায়, তাহলে ধৈর্য এবং সাধনা আসবে কোথা থেকে? আমি পুনরায় গৌতমকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করি—"তাহলে মহার্ষি না। কুরূপা নারীকে বিবাহ

করে তাদের আত্মার ঐশ্বর্যে আত্মোন্নতি সাধন না করে সুন্দরী নারীকে বিবাহ করেন কেন? গৌতম অহল্যাকে বিবাহ করলেন কেন?''

ঋষিরা সুন্দরী কন্যা বিবাহ করেন কেন তুমি জান? সৌন্দর্যের একটা সহজ আকর্ষণ আছে। নারীর শারীরিক সৌন্দর্য পুরুষের মনে কামবাসনা জাগ্রত করে। কামবাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অহরহ তীব্র কামবাসনা অনুভব করেই তাকে দৃঢ়চিত্তে দমন করতে হবে। ভোগ্যবস্তুর অধিকারী হয়েও ভোগ থেকে দূরে থাকাটাই সন্ন্যাসের প্রমাণ। সেই কারণেই আমি অহল্যার পতি। সেই কারণেই মহর্ষিরা রূপবতী পত্নী গ্রহণ করেন।

''গৌতম তপস্বী হতে পারেন, কিন্তু অহল্যা তো সাধারণ নারী। যথেষ্ঠ অভিজ্ঞ হয়েও মহর্ষিগণ একথা বোঝেন না কেন? শরীর ব্যতীত আত্মার মূল্য কি?

—আত্মা ব্যতীত শরীরের কি মহত্ত্ব?

—আত্মা তো নিরাধার।

আত্মা বিনা শরীর শব। আত্মাকে না চিনে যে শরীর সর্বস্ব হয়ে জীবন কাটায়, সে ঈশ্বরের অবমাননা করে। কারণ পরমাত্মা আত্মাতেই অনুভূত হয়। আধ্যাত্মবাদ এবং দেহাত্মবাদের মধ্যে আধ্যাত্মবাদের স্থান ঊর্ধ্বে।

শোনো অহল্যা, জীবন তর্ক নয়, জীবন শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা মানতে হবে। তাই তর্ক ছেড়ে আত্মস্থ হও অন্তর্মুখী হও। সদগুণেব বিকাশ ঘটাও। তাহলেই গৌতমের উপযুক্ত পত্নী হতে পারবে।''

গৌতমেব যুক্তি দুর্বল হয়ে যায় তখন তিনি স্বামীত্ব জাহির করেন। তাঁর স্বামীত্বকে সম্মান জানিয়ে আমি নীরব হয়ে যাই।

সমাজের নিয়মের বাইরে বহু নিয়ম আছে। সমাজের নিয়ম এবং জীবনের নিয়মের মধ্যে সমাজ যে বিরাট ফাঁক রেখেছে, সেটা আশ্রয় করলে জীবনে সৃষ্টি হয় গহ্বর। জীবনের নিয়ম মানার পরিবর্তে শাস্ত্রেব নিয়ম অনুযায়ী গৌতম যুগ্মজীবনের খসড়া প্রস্তুত করেছেন। জীবনের নিয়মে কি পত্নীপ্রেম নিষিদ্ধ? শাস্ত্র অনুসরণকারী গৌতমের নির্দেশ অনুযায়ী আমি দাম্পত্যধর্ম পালন করছি। জানি না অবশেষে আমার জীবন রসময় হবে না বিষময় হবে।

পুরুষ ও নারী পৃথকভাবে আদর্শব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু পতিপত্নী হিসাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ব্যতীত আদর্শ দম্পতি হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। পুরুষ হিসাবে গৌতম আদর্শ—আমি বরনারী। কিন্তু আমাদের দাম্পত্যজীবন আদর্শ হওয়া তো দূরের কথা বরং বিষময় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা জাগে আমার মনে।

নিজের আদর্শে অটল থাকা অত্যন্ত ভালো কথা, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর আদর্শ যদি ভিন্নমুখী হয় তাহলে স্বামী স্ত্রী একমন একপ্রাণ হওয়া কি ভাবে সম্ভব?

যখন গৌতম আর্যকল্যাণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তখন অনার্য উন্নয়নই আমার সাধনা। তার মানে আমি আর্যবিরোধী নই। আর্যসংস্কৃতির উন্নতি এবং সংরক্ষণের জন্য গৌতম আশ্রমের অনেক কাজ আমি নিজের হাতে নিয়েছিলাম। কিন্তু গৌতম ছিলেন সম্পূর্ণ অনার্য বিরোধী। এর মূল কারণ হল অনার্যদের বেদ বিরোধিতা।

বেদের বিরোধিতার সাথে তারা বৈদিক কাজকর্মেরও বিরোধী ছিল। সেই কারণে তারা মুনি ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করত। দেবতাগণ বিশেষত ইন্দ্রদেবের অনার্যদমন নীতির জন্য অনার্যরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। তাই প্রতিশোধ স্বরূপ দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত হবি ও স্তুতি সকল নষ্ট করাটাই নিজেদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অন্য ঋষিদের মতো গৌতমও অনার্যদের ঘৃণা করতেন। কিন্তু আমি অনার্যদের প্রতি সংবেদনশীল—এটা আমার জন্মগত। বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি আর্যঋষিদের অনুরোধে রাজা এবং দেবতাগণ অনার্যদমন করার ফলে প্রচুর রক্তপাত এবং মানুষের হাতে গড়া সমাজ ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে। কত শিশু অনাথ হয়েছে কত নারী আশ্রয়হীনা, ক্রীতদাসী হয়েছে। অনার্য নারী-পুরুষকে ক্রীতদাস-দাসী হিসাবে বাজারে বিক্রয় হওয়ার দৃশ্য আমিও দেখেছি। বিশেষত ঋচার অসহায়তা এবং রুদ্রাক্ষের দুর্ভাগ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি। বাল্যকাল থেকেই দুর্বলের প্রতি সংবেদনশীলতা আমার স্বতঃস্ফূর্ত। এতে আমার দোষ কোথায়? শক্তিমানের প্রতি সম্ভ্রমবোধ এবং দুর্বলের প্রতি করুণা প্রদর্শন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমার অনার্যপ্রীতিকে গৌতম তার আদর্শের প্রতি আমার বিরুদ্ধাচরণ মনে করতেন। তিনি মনে করতেন এটা তাঁর প্রতি আমার অবজ্ঞার নিদর্শন। তাই তিনি আমার ওপর ক্ষুব্ধ। আমি স্বীকার করছি, পতির আদর্শই পত্নীর আদর্শ হওয়া উচিত, কিন্তু পত্নীরও স্বতন্ত্র আদর্শ থাকা স্বাভাবিক। পত্নীর আদর্শেব প্রতি পতিরও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে আদর্শ মঙ্গলময় তাহা অবশ্যই অনুকরণীয়। সেইজন্য আমি আমার স্বামীর কয়েকটি আদর্শগ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার আদর্শ মেনে নিতে গৌতম প্রস্তুত নয়। তাঁর মতে কোনও স্ত্রীর স্বতন্ত্র আদর্শ থাকা অপরিহার্য নয়। যদিও থাকে নিঃশর্তভাবে সেটা মানতে স্বামী বাধ্য নয়। উপরন্তু সেই আদর্শ যদি অনার্যকল্যাণকারী এবং অহল্যার মতো অল্পবয়সীর তরুণীর হয়, যে জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা। তাকে মেনে নেওয়ার পতির পৌরুষ বাধাপ্রাপ্ত হবে না কি?

ব্রহ্মচারিনী হিসাবে আশ্রমে থাকার সময়ে আমার অনার্য প্রীতির অনেক নিদর্শন গৌতম প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তখন গুরুকুল আশ্রমের শিষ্যা হিসাবে আমি আচার্যের অনার্য বিরোধী মনোভাবের বিরোধিতা করতে পারতাম না। এখন আমি গৌতম পত্নী। আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক যাই হোক না কেন "গৌতম পত্নীর পরিচয়ে আমার মনোবল দৃঢ় এবং আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমার আদর্শ এবং লক্ষ্য আমি স্পষ্টভাবে গৌতমের কাছে প্রকাশ করতাম, সেজন্য তিমি সন্তুষ্ট ছিলেন না। চিরকাল তিনি আমাকে অনভিজ্ঞা সীমিত জ্ঞান ও স্বল্পবিদ্যার অধিকারিণী ভেবে সেই অনুযায়ী আচরণ করতেন। তাই আমার প্রতিটি কাজ তিনি পরীক্ষকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতেন এবং দোষত্রুটি খুঁজতেন। বিশেষত আশ্রমের বাইরে, আমার কার্যকলাপের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। অনার্য পল্লীতে আমার যাতায়াতের বিরোধিতা করার পিছনে গৌতমের অনেক যুক্তি ছিল।

তাঁর মতে অনার্যগোষ্ঠী আসুরিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ভোগবাসনায় ডুবে আছে।

ভোগবাসনার চরম পরিণতিতে মাতৃজাতি কুণ্ঠিত ও অপমানিত হয়। ভোগবাদীদের দ্বারা নারীর সতীত্ব ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। ভোগবাদী অনার্যদের উপদ্রবে ঋষিদের আশ্রম তথা এই অঞ্চলের শান্তি সুরক্ষা নষ্ট হচ্ছে। ভোগ্য পদার্থগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করায় অনার্যগণ অধিক পরিমাণে বিষয়াসক্ত হয়ে উঠেছেন। বিষয়াসক্ত মানুষের কাছে ন্যায়ের স্থান নেই। তাই পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়াটা তাদের ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমার আশ্রমের মধ্যেই থাকা উচিত।

গুরুকুল আশ্রমে থাকার সময়ে আমি ছিলাম ব্রহ্মাপুত্রী। তখন অনার্যগোষ্ঠী আমার প্রতি বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু এখন গৌতমবিরোধী অনার্যগণ প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আমাকে অপমান করতে পারে। পুরুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে হলে তার স্ত্রীকেই প্রথমে পতিতা করে এই সমাজ। এটাই সমাজের ক্রুর নীতি। আর্য অনার্য উভয় পক্ষই এই নীতি গ্রহণ করেছেন। বিশেষত আমার সৌন্দর্যই আমার শত্রু। তাই আশ্রমের সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় আমার। এক কথায় বলতে গেলে আমার প্রতিটি কার্যকলাপের ওপর গৌতম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং আমার প্রতিটি মৌলিক ভাবনার ওপর তিনি প্রশ্নচিহ্ন রাখতেন।

নির্মম প্রতিকূলতায় মানুষ অনায়াসে ভেসে যায় না—ভেসে যায় অনুকূলতার প্রাবল্যে। প্রতিকূলতা মানুষকে শেখায় ভেসে না যাওয়ার কৌশল, যোগায় ডুবে না যাওয়ার প্রেরণা, আত্মসত্তা প্রকট করার মনোবল।

আমাদের দাম্পত্যের নির্মম প্রতিকূলতায় আমার মনের মধুকোষ মরে না—আমার যৌবনের স্বপ্নও ভেসে যায় না। বরং গৌতমের নীরস ঔদাসীন্য আমার অন্তরকে এক বিচিত্র প্রেমের মাধুরিমায় রঙিন করে দেয়। গৌতমের উদাসীনতা এত কষ্টদায়ক ছিল যে আমি তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার অন্তরে সঞ্চিত মাধুরিমাকে প্রেমের রঙিন আলপনায় ভরিয়ে তুললাম ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ। এঁকে দিলাম গাছপালা, পাহাড় পর্বত পশুপাখি মানুষ সকলের বুকে।

গৌতমের প্রতি ধ্যান কেন্দ্রীভূত করলেও মন ভোলাবার জন্য সারা পৃথিবীকে আমি আঁকড়ে ধরলাম। আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ এমনকি নিষিদ্ধ কাজের মধ্যেও নিজেকে নিমজ্জিত করলাম।

অগ্নিহোত্র, দর্শ পূর্ণমান, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যথাসময়ে নিজের অধিকার অনুসারে আমি অংশ নিলাম। সেইরকম নির্দিষ্ট প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এবং কামনা সিদ্ধির জন্য কর্মকাণ্ডগুলিতেও যোগ দিলাম। আমার আচরণে গৌতম খুশী হলেন। আমি তাঁর উপযুক্ত পত্নী হওয়ার চেষ্টা করছি বলে তাঁর ধারণা হল। তিনি কিভাবে জানবেন যে, নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যই আমি এই সকল কাজ করে চলেছি।

প্রত্যেক কর্মই ফলদায়ক। কর্ম অনুযায়ী তাহা ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলযুক্ত হয়। নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক কর্মে ইষ্টফল লাভ হয়। কিন্তু নিষিদ্ধকর্মে অনিষ্টফল পাওয়া যায়।

নিষিদ্ধ কর্ম কি? সবকাজ সবাইয়ের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে না। যাহা ধর্মবিরোধী তাহা

নিষিদ্ধ কর্ম হতে পারে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ না বুঝে কোনও কাজকে নিষিদ্ধ করাটাও নিষিদ্ধ কর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

গৌতমের কিছু নিয়মের সাথে আমি একমত হতে পারতাম না, তার মধ্যে অনার্যপল্লীতে গিয়ে তাদের শিক্ষিত করে তোলাটা নিষিদ্ধ কর্ম হিসাবে গণ্য হওয়ায় আমি বিরোধিতা করতাম। এ ব্যাপারে গৌতমের সাথেও আমার তর্ক হত। সেদিন গৌতম আমার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমি অনার্যপল্লী থেকে ফেরার সময় আমার সাথে ঋচা এবং রুদ্রাক্ষও এসেছিল।

আমি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলাম গৌতমপত্নী হিসাবে আমার অন্তত এটুকু অধিকার আছে যে আমি তাদের একফোঁটা জল দিতে পারব। এইরকম দূরে থাকলে গৌতম কিভাবে জানবেন---ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের ব্যক্তিত্ব কত উজ্জ্বল। কিন্তু গৌতম তাদের আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না। অনার্যেরা শুধুমাত্র ক্রীতদাস-দাসী হিসাবে আশ্রমে থাকতে পারে। এছাড়া তাদের আশ্রমে প্রবেশ নিষেধ। ব্রহ্মচারিণী থাকার সময়ে এই নিয়মের বিরুদ্ধে আমি নীরব প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু আশ্রমের অধ্যক্ষের পত্নী হওয়ার পর দৃঢ়ভাবে এই নীতির বিরোধ করার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ জাগে। কিন্তু আমি জানতাম আমি একা এই যুগব্যাপী কুসংস্কারের পরিবর্তন করতে পারব না। শুধু অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হবে না। তাই ঋচা এবং রুদ্রাক্ষকে আমি ফিরে যেতে অনুরোধ করলাম। প্রকৃতপক্ষে তারা এসেছিল আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমার ইচ্ছা ছিল, আশ্রমে ডেকে তাদের আতিথ্যদান করে পথশ্রম দূর করার জন্য। ফল, দুধ কিছুই তাদের দিতে পারলাম না, এমনকি তৃষ্ণার জলটুকুও দিতে পারলাম না। মনে হল, এই আশ্রমে কি আমার কোনও অধিকার নেই? সেইদিক থেকে রম্যবন ছিল অত্যন্ত উদার এবং মধুময়। সেখানে আর্য, অনার্য মানুষ পশুর ভেদাভেদ আমি রাখতাম না। সে ছিল এক উদার জীবনভূমি।

এখানে গৌতম আশ্রমে আমি শুধু নিজে থাকতে পারব। আমার থাকাটা আমার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কি না সে ব্যাপারে আমার মনে সংশয় জাগে। কে জানে কোনও দিন আমার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার কর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গৌতম আমার এই অধিকার খর্ব করে দেবেন।

অবশ্য আমি আমার জন্য চিন্তিত ছিলাম না। পৃথিবীর সকল স্থানই আমার জন্য মনোরম, কারণ সেখানে আছে মাটি এবং জীবন। আমার চিন্তা এই অনার্য প্রতিবেশীদের জন্য। ধীরে ধীরে তারা আপন জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। ওদের যজ্ঞবিরোধী মনোভাবই এর মূল কারণ। তাই আমি তাদের যজ্ঞাভিমুখী করার চেষ্টা করছিলাম।

'যজ্ঞ'র অর্থ মহৎ কর্ম। তাই যজ্ঞের বিরোধিতা করার অর্থ মহৎ কর্মের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। উদার সহিষ্ণু এবং পরোপকারী হওয়ার জন্য আমি তাদের উপদেশ দিতাম। দেশের জন্য এবং অপরের জন্য বৈদিক মুনি ঋষিদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী বর্ণনা করে আমি তাদের বেদাভিমুখী করার সাথে সাথে মুনিঋষিদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতাম।

সত্যচারীর সমগ্র পরিবেশটাই সুন্দর হয়, কিন্তু গৌতম আশ্রমের পরিবেশ মনোরম ছিল না। গৌতম সত্যাচারী হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে শত্রু মনে করা দাসগোষ্ঠী সত্যাচারী ছিল না। আর্যদের বিব্রত করার জন্য তারা নানা মায়াজাল সৃষ্টি করত। মানবের অন্তঃকরণে সত্য এবং অসত্য পরস্পর বিরোধী হওয়ায় সত্যকেও অভিনয় করতে হয়। তাই একজন সত্যচারী হলে পৃথিবী মধুময় হবে না। মৌচাকের একটি মাত্র রন্ধ্রে মধু সঞ্চিত হলে তাহা মধুক্ষরা হবে না। আশ্রমের চারপাশে বসবাসকারী অনার্যদেরও সদাচারী করে তোলা যে তাঁর কর্তব্য এটা কেন গৌতম বোঝেন না। তা না হলে যে আশ্রমের শান্তি নষ্ট হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমার মন বলছিল, যদি প্রথম থেকেই আশ্রমে আর্য অনার্য সকল বালক বালিকাদের 'ব্রহ্মবিদ্যা' শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত তাহলে সবকিছুই সুন্দর হত। কারণ 'ব্রহ্মবিদ্যা'র অধিকারী মানুষের চতুর্দিক মধুর কোমল, উদার আনন্দময়। মহানন্দের প্লাবনে অন্তরে বাইরে সে আনন্দময় হয়ে ওঠে।

সবকিছু মধুময় করার জন্য 'ব্রহ্মবিদ্যা'র প্রতি আমার আজন্ম শ্রদ্ধা ও আগ্রহ। 'ব্রহ্মবিদ্যা' শিক্ষার স্বপ্ন আমার দুরূহ হতে পারে কিন্তু দুর্বার। কিন্তু আমি চাইলেই 'ব্রহ্মবিদ্যা'র অধিকারিণী হতে পারব না। আমার মধ্যে 'ব্রহ্মবিদ্যা' লাভ করার সাত্ত্বিক, নিঃস্বার্থ ভাব কত গভীর সেটাই নিরূপণ করবে আমার ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্যতা আছে কি না! তাই দাসপল্লীর ঋচা, রুদ্রাক্ষ, ধৃতিঃ, অশ্বযুগ, বিরাট প্রভৃতি অনার্যদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করার প্রশ্ন উঠছে কোথায়? এমনকি গৌতম মহর্ষি হলেও 'ব্রহ্মবিদ্যা' লাভ করার যোগ্যতা লাভ করেন নি। কারণ গৌতম এপর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেননি।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ্য নয়, অনুভব্য। নিজেকে জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মার সাথে একান্ত করে সেই দিব্য অনুভূতি। যিনি বিশ্বকে প্রেমময় এবং সমদৃষ্টিতে দেখেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী। মানুষকে ঘৃণা করে গৌতম কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন? অনার্যরাও মানুষ। তাদের মধ্যেও বিশ্বাত্মা বিরাজিত। কিন্তু গৌতম তাদের সমদৃষ্টিতে দেখেন না। সম্ভবত এইজন্যই গৌতম মধুবিদ্যার অধিকারী হতে পারেননি। আমি তো দোষ দুর্বলতা যুক্ত মূঢ়া নারী। আমার প্রশ্ন কোথায়? ইন্দ্রদেব সমস্ত সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত মধুবিদ্যার অধিকারী হতে পারেননি। বিলাসব্যসন ও সমস্ত প্রকার ভোগলালসা ত্যাগ করলেই মধুবিদ্যা লাভ করা সম্ভব।

সেদিন অনার্যপল্লীতে আমি মধুবিদ্যা সম্পর্কে চর্চা করছিলাম। মধুবিদ্যার গুরুত্ব বর্ণনা করে পনি, বণিক ও অনার্যদের ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যজ্ঞে আগ্রহী হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলাম। তাদের ধারণা কেবলমাত্র আর্যদের যজ্ঞাধিকার আছে, তাই তারা যজ্ঞবিরোধী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি যে, যজ্ঞ অর্থাৎ মহৎকর্ম সকলের জন্মগত অধিকার। এই বিশ্ব এক মহান যজ্ঞ এবং পরমাত্মা হলেন যজ্ঞদেব। জীবের মঙ্গলের জন্য বিশ্বযজ্ঞের পুরোভাগে তিনি বিদ্যমান থাকায় সে হোতা ঋত্বিক এবং সর্বশক্তিমান।

তাই যজ্ঞপথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য সেই পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবার

প্রতীক স্বরূপ প্রত্যহ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে নিজের সমস্ত শুভ ভাবনাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে।

আর্য অনার্য সংঘর্ষে নিজের পিতামাতা, আত্মী স্বজনকে হারিয়ে অশ্বযুগ আর্য-বিরোধী এবং উগ্রস্বভাবের হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সে বেশ শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার কথা মন দিয়ে শুনত, একদিন সে প্রশ্ন করে—দেবী! প্রতিদিন আমরা খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আগুন জ্বালাই, ভয়ঙ্কর পশু বিতাড়নের জন্যও আগুন জ্বালাই, তবে এটা যজ্ঞাগ্নি নয় কেন? এটাও মহৎ উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই আলাদাভাবে যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন?

আমি হাসতে হাসতে বলি—"তোমরা খাদ্য প্রস্তুতের জন্য যখন আগুন জ্বালাও তা' তোমাদের উদর এবং জিহ্বার লালসা পূর্তির জন্য অর্থাৎ সেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিহিত। কিন্তু, হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী যজমানের মনে স্বার্থভাব থাকে না। হোমকর্তার অন্তরাত্মা সেবা ও শ্রদ্ধারূপী অগ্নিতে আলোকিত হয়ে যায়। তার হৃদয়ে ত্যাগরূপী অগ্নি জ্বলে। অদিতি-সমর্পণ ভাবনাই যজ্ঞাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ। তাই তোমার ভিতরে সেই ভাব উদ্রেক হলে বাইরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার প্রয়োজন থাকবে না।"

এইসময়ে ঋচা ও রুদ্রাক্ষ 'ব্রহ্মবিদ্যা' সম্পর্কে অধিক আগ্রহী হলে অমি তাদের দধ্যাড়ং অথর্বনের মহান ত্যাগের কাহিনী শোনালাম। বাল্যকাল থেকেই এই আখ্যান আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাই নারদের কাছে এই কাহিনী আমি কতবার শুনেছি তার হিসাব নেই। যতবার শুনেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। এখানে মহান দেশভক্তি ও অনন্ত ত্যাগের বাণী প্রচারিত। তাই আমি আগ্রহ সহকারে দেশের জন্য সেই মহাত্মার আত্মোৎসর্গের কাহিনী বর্ণনা করি।

ঋগ্বেদের সেই মহর্ষির নাম দধ্যাড়ং অথর্বণ। পরবর্তীকালে তিনি দধীচি নাম খ্যাত হন। দধীচি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতেন। ইন্দ্রদেব সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন না। একদা তাঁর মনে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রলোভন জাগে। তিনি দধীচির কাছে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দধীচি নির্ভয়চিত্তে জানিয়ে দেন যে ইন্দ্রদেবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্যতা নেই। —"কিন্তু ইন্দ্রদেব মহান আর্যনেতা, সকল সম্পদের অধীশ্বর, আর্যদের সাহায্যকারী বন্ধু, ঋষিদের রক্ষক.....ঋচা প্রশ্ন করে। —আমি বললাম —হ্যাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু ইন্দ্রদেব ছিলেন ভোগবাদী। আর্য অনার্য বৈষম্যের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। নিজের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের জন্য। তাঁর মনে অহঙ্কারও জাত হয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ সম্ভব নয়। দধীচি সেটাই স্পষ্ট করে দেন। "একথা কি ইন্দ্রদেব জানতেন না?" —রুদ্রাক্ষের প্রশ্ন। "হ্যাঁ জানতেন। সেইজন্য তিনি অতিথি হিসাবে দধীচির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। অতিথি হলেন দেবতা, উপরন্তু ইন্দ্রদেব ঐশ্বর্যশালী, তিনি অতিথি শ্রেষ্ঠ। তার সমস্ত প্রার্থনা এবং অভিলাষ ঋষি পূরণ করবেন— প্রথমেই তিনি ঋষিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান, তারপর নিজের অইভিলাষ ব্যক্ত করেন।"

তাহলে তো ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা দানে বাধ্য এবং ইন্দ্রদেব নিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে থাকবেন—ঋচা বলে।

রুদ্রাক্ষ বলে—"ইন্দ্রদেব যদি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতেন তাহলে মত্তহস্তীর মতো অনার্যসংহার করতেন না, তাদের শহর নগর ধ্বংস করতেন না, নিজের ইন্দ্রাসন সুরক্ষিত করার জন্য মহর্ষিদের তপোঃভঙ্গ করাতেন না। সবকিছু তাঁর মধুময় মনে হত।"

—"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রদেব এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারেননি। প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হন দধীচি।

—"ঋষি হয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন? এত পাপ"—ধৃতিঃর চকিত প্রশ্ন।

স্মিত হেসে আমি বলি—এইরকম পবিত্র পাপ দধীচির মতো মহাত্মারাই করতে পারেন। ছলনার সাহায্যে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় তদুপরি যে প্রতিশ্রুতি পালনে জগতের অকল্যাণ হয়, সেটা ভঙ্গ করে পাপ অর্জন করা বরং শ্রেয়! সেইজন্য ইন্দ্রদেবের অভিশাপও তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেন।

—"কি অভিশাপ দিলেন আর্যবীর ইন্দ্রদেব?" —অশ্বযুগ প্রশ্ন করে।

ইন্দ্রদেব তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে—ভবিষ্যতে দধীচি যদি অন্য কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন তাহলে তিনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রদেব দধীচির শিরশ্ছেদ করতে পশ্চাৎপদ হলেন না।

"হে পৃথিবীমাতা! কি পরিস্থিতিতে ইন্দ্রদেব দধীচির শিরশ্ছেদ করলেন? তাহলে কি আর কেউ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারেননি? এই পৃথিবী কি আর কখনও মধুময় হবে না?" —ধৃতিঃ বলে।

ধৃতিকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম—"না, না এই পৃথিবী মধুক্ষরা, মধুর শেষ নেই এখানে। ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো। ইন্দ্রদেব নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে খবর রাখতেন।

কিছুদিন পরে ঋষির আশ্রমে এলেন আরও দু'জন অতিথি। তাঁরা হলেন স্বর্গবৈদ্য যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তাঁরা ছিলেন পরোপকারী দয়াবান। পীড়িত মানুষের সেবায় তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বর্গলোকের অধিবাসী হলেও মর্তে অবতরণ করে জটিল শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে পীড়িতকে নতুন জীবন দান করতেন। তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভে আগ্রহী ছিলেন। মহর্ষি দধীচিকে প্রণাম জানিয়ে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রদানের প্রার্থনা জানাবেন, মহর্ষি জানতে পারলেন যে এই সৌম্য চিকিৎসকযুগল সেবার মাধ্যমে জগতকে শান্তি বিতরণ করছেন, এরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্য। সহসা তিনি তাঁদের ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানে সম্মত হলেন।

"কিন্তু ইন্দ্রদেবের সেই নিষ্ঠুর অভিশাপ!" ভয় বিহ্বল কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ঋচা। পরবর্তী ঘটনা শোনার জন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে কান পেতে থাকে।

বিহ্বলস্বরে আমি বলি—মহাত্মাদের ক্ষেত্রে অভিশাপও আশীর্বাদ হয়ে যায়। শিক্ষাদান করার পূর্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে কিছু উপদেশ দিয়ে দধীচি বললেন—"আমি জানি, তোমাদের বিদ্যাদান করার পরেই আমার মৃত্যুবিধান হবে। ইন্দ্রদেব অস্ত্রাঘাতে আমার মস্তক

বিদীর্ণ করবেন। আমি একথাও জানি তোমরা ইন্দ্ররাজ্যের বেতনভোগী চিকিৎসক। তাঁর অনুমতি নিয়ে তোমরা আমার কাছে এসেছ। তোমরা দু'জনে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে ইন্দ্ররাজ্যের গৌরব বর্ধন করো—সেটা ইন্দ্রদেবেরও ইচ্ছা।

কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি তার অভিশাপকে সত্যে পরিণত করবেন। সেজন্য আমার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। কারণ আমার অন্তে তোমরা যোগ্যপাত্রে ব্রহ্মবিদ্যা দানে সক্ষম হয়ে উঠবে। জগতের কল্যাণই আমার জীবনের লক্ষ্য। সেটা আমার মাধ্যমে না হয়ে তোমাদের দ্বারা হলেও আমার লক্ষ্যপূরণ হবে। কিন্তু মনে রেখো, কখনও অপাত্রে বিদ্যাদান করবে না। অপাত্রে অমৃত দান করলেও তাহা বিষে পরিণত হয়ে যাবে, আবার পদ এবং অবস্থান বিচার করে বিদ্যাদান করবে না। ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতার বিচার করে বিদ্যাদান করবে। সেই কারণেই আর্যবীর ইন্দ্রদেবকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ না করে তাঁর রাজ্যে বেতনভোগী চিকিৎসক অর্থাৎ তোমাদের আমি শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। আর একটা কথা—বিদ্যালাভের জন্য তোমরা যেমন স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করেছ, সেইরকম অন্যরাও যাতে বিদ্যাকে উচ্চস্থান দিয়ে পদমর্যাদাকে গৌণ ভাবেন সে বিষয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে। আমার মৃত্যুর জন্য দুঃখ করো না। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণের কারণে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে সে মৃত্যুও মধুময়।"

দধীচির মৃত্যুর বর্ণনা করতে গিয়ে আমার চোখ জলে ভরে যায়, ঋচা, ধৃতি এবং অন্যান্য মহিলাদেরও চোখে জল। রুদ্রাক্ষ, অশ্বযুগ প্রভৃতি ভাবগম্ভীর হয়ে আমার কথা শুনছিল।

হাতজোড় করে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেন—"মহাত্মা, আপনার শিষ্যত্বলাভ করে আমরা ধন্য। এখন ব্রহ্মবিদ্যা দান করে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

অকুণ্ঠচিত্তে দধীচি তাদের ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেছিলেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর মুহূর্তেই তাঁর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছিল। অন্তরালে থেকে ইন্দ্রদেব অস্ত্রঘাতে দধীচির মস্তক বিদীর্ণ করেছিলেন। দধীচির আশ্রমে শোকের কালো মেঘ ঢেকে আসতে আসতে আনন্দ উল্লাসের সূর্যোদয় হয়েছিল। সূক্ষ্ম শল্য চিকিৎসার সাহায্যে অশ্বিনীকুমারগণ দক্ষতার সাথে দধীচির মস্তক শরীরের পুনঃস্থাপন করেন। নবজন্ম পেয়ে দধীচিকে কোমল উজ্জ্বল ও মহান দেখাচ্ছিল। কিন্তু এখানে দধীচি উপাখ্যানের অন্ত হল না। তাহলে তো দধীচি কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ ব্রহ্মজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হতেন, একজন মহান দেশভক্ত হিসাবে গণ্য হতেন না। সেই কাহিনী যত হৃদয়গ্রাহী তত মর্মস্পর্শী।

দধীচির দেশভক্তির কাহিনী কি? অশ্বযুগ প্রশ্ন করে।

আমি বলতে শুরু করলাম সেই অবিস্মরণীয় ইন্দ্র বৃত্রাসুর যুদ্ধের কাহিনী। আর্য-অনার্য সংঘর্ষের এক হৃদয়বিদারক রক্তাক্ত অধ্যায়। ইন্দ্রহন্তা পুত্র বৃত্রাসুর আর্যদের এলাকার জলপথ অবরোধ করে আর্যদের অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছিল। ইন্দ্রসহ দেবতাগণ বৃত্রাসুরের সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থেকে বহু ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করছিলেন। অবশেষে তাঁরা বৃত্রাসুরের বধের জন্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন।

বিষ্ণু যেরকম বিচারশীল সেইরকম জ্ঞানী এবং কূটনীতিজ্ঞ। দধীচির শরণাপন্ন হওয়ার

জন্য তিনি ইন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন। যদি দধীচি স্ব-ইচ্ছায় দেহত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর অস্থিসমূহ দ্বারা অস্ত্রবিশারদ দেবতাগণ ইন্দ্রের জন্য 'বজ্র' নামক এক স্বতন্ত্র অস্ত্র নির্মাণ করবেন। সেই 'বজ্র'ই বৃত্রাসুরের মস্তক বিদীর্ণ করতে পারবে। বৃত্রাসুরকে বধ করে আর্যদের নিষ্কন্টক করলে ইন্দ্রের যশ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে এবং তিনি দেবরাজ হবেন। তাছাড়া তিনি বৃত্রহী নামে পরিচিত হবেন। বজ্ররূপী অমোঘ অস্ত্রটি ইন্দ্রায়ুধ হয়ে থাকবে।

আমার কাছে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বৃত্তান্ত শোনার সময়ে দাসদের মধ্যে বিদ্রোহ ও অসন্তোষের একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, কারণ দাসদের দানব, দস্যু, অনার্য ইত্যাদি নামে ভর্ৎসনা করা এবং ইন্দ্রের দেবরাজ পদ সুদৃঢ় হওয়া এই সংগ্রামের পরিণতি ছিল। বৃত্রাসুর বধ আর্যদের পক্ষে আনন্দদায়ক ছিল সত্যি, কিন্তু দাসদের পক্ষে তাহা ছিল পরাজয়ের, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কলঙ্কময় দুঃখদায়ক স্মৃতি। তাই সেই প্রসঙ্গ ওঠামাত্রই দাসদের মধ্যে আর্য বিনাশকারী হুঙ্কার বংশপরম্পরার মতো দুন্দুভিত হয়, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কথাটা আমার জানা ছিল না। তাই সেই মৃদু গুঞ্জন অগ্রাহ্য করে আমি ভাববিহ্বল হয়ে দধীচির আত্মোৎসর্গের কাহিনী পুনর্বার শুরু করতেই ঋচা বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বলে ওঠে—"দেবী! তুমি ইন্দ্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করছ না দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করছ? এখানে উপস্থিত অন্য সবাই হয়ত জানে না, আমি কিন্তু পূর্বে বহুবার তোমার কাছে দধীচি উপাখ্যান শুনেছি, তাতে দধীচির দেশভক্তি অপেক্ষা ইন্দ্রের বীরত্ব অধিক প্রাঞ্জল মনে হয়েছে।"

আশ্চর্য হলাম ঋচার শ্লেষপূর্ণ বক্তব্যে। রম্যবনে থাকার সময়ে ঋচা বহুবার ভাই নারদ এবং আমার মুখে এই কাহিনী শুনে উৎফুল্ল হয়ে ইন্দ্রস্তুতি করেছে, অবশ্য ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করে দাসবর্ণের প্রতি অবিচার করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছে, কিন্তু এইরকম ব্যঙ্গপূর্ণ বিদ্রোহ কখনও করেনি। অথচ আজ রুদ্রাক্ষের স্ত্রী হওয়ার ফলে দাসপল্লীতে বাস করে স্বর পরিবর্তন করেছে। দশরাজ্ঞ যুদ্ধে রুদ্রাক্ষের পূর্ব পুরুষগণ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়। অপর এক আর্যদাস সংঘর্ষে রুদ্রাক্ষ, অশ্বযুগ ধৃতি ইত্যাদি পিতামাতা হারিয়ে অনাথ হয়েছে, অশ্বযুগের যুবতী মা ও ধৃতির যুবতী বোনকে রক্ষিতা ও দাসী করে রাখার জন্য আর্যরাজাগণ বলাৎকার করে নিয়ে গেছে। তারা এখন কোথায় আছে, জীবিত কি মৃত—কেউ জানে না। তাই ইন্দ্রদেবের নামোচ্চারণ মাত্র রুদ্রাক্ষ, অশ্বযুগ তথা দাসবসতিতে ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। দধীচির ম্যাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইন্দ্রদেবের বীরত্বকে কিভাবে অগ্রাহ্য করব?

আমাকে হতবাক করে রুদ্রাক্ষ, অশ্বযুগ বিরাট প্রভৃতি কয়েকজন যুবক বিকট চিৎকার করে বলে—"দেবী, তোমার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে কিন্তু ইন্দ্রদেবের মতো হিংস্র উগ্র, দাসদলনকারী অবিবেচক পুরুষের নামোল্লেখ করলে পরিস্থিতি গুরুতর হবে, পরে আমাদের দোষ দেবেন না।"

কেন জানি না আমার মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয়, এই অজ্ঞ যুবকদের দধীচিউপাখ্যানের মহিমা বুঝিয়ে দেশভক্ত করতে মন চায়, আমি পুনর্বার বর্ণনা করতে উদ্যত হই, সহসা ভাই

নারদ এবং প্রথা এসে উপস্থিত। আমার সংবাদ নেওয়ার জন্য ভাই নারদ গৌতম আশ্রমে এসেছিলেন এবং আমার খোঁজে প্রথার সাথে এখানে এসে হাজির তাঁর সাথে মহর্ষি বশিষ্ঠও আশ্রমে এসেছেন। আমার বিয়ের পর মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য এসেছেন বলে ভাই নারদের কাছে শুনলাম।

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভাই নারদ বুঝতে পারেন যে আমি প্রতিজ্ঞা থেকে একচুল সরে যাব না, কিন্তু বৃত্রাসুর বধের কাহিনী শুনে দাসযুবকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তাই ইন্দ্রের স্বপক্ষে যুক্তি করে তিনি বলেন—"ইন্দ্র সম্পর্কে তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তোমরা নয়, বহুলোক ইন্দ্রের শক্তির ভুল চিত্র এঁকেছে। তাঁদের ধারণা ইন্দ্র ভোগবিলাসী কামুক, হিংস্র এবং ক্রুর। বাস্তবে আমাদের বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করেছেন। পৃথিবীতে একটি উচ্চ বিচার স্থাপন করার অর্থ হল একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ। পৃথিবীতে সহস্র উচ্চ বিচার স্থাপন করে তিনি ইন্দ্র হয়েছেন। একজন জীবদ্দশায় একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারে। আর যে নিজের জীবনকালের মধ্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছে, নিশ্চিতভাবে সে এক অলৌকিক শক্তি। সামান্য মহৎকাজ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের অহংকার জন্মায়, সে নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু সমস্ত ঐশ্বর্যলাভের পর যত অহংকারী এবং বিলাসী হওয়ার কথা, তিনি তা হননি। এখনও তাঁর মধ্যে বহু সৎগুণ বিদ্যমান। ঈর্ষাকাতর লোকেরা ইন্দ্রের নিন্দা করার জন্য তাঁকে কামুক বলে প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কাম হল মনুষ্যপ্রবৃত্তির প্রবলতম শক্তি। ইন্দ্রের প্রবলশক্তিকে কামশক্তি হিসাবে বিকৃত করাই বিকারগ্রস্ত লোকেদের কাজ। কোনও মহৎ কাজ করতে হলে তাকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীণ হতে হয়। ইন্দ্রদেবের জীবন মহৎ কাজ এবং বিরোধের সমাহার। মহর্ষি বশিষ্ঠ ইন্দ্রদেবের পরম মিত্র। এই মিত্রতা ইন্দ্রদেব নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীতে মহর্ষি বশিষ্ঠ একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, পরোপকারী এবং সমাজসেবী তপস্বী। বশিষ্ঠের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে ইন্দ্রদেব তাঁর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ইহা শুধু বশিষ্ঠের মহানতা নয়, ইন্দ্রদেবেরও মহানতা।

যারা দুষ্ট তাদের রাক্ষস নাম দেওয়া হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে জরোধ নামক এক রাক্ষস বশিষ্ঠকে নানাভাবে উৎপীড়ন করছিল। বৈদিক সমাজের পুনরুত্থানের জন্য বশিষ্ঠ সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করছিলেন, জরোধ রাক্ষস প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করছিল, তা সত্ত্বেও মহাত্মা বশিষ্ঠ নিজ সঙ্কল্পে অটল ছিলেন। বশিষ্ঠের সঙ্কট জানার পর তাঁর প্রিয় মিত্র অগ্নিদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জরোধ রাক্ষসের সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। বশিষ্ঠ অগ্নিদেবের সহায়তা প্রার্থনা করেননি। তাহলে অগ্নিদেব জরোধবধ করলেন কেন? ইহাই প্রকৃত মিত্রতা। এরজন্য অগ্নিদেবকে কি হিংস্র বা উগ্র বলা যাবে? রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সকলের শক্তি বিনিয়োগ হওয়া আবশ্যক এবং মিত্রতার পরীক্ষা হল সঙ্কট ও বিপদ।

রুদ্রাক্ষ এইসব কথায় প্রভাবিত হয় না। উত্যক্তভাবে সে ভাই নারদকে প্রশ্ন করে—"কিন্তু দশরাজ্ঞ যুদ্ধের পিছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল? ব্রহ্মর্ষি হলেও বিশ্বামিত্রের চরিত্রে

অনেক ত্রুটি দেখা যায়। তাঁরই পরামর্শে রাজা সুদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সমস্ত দাসরাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। দাসরাজাদের শক্তিভঙ্গ করাই ছিল ঐ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। তাই ভুর্বস, দ্রুহ্য বৈগঙ্গয় প্রভৃতি দশজন রাজা প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন সুদাস বশিষ্টের সহায়তা না পেলে যুদ্ধে পরাস্ত হতেন। কারণ দসরাজ্ঞ যুদ্ধ দাসবংশীয় পরাক্রমী সেনাগণের সহায়তায় হয়েছিল। বশিষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পিছনে সুদাসের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রের সহায়তা ভিক্ষা। বশিষ্ঠ পত্রের মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো মাত্রই সোমাসক্ত ইন্দ্রদেব সোমপান ত্যাগ করে যুদ্ধ করার জন্য পৌঁছে গেলেন এবং বরুষ্ণী নদীর তীরে দাসরাজা সহ সমস্ত দাসসেনা ও তাদের পরিবারবর্গকে ধ্বংস করলেন। এই যুদ্ধে ইন্দ্রদেবের যোগদানের কি আবশ্যকতা ছিল? সোমপান এবং যুদ্ধ ব্যতীত তাঁর কি আর কোনও কাজ নেই?

"কেন থাকবে না? নারীসঙ্গ তাঁর এক কাজ। যুদ্ধের পর পরাজিত রাজ্যের সুন্দরী নারীদের বলাৎকার ও ভোগ করা ইন্দ্রদেবর চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ঠ' —রুদ্রাক্ষ তাচ্ছিল্য করে।

কে জানি কেন ইন্দ্রদেবকে এইরকম অযথা ভর্ৎসনা করাটা আমার ভালো লাগে না। রুদ্রাক্ষের অশ্লীল মন্তব্যে আমি ক্ষুণ্ণ হলাম।

আমার মুখ দেখে ভাই নারদ আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। স্মিত হেসে তিনি বলেন—"পরাজিত রাজ্যের সুন্দরী রমণীদের সকল আর্যরাজারা ভোগ করেন অথচ কলঙ্কলেপন হয় ইন্দ্রদেবের ওপর। আজ পর্যন্ত ইন্দ্রদেবের নামে যত কলঙ্কলেপন হয়েছে অন্য কেউ হলে কলঙ্কের ভারে নরকগামী হতেন, কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্য এখনও তিনি ইন্দ্রলোকে দেবরাজ পদে অধিষ্ঠিত। তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে দাসরাজ্ঞ যুদ্ধে কেবলমাত্র দাসরাজা ও দাসসেনা নয়, পরোক্ষভাবে আর্যঋষি বিশ্বামিত্রও পরাজিত হয়েছিলেন। তাই শুধুমাত্র ইন্দ্রদেবকে দাসবিরোধী বলা সঙ্গত নয়।"

এমন সময়ে প্রথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে আশ্রমে অতিথি এসেছেন। আমার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। অবশ্য বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রের মতো ক্রোধী নয়। তা না হলে আমি এতক্ষণে অভিশপ্তা হয়ে যেতাম। গৌতম বিরক্ত হচ্ছেন এবং আমাকে দ্রুত আশ্রমে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাই নারদ জানালেন—'মহর্ষি বশিষ্ঠও তার সাথে দাসপল্লীর নিকটস্থ নদীর তীরে এসে একটি বৃক্ষের নিচে ধ্যানে বসেছেন। বৈদিক সংস্কৃতি এবং সামাজিক সমন্বয় যেরকম সঙ্কটের সম্মুক্ষীণ হয়েছে তাহা দূরীকরণের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত। সমস্ত মুনিঋষিদের আলোচনার জন্য তিনি পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রা জরাগ্রস্ত হলেও সামাজিক সমন্বয় এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আগামী সপ্তাহে তাঁরাও এখানে আসবেন।

গৌতম আশ্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। কিছুদিনের জন্য অহল্যার কার্যব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। সে হয়তো দাসপল্লীতে আসার সময় পাবে না। তাই তার অসমাপ্ত

বর্ণনা শীঘ্র সমাপ্ত করে আশ্রমে ফিরে যাক। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠর ধ্যানভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে অপেক্ষা করছি। আমাকে দধীচি উপাখ্যান শেষ করার ঈঙ্গিত দিয়ে ভাই নারদ চলে গেলেন। প্রথা তাঁকে অনুসরণ করে।

আমি অর্ধসমাপ্ত কাহিনী আবার শুরু করলাম—"বিষ্ণুর পরামর্শ অনুযায়ী ইন্দ্রদেব দধীচির আশ্রমে পৌঁছালেন। প্রথমে নিজের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য দধীচির কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর নম্রকণ্ঠে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। একদা তাঁব শিরঃচ্ছেদকারী ইন্দ্রদেবকে নিজগুণে ক্ষমা করলেন দধীচি এবং হাসতে হাসতে বললেন—"তাহলে পুনর্বার আমার শিরশ্ছেদ করে আমাকে মৃত্যুলোকে পাঠাবেন এবং আমার অস্থিসংগ্রহ করে দেবতা ও আর্যদের শত্রুনাশকারী বজ্র নির্মাণ করবেন।

বিনীতভাবে হাতজোড় করে ইন্দ্রদেব বলেন—"হে পরমপূজ্য মহাত্মা! আমাকে আর লজ্জা দেবেন না; সেদিন আপনার শিরশ্ছেদ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছি সত্য, কিন্তু আমার চিকিৎসকদ্বয়কে পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছিলাম যতশীঘ্র সম্ভব আপনার মস্তক পুনঃ স্থাপনের জন্য তা না হলে দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের বৃত্রাসুরের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আপনি থাকতেন না। যদি আপনাকে হত্যা করে আপনার অস্থি সংগ্রহ করি, তাহলে ঐ অস্থি বজ্রে পরিণত হবে না, সেইজন্য আপনাকে স্ব-ইচ্ছায় শরীর ত্যাগ করতে হবে। এটা আমার নির্দেশ নয়। ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শ। আমি সেটাই আপনাকে নিবেদন করলাম এবার অপনার ইচ্ছা, দেহত্যাগ করার জন্য আমরা আপনাকে বাধ্য করতে পারব না।

মৃদুহেসে দধীচি বললেন—"দেশের মঙ্গলের জন্য যদি আমার অস্থি আবশ্যক হয় তাহলে সেই মৃত্যু জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কাছে। হে ইন্দ্র! তুমি জানো, একদা তুমি আমার হত্যাকারী ছিলে সেই অর্থে তুমি আমার শত্রু। একথা তুমিও জানো যে, তোমাকে ভয়ঙ্কর অভিশাপ দেওয়ার শক্তি আমার আছে। সে কথা জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তুমি নির্ভয় নিরহঙ্কার চিত্তে আমার শরণাপন্ন হয়েছ।

বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য তোমার শক্তি অপরিমেয়। অথচ আমার প্রাণহীন অস্থি বৃত্রাহন্তা শক্তি সমৃদ্ধ। একথা প্রকাশ করতে তুমি কুণ্ঠাবোধ করনি, এটা তোমার নিরহঙ্কারী হৃদয়ের পরিচয়, আমি তোমার আচরণে খুশী হয়েছি। আমার অস্থি নির্মিত বজ্র তোমার হাতে থাকা পর্যন্ত আমি মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকব। কিন্তু আমার একটাই অনুরোধ—আত্মস্বার্থের জন্য আমার অস্থি নির্মিত বজ্র প্রয়োগ করবে না, তার ফলে আমার আত্মা কষ্ট পাবে এবং তোমার খ্যাতি হ্রাস পাবে।

এইকথা বলে মহাত্মা দধীচি নির্মল চিত্তে দেহত্যাগ করলেন এবং তাঁর অস্থিনির্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধ করে ইন্দ্রদেব যশস্বী হলেন। তাই দেশ হল জাতির উর্ধ্বে এবং জাতি ব্যক্তির উর্দ্ধে।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই রুদ্রাক্ষ, অশ্বযুগ বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতি যুবকগণ চিৎকার

করে—"দেশ কি শুধু আর্যদের? দাসবর্ণের বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্র দেশভক্ত এবং দধীচি মহান। নিজের জাতির জন্য প্রাণবলি দিয়ে বৃত্রাসুর কেন দেশভক্ত এবং মহান হবে না? কারণ সে আর্য নয়। দাসহত্যার জন্য পুনরায় এক নতুন ষড়যন্ত্র করার জন্য সম্ভবত বশিষ্ঠ ঋষির গৌতম আশ্রমে আগমন ঘটেছে। আমরা কিন্তু তা হতে দেব না। আমাদের পল্লীর নিকটে প্রবাহিত নদীতট গৌতম আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বশিষ্ঠ যোগাসনে বসেছেন বোধহয়। প্রথমে তাকে বধ করে আমরা বৃত্রবধের প্রতিশোধ নেব।"

উন্মত্ত জনতাকে নানাপ্রকার প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রসহ নদীর দিকে যেতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যে আখ্যান বর্ণনা করলাম, সেটা যে এমন ভয়ঙ্কর আর্যদাস সংঘর্ষে পরিণত হবে এবং বশিষ্ঠ বধের কারণ হবে তা আমি ভাবিনি। নিজের অজ্ঞানতার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিই। ভাই নারদের ওপরও রাগ হয়, তিনি তো ব্রহ্মর্ষি। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি কি জানতে পারেননি যে আমার ব্যাখ্যার পর এই রকম ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে। দধীচি উপাখ্যান বর্ণনা থেকে তিনি আমায় বিরত করলেন না কেন?

আমি তাদের পিছনে পাগলিনির মতো দৌড়ালাম। অগ্নি যেমন বায়ুর শীতল স্পর্শে লেলিহান শিখা বিস্তার করে সেইরকম আমার করুণ মিনতি সেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পাষণ্ডদের এক হিংস্র আনন্দে অধিক প্রজ্জ্বলিত করে। আমি ধরেই নিয়েছি যে আজ মহর্ষি বশিষ্টের শেষদিন উপস্থিত। তাছাড়া আমার প্রিয় সহচীর ঋচার স্বামী রুদ্রাক্ষই এই হিংসাকাণ্ডেব নেতা। আমি কি করব? কার সাহায্য নেব? এই হিংসাকাণ্ডের কারণ তাহলে আমি? অপরাধবোধ ও আশঙ্কায় আমি মৃতপ্রায়।

হঠাৎ দেখি, মিত্র বশিষ্ঠকে উন্মত্ত রুদ্রাক্ষর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মত্তহস্তীর উপর ধাবমান বজ্রধারী ইন্দ্রদেব উপস্থিত। ইন্দ্রদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমি আপ্লুত হয়ে গেলাম। প্রার্থনা করার পূর্বে যিনি প্রার্থনা পূরণ করেন, তিনিই কেবল ইন্দ্রপদের অধিকারী হতে পারবেন। বিপদ দূর হয়ে গেল ভাবামাত্রই আমার মনে পড়ল যে আমার প্রিয় রুদ্রাক্ষের আজ অন্তিম দিন। ভয় এবং আশঙ্কায় আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। রুদ্রাক্ষসমতে অসংখ্য দাস হত্যা করে আজ ইন্দ্রদেব বিদ্রোহ দমন করবেন। এই ঘটনার পর আমার আত্মহত্যা অবশ্যম্ভাবী। আর বেঁচে লাভ কি? আমি কি আর সুস্থ মনে বাঁচতে পারব? ঋচার জলভরা চোখের দিকে কি করে তাকাব?

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই উন্মত্ত জনতাকে ঠেলে সরিয়ে আমি ইন্দ্রদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। ইন্দ্রদেব রুদ্রাক্ষকে হত্যা করতে উদ্যত। কি জানি কোথা থেকে এল আমার এত সাহস ও মনোবল। সম্ভবত পিতার প্রভাবে আমার আত্মবল প্রখর। আমি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলাম—"হে পরমদাতা ইন্দ্রদেব। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সমাবর্তন উৎসবে আপনি আমাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলেন। আজ আমি সেই বর.....।

আমাকে চমকে দিয়ে বজ্র নিনাদস্বরে ইন্দ্রদেব বললেন—"ক্ষান্ত হও অহল্যা, এই সামান্য দস্যুর জীবন রক্ষার তোমার দুর্লভ বরের অসদউপযোগ কর না। পরে মহৎ কাজের জন্য সেই বর প্রয়োজন হতে পারে।"

আমি হাতজোড় করে বললাম—"দেবরাজ! এই পৃথিবীতে কারও জীবন নগণ্য নয়, ভবিষ্যতে রুদ্রাক্ষের দ্বারা বহু কল্যাণ যে সাধন হবে না, সে কথা কে বারণ করবে? রুদ্রাক্ষও একজন দেশভক্ত বীর..... তার ক্রোধ নেহাৎ অকারণ নয়—"

—"কিন্তু অপরের জন্য তোমার দুর্লভ বর হাতছাড়া করো না অহল্যা।"

—"রুদ্রাক্ষ পর নয়, সে আমার প্রাণপ্রিয়া সহচরী ঋচার স্বামী। সে আমার প্রিয় রুদ্রাক্ষ।"

—"কিন্তু গৌতমের অনুমতি বিনা তুমি আমার কাছ থেকে বর নিতে পারবে না অহল্যা, তুমি এখন গৌতমের অধীনা" ..... ইন্দ্রের কণ্ঠে শ্লেষ।

—"আত্মা কারও অধীন নয়—আত্মা কেবলমাত্র পরমেশ্বরের অধীন। আমার আত্মার এই প্রার্থনা পূরণ করুন দাতা।"

—"আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে পারি অহল্যা, কিন্তু প্রতিদানে তুমিও আমাকে বর দিতে পার, সে শক্তি তোমার আছে।"

—"আমার কি শক্তি দেবরাজ!"

—তুমি ঐশ্বর্যময়ী নারী, তোমার ঐশ্বর্যের তুলনা নেই, তাই তার হিসাব চেও না। আমি যদি তোমার ঐশ্বর্যের বর্ণনা করি, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যশালিনী নারীরা নিঃস্ব হয়ে যাবে। রুদ্রাক্ষের জীবনের বদলে আমি যদি তোমার কাছে বর চাই?

কিছু না ভেবে আশঙ্কা বিহ্বল চিত্তে আমি উত্তর দিলাম—"প্রভু! নিশ্চয় দেব, যা চাইবেন আমার অদেয় থাকবে না। যদি প্রকৃতই আমার কিছু ঐশ্বর্য থাকে তাহলে রুদ্রাক্ষ তথা অন্যান্য দাসভাইদের জীবনরক্ষার জন্য অকাতরে দান করে দেব।"

—"থাক দেবী! এই বরদান কখনও হয়তো কোনও মহৎ কাজে লাগতে পারে, তাই আজ আমি তোমার কাছে বর চাইব না। আমি স্ব-ইচ্ছায় রুদ্রাক্ষকে মুক্ত করে দিচ্ছি" —এই কথা বলে ভাই নারদ এবং মহর্ষি বশিষ্ঠকে নিয়ে রথযানে যেতে উদ্যত হন। মহর্ষি বশিষ্ঠকে নম্র প্রণতি জানিয়ে আমার আজকের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলাম। উদারচিত্তে বশিষ্ঠ স্নেহবিগলিত হৃদয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। ওঃ ইন্দ্রদেবের উদারতা এবং বশিষ্ঠের ক্ষমাশীলতার জন্য কতবড় প্রলয় থেকে আজ পৃথিবী রক্ষা পেল।

সৃষ্টির পরে আসে প্রলয়; কিন্তু প্রলয় অনন্ত নাও হতে পারে। কিছু কিছু প্রলয় সংঘটিত হয় এবং নতুন সৃষ্টিতে পৃথিবী হয় ঋতম্ভরা। গতকালের প্রলয় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হই। ভবিষ্যৎ বিচার করে কাজ করা উচিত জেনেও মানুষ সবসময় সবকাজ সঠিকভাবে করে না। কারণ মানুষ সর্বজ্ঞ নয়। আমার কথা না বলাই ভালো। সংসার সম্পর্কে আমি একেবারেই অজ্ঞ—তাই কাল এতবড় প্রলয়ের সূত্রপাত হয়ে গেল।

নদী যখন বয়ে চলে, সে কি তার গতিপথ জানতে পারে? জানে কি তার ভবিষ্যৎ? চেনে কি সমুদ্রকে? সমুদ্রে তার স্থান আছে কি না? তার চলার পথে কত বাধা বিঘ্ন অপেক্ষা করে আছে—সে কি জানে? তবুও বয়ে যায়। বয়ে যেতে যেতে রাস্তা তৈরি হয় বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও।

কিন্তু সেই রাস্তায় যে সমুদ্রে পৌঁছাবে তার নিশ্চয়তা নেই। সমুদ্রে পৌঁছাক বা না পৌঁছাক পৃথিবী শষ্যশ্যামলা করতে কুণ্ঠা নেই তাব। সে গড়ে দেয় বিশাল বনানী বনানীর অন্তরালে সৃষ্টি করে যায় জীবনের প্রবাহ। গড়ে দেয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি। নিজের ভবিষ্যৎ অজানা বলে নদী কি বনানীর ভবিষ্যতের পথরোধ করে?

সেইরকম আমার ভবিষ্যৎ কি হবে জানি না বলে আমি কেন আমাব লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হব?

গতকালের ঘটনাব জন্য আমার কোনও গ্লানি নেই। দাসদের যজ্ঞাভিমুখী করতে হলে এইরকম কত প্রলয়ের সম্মুখীণ হতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের বৈবিতা প্রলয ব্যতীত দূর কবা কি সম্ভব?

আশ্রমে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বলছিলেন—"দেবী অহল্যার জন্য কাল এতবড় বিপদ থেকে গৌতম আশ্রম রক্ষা পেল। দাসগোষ্ঠী শুধু আমাকে হত্যা করেই সন্তুষ্ট হত না, গৌতম আশ্রমও ধ্বংস করত। অবশ্য আমার হত্যার পূর্বেই বিনা আমন্ত্রণে মিত্র ইন্দ্রদেব উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কাল তিনিও দাসপল্লী সমূলে ধ্বংস করতেন এবং তার পবিণতি স্বরূপ আর এক দেবাসুর যুদ্ধ সমগ্র আর্যাবর্তে ব্যপ্ত হয়ে মহাপ্রলয় সংঘটিত হত। নিজের পবিত্র ব্যক্তিত্বের দ্বাবা অহল্যা যদি ইন্দ্রদেবকে প্রভাবিত না করতেন, তাহলে ইন্দ্রদেব তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতেন না। রুদ্রাক্ষ প্রভৃতিদের হত্যা করে খণ্ড প্রলয সৃষ্টি করতেন। অহল্যাব অপরকে প্রভাবিত কবার অদ্ভুত ক্ষমতার ফলেই কাল এতবড় বিপদ দূর হয়েছে। মহর্ষি গৌতম! তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।অহল্যার জন্য ভবিষ্যতে তোমাব অনেক বিপদ দূর হবে বলে আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বলছে। আমি জানি তোমার পত্নী হিসাবে এই আশ্রমে অহল্যাব কিছু কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু তুমি তাকে এই আশ্রমের উপাধ্যাক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি দাও। তার একটা স্বতন্ত্র পরিচয় থাক। তাব দ্বারা সে অসুর, রাক্ষস, পনি তথা দাসগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে সৎমার্গে পরিচালিত করতে পারবে। তোমাব প্রতি দাসগোষ্ঠীর বিদ্বেষ স্বাভাবিক। তাই গৌতম পত্নীর পরিচয়ে আর্য-অনার্য সমন্বয় সাধনের যে পদক্ষেপ অহল্যা নিয়েছে, তাতে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে।

গৌতম পত্নী হিসাবে অহল্যার ওপর তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে না। শুধুমাত্র বন্ধু হিসাবে আমি তোমাকে এই প্রস্তাব দিলাম। নিজে বিচার করে তুমি এটা গ্রহণ করতে পার নাও করতে পার। আমি জোর করে তোমার ওপর আমার ধারণা চাপিয়ে দিচ্ছি ভেব না।

গতকালের ঘটনার পর থেকেই গৌতম অপ্রসন্ন ছিলেন। তাঁর মতে গতকালের মহাপ্রলয়ের মূল কারণ হলাম আমি। কি প্রয়োজন ছিল দাসপল্লীতে বেদ, প্রচারের? উপরন্তু ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যান বর্ণনার মূর্খতা আমি কেন করলাম? অনর্থের দ্বিতীয় কারণ ইন্দ্রদেব। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মশক্তির দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। ইন্দ্র কি বশিষ্ঠের শক্তি জানেন না? অর্বাচীন রুদ্রাক্ষ বশিষ্ঠকে হত্যা করতে পারবে বলে কি করে ভাবলেন ইন্দ্র? গায়ে পড়ে নিজের শক্তি জাহির করা ছাড়া ইন্দ্রের সম্ভবত আর কোনও কাজ নেই। তাঁর

উপস্থিতি দাসদের মধ্যে অধিক হিংসা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা বশিষ্ঠের ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাঁকে অপমান করেনি? তাই অহল্যা প্রলয়ের যবনিকা টানেনি, প্রলয় ডেকে এনছে। কাল থেকে এই দোষারোপ করে চলেছেন গৌতম। আজও তিনি সেই কথাই বলেছেন। ভাই নারদ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদদাতা। সমগ্র সংসারের ঘটনাবলী তাঁর জিহ্বাগ্রে। গৌতমের দোষারোপের উত্তরে তিনি বললেন—"কি ভগ্নিপতি মহাশয়! আমার বোনের প্রশংসা সহ্য করতে পারছ না, আবার নিজের সহপাঠী ইন্দ্রদেবের শক্তিও সহ্য করতে পারছ না? যখন অগ্নিদেব স্ব-ইচ্ছায় জরোধ রাক্ষসকে বধ করে মিত্র বশিষ্ঠকে রক্ষা করেছিলেন তখন তুমিই শতমুখে অগ্নিদেবের শক্তি, বন্ধু বৎসলতা, পরোপকারীতা এবং নিরহঙ্কারীতার প্রশংসা করেছিলে। আজ ঠিক একই পরিস্থিতিতে তুমি ইন্দ্রদেবের নিন্দা করছ কেন? এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে তুমি তোমার সহপাঠীর সফলতায় ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছ। এছাড়া আমার বোনের অলৌকিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্রদেব তার প্রার্থনা রক্ষা করেছেন বলে তোমার শাস্ত্রীয় স্বামীত্ব আহত হয়েছে ভাবাটা কি ধৃষ্টতা হবে? ভবিষ্যতে আমার বোনের কাছে বরভিক্ষা করবেন বলে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করায় তুমি সন্দিগ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছ কি? সেইজন্য কাল থেকে তোমায় অপ্রসন্ন এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। যাই হোক সে কথা বাদ দাও—আমার প্রশ্নের উত্তরে তুমি শুধু অখণ্ড যুক্তি করবে—সেঁটা আমি জানি, তাই এই প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেকেই দাও। বর্তমান মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার মত প্রকাশ কর। আশ্রমবাসীসহ আমি নিজেও তোমার মত জানতে উৎসুক। অহল্যা আজন্ম বনচারিণী, প্রকৃতি বিলাসিনী এবং জীবমানব নির্বিশেযে প্রেম পাগলিনি। তাকে অধিকসময় আশ্রমের দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রাখলে সে আর বন জঙ্গলে ঘুরে দাসদের সাথে বন্ধুত্ব করে অনর্থ সৃষ্টি করার সময় পাবে না। তাই বশিষ্ঠের প্রস্তাব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।"

ভাই নারদের কথায় ক্ষুণ্ণ হলেও শান্ত থাকার চেষ্টা করে সহজ সুরে গৌতম উত্তর দিলেন—"শ্যালক মহাশয়। অহল্যার বয়স কত? পনেরো ষোলো বছর বয়সে কেউ গুরুকুল আশ্রমের উপাধ্যক্ষা হতে পারে? তার শিষ্যরা তার চেয়ে আট দশ বছরের বড় হবে জেনেও তোমার এবং বশিষ্ঠের এইরকম প্রস্তাব দেওয়াটা কি প্রাসঙ্গিক? আশ্রমের মধ্যে অহল্যাকে কর্মব্যস্ত রাখার অন্য উপায় আমি স্থির করেছি। সেই সুসংবাদ তুমি ঠিক সময়ে জানতে পারবে এবং বোনের জন্য সুস্বাদু মিষ্টান্ন নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই এখানে প্রত্যাবর্তন করবে।"

গৌতমের রসিকতায় ভাই নারদ মোটেই খুশী হলেন না। যুক্তিচ্ছলে তিনি বলেন—"ইন্দ্রদেবের বয়স কত? দিব্য সংস্কারের জন্য যে মানবগণ আজ দেবতাপদ লাভ করে স্বর্গরাজ্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রদেব হলেন সর্বকনিষ্ঠ দেবতা। তিনিই আবার স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ পদ লাভ করে দেবতাদের শাসন করছেন কি করে? দেবরাজ পুরুষ এবং আমার বোন নারী—শুধুমাত্র সেইজন্য বিচার বিভেদ? পুরুষের মস্তিষ্ক শক্তি এবং নারীর দেহ সৌন্দর্যকে নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় নারী পুরুষের এই বৈষম্যকে তোমার মতো বিচারশীল ঋষির উৎসাহ দেওয়াটা কি সঙ্গত হচ্ছে?

এই গুরুতর সামাজিক সমস্যাকে লঘু পরিহাসে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গৌতম বলেন—"ইন্দ্রদেব ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির রাজনীতি চর্চা না করাই ভালো। সব প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি কি সবসময় উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়? প্রতিভা এবং প্রতিষ্ঠা দুটি ভিন্ন কথা। তাই সে কথা থাক। আচ্ছা ব্রহ্মচারী শ্যালক মহাশয়! নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা কবে থেকে হলে? নিজে বিয়ে করলে নারী মুক্তির স্বপক্ষে এত জোরালো স্বর শোনা যেত না। হ্যাঁ, বোনকে যোগ্যপাত্রে বিয়ে দিয়েছে বলে যদি ভাব, তাহলে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাটাই সমীচীন। পিতা মাতা ভাই ইত্যাদি মেয়ে জামাইয়ের মধ্যে ঢুকে সিদ্ধান্ত নিলে দাম্পত্য বিভ্রাট ঘটার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাই বন্ধুবর! ভগ্নিপতিব ওপর ভরসা রাখ। আমিও অহল্যার শুভার্থী। কারণ সে শুধু আমার স্ত্রী নয় আমার পরম প্রিয় শিষ্যা।" নবমঞ্জরীর চতুর্দিকে মধুমক্ষিকা মৃদুগুঞ্জন যখন আমার কোমল ইচ্ছাগুলিকে "মধুপবাতাঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" এই মন্ত্রে মন্ত্রিত করছিল ঠিক সেই সময়ে আমার চতুর্দিকে মম পুত্রাঃ শত্রুহনো (আমার পুত্রগণ শত্রুনাশকারী হোক) এই মন্ত্র আমার কানে ঋষিকণ্ঠে অনুরণিত হল। 'পুত্রবতী ভবঃ, পুত্রবতী ভবঃ' এই আশীর্বাদ বাণী প্রণব ওঁকারের সাথে মিশে আমার চারপাশের পৃথিবী ও আকাশকে ভারাক্রান্ত করছিল। আমাকে পুত্রবতী করার সকল আয়োজন গৌতম আশ্রমে শুরু হয়েছিল। এটাই ছিল আমাকে আশ্রমের মধ্যে বন্দিনী করে রাখাব উপায়।

অল্প বয়সের জন্য উপাধ্যক্ষা হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। কিন্তু এগারো বছর বয়সে আমার শরীর জননী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিল। তাই স্বামীর এই মহৎ উদ্দেশ্যের বিরোধীতা করার অধিকার আমার ছিল না। অবশ্য জননী হওয়ার পূর্বে আমি প্রেমময়ী পত্নী হওয়ার আশা করেছিলাম। কিন্তু গৌতমের নৈষ্ঠিক স্বামীত্বের জন্য "প্রেম" শব্দ উচ্চারণ করার সাহস আমার ছিল না। প্রেমও এক বাসনা। বাসনাকে জয় করার জন্য গৌতম সাধনা করছিলেন। তাই সংসারের সকল সহজ নিয়মের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এইরকম সংসার বিরাগী স্বামীর সাথে সংসার করা যে কি দুঃসাধ্য তা' আমি জানি। তাই আমার প্রেমলিপ্সাকে কঠোরভাবে দমন করে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম। তাই আজ পুত্রবতী হওয়ার আয়োজনে আমার খুশী হওয়ার কথা, কিন্তু আমি তা হতে পারছি না। প্রেম কি শুধু দেহভোগ! প্রেম কি জৈবিক প্রবৃত্তির পূরণ—প্রেম কি প্রজনন?

এতদিন গৌতম আমার দেহসত্তাকে স্বীকৃতি দেননি। কামভোগের জন্য শরীরসুখ পাপ। তাই পুত্র উৎপাদনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। এখন তাঁর পুত্র উৎপাদনের প্রবৃত্তি হয়েছে। তাই আমার গর্ভভূমিকে পুত্রসন্তান উৎপাদন-ক্ষম করায় ব্রতী হয়েছেন। দুটি কারণে আমার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। প্রথমত জননী হওয়ার জন্য আমার মন অনুকূল অবস্থায় আছে কি না তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি। দ্বিতীয়ত আমি পুত্র চাই কিংবা কন্যা চাই সে বিষয়েও তিনি আমার সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নি। আমি যেন একটা অনুর্বরা জমি। ঔষধ প্রয়োগ করে তিনি আমাকে উর্বরা করবেন এবং তাঁর

ইচ্ছানুযায়ী যে কোনও শস্য উৎপাদন করবেন। কিন্তু এসব ছিল আমাব নীরব বিদ্রোহ। প্রকাশ্যে আমি কোনও প্রতিবাদ করিনি। সেটাই আমার সময়েব সমাজের নিয়ম। কোন রাজা, ঋষি বা দেবতা নিজের স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী সন্তান প্রজননের পরিকল্পনা করতেন যে, আমি ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যা বলে আমার জন্য গৌতম ভিন্ন নিয়ম গড়বেন।

আশ্রমের বহির্দ্বার আমাব জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কারণ পুত্রসন্তান ধারণ করার জন্য আমি চিকিৎসাধীন ছিলাম। অশ্বত্থ গাছের পাতা ও ছালের রস আমাকে নিয়মিত সেবন করতে হচ্ছিল। অত্যন্ত কটুস্বাদযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই রসপানে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছিল। এর দ্বারা গর্ভধারণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিছুদিন সেই ছাল ও পাতার রস সেবনের পর ঐ বৃক্ষের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ শিকড়, ছাল, পাতা ফুল ও ফল শুকিয়ে গুঁড়ো করে ঐ চূর্ণ দুধ ও মধুর সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন দুবার আমাকে সেবন করতে হত। এর দ্বারা কন্যাসন্তান ধারণের আশঙ্কা দূর হয়ে পুত্রসন্তান ধারণ নিশ্চিত হবে বলে প্রথা আমায় আশ্বাস দেয়। কিন্তু আমি তখন জননী হওয়ার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া পুত্রকন্যার কোনও বিভেদ ছিল না আমার মনে বরং গৌতম তথা সমাজের কন্যাবিরোধী চিন্তাধারা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আমাব মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি হচ্ছিল। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি পুত্রলাভের জন্য গৌতমের সকল প্রকার উদ্যম সত্ত্বেও আমি যেন কন্যাসন্তান ধারণ করি। গৌতমের বিরুদ্ধে এটা এক ধরনেব প্রতিশোধ বলে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল। ক্রমাগত ঔষধ সেবনে আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ঋচা, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদির সাথে আমার আর দেখা হয়নি। তাদের জন্য আশ্রম নিষিদ্ধ আমার জন্য অরণ্য নিষিদ্ধ।

সেদিনের ঘটনার পর আমার সম্বন্ধে তাদের কি মনোভাব সেকথা জানার উপায় আমার ছিল না। নানা কারণে আমার মন ছিল অপ্রসন্ন।

এইরকম এক অপ্রসন্ন ঋতুতে গৌতম আমাকে গ্রহণ করলেন। হ্যাঁ, তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন একপ্রকার বলাৎকার করে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার অর্থ বলাৎকার ছাড়া আর কি?

যখন আমি প্রথমবার গৌতমের সাথে একান্তে মিলিত হব বলে বহুভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম তখন আমার শয্যাগৃহে গৌতম প্রেমিকরূপে প্রবেশ করেননি, তিনি এসেছিলেন কঠোর নীতিনিয়মের দণ্ডধারী সমাজের রক্ষক হিসাবে। এখন আমার মধ্যে কোনও উন্মাদনা নেই---আমার স্নায়ুতে শীতল, প্রত্যাখ্যানের হিমরক্ত জমাট হয়ে গেছে। গৌতমের ভস্মাচ্ছাদিত শরীর ও বৈরাগ্যরঞ্জিত মুখের দিকে তাকাতেই আমার স্নায়ুতে হিমস্রোত বয়ে যায়—ইচ্ছা করে সব বন্ধন ছিন্ন করে এই মুহূর্তে গৌতমের স্বামীত্বের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাব। ঘোষণা করব—শুধুমাত্র স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রী গর্ভধারণ করা পাপ। অবৈধ! কিন্তু সংসারে বহু সন্তান স্বামীর বলাৎকারে জননীর গর্ভে আশ্রয় নেয়। বিবাহ নামক সামাজিক অনুমোদন থাকলে বলাৎকারজনিত সন্তানকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার সমাজের নেই। তাই আমি প্রতিবাদ করার কে?

ভেবেছিলাম প্রথমে অন্তত স্বামী প্রেম সম্ভাষণ করবেন। হয়তো স্বামীর প্রেমময় একটি কথায় আমার দেহমনের সমস্ত শৃঙ্খল খুলে যাবে অনায়াসে—স্বামীর পবিত্র পৌরুষের কাছে নিজের কোমল নারীত্বকে সমর্পণ করব। আমার সন্তানের আগমনের মাঙ্গলিক মুহূর্তটিকে পূর্ণ প্রাণে স্বাগত জানাব।

কিন্তু 'প্রেমে'র মতো লঘু আবেগকে আমার সামনে প্রকাশ করতে গৌতমের কঠোর স্বামীত্বের অহংকার বাধা দেয়। আমাকে সম্ভাষণ জানাবার পরিবর্তে আমার শরীরকে অভিমন্ত্রণ করে সম্পৃক্ত মন্ত্রপাঠ করার পরেই উগ্রভাবে আমার সাথে মিলিত হলেন।

সহসা আমি দু'ভাগ হয়ে গেলাম—আমার পার্থিব শরীর এবং অপার্থিব আত্মা। আমার শরীর জড়বৎ স্বামীত্বের সমস্ত উৎপীড়নকে নীরবে সহ্য করে। আমার কোমল প্রেমাকাঙ্খী আত্মা কোন অদৃশ্য মধুবনে আমার জীবনের কল্পিত প্রেমিক গৌতমকে খুঁজে খুঁজে আশ্রুমোচন করছিল।

কায়মনোবাক্যে আমি স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলাম না। এটা কি আমার পাপ! আমার তাপদগ্ধা মধুযামিনী উদ্‌যাপিত হয়ে গেল, অথচ সুখের স্বাদ অননুভূত রয়ে গেল। বহু নারীর ভাগ্যেই এইরকম ঘটে। আমি তিলকে তাল করছি কেন? আমার কাছে সব কথা শুনে প্রথা আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে এটুকু বলা মাত্রই আমি আমার অন্তরস্থ অহল্যাকে ভর্ৎসনা করে বহু নারীর মধ্যে একজন হওয়ার চেষ্টা করলাম।

মাতৃস্তনে যেমন অনায়াসে অমৃত ঝরে সেইরকম গর্ভবতী নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের আবেগ অনায়াসে জাগে, কি বিচিত্র নারীর মন!

গর্ভসঞ্চার হয়েছে জানার পর আমার সমস্ত বিরূপতা দূর হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবী আমার কাছে মধুময় মনে হয়। সন্তানধারণের মুহূর্তটিকে কেন পূণপ্রাণে স্বাগত জানাতে পারিনি, তাই নিজেকে ধিক্কার দিই। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বামীর যাবতীয় দৌরাত্ম সন্তানের হিতকারী মনে করে সহাস্যে সহ্য করি। ভূমি যতই কর্কশ, কঠিন হোক না কেন বীজ স্থাপনের পর অঙ্কুরোদগমের জন্য নিজেকে বিদীর্ণ করায় ভূমি কি কুণ্ঠাবোধ করে?

আমি ও গর্ভধারণের পরবর্তী নীতিনিয়ম মেনে নিলাম। নিজেকে বিদীর্ণ করতে প্রস্তুত হলাম। গর্ভধারণের দু'মাস পর বটগাছের রস নাক দিয়ে রোজ সেবন করতে হত। ইহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলেও সমাজ নির্ধারিত 'পুংসবন সংস্কারকে' আমি অমান্য করি কি করে? এর দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান 'পুত্র' হবে বলে প্রথা আমাকে বোঝায়। 'পুত্র'র জন্য আমার মনে বিরোধ নেই। আমি নিজেও পুত্রবতী হতে চাই।

স্বর্গ মর্ত পাতালের কোন রমণী পুত্রবতী হতে না চায়? কিন্তু আমি 'কন্যাবতী'ও হতে চাই। তাই সমাজের কন্যাবিরোধী চিন্তাধারার আমি বিরোধিতা করি। আজ কিন্তু আমি পুত্র প্রসবের জন্য প্রস্তুত। দু-তিনটি পুত্রসন্তান লাভ করার পর গৌতম সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তখন আমি কন্যাবতী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করব। তখন যদি গৌতম বিরোধীতা করেন, তাহলে আমি প্রতিবাদ করব বলে প্রতিজ্ঞা করলাম।

এটা প্রথম গর্ভ, তাই চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হল।

সব কষ্ট আমি সহ্য করলাম। আবার নিজেকে বিদীর্ণ করার কষ্টও সহ্য করতে হবে এই কোমল শরীরে। সম্ভবত সেইজন্যই নারীকে কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার জন্য সমাজ এতরকম প্রারম্ভিক বিধি ব্যবস্থা করেছে। সুখপ্রসবের জন্য 'সোষ্যন্তী কর্ম' সমাপন হল। এবার বিদীর্ণ হওয়ার শুভ মূর্ত উপস্থিত। সংবাদ পেয়ে পিতা ব্রহ্মা, ভাই নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি মুনিগণ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। প্রথা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথা যতই জীর্ণ হোক না কেন ওকে আঁকড়ে ধরলে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হয়।

অসহ্য যন্ত্রণা বলে কি কিছু আছে? তাহলে গর্ভযন্ত্রণায় সব নারী মৃত্যুবরণ করত। বিশেষত আমার মতো সুকুমারী গর্ভযন্ত্রণার এক ধাক্কায় দেহবিসর্জন করে যন্ত্রণা-মুক্ত হয়ে যেত। সংসারে নাকি গর্ভযন্ত্রণার অধিক কোনও যন্ত্রণা নেই। অথচ আমি কি কবে সহ্য করলাম সেই যন্ত্রণা, আবার নিমেষে ভুলে গেলাম সকল যন্ত্রণা পুত্রের কোমল ক্রন্দনধ্বনি শোনা মাত্র।

ফলধারণ করার জন্য বৃক্ষ কি কখনও প্রতিবাদ করে? প্রতিবছর ফলভারে বৃক্ষ হয় নতমুখী। ফলবতী হওযা বৃক্ষেব ধর্ম। সেটাই বৃক্ষের জীবনের গৌরব এবং সফলতা। তাই চারবছরের মধ্যে আমি তিনটি পুত্রের জননী হলাম এবং একটি গর্ভ নষ্টও হল। তাহলে আমার প্রতিবাদ করার যথার্থতা কোথায়?

আমার ইচ্ছা ছিল ক্রমাগত এগারোটি পুত্রের জননী হওয়ার। এগারোটি পুত্রেব জনক হওয়ার পর ব্রহ্মচর্য পালন করে গৌতম বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন—এটাই ঋষিকুলের নিয়ম। কিন্তু তিনটি পুত্রের জন্মের পর চতুর্থবার গর্ভ বিভ্রাট হওয়ায় গৌতম স্থির করেন তিনি এবার ব্রহ্মচর্য পালন করবেন।

প্রতিবার গর্ভাবস্থায় পুত্রলাভের জন্য আমাকে সেই যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসায় থাকতে হত। শতানন্দ ও চিরকারীর জন্মের পর কনিষ্ঠপুত্র শরৎভানুর জন্মের সময় আমার বয়স মাত্র কুড়ি। দুর্বল শরীরে আর গর্ভধারণের স্পৃহা নেই। দুর্বল শরীর; তিনটি সন্তানের লালন পালন, আশ্রমের কাজকর্ম, গৌতমের কঠোর স্বামীত্বের বোঝা আমাকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। পুনর্বার গর্ভকষ্ট সহ্য করতে শুধু মনই বিদ্রোহ করে না শরীরও সহযোগিতায় অনিচ্ছুক। কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারি না, আমি ব্রহ্মাপুত্রী বলে কি আমার জন্য নিয়ম ভিন্ন হবে? আশ্রমের অন্যান্য ঋষিদের অল্পবয়সী পত্নীরা যেখানে প্রতিবছর পুত্রবতী হচ্ছেন, সেখানে আমার বাধাদান কতটা সঙ্গত হবে? কিন্তু যে কোনও উপায়ে গৌতম নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য আমার মধ্যে বেসুরো এক অহল্যা বিদ্রোহের ডাক দেয়। আমি গৌতমের স্বামীত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই গৌতম স্বামীত্ব জাহির করলে আমার শরীর মন প্রাণ আত্মা ভেঙ্গেচুরে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলেও সেটা নীরবে সহ্য করাই হল আমার স্ত্রী-ধর্ম। কিন্তু আমি পুত্রবতী হব কি কন্যাবতী হব সে বিষয়েও কি আমার কিছু বলার নেই? আমার জন্য দাসপল্লী নিষিদ্ধ। আমার সখী সহচরীদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া

হয়েছে। পুত্রেরা উপযুক্ত হলে পিতার দায়িত্ব এবং উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। কিন্তু আমার দুঃখের একবিন্দুও তারা হ্রাস করতে পারবে না। আমার দুঃখ বোঝার জন্য তাদের পুরুষ হৃদয়ে স্পন্দন জাগবে কেন?

প্রতিবার পুত্রদের নিষ্ক্রমণ সংস্কারের সময় কন্যাবতী হওয়ার অভিলাষ আমার মাতৃহৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়।

পুত্রদের জন্মের তৃতীয়মাসে, শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পুত্রদের চন্দ্রস্নান করাবার সময় আমি আমার অন্তরের বেদবাণী নিয়ম অনুযায়ী উচ্চারণ করি—"হে মোর প্রিয় পুত্র! আজ এই শুভলগ্নে আমি তোকে জ্যোৎস্নায় হাজির করাচ্ছি। এখন তুই মুক্ত। এই নীল আকাশ তোর জন্য নয়নাভিরাম হয়েছে তাকে দিব্যচক্ষুতে দর্শন কর। সূর্যদেবের মঙ্গলকিরণ, চন্দ্রদেবের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, পৃথিবীর অশেষ বনস্পতি তোর সকল আশা পূর্ণ করুন। তোর হিতাকাঙ্খী পিতা তোর মধ্যে নিজেকে দর্শন করুন। তুই পিতার গৌরব বৃদ্ধি কর—পিতার নাম তোর কীর্তির মাধ্যমে অমর হোক.....।"

এইটুকু উচ্চারণ করার সময় আমি ভাবি আমার যদি কন্যালাভ না হয় তাহলে কার মধ্যে আমি নিজেকে দেখব? আমার আকৃতি, আচরণ সংস্কার নিয়ে জন্মলাভ করে কে আমার সুনাম বৃদ্ধি করবে? শুধুমাত্র গৌতম নয়, মুনিঋষি রাজাগণও কন্যার জন্য কুণ্ঠিত এবং নির্দয়। বেদবাণীতে ঝঙ্কৃত হয়—"হে প্রভু, যদি কন্যাসন্তান দান কর, তাহলে অন্য পরিবারকে দান কর—এই পরিবারকে পুত্রসন্তান দান কর....." মনে বিদ্রোহ জাগে। বেদের বাণীতে যদি এত সংকীর্ণতা এত স্বার্থপরতা তাহলে তার কি সংশোধন আবশ্যক নয়? একজন বেদজ্ঞ পরোপকারী হবে আশা করা যায়। অথচ কন্যাসন্তান যদি ক্ষতিকারক মনে করা হয় তাহলে তা অপর পরিবারকে দান করার জন্য প্রার্থনা করাটা চরম স্বার্থপরতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাছাড়া একজন বেদজ্ঞর জাতি বর্ণ পুরুষ নারী নির্বিশেষে মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখার কথা। তিনিই আবার কেবলমাত্র পুত্রবান হওয়ার অভিলাষ কি করে পোষণ করেন? ইহা আর্যদের কোন উদারনীতির অন্তর্ভুক্ত!

যাদের দাসদস্যু, পনি, ইতর রাক্ষস আখ্যা দিয়ে হীনদৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, ও বিষয়ে তারা যথেষ্ট উদার। তাদের সমাজে স্ত্রী জাতির স্থান উচ্চে। পুত্রকন্যা নির্বিশেষে সন্তানলাভই তাদের আনন্দ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। অথচ মুনি ঋষি ও আর্যগণ নারীশূন্য পৃথিবীর কল্পনা করেন বলে মনে হয় আমার। যদি একজন রাজার একশত রাজ্যকন্যা বিবাহ করাটা আর্যনীতি এবং সমস্ত আর্যনারী যদি পুত্রবতী হন, তাহলে অবশেষে আর্যবর্ণ লোপ পাবে না কি? আবার কেউ কেউ কন্যার প্রতি এতটাই নিষ্ঠুর যে জ্যোতিষশাস্ত্র বা দিব্যদৃষ্টির ফলে যদি জানা যায় যে গর্ভস্থ সন্তান কন্যা তাহলে ভ্রূণহত্যা করতেও পশ্চাৎপদ হন না একথা চিন্তা করলে ভয়, বেদনা এবং ঘৃণায় আমার লোম খাড়া হয়ে যায়।

যেমন পুত্রকন্যা নির্বিশেষে মাতৃদুগ্ধে সন্তানের জন্মসিদ্ধ অধিকার সেইরকম মাতৃগর্ভেও পুত্রকন্যা নির্বিশেষে সন্তানের জন্মসিদ্ধ অধিকার রয়েছে। পুত্রসন্তানের জন্য মাতৃগর্ভকে

প্রস্তুত করার মাধ্যমে কন্যাসন্তানকে তার জন্মসিদ্ধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করাটা আর্যধর্ম হতে পারে, কিন্তু মানবধর্ম নয়। আমার জননীপ্রাণ এইরকম ভাবনায় আন্দোলিত হওয়ায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রথা বলে—"তুমি নারীর পক্ষ নিয়ে ভাবছ, কারণ তুমি নারী। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম পুরোধা বোধহয় তুমি। নারীমুক্তি আন্দোলন তোমার থেকে শুরু হয়ে স্থানাতীত, কালাতীত আন্দোলনে পরিণত হবে। তখন যুগে যুগে তুমি সমাজের সমালোচনার পাত্রী হয়ে থাকবে। গৌতম পুত্রসন্তান চান, তুমি তাঁর পত্নী। পৃথকভাবে কন্যাসন্তান কামনা করার অর্থ গৌতমকে বিরোধ করা। এটা ওটা না ভেবে ঔষধ ব্যবহার করো এবং অন্তত এগারোটি পুত্রসন্তান গৌতমকে দান করো।"

এইরকম রক্ষণশীল কথায় আমি প্রথার ওপর ক্ষুব্ধ হই। ক্রমাগত গর্ভযন্ত্রণায় আমি বোধহয় আমার স্বভাবসুলভ শান্তভাব হারিয়ে ফেলেছি। বিরক্ত হয়ে আমি বলি—"গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করব আমি, অথচ নিজের ইচ্ছায় একটি কন্যাসন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারব না। শত অযোগ্য পুত্র জন্ম করলে আমার সুনাম বৃদ্ধি হবে অথচ একটি গুণবতী কন্যা জন্ম দিলে পাপ। কে এইরকম নিয়ম করেছেন প্রথা? বিধাতা তো এইরকম নিয়ম সৃষ্টি করেন নি। মানুষের গড়া অমানবিক নীতি নিয়ম আমি ভেঙ্গে দিতে চাই নারী হিসাবে নয়, জননী হিসাবে আমার এই বিদ্রোহ। এটা নারীমুক্তির হুঙ্কার নয়, মানব মুক্তির হুঙ্কার। সময় আমাকে কিভাবে চিত্রিত করবে, সে বিষয়ে আমার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। বলে রাখলাম—এবার আমি কন্যাবতী হওয়ার কামনা করছি।" প্রথা হাসে। কুটীল, নিষ্ঠুর তার হাসি। সে বলে—"গৌতম তোমাকে সেই সুযোগ দিলে তো। তোমাকে পুত্রবতী করার জন্য বৈদ্যগণ যে মহৌষধের ব্যবস্থা করেছেন, সেটা যে অব্যর্থ তুমি জানো। বৃথা আশা করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?" আমি নীরব থাকলাম। স্থির করলাম—পুত্রার্থে ঐ মহৌষধ আর সেবন করব না, সব কিছু ছেড়ে দেব ঈশ্বরের ওপর। যদি ঈশ্বর আমাকে কন্যাদান করেন তাহলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করব যদি পুত্র দান করেন তাহলেও। কন্যালাভের কামনা থাকলেও আমার গর্ভস্থ পুত্রসন্তানকে কি আমি অবহেলা করতে পারি।

গৌতম প্রদত্ত ঔষধ সেবন করলাম না জেদ ধরে। গৌতমের অজ্ঞাতে সমস্ত ঔষধ অগ্রাহ্য করে গর্ভবতী হলাম। আমার এই রহস্য একদিন উন্মোচিত হয়ে গেল। কারণ আমার বাহ্যলক্ষণ থেকে বৈদ্যগণ জানতে পারেন আমার গর্ভস্থ সন্তান পুত্র নয়, কন্যা। এটা কি করে সম্ভব? বৈদ্যগণ আশ্চর্য হওয়ার সাথে গৌতম চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে প্রথাই আমার ঔষধ বর্জনের রহস্য উন্মোচন করে। আমার আচরণে গৌতম শুধুমাত্র ক্ষুব্ধ নয় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। তার ধারণা হল, তাঁর অগোচরে আমি বহু গুরুতর অপরাধ করতে পারি। তাঁর আরও ধারণা হল যে, আমার ভিতরে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, যেটা তাঁর স্বামীত্বকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে প্রশ্ন করার দুঃসাহসও করতে পারে।

অবশ্য পুরুষবীর্যের ন্যূনতা এবং স্ত্রীরজঃর আধিক্যেই কন্যাসন্তান জাত হয়। বীর্যদানকারী হওয়াটা পুরুষের এক অহঙ্কার। সম্ভবত সেই কারণেই কন্যাসন্তান লাভে পুরুষের অহংকার

বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে পুরুষবীর্যের আধিক্য ও স্ত্রীরজঃর ন্যূনতা থাকলেও পুত্রবতী হয়ে নারী নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করে কিভাবে?

হায়! কন্যার মুখ দর্শনের সৌভাগ্য গৌতমই পণ্ড করলেন। 'গর্ভভঙ্গ' ঔষধ সেবনের ফলে আমার গর্ভনষ্ট হল। যে ঔষধ আমি সুখ প্রসবের জন্য খাচ্ছি তা যে গর্ভভঙ্গ করাবে সেটা আমি জানতে পারিনি! 'কন্যাসন্তান জানার পর পিতা মাতা এবং বেদজ্ঞ বৈদ্যগণের গর্ভভঙ্গ করবার পাপ নিতান্তই বিরল। সেটা আবার আমার অদৃষ্টেই লেখা ছিল।

ঈশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ হল 'পাপ'। বেদজ্ঞ বৈদ্যগণ যে এইরকম পাপ করবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি। যাহা জীবনদান করে তাহা ঔষধ, যাহা প্রাণনাশ করে তাহা বিষ। প্রকারান্তরে আমার স্বামী, সমাজের একজন দণ্ডধারী প্রতিনিধি, আমাকে বিষপান করিয়েছেন। আমার মাতৃত্বের উপরে হস্তক্ষেপ করেছেন। ঔষধ হল অরুন্ধতি! অথচ গৌতম প্রদত্ত ঔষধ (বিষ) পান করে আমার দেহ মন, প্রাণ আত্মা এবং প্রতিটি ভাবকোষ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমি প্রবাহিত হতে চেয়েছিলাম—বন্দী হয়ে গেলাম স্বামীর নিষেধাজ্ঞায়। এই বন্ধন থেকে যদি মুক্তি সম্ভব নয়, তাহলে মৃত্যু তো সম্ভব। গর্ভভঙ্গের শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় আমি শয্যাশায়ী। অন্ন জল স্পর্শ করি না। একটা অস্ফুট ক্রন্দন অবিরাম আমার বুকের ভিতরটা বিদীর্ণ করছে। আমার কন্যাসন্তানের হত্যাকারী গৌতমকে আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি শুধু আমার কন্যাভ্রূণের হত্যাকাবী নয়, আমাব সমস্ত মধুর স্বপ্নের ব্যাধ!

অবশেষে ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হতে হল। বিষাক্ত জড়িবুটিব প্রয়োগে আমাব গর্ভনষ্ট হল সত্যি, কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ণাবযব শিশুতে পরিণত হওয়ায় গর্ভপাত হল না। গর্ভযন্ত্রণা সত্ত্বেও মৃতসন্তান প্রসব হওয়ার কোনও লক্ষণ ছিল না। আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লাম—এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা।

পিতা ব্রহ্মা, ভাই নারদ এবং অন্যান্য মুনি ঋষিগণও উপস্থিত হলেন। গৌতম অবশ্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমাকে এভাবে হারাতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ আমার মৃত্যুর জন্য সারাজীবন তাঁকে গ্লানিভোগ করতে হবে। ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে অশ্বিনীকুমাদের মর্তে আনার জন্য সকলেই মত প্রকাশ করেন। দিতির গর্ভভঙ্গ হওয়ার সময়ে অশ্বিনীকুমারগণই গর্ভস্থ খণ্ডিত ভ্রূণকে জীবনদান করেছিলেন। ফলস্বরূপ, সপ্ত মরুতের জন্ম হয়েছিল। আমার মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়, আমার গর্ভস্থ কন্যাভ্রূণের জীবন রক্ষা হবে এবং একটি কন্যার পরিবর্তে আমি সাতটি কন্যার জননী হব। কিন্তু গৌতম ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি হয়তো আশঙ্কা করছিলেন যে, আমার জীবনরক্ষা করতে গিয়ে মৃত কন্যাভ্রূণটিও জীবন্ত হয়ে যেতে পারে। তাই মর্তলোকের প্রখ্যাত বৈদ্যগণেরসাহায্যে দু'দিন ধরে আমার গর্ভপাতের চেষ্টা চলল। যখন আমার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, তখন সবাই একবকম বাধ্য করেন গৌতমকে ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা করার জন্য, তা সত্ত্বেও গৌতম কুণ্ঠিত। আশ্রমবাসীর জন্য তিনি ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে পারেন, কিন্তু নিজের স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা জানাতে তাঁর অহংকারী স্বামীত্ব অনিচ্ছুক। আমি মনে মনে ইন্দ্রদেবকে প্রার্থনা জানাই।

আমার অস্ফুট প্রার্থনা ভাই নারদ শুনতে পেলেন বোধহয়, তৎক্ষণাৎ তিনি ইন্দ্রদেব সমেত অশ্বিনীকুমারদের নিয়ে গৌতম আশ্রমে পৌঁছালেন।

ইন্দ্রদেব গৌতমের অনুমতির অপেক্ষা করলেন না। আমি শুধু গৌতম পত্নী নয়, ব্রহ্মাপুত্রীও। তাই পিতার অনুমতি নিয়ে আমার গর্ভস্থ ভ্রূণসহ আমার জীবনরক্ষার জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আদেশ দিলেন।

প্রকাশ্যে অবশ্য গৌতম বললেন—"অহল্যার গর্ভস্থ ভ্রূণের জীবন অপেক্ষা অহল্যার জীবন অধিক মূল্যবান। তাই অবস্থার গুরুত্ব বিচার করে, কন্যাভ্রূণের রক্ষার্থে অধিক সময় ব্যয় না করে অহল্যার জীবনরক্ষা করা হোক।" গৌতমের মর্মকথা আর কারও অজানা নয়। তাই ইন্দ্রদেবেরও কিছু অবিদিত নয়। শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আমি জানি অহল্যার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা তুমি, তাই তুমি যার মৃত্যুবিধান করেছ, আমি তার জীবনদান করার কে? সেইজন্যই তোমার মনে আমার কাজের প্রতি বিরোধীতা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু গৌতম, তুমি বেদজ্ঞ হলেও একদেশদর্শী—তাই সবকিছু জেনেও মাঝে মাঝে অজ্ঞানের মতো কাজ করছ। পৃথিবী ঔষধের জন্মদাত্রী হলেও স্বর্গলোক ঔষধের পালক। তাই মর্তমানব হিসাবে তুমি যে ঔষধ প্রয়োগ করেছ, তার বিষম প্রভাব খণ্ডন করার অধিকার দ্যুলোকপতি হিসাবে আমার আছে। তাছাড়া একজনের জীবনরক্ষা করার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এমন কি রাজাও প্রজার জীবনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। তুমি অহল্যার স্বামী হলেও তার জীবন তথা আত্মার অধিকারী তুমি নয়।"

—"তাহলে অহল্যার আত্মার অধিকারী কে?" এক সন্দিগ্ধ স্বগতোক্তিতে গৌতম খর্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে ইন্দ্রদেবকে স্বীকার করে নিলেন।

আমার জীবনরক্ষা হল। কিন্তু আমার কন্যার জীবনরক্ষা হল না। বিষাক্ত ঔষধের প্রভাবে আমার জরায়ুও দুর্বল হয়ে গেছে।

একটি মৃত সন্তান প্রসব হল। আমার জরায়ু সন্তানধারণের ক্ষমতা হারিয়েছে—এই নিষ্ঠুর ঘোষণা করে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ফিরে গেলেন। হ্যাঁ, সেটাই ছিল বোধহয় এক জননী জরায়ুর বিদ্রোহ। যেখানে মানুষের মধ্যে এত বিভেদ, সেখানে জরায়ু বন্ধ্যা হয়ে যাওয়াই বরং শ্রেয়।

মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে আমি দুঃখে অভিমানে ম্রিয়মান হয়ে যাই—কিন্তু মাতৃবক্ষের অমৃতধারা শুকিয়ে যায় না। অমৃতও বিষের মতো কাজ করে যদি তাহা স্বার্থের সীমার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে। অমৃত যদি দেবতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকত তাহলে দেবাসুরের যুদ্ধ হত না, কিংবা যুগযুগান্তরের আর্যদাস বর্ণবিদ্বেষে মানবজাতি অপরিমেয় দুঃখের শিকার হত না।

আমার বক্ষের অমৃত আমার সন্তানের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, তাই মৃৎবৎসা হতে আমার বক্ষামৃত বিষবৎ আমাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করতে থাকে। আমি প্রায়ই জ্বরগ্রস্ত থাকতাম। প্রথা বলে—চিন্তা করো না, ঔষধে বক্ষের অমৃত শুকিয়ে দেওয়া যাবে। আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করি—"গৌতমের প্রেরিত ঔষধ আমার শরীরে বিষবৎ কাজ করছে, তাই অমৃত নিধন ঔষধের কোনও প্রয়োজন নেই। বরং মৃত্যুবরণ করব, অমৃত ঝরণার বিরোধ করব না।"

আমার শরীরে সূতিকা রোগের জীবাণু প্রবেশ করেছিল। প্রিঙ্গ গাছের পাতার ও ছালের ধোঁয়া নিতে হত আমাকে, ওটা আমার শ্বাসরুদ্ধকারী মনে হত। তা সত্ত্বেও রোগ উপশমের কোনও লক্ষণ নেই। প্রকৃতপক্ষে আমি সূতিকাগৃহে একরকম বন্দী অবস্থায় থাকতাম। ঐ ঘরে সূর্যালোক প্রবেশ করত না। ভাই নারদ স্বর্গবৈদ্যদের কাছে জেনে এলেন যে, পর্যাপ্ত সূর্যালোক আমার শরীরে না পড়লে আমি রোগমুক্ত হতে পারব না।

ইচ্ছা থাক বা না থাক গৌতম আপত্তি করতে পারলেন না। প্রত্যূষে আশ্রমের বাইরে গিয়ে পিঙ্গল বর্ণের সূর্যালোকে উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণের অনুমতি আমাকে দেওয়া হল। প্রথা আমার পাহারার কাজ করত। ধীরে ধীরে আমি শক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম। কিন্তু প্রাতঃকালীন পাখির কূজন শোনামাত্রই অমৃতধারায় আমার বক্ষবাস ভিজে যেত, আর আমি মৃতবৎসা বলে নিজেকে ধিক্কার দিতাম।

সেদিন অকস্মাৎ অরণ্যের মধ্যে নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি সেদিকেই দৌড়ালাম। আমরা পিছনে মন্থরগতিতে আসছে প্রথা। একটা অশোকগাছের তলায় নবজাত কন্যাটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার অস্তিত্ব জাহির করে চলেছে। তার ন্যায্যদাবি পূরণের জন্য সে চিরন্তন মনুষ্যস্বরে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে।

শিশুটি কার? ওখানে কিভাবে এল? তার পিতামাতা আর্য না দাস? কেন-ই বা সে পরিত্যক্তা? এইসব কিছু চিন্তা না করে এক স্বর্গীয় আবেগে শিশুটিকে বুকে তুলে নিলাম। শিশিরে ভেজা তার কোমল শরীরটাকে মাতৃত্বের উষ্ণতায় সতেজ করার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ আমি তাকে নিয়ে সূর্যকিরণে দাঁড়ালাম। এইরকম অসহায় শিশুকে কেউ কি মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিতে পারে? অবশ্য মানুষের দ্বারাই মানবশিশু পরিত্যক্ত হয়। সেই মানুষ আবার অজ্ঞানী বা পাষণ্ড নয়, বিশ্বামিত্রের মতো বেদজ্ঞ ঋষিও গর্ভবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করে সিদ্ধিলাভের জন্য তপস্যায় মগ্ন হন। স্বর্গগণিকা সুন্দরী এবং দিব্যজ্ঞানসম্পন্না মেনকাও নবজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করে স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। অবশ্য ঈশ্বর শুধুমাত্র বিশ্বামিত্র বা মেনকা সৃষ্টি করেননি, তিনি কন্বমুনিরও সৃষ্টিকর্তা। এই পৃথিবী শুধুই পাপে পরিপূর্ণ নয়—পুণ্যের সূর্যালোক পাপের মেঘ সরিয়ে পৃথিবীকে অন্ধকারমুক্তও করতে পারে।

আমার কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। দ্বন্দ্বের প্রশ্ন কোথায়? অসহায় শিশুটিকে বক্ষে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করণীয় ছিল না। কখন যেন আমার বক্ষের অমৃতে তার শুষ্ক অধর সিক্ত হয়েছে আমি জানি না। ফুল যখন পাপড়ি মেলে তখন তার কি কোনও দ্বন্দ্ব থাকে? নদী যখন পাহাড় থেকে নেমে আসে তার কি কোনও দ্বন্দ্ব থাকে? অন্ধকার সরিয়ে যখন চন্দ্রোদয় হয় তার কি কোনও দ্বন্দ্ব থাকে? শিশুর প্রতি বাৎসল্য স্নেহ মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগ। তাই আমি যদি সেই পরিত্যক্ত শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বক্ষের অমৃত উজাড় করে দি, সেখানে অস্বাভাবিকতা কোথায়?

শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরা মাত্রই আমরা বুকের শূন্যস্থান ভরে ওঠে। আমার হৃদয়ের

ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। আমার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শান্ত দীপশিখায় পরিণত হয়। আমরা মনে হল আমার মৃত কন্যারত্নটি আমার কোলে ফিরে এসেছে। যদি প্রথার বুদ্ধিতে বক্ষের অমৃত শুকিয়ে ফেলতাম তাহলে আমার এই ক্ষুধাতুরা কন্যার মুখে চোখের জল দেওয়া ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম? ঈশ্বরের এইরকম ইচ্ছা ছিল বলেই আমি প্রসূতি রোগের উপশমের জন্য অরণ্যে এসেছিলাম। মৃতবৎসা হয়েও প্রথার অবাধ্য হয়ে বক্ষের অমৃত সঞ্চয় করেছিলাম।

শিশুটি নিশ্চিন্তে আমার বুকে ঘুমিয়ে আছে, আমি প্রশান্তচিত্তে আশ্রমে ফিরছি। আমার মনে কারও প্রতি, এমনকি গৌতমের প্রতিও কোনও বিদ্বেষ নেই।

প্রথা আমাকে বাধা দেয়, বলে—"কার বাচ্ছা কিছু জানা নেই, আশ্রমে কি করে নিয়ে যাচ্ছ?"

—"এতটুকু জানা গেছে যে মানুষের সন্তান।"

—"হ্যাঁ, মানুষের সন্তান—কিন্তু সম্ভবত অবৈধ—দাস বর্ণের.....। প্রথার হৃদয়হীনতায় আমি ক্ষুণ্ণ হই, কঠোর কণ্ঠে বলি—"জানি, পশুজগতে বৈধ-অবৈধ নেই। মানুষের নিয়তি এমন যে, মানুষের সমাজেই অবৈধ শিশুর জন্ম হয়। এই অরণ্যের পশুপাখি, কীটপতঙ্গ অবাধ জীবন কাটায়, অথচ মানুষের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ'র স্বর্গ-নরক। তাহলে কি মানুষ জন্ম হওয়া পাপ?"

—"বহু পুণ্যের ফলে মানুষ জন্ম হয়, কিন্তু অবৈধ হয়ে জন্ম হওয়া বহু পাপের ফল।" প্রথা বলে।

দুঃখের মধ্যেও আমি পরিহাস করি—"কার পাপের ফল? সন্তানের না পিতা-মাতার? জঞ্জাল আবর্জনার ওপর বৃক্ষ জন্মালে ঐ বৃক্ষের ফুল অপবিত্র বা ফল বিষাক্ত হয় কি? তাই এই নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি সমাজ এইরকম নিদয় কেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রথা বলে—"আমাকে তুমি নির্দয় ও হৃদয়হীনা ভাবছ, কিন্তু আমি কি আমার নিজের ইচ্ছায় কথা বলি?" আমি সমাজের নির্দেশ পালন করি। মানুষের সম্পর্ককে সংযত করার জন্য বিভিন্ন নীতি নিয়ম ও বিবাহরূপী সামাজিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয। সেই নিয়ম সঠিকভাবে পালিত না হওয়ায় মানুষের সম্পর্ক পুনরায় অবৈধ ঘোষিত হয়। অবৈধ সম্পর্কের ফল বৈধ হবে কি করে?"

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলি—কোনও শিশু যদি নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের ফল হয়ে থাকে তাহলে তাকে বৈধ করার একমাত্র উপায় হল—যদি কোনও দম্পতি তাকে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে। শকুন্তলাকে যদি কন্বমুনি গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আমি এই পরিত্যক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে পারব না কেন?"

—"কন্বমুনি ছিলেন তপোবনের আচার্য, তুমি আচার্যের পত্নী। গৌতমের সম্মতি ব্যতীত এই শিশুটিকে তুমি সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। এর জন্য তোমাকে গৌতমের অনুমতি নিতে হবে।"

—"আমার তিন পুত্রের জন্মের সময় আমি কি গৌতমের অনুমতি নিয়েছিলাম? পাহাড়ের ললাটে মৌসুমীবায়ু যখন মেঘের বিভূতি এঁকে দেয় তখন কি সে আকাশের অনুমতি নেয়? কন্যারত্নটি উপহার দিয়ে আমি গৌতমের পিতৃত্বকে সার্থক করতে চাই সেখানে গৌতমের অনুমতি কেন নেব? আমার এই কাজে কি গৌতম অসন্তুষ্ট হবেন?"

—"তুমি তো জান গৌতম কন্যাবান হতে ইচ্ছুক নয়।" প্রথা আমার ক্ষতস্থানে আঘাত করে। আমি ম্লান হয়ে যাই। যে মহর্ষি নিজের কন্যাভ্রূণের বিরোধীতা করেন এই অজ্ঞাতকুলশীলা অবাঞ্ছিতা শিশুকন্যাটিকে তিনি পিতৃত্বের স্নিগ্ধ ছায়ায় সুরক্ষা দেবেন বলে বিশ্বাস হয় না। তবুও মনে ক্ষীণ আশা জাগে—অন্তত অপরের কাছে মহান এবং উদার হওয়ার জন্য এই অসহায় শিশুটিকে গৌতম কন্যার অধিকার দেবেন।

এইরকম এক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সেই একমুঠো ফুল বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হই। বৃদ্ধা হলেও প্রথার গতি অত্যন্ত দ্রুত।

এই সংবাদ সর্বাগ্রে গৌতমকে জানাবার জন্য আমাকে পিছনে ফেলে প্রথা এগিয়ে যায়। নচেৎ গৌতম তাকে দোষারোপ করবেন যে, প্রথার মতো একজন বয়োজ্যেষ্ঠা থাকতেও আমি কি করে এইরকম নিষিদ্ধ কাজ করলাম!

গৌতমসহ অন্যান্য ঋষিগণ আশ্রমের দ্বার অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। গৌতমের ক্রুর দৃষ্টিতে আমার অন্তর কেঁপে ওঠে। আমার বুঝতে দেরি হয় না যে, গৌতম আর যাই হোক না কেন অপরের কাছে মহান হওয়ার জন্য তিনি শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের বিরোধীতা করবেন না। তিনি অভিনেতা নয়, রুক্ষ হলেও তিনি স্পষ্টবাদী এবং নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

শিশুকন্যাটিকে গৌতমের পায়ের নিচে রেখে আমি হাতজোড় করে সবিনয়ে বললাম—"স্বামী! এই অসহায়া শিশুটিকে আশ্রয় দিন। ওকে পেয়ে আমি কন্যা শোক ভুলেছি, মনে হয় আমার জন্য সে যেন ঈশ্বর প্রেরিত। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে আমার কোলে স্থান দেব। সারারাত শিশিরে ভিজে তার শরীর বরফ হয়ে গেছে, দ্রুত আগুন জ্বেলে তাকে সুস্থ করতে হবে। বিলম্ব হলে কন্যাবধে দোষী হতে হবে।"

আমি কি জানতাম কন্যাবধ গর্হিত কাজ নয় বলে। সমাজ যদি কন্যার বিরোধী তাহলে কন্যাবধ করা সমাজের উপকার বলে ধরে নিতে হবে। তাই সমাজমঙ্গলের কাজ কখনও গর্হিত হতে পারে না।

অবিচল কণ্ঠে গৌতম বলেন—"আমি জানি, তুমি আমার বিরোধীতা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই এই অজ্ঞাতকুলশীলা শিশুকন্যাকে তুলে এনেছ। তোমার এখনও ধারণা যে, তোমার গর্ভস্থ শিশুকন্যার হত্যাকারী আমি। একথা সত্য যে, আমি কন্যাবান হতে চাইনি, কিন্তু কোনও ঔষুধ প্রয়োগ করে তোমার গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করিনি। স্বাস্থবর্ধক ঔষুধ দুভার্গ্যবশত বিষাক্ত হওয়ার ফলে এইরূপ ঘটনা ঘটেছে। তুমি কিন্তু জেদ ধরে আছ যে এই কন্যাটিকে আশ্রমে রাখবে ও আমার তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করবে। কন্যার জন্য পিতামাতার কত দুশ্চিন্তা সে-তো তুমি জান। এর মধ্যে আমি আর কি তপস্যা করব? অকপট চিত্তে আমি

বলি—"এই সদ্যোজাত শিশুটিকে যখন আমি মাটি থেকে তুলে আনলাম, তখন আমার মনে বাৎসল্য স্নেহ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই পরিত্যক্ত শিশুটিকে যখন আমি অমৃত পান করাই তখন আমার হৃদয় থেকে পবিত্র করুণাই অনায়াসে ঝরেছিল। যখন এই শিশুটিকে আশ্রমে স্থান দেব বলে স্থির করলাম তখন অসহায় শিশুটির সুরক্ষার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও ভাবনা ছিল না আমার মনে, তখন শিশুরূপে স্বয়ং ঈশ্বর আমার সম্মুখে বিদ্যমান ছিলেন। তাই আমার এই সিদ্ধান্ত বিধিনির্দেশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আপনাকে দগ্ধ করার জন্য এ আমার কোনও হীনপ্রয়াস নয়, দয়া করে শিশুটিকে গ্রহণ করে আমার মাতৃহৃদয়ের স্বপ্ন সার্থক করুন।"

আমার আকুল প্রার্থনা গৌতমের নীতির তীক্ষ্ণ আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল। কঠোর কণ্ঠে তিনি নির্দেশ দিলেন—"অযথা বাক্যব্যয় করো না অহল্যা, তোমাকে আশ্রমের বাইরে যেতে দেওয়ার ফল যে এইরকম কিছু হবে সেটা আমি আশঙ্কা করেছিলাম। এই আশ্রম এক উচ্চশ্রেণীর গুরুকুল আশ্রম, এটা কোনও শরণার্থী শিবির নয়। নবজাত শিশু, তদুপরি কন্যাশিশুর স্থান গুরুকুল আশ্রমে নেই। তোমাব যদি এত দয়া, তাহলে তাকে শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দাও। আর্য-অনার্য সংঘর্ষের পরিণতিস্বরূপ বহু শিশু আজ অনাথ, বহুমানুষ গৃহহীন। যারা আর্যদের শরণাপন্ন হয়েছে, তারা ক্রীতদাস হিসাবে নিজেদের অন্নসংস্থান করতে পেরেছে। যারা রুগ্ন, অলস, বৃদ্ধ এবং শিশু অর্থাৎ যারা কঠিন পরিশ্রমের যোগ্য নয় তাদের জন্য কিছু শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। আর্যরাজা এবং ধনীব্যক্তিগণ তাদের জন্য অন্নসত্র খুলেছেন। ধনীগোষ্ঠীর পুণ্য অর্জনের জন্য এই শরণার্থী শিবিরগুলি বেশ সহায়ক হয়েছে। তুমি কারও হাতে শিশুটিকে আশ্রমের সীমায় থাকা শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে আশ্রমে এসো—এটাই আমার শেষ কথা।"

আমার বুকের মধ্যে থাকা শিশুটি এইরকম নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে কেঁপে ওঠে, কিংবা এই কম্পন আমার হৃদয়েরই, জানার ধৈর্য আমার ছিল না। গৌতমের সাথে তর্ক করারও ইচ্ছা নেই। কি লাভ? গৌতম তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না—একথা মৃত্যুর মতো সত্য। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশুটিকে আমি কি সেই জঘন্য শরণার্থী শিবিরে পাঠাতে পারব?

শরণার্থী শিবির—স্বার্থপর মানুষের অহংকার এবং ক্রুরতার বিভৎস চিত্রশালা। নিজের দেশে একজন শরণার্থী—অপরজন শরণদাতা। একজন ভিখারি আর একজন অন্নদাতা। শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা আমার আছে। গাছের যেমন শাখা থাকে, সেইরকম আর্য-অনার্য পল্লীর পাশাপাশি শরণার্থী শিবির দেখতে পাওয়া যায়। মানুষে মানুষে সংঘর্ষের ফলেই এর উৎপত্তি। গৃহহীন অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আত্মীয়স্বজনবিহীন অনাথ শিশু, আর্য অনার্যদের পাশবিকতার শিকার হওয়া নারীদের নিয়ে শরণার্থী শিবির মানবিকতার নির্মম পরাজয়ের ধ্বজা ওড়ায়। শরণার্থী শিবিরেও মানুষের ওপর অত্যাচারের সীমা নেই। ধনীগোষ্ঠীর দান যৎসামান্য। ক্ষুধা, দুঃখ এবং ক্ষোভের তাড়নায় মানুষ নিজের ওপরই প্রতিশোধ নেয়। আভ্যন্তরীণ বিবাদ লেগেই থাকে। তাছাড়া অরণ্যপথে যাতায়াতকারী বণিক,

পর্যটক এবং ধনী পথচারীরা নিজেদের বিভৎস কামনা পূরণের জন্য শরণার্থী শিবিরের নারীদের নিয়োজিত করেন। বালক বালিকাদের ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পদসেবা করাতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। ধীরে ধীরে শরণার্থী শিবিরের বালক বালিকারা উগ্র নির্দয় স্বভাবের হয়ে যায় এবং সাধারণ জীবন যাপনে অক্ষম হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তারাই রাক্ষস, রাক্ষসী দস্যু হিসাবে পরিচিত হয়।

ঋচার অতীত আমি স্মরণ করতে চাই না। তাই সেকথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। আজ হঠাৎ সেকথা মনে পড়ে যায়। ঋচাকে আমি শরণার্থী শিবির থেকে এনেছিলাম—তখন সে সাত বছরের নিষ্পাপ বালিকা। জানি না ঋচা সেই জঘন্য অনুভূতি থেকে মুক্তি পেয়েছে কিনা—কিন্তু আমি নিজে সেই থেকে মুক্ত হইনি। সেদিনের দৃশ্য আজও আমার সমস্ত কোমল ভাবনাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ে। ভাই নারদের সাথে আমি সেদিন অরণ্যে ভ্রমণ করছি। আমার বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। হঠাৎ শিশুকণ্ঠের করুণ আর্তনাদে সমগ্র বনভূমি কেঁপে ওঠে। আমার হাত ধরে ভাই নারদ সেইদিকে ছুটে গেলেন। সেখানে যা দেখলাম তাতে আমি হতবাক্ হযে গেলাম। ভাই নারদের মতো শান্ত, সৌম্য ব্রহ্মচারীও রাগে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। আমার তখন বোধগম্য হয়নি সাতবছরের বালিকার নগ্নশরীর কবলিত করে সেই চারজন পাষণ্ড কি প্রকার বর্বর ক্রীড়ায় রত যে শিশুটির করুণ চিৎকার পৃথিবী বিদীর্ণ করছে। অট্টহাস্য সহকারে সেই বর্বরগুলির শিশুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য আজও দুঃস্বপ্নের মতো আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে। ভাই নারদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেই পাষণ্ডগুলি শক্তিহীন হয়ে যায়। তখন সেই ঘৃণ্য ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও ঋচাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে বৃদ্ধা প্রথা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। দেখলাম তার কোটরগত চক্ষু থেকে অশ্রুর পরিবর্তে রক্তধারা বইছে। আমার কোল থেকে অশ্রুর পরিবর্তে রক্তধারা বইছে। আমার কোল থেকে প্রথা ঋচাকে নেয়। তারপর তাকে আমার রম্যবনের আশ্রমে নিয়ে এলাম। তাকে সুস্থ করলাম। প্রথা এবং ভাই নারদ বললেন তাকে শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। রম্যবনের নিকটবর্তী শরণার্থী শিবির থেকে ঋচাকে অপরহণ করা হয়েছিল। বহুদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম ঐ পাষণ্ডেরা নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য ঋচার সাথে বলাৎকার করছিল। আমরা ঠিক সময়ে না পৌছালে ঋচার শুধুমাত্র সর্বনাশ নয়, মৃত্যুও হতে পারত। আমি জেদ ধরলাম ঋচাকে নিজের কাছে রাখার জন্য, কিন্তু আমার জেদের বিরোধীতা করছিলেন পিতা, ভাই নারদ, প্রথা এবং অন্যান্য আগন্তুক মুনি ঋষিগণ। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম এবং ঋচা আমার প্রিয় সহচরী হয়ে গিয়েছিল।

ঋচার সেই অভিশপ্ত অতীতের কথা আমি কখনও কারও সাথে আলোচনা করিনি, এমনকি ঋচার সাথেও। ঋচা নিজের অতীত ভুলে গেছে বলে আমার ধারণা। যে অতীত ভবিষ্যতকে শাপগ্রস্ত করে সেই অতীতকে ভুলে যাওয়া উচিত। আজ এই শিশুকন্যাটিকে শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্মম আদেশে আর একবার ঋচার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর

অতীত করাল রূপ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। দানবের বিশাল লোমশ হাত যেন অগিয়ে আসছে আমাব দিকে এবং এই শিশুকন্যাটিসহ আমার অমৃতময় মাতৃত্বকেও যেন বিধ্বস্ত করে দেবে চোখের নিমেষে। আমি নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরি আমার স্বপ্নের পুত্তলিটিকে। আমার চোখের জলে তার অবৈধ কালিমাকে ধুয়ে দিতে আমি বদ্ধপরিকর। আমার প্রতিজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আজ আমি কুমারী কন্যা অহল্যা নয়, আমি গৌতমপত্নী অহল্যা। আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপদে ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। পিতার কাছে যে ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল, স্বামীর কাছে সেটা হবে না বলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ কার কোমল স্পর্শে আমার বুকের ব্যথা উপশম হয় কোন স্বর্গীয় মহৌষধে আমার বুকের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। বিড়ম্বিত দ্বন্দ্বকে আমার বুক থেকে কে অপসারণ করল?

শিশুকন্যাটি ঋচার বুকে মাতৃত্বের উষ্ণতা খুঁজছে। ঋচার পবিত্র অশ্রুজলে শিশুকন্যাটির দেহ থেকে অবৈধ কালিমা ধুয়ে যাচ্ছে। বিনা দ্বিধায় আমার বুক থেকে শিশুটিকে তুলে নিয়ে আপন করে নিয়েছে ঋচা। রুদ্রাক্ষের উদার মহত্ত্বে পিতৃত্বের অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ। ইতিমধ্যে ঋচা দুটি শিশুকন্যার জননী হয়েছে, তৃতীয় কন্যা হিসাবে সে স্বীকার করে নিয়েছে আমাব এই স্বপ্নের কন্যাটিকে। শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা শুনেই ঋচা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছুটে এসেছে কন্যাটিকে সেই বিভৎস শিবির থেকে উদ্ধার করার জন্য। তার মানে ঋচা তাব বালিকা বয়সের সেই ঘৃণ্য অনুভূতি বিস্মৃত হয়নি। শিশুর মতো সরল এই বাল্যস্মৃতি। সুখের হোক কিংবা দুঃখের; সে চিরকাল আঁকড়ে থাকে মনকে। মা দেবী হোক বা দানবী শিশু, কিন্তু মাকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক সেইভাবে বাল্যস্মৃতি জড়িয়ে থাকে সমগ্র জীবনকে। গাছপালাকে বেড়া দিয়ে বন্দী করলে সে কি বন্দী হয়? শরীর থাকে বন্ধনের মধ্যে, মনের ফুল ফল আত্মার সুরভি মুক্ত বাতাসে উড়ে বেড়ায় যেখানে খুশী। বাগানের মালিক ভাবে গাছ তার। গাছের দেহ না হয় উদ্যানে তার মাথা আকাশে। ফুল ফল না হয় তার কিন্তু সুগন্ধ সারা পৃথিবীর।

আশ্রমের মধ্যে আমাকে প্রায় বন্দী করে রেখেছেন গৌতম। দাসপল্লীতে যাওয়া নিষেধ। এমনকি অরণ্যে ভ্রমণের অনুমতিও দেওয়া হয় না। স্বাধীনতা পাওয়া মাত্রই আমি কোনও না কোনও কাণ্ড ঘটিয়ে গৌতমের তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করছি।

আমিও আমার তিন ছেলের ঝামেলায় ব্যস্ত। আশ্রমের বাইরে যাওয়ার সময় ছিল না, তাছাড়া গৌতমের বিরোধীতা করার ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু স্নেহ শুভেচ্ছা সবকিছুই উজাড় করে দিয়েছিলাম অরণ্যের কোণে কোণে। ঋচা এবং রুদ্রাক্ষ ইত্যাদির কাছে ছিল আমার প্রাণ, কর্তব্যরত দেহ বন্দী হয়েছিল গৌতমের আশ্রমে। তাদের সংবাদ আমি পেতাম। গৌতমের ভয়ে সেই শিশুকন্যার নামকরণ উৎসবে আমি যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু আমার ইচ্ছানুসারেই তার নাম রাখা হয় গৌতমী। গৌতমকে প্রশংসা করার জন্য এ-নাম রাখিনি এই নাম আমার বহুদিনের আকাঙ্খিত। আমাদের তিন পুত্রের নামকরণ করেছিলেন গৌতম। তাই আমি চেয়েছিলাম, আমার মেয়ের নাম রাখব আমার পছন্দ অনুযায়ী। তাছাড়া আমি মনে

মনে চেয়েছিলাম, আমার মেয়ে আমার মতো সুন্দরী না-ই হোক, কিন্তু গৌতমের মতো জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমতী হোক। যদি সুন্দরী হওয়ার সাথে জ্ঞানী হয়, তাহলে অত্যন্ত আনন্দের কথা। শারীরিকভাবে সুন্দর কিংবা অসুন্দর হয়ে মানুষ জন্মায়, কিন্তু জ্ঞান আহরণ করে একজন জ্ঞানী হয়। অবশ্য বুদ্ধি নিয়েই শিশু জন্ম হয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি দিব্যজ্ঞান লাভ না করে, সে বুদ্ধির মূল্য কি? গৌতমের নামানুসারে মেয়ের নাম গৌতমী দিলে অন্তত গৌতমের জ্ঞান সংযম এবং সাধনার প্রভাব মেয়ের ওপর পড়বে। তাই আমি বহুদিন থেকেই স্থির করেছিলাম মেয়ের নাম "গৌতমী" রাখব।

মেয়ের নামাকরণ উৎসবের পূর্বে প্রথার মাধ্যমে ঋচা যখন আমার পরামর্শ চায়, তখন আমি তাকে আমার মনের কথা জানালাম। আমার মনে হয় যে, আমার কন্যা আমার গর্ভ থেকে অপসৃত হয়ে অরণ্যে জীবন পেয়েছে। আমার ভাবপ্রবণতাকে সম্মান জানিয়ে ঋচা মেয়ের নাম রেখেছে "গৌতমী"। কিন্তু গৌতম অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। এক অবাঞ্ছিতা কন্যার নাম তাঁর নামানুসারে হওয়াটা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানসূচক বলে তিনি মাধুর্য তথা অন্যান্য ঋষিদের কাছে বলেন। গৌতম জানতেন না যে, আমার পরমার্শেই ঋচা এই নাম রেখেছে। তাই তাঁর ধারণা, তাঁকে অপমান করার জন্য ঋচা রুদ্রাক্ষ তথা অন্যান্য দাসগণের এই হীন চক্রান্ত। গৌতমের এই অযথা সন্দেহকে অন্য ঋষিরাও সমর্থন জানান। গৌতমের সন্দেহকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করে ঋষিগণ এর বিরোধীতা করার সিদ্ধান্ত নেন। দাসকন্যা হেতু ঋচার মেয়ে রাক্ষসী হিসাবে পরিচিতা হবে, তাই তার নামও রাক্ষসীসুলভ হওয়ার কথা। যেমন—ভুকুণ্ডা, প্রলয়া, বিকটা, ভূকম্পা, নির্দয়া, রীক্ষা, প্রচণ্ডা, হিংস্রা, চড়কা ইত্যাদি তাদের এইরকম নামকরণ আর্যরাই করেন। ভয় উদ্রেককারী নামে তাদের চিহ্নিত করে অযথা ভীত হয়। আমি যখন 'ঋচা' নাম রাখি, তখন ভাই নাবদ সহ অন্যান্য ঋষিগণ পরামর্শ দিয়েছিলেন "রুক্ষা" নাম রাখার জন্য। তখন আমি বেদের ঋচার সাথে পরিচিত ছিলাম, "রুক্ষা"র অর্থ আমি জানতাম না—কিন্তু 'রুক্ষা' শব্দটি আমার শ্রুতিমধুর লাগেনি। ভাই নারদ যতবার আমাকে 'রুক্ষা' উচ্চারণ করতে বলেন, আমি বারম্বার ঋচাই উচ্চারণ করি। শেষে ঋচা নামই থাকল। পরে আমি যখন 'রুক্ষা' শব্দের অর্থ বুঝলাম, তখন মনে হল ঐ নামটা ঋচার কোমল ব্যক্তিত্বের সাথে আদৌ সামঞ্জস্য হত না। সেই 'ঋচা'র কন্যা "গৌতমী" নামে পরিচিতা হওয়াটা গৌতম তথা অন্য ঋষিদের কি করে ভালো লাগবে? গৌতম তথা অন্যান্য ঋষিগণ এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। একথা জানামাত্রই আমি গৌতমের কাছে সত্যপ্রকাশ করে বলি—"অকারণে ক্রুদ্ধ হবেন না। শিশুকন্যাটি অশোকগাছের তলায় আবিষ্কৃত হওয়ার তার নাম 'অশোকা' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঋচা এবং রুদ্রাক্ষ, কিন্তু আমার অনুরোধেই তার শিশুটির নাম গৌতমী রেখেছে। আমার মৃতা কন্যাকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, সেই বৃক্ষের ছায়ায় শিশুটি পড়ে থাকায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই কন্যাটি আমার গর্ভস্থ সন্তান। তার মৃত্যু হয়নি, পুনর্জীবন লাভ করে সে আমার কাছে ফিরে এসেছিল। আমার কন্যার নাম আমি

'গৌতমী' রাখব স্থির করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম আমার কন্যা আমার মতো না হয়ে আপনার মতো জ্ঞানগর্ভ বিচারশীল এবং যশস্বী হোক।" এইকথা বলার সময়ে আমার মাতৃহৃদয় কি এক অব্যক্ত বেদনায় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল, আমাব চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। ভেবেছিলাম আমার মুখে একথা শুনে গৌতম খুশী হবেন। আমার গর্ভস্থ সন্তান আমার মতো না হয়ে তাঁর মতো হোক এই প্রার্থনা আমার অন্তরের বলে জানার পরে তিনি বুঝতে পারবেন যে, আমি তার ব্যক্তিত্বকে পূজা করি। এতে যে কোনও স্বামীরই সন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাকে হতচকিত করে গৌতম অগ্নির মতো জ্বলে উঠে রুক্ষকণ্ঠে বললেন—"যেদিন থেকে তুমি পুত্রদায়ী ঔষধ সেবন না করে আমার অজ্ঞাতে ফেলে দিয়েছ, সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার বিরোধীতা করায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমার আরও ধারণা হয়েছে যে, তুমি আমার অজ্ঞাতে এমন কিছু করবে যাতে আমার অভিমান আহত হবে। ঋচা রুদ্রাক্ষকে পরামর্শ দেওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

আমি কি করে বোঝাব যে, গৌতমকে আহত করার জন্য নয়, আমার আহত মাতৃত্বকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমি এই নামকরণ করেছিলাম। গৌতমকে কোনোভাবেই বোঝানো যাবে না। আমার সাথে কেন এমন হয়? আমার সকল সিদ্ধান্ত গৌতমকে ক্ষুব্ধ করে কেন? তাহলে কি আমার কোনও সিদ্ধান্ত ঠিক নয়? গৌতমের সাথে বয়সেব পার্থক্যহেতু আমাদের উভয়ের বোঝাপড়া এবং বিচারের তারতম্য ঘটছে? হতে পারে—কিন্তু এখন আর কি করা যাবে? সম্ভবত জ্ঞান এবং বয়সে অর্বাচীন মনে করে আমার সকল সিদ্ধান্তকেই হেয়জ্ঞান করেন। সম্ভবত গত কিছুদিন যাবৎ তিনি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে আছেন। আমিও কম ক্ষুব্ধ নয়। আমার এরকম বন্দী করে রাখার ফলে আমার মধ্যে 'বিদ্রোহ' যে অঙ্কুর থেকে মহাদ্রুমে পরিণত হতে যাচ্ছে তখন আমি ও জানতাম না! গৌতম বা কি করে জানবেন!

বড়ছেলে শতানন্দ ছিল তার বাবার মতো বুদ্ধিমান। তার চেহারাও ছিল গৌতমের মতো সাধারণ। সে রূপবান বলে কেউ বলত না। কিন্তু আমার চোখে আমার শতানন্দ অত্যন্ত সুন্দর। ছোটছেলে শরৎভানু ছিল আমার মতো সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। সে বুদ্ধিহীন ছিল না কিন্তু অতিরিক্ত চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় মন ছিল না। মেজ ছেলে চিরকারী ছিল অত্যন্ত শান্ত, ধীর। আকৃতিতে সে ছিল কৃশ এবং বুদ্ধিতে মন্থর। সবকাজ সে করত, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে তার অনেকসময় লাগত। আমার কাছে সবাই সমান। কিন্তু আমার অজান্তে চিরকারীর জন্য আমার হৃদয়ে ছিল অধিক কোমলতা। সব মায়েরই দুর্বল ছেলেটির জন্য বেশি চিন্তা। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। গৌতম সম্ভবতঃ শতানন্দকে বেশি ভালবাসতেন। সেই তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে বলে তিনি গর্বের সাথে ঘোষণা করতেন। প্রকৃতপক্ষে শতানন্দ বিদ্যাবুদ্ধিতে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিল, তার জন্য আমার মনেও কম গর্ব ছিল না। কিন্তু সেজন্য শরৎভানুর অমনোযোগিতা বা চিরকারীর অপারগতার জন্য আমি তাদের পদে পদে ভর্ৎসনা করতাম না গৌতমের মতো। পিতা হিসাবে গৌতম চাইতেন তিনটি পুত্র বেদজ্ঞ এবং যশস্বী হোক। গুরুকুল আশ্রমের ছাত্রদের

মধ্যে অগ্রণী হোক। তাই তাদের লেখাপড়ায় মনযোগী হওয়ার জন্য এবং অধিক পরিশ্রম করার জন্য সর্বদা ভর্ৎসনা করতেন। তিনি ভাবতেন এর ফলে তারা লেখাপড়ায় অধিক গুরুত্ব দেবে—কিন্তু ফল বিপরীত। চিরকারীর ওপর গৌতমের কটূভর্ৎসনার প্রভাব বিশেষ ছিল না। কারণ সব কিছু সে দেরিতে বুঝত। যখন সে বুঝতে পারত তখন গৌতম বা অন্য কেউ সেখানে থাকত না। কিন্তু শরৎভানুর ওপর গৌতমের বাৎসল্য স্নেহের তারতম্য ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বুদ্ধিমান ও ভাবপ্রবণ হওয়ায় গৌতমের ভর্ৎসনায় মনে আঘাত পেত এবং তার অন্তরে ক্রোধ ও হীনমন্যতা সৃষ্টি হচ্ছিল।

চিরকারী আমার সর্বদা ধীর, আত্মমগ্ন, শান্ত ছেলে। পিতার অনুচিত তুলনায় সে অন্তরে কষ্ট পায় নিশ্চয় কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ পায় না। যেন সে শুধু ধীর নয় বধিরও। শতানন্দ, পিতার বাধ্যপুত্র। শরৎভানু পিতার অবাধ্য হতে ভালবাসে। পুত্রস্নেহে পিতার পক্ষপাতিত্বের প্রতিশোধ সে এইভাবেই নেয়। কিন্তু আমি কখনও শরৎভানুর সুন্দর চেহারার সাথে শতানন্দ ও চিরকারীর সাধারণ চেহারার তুলনা কবি না। গৌতম এত বুদ্ধিমান, বিচারশীল হয়েও এইরকম অনুচিত তুলনা করেন কেন? শরৎভানুর সুন্দর চেহাবার প্রতি তার ঈর্ষা হয়—না কি আমার সাথে শবৎভানুর অধিক সামঞ্জস্য থাকায় তিনি সহ্য কবতে পাবেন না? চিরকারী পিতার অবাধ্য নয়—কিন্তু অন্ধের মতো পিতার কথায আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ছেলে সে নয়। সে পিতার আদেশ পালন করে—কিন্তু পিতার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তার অনেকসময় লাগে। শতানন্দের কৃতিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তায় উৎফুল্ল হয়ে গৌতম ছেলেদের সামনে বলেন—দেখ, আনন্দ কিরকম প্রশংসাভাজন হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে আমার যোগ্য ছেলে। ভানু তার মায়ের ছেলে, শুধু রূপই আছে। লেখাপড়ায় মন নেই। আরে. রূপ তো ঈশ্ববেব দান, তাতে তোমার কি বাহাদুরি? রূপ নিয়ে কি করবে? গুণ ও ব্যক্তিত্ব তোমার অধীন। তাকে বিকশিত না করলে এই সংসারে তোমার কি মূল্য?

চিরকারী না মায়ের রূপ পেয়েছে না বাবার বিদ্যাবুদ্ধি। ভাগ্যদোষে এইরকম ছেলে জন্ম হয়। অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময়ে অহল্যা নিশ্চয়ই নিয়মিত খাদ্য ও ওষুধ সেবন করেনি—তা না হলে এইরকম রুগ্ন শিশু জন্ম নিত কেন?

আমি আঘাত পাই—আমার জন্য নয়, আমার ছেলেদের জন্য। আমি লক্ষ্য করেছি, বাবার কথা শুনে শরৎভানু রাগে অপমানে লাল হয়ে যায়, আব চিরকারী দুঃখে ম্লান হয়ে যায়। শতানন্দ খুব ভালো ছেলে—পিতার প্রশংসায় উৎফুল্ল হয় না। তার আনন্দ সে ভাইদের কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করে।

আমি অনেকবার গৌতমকে বলেছি এইরকম তুলনা না করার জন্য। এর ফলে তাদের মনে অসুস্থ ভাবনা জাগবে, সেটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। বুদ্ধিমান, রূপবান, রুগ্ন যাই হোক না কেন সকলেই আমাদের সন্তান। আমাদের কাছে সবাই সমান। এইরকম তুলনা করলে ভাইদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। সব ভাই একরকম সংসারে কোথাও দেখা যায়?

গৌতম আমার উপদেশ গ্রহণ করেন না। কারণ জ্ঞান এবং বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ আমি

নিকৃষ্ট। তিনি বলেন—"ঠিক আছে, তুমি তোমার দুই ছেলের চিন্তা করো; কিন্তু শতানন্দ আমার ছেলে, সে আমার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। তুমি তোমার বিচার তার ওপর চাপিয়ে দেবে না।"

পুত্র যোগ্য হলে বাবার, আর অযোগ্যপুত্র মায়ের। এটা কি সংসারের নীতি? সংসারের নীতি যাই হোক, মাতৃত্বের নীতিতে সন্তানের প্রতি পক্ষপাত বাছবিচার থাকেনা। মাঝে মাঝে চিরকারীর জন্য মনে দুঃখ হয়। সবসময় চিরকারী কোনও না কোনও রোগে ভুগছে—জ্বর, সর্দি-কাশি, বদহজম তার নিত্যসঙ্গী। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তার নেই। সেজন্য কি গৌতম দায়ি নয়? কতই বা ছিল, আমার বয়স? তিন বছরে তিনটি সন্তান জন্ম করার পরিণতি তাঁকে তো ভোগ করতে হচ্ছে না। ভুগছি আমি এবং আমার চিরকারী। চিরকারী গর্ভে থাকার সময়ে আমি পরপর দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে দুর্বল রক্তহীনা হয়ে গেছিলাম মায়ের রক্তাল্পতার জন্য চিরকারী রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে জন্মেছে। এখন শত চেষ্টায়ও তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে না। মাঝে মাঝে আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। কিন্তু আমি কি প্রতিরোধ করিনি? আমার প্রতিরোধের কি মূল্য? পুরুষের কামনা ও প্রভুত্বের অহংকারকে কি স্ত্রী প্রতিরোধ করতে পারে? পুত্রদায়ী ওষুধ প্রত্যাখ্যান করে যদি আমি কন্যাসন্তান ধারণ না করতাম এবং গর্ভভঙ্গের ফলে আমার জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত না হত তাহলে নিয়ম অনুযায়ী এগারোটি সন্তান হওয়ার পরই গৌতম ব্রহ্মচর্য পালন করতেন—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। না হলে প্রতিবছর রুগ্ন শিশু জন্ম করে আমি আমার সন্তানদের প্রতি অবিচার করতাম।

উপযুক্ত বয়সে তিন পুত্রের উপনয়ন হল। বর্তমানে তারা ব্রহ্মচারী। নিয়ম অনুযায়ী তারা আশ্রমের অন্য ছাত্রদের সাথে ছাত্রাবাসে থাকে। কিন্তু শতানন্দকে গৌতম বশিষ্ঠের আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পিতার আশ্রমে থাকলে গুরুভক্তি নম্রতা ইত্যাদি মানবিক গুণের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে, আমার বাৎসল্য স্নেহ তার ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমের সুনাম আছে। সবদিক বিচার করেই গৌতম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার এতে কোনও আপত্তি নেই। ছুটির সময়ে সে এখানে আসবে। তার বয়সী ছেলেদের গুরুকুলে থাকাটা নতুন নয়। কিন্তু চিরকারী ও শরৎভানুর শিক্ষা সম্পর্কে গৌতম উদাসীন। অন্য কোনও উন্নত গুরুকুলে পাঠালেও তাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হবে না—এই কথা বলে নিজের আশ্রমে নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদের রেখেছেন গৌতম। আমার এতেও কোনও আপত্তি ছিল না। গুরু হিসাবে অভিজ্ঞ গৌতম জানেন কোন ছাত্রকে কিভাবে তৈরি করতে হবে। কিন্তু এর ফলে শরৎভানু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। চিরকারী তো সর্বদাই আত্মমগ্ন, তার কোনও প্রতিক্রিয়া জানতে পারি না। তার দুর্বল শরীরের জন্য আমিও তাকে দূরে পাঠাতে চাই না। কিন্তু শরৎভানুকে শতানন্দের সাথে বশিষ্ঠের আশ্রম পাঠালে কি ক্ষতি হত?

শরৎভানুর বুদ্ধি খারাপ নয়—সে একটু চঞ্চল এবং সঙ্গীতের প্রতি তার আগ্রহ জন্মগত। সবসময় মৌমাছির মতো গুন্‌গুন্ করে। বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলে সে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকত। চমৎকার সামগান করত। কত চপল চঞ্চল বালক গুরুকুল আশ্রমে উপযুক্ত শিক্ষা

লাভ করে সুনাম অর্জন করেছে। আমার ভানু কি সেরকম হত না? কিন্তু গৌতম আমার কথা শুনলেন না। শরৎভানু-শতানন্দের সঙ্গে থাকলে তার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে বলে গৌতমের ভয় হয়। আমার মনে দুঃখ হয়—শরৎভানু যা হতে পারত, গৌতমের কঠোর শাসন ও পক্ষপাতের মধ্যে থেকে সে তা হতে পারবে না—এই কথা ভেবে আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। গৌতম গৃহের কর্তা এবং আমাদের সকলের ভাগ্যবিধাতা। আমাদের ভবিষ্যৎ বিধাতার হাতে নয়, গৌতমের হাতে।

শতানন্দ বশিষ্ঠ আশ্রমে চলে যাওয়ার পর বহুদিন তার জন্য আমার মন খারাপ হল। সবসময় তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ও প্রশান্ত মুখ আমার চোখেব সামনে ভেসে উঠত। তার পছন্দের কোনও খাবার আমি ঘরে রান্না করতে পারতাম না। তার প্রিয় ফুলমূলও আমি খেতে পারি না। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রথা বলে—"তুমি কি ভাবছ আম, জাম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি ফল অন্য কোনও অরণ্যে পাওয়া যায় না? বশিষ্ঠের আশ্রমে কি দুধ, মধু, ছানা, দৈ-এর অভাব? এখানকার চেয়ে শতানন্দ ওখানে ভালো আছে। বশিষ্ঠের আশ্রমের মতো গৌতমের আশ্রমে খাওয়া দাওয়ার এত প্রাচুর্য কোথায়? ঘরে রান্না বন্ধ করে দিয়ে গৌতম ও অন্যান্য সন্তানদের প্রতি তুমি অন্যায় করছ।"

ধীরে ধীরে আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠি। শতানন্দর অনুপস্থিতি ভোলার জন্য শরৎভানু ও চিরকারীর ওপর অধিক নজর দিই। ভাবলাম চিরকারীর শরীর ও শরৎভানুর লেখাপড়া আমি নিজে দেখাশোনা করব।

কিন্তু গৌতম তাও করতে দিলেন না। গৌতমের আশ্রমে থাকলেও আমার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের প্রতি গৌতমের কঠোর নির্দেশ। ব্রহ্মচারী জীবনে মাতৃস্নেহের প্রতি দুর্বলতার স্থান নেই। তাই তারা কাছে থাকলেও দূরে থাকার সাথে সমান। অন্যান সহপাঠীদের সাথে তারা আশ্রমের খাদ্য খায়। আশ্রমে ছুটির সময়ে অন্য ছাত্ররা যখন গৃহে যায়, তখন তারা আমার কাছে আসে। শতানন্দও সেইসময় আমার কাছে আসে। সেটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়। ছেলেদের আদর আবদার হাসি কলরোলে আমার নির্জন মনোভূমি মুখরিত হয়ে উঠত। সেই কয়েকটা দিন আমি নিজের স্বতন্ত্র সত্তার কথা ভুলে যেতাম। ছেলেরা আশ্রমে ফিরে গেলে আমি বিষাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে হতাম। রাত্রে ঘুম হত না খাদ্যে আগ্রহ নেই, শরীর অবসন্ন। অমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে যেতাম। আমার দুঃখ বিষাদ ভাগ করে নেওয়ার কেউ ছিল না। গৌতম আমার জীবনসঙ্গী হতে পারেননি, তিনি হলেন আমার প্রভু ভাগ্যবিধাতা। ঋচার আশ্রমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন গৌতম। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেত গৌতমের স্বামীত্বের কারাগারে। ইচ্ছা করে এই কারাগার ভেঙ্গে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাব এই স্বার্থপর পতিপত্নীর বন্ধন থেকে। মুক্ত বিহঙ্গীর মতো উড়ে বেড়াব অরণ্য থেকে অরণ্যে। শতানন্দর অদর্শন, শরৎভানুর নীরব প্রতিবাদ চিরকারীর কুণ্ঠিত ব্যাথাকে স্মরণ করে আর তিলে তিলে মরব না। তাদের ভাগ্যের রশি যখন আমার হাতে নেই, সেজন্য নিজেকে দায়ি করে মাতৃত্বকে ধিক্কার দিয়ে মন ও শরীরকে রোগগ্রস্ত করে মনুষ্য জন্মকে অবমাননা করব কেন?

কিন্তু বিবাহের বন্ধন লোহার চেয়ে শক্ত পাথরের চেয়ে কঠিন। সাগরের থেকেও গভীর। তার থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। অর্থাৎ বন্ধনকে জীবন ভেবে বাঁচতে হবে। বিবাহ নারীর পক্ষে যদি পাহাড়ের মতো ভারি হয়, তাহলে সেই পাহাড়কে মাথায় নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে। তাতেই নারীজন্মের সার্থকতা ও সুনাম আছে।

বিবাহিতা নারী দুঃখ কষ্টে আত্মহত্যা করলেও তার মুক্তি নেই। সমবেদনা অপেক্ষা সমালোচনাই অধিক হয়। ব্যক্তি সুখের চেয়ে সমাজের নিয়ম বেশি বলবান। ব্যক্তির জন্য সমাজকে রুগ্ন করা যেতে পারে না। সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যক্তি বরং রুগ্ন হয়ে বাঁচা কাম্য। ত্রিলোকে এমন আকাশ কোথায় আছে যা মেঘরুদ্ধ হয়নি? স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবীতে এমন দাম্পত্য কার আছে যা কখনও রাগরুদ্ধ হয়নি? নেবলা আকাশ কখনও আর্দ্র হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় না কোথাও না কোথাও একটুকরো মুক্ত আকাশ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে হাসে—সূর্য চন্দ্রকে প্রকট করে। দাম্পত্য শত বিরাগরঞ্জিত হলেও অনুরাগরঞ্জিত একটুকরো মন সংগোপনে যুগ্মজীবনকে জ্যোৎস্নার স্বর্ণাভ এবং উষার অরুণ আভায় মণ্ডিত করে। তার ফলেই সমগ্র জীবন স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে যায়। আমাদের দাম্পত্যও নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে প্রবাহিত হচ্ছিল। ক্রমশ আমি নিজেকে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করে বিষাদমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। গৌতমপত্নী হিসাবে আমার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। সেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে আমি দিইনি। সকলের ভাগ্যে সব সুখ থাকে না। আমি নিজেকে বোঝাই—যতটুকু পেয়েছি, ততটুকু নিয়ে বাঁচতে না শিখলে জীবন্ত দগ্ধ হওয়াই সার হবে।

আচার্য গৌতম বিশ্বে আর্যমর্যাদা স্থাপন করার জন্য বদ্ধ পরিকর। "আর্যাবর্ত্ত" নামকরণের প্রতিবাদ করে আর্যেতর গোষ্ঠীর যুবকেরা আন্দোলন শুরু করেছে। আর্যঋষিগণ রাজনীতিতেও দক্ষ। তাই আর্যেতর আন্দোলনকে অসিদ্ধ ঘোষণা করে তারা বললেন—"আর্য জাতিবাচক নয়, গুণবাচক। জিতেন্দ্রিয়, কর্মঠ, বিনয়ী, মানুষ হল আর্য। সবাই আর্য হতে পারবে। আর্য হওয়ার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান করছি।" এইসব শুধু কথার কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে আর্য এবং আর্যোত্তর জাতি বিশেষভাবে গণ্য হত।

পরাজিত আর্যেতর লোকেদের আর্যগণ দাসদাসী হিসাবে কৃষিক্ষেত্রে তথা গৃহকর্মে নিযুক্ত করতেন। তাদের অত্যন্ত হীনচোখে দেখতেন। সমাজে তাদের স্থান ছিল নিম্নে।

সেদিনটা ছিল গৌতমের পক্ষে একটা পরীক্ষার দিন। শান্ত সৌম্য একটি বালক আশ্রমে এসে পৌঁছেছে। বহুদূর থেকে পদব্রজে এসেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বালকটির সৌম্য রূপের সাথে নামটিও বেশ আকর্ষণীয়—'সত্যকাম'।

আচার্য গৌতমের খ্যাতি শুনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য সে এসেছিল। শিষ্যগ্রহণ করায় আচার্য গৌতম অত্যন্ত রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করতেন। ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার জন্য তিনি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবালকদের শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন। সাধারণত পিতা নিজের সন্তানকে নিয়ে আশ্রমে আসেন। তারপর গৌতম তার জাত, গোত্র, বংশ পরম্পরা ইত্যাদি অনুসন্ধান করে সন্তুষ্ট হওয়ার পরই তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। সত্যকাম একা আসায় গৌতমের

মনে সন্দেহ জাগে। অনেকসময় পিতৃহীন বালককে অভিভাবকেরা সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু সত্যকাম এসেছিল একা। তাহলে কি সত্যকাম অজ্ঞাতকুলশীল! আচার্য গৌতমের অভিজ্ঞমনের অনুমান ছিল সত্য। সত্যকাম তার বাবার নাম গোত্র জানে না, সে তার বাবাকে দেখেও নি। সত্যকামের মা দাসী জাবালা তাকে লালন পালন করেছে। জাবালাই সত্যকামকে আচার্য গৌতমের কাছে পাঠিয়েছে।

আচার্য গৌতম নির্দয়ভাবে সত্যকামকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—"যাও মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো তোমার পিতা কে? তিনি কোন বর্ণের, তাঁর কি গোত্র ইত্যাদি.....। তারপর তোমার কথা বিচার করা যাবে।"

এইরকম নিষ্ঠুর কথায় সত্যকামের আশাবাদী মুখটা মলিন হয়ে যায়। আমার বুকটা ফেটে যায়। মনে হল যেন আমার গর্ভজাত সন্তানকে কেউ অপমান করে জ্ঞানমন্দিরের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আমি সত্যকামকে কোলে টেনে নিলাম। বুকে জড়িয়ে ধরলাম, তার চোখ ছলছল করে। আমার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজে সে বলে—'মা, আমি কি আচার্যকে গুরুরূপে পাব না? আমার মা-তো বলেন আচার্যের শিষ্য হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা আমার আছে। দাসী হলেও আমার মা বিদ্যানুরাগিনী। তাঁর কাছ থেকে আমি বেদ সম্পর্কে শুনেছি। যেহেতু আমার মা দাসী, তাই সর্বসমক্ষে বেদ উচ্চারণ করতে পারেন না। কিন্তু নিভৃতে তিনি আমার সম্মুখে শুদ্ধ উচ্চারণসহ সামগান করেন। মালিকের বাড়িতে কাজ করার সময় তাঁর কান সবসময় বেদাভিমুখী হয়ে থাকে। তার স্মবণশক্তি প্রখর। চারটি বেদ তাঁর কণ্ঠস্থ। আমাব মা আমার প্রথম গুরু। আমি কিংবা আমার মা এমন কোনও কাজ করিনি, যার জন্য আচার্য আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।

সত্যকামের বয়স দশবছর হয়ে গেছে। তার মা তার শিক্ষা আরম্ভ করে দিয়েছে। তাই তার মুখে এইরকম জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হইনি। আমি অবশ্য আশ্রমের নিয়ম শৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ করতাম না। সেটা আমার অধিকারে ছিল না। মাঝে মাঝে আমি গৌতম আশ্রমের রক্ষণশীল নীতির সংশোধন করতে চাইতাম, কিন্তু আমাকে কেউ সমর্থন করত না। সেইসময়ে আশ্রম থেকে আশ্রমে আমার নিন্দা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, আমার আচরণ আর্যনারীসুলভ নয়। মাঝে মাঝে যে ছোটবড় বিদ্রোহ এবং দাসদের দ্বারা যজ্ঞভঙ্গ ঘটছিল, তার জন্য প্রকারান্তরে গৌতম আমাকেই দায়ি করতেন। দাসবংশজদের নাম পরিবর্তন করে স্বস্তিক, স্বাহা ইত্যাদি নাম আমি রেখেছিলাম। বেদ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন তাদের ন্যায্য অধিকার বলে তাদের সচেতন করাচ্ছিলাম। সেইজন্যই দাসগণ অধিক উগ্র ও সংগঠিত হয়েছে বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছিল। তাই সরাসরি প্রতিবাদ করে দাসদের স্বপক্ষে কিছু বলার সাহস করতে পারছিলাম না। কিছু বললেও আচার্য গৌতম যে আমার মতামতকে সম্মান দেবেন, সে বিশ্বাস আমার ছিল না।

আজ কিন্তু সত্যকামের স্বপক্ষে আশ্রমের অধ্যক্ষ আমার স্বামী গৌতমকে কিছু বলব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু প্রথমে সত্যকামের উচিত আচার্যের আজ্ঞাপালন করা, গুরু আজ্ঞা

পালন করা শিষ্যের প্রধান কর্তব্য। আমি সত্যকামকে খেতে দিলাম। অনেক বোঝাবার পর সে খেল। অবশ্য সেইজন্য আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল যে, জাবালার কাছ থেকে নিজের পিতার নাম, পরিচয় জেনে আসার পর আচার্য গৌতম তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। এই নিরপরাধ জ্ঞানলিপ্সু বালকটিকে কোন সাহসে আমি এতবড় প্রতিশ্রুতি দিলাম—আমি জানি না। আমার অন্তরের কোনও অদৃশ্য শক্তি আমাকে এই প্রেরণা দিয়েছে' বলে আমি অনুভব করলাম।

আমার কথায় ভরসা করে সত্যকাম তার পিতার পরিচয় জানার জন্য ফিরে গেল।

আমি সত্যকামের ফিরে আসার পথ চেয়ে আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, গৌতম তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তার জ্ঞান ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে সত্যকাম গৌতমকে চমৎকৃত করেছিল। গৌতমের চোখে আশীর্বাদ ও প্রশংসার ঝলক আমি দেখেছিলাম। আমি জানতাম গৌতমের কাছে শিষ্যের পরিচয় শুধুমাত্র শিষ্য। পিতৃপরিচয় না থাকলেও একজন উত্তম শিষ্য হতে পারে। কিন্তু একটা শঙ্কা হচ্ছিল আমার মনে—সত্যকাম যদি দাসবংশজ হয় তাহলে গৌতম তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করবে না। অবশ্য সত্যকাম গৌরবর্ণ, তার উন্নত নাসিকা। কিন্তু যদি সে বর্ণসংকর হয়, তাহলে আচার্যের শিষ্য হওয়া তার ভাগ্যে নেই। এই বর্ণসংকর শিশুদের প্রতি আর্যসমাজের যতটা বিরূপতা, সেই শব্দটির প্রতি আমার ততটাই বিরোধীতা। আর্য-দাস মিলনে যে শিশু জন্ম নেয় তারা ঘৃণার পাত্র কেন? কৃষ্ণবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণের মিলনে যে শিশু জন্মগ্রহণ করবে তাকে কেবলমাত্র একটি বর্ণেই চিহ্নিত করা হবে, তা হল মানুষবর্ণ।

ভাই নারদকে আমি জাবালা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে অনুরোধ করলাম। দু'দিন পর ভাই নারদ আমাকে যে সংবাদ দিলেন, তাতে আমার সব উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল। সত্যাকমকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যে আমি রাখতে পারব না একথা স্পষ্ট হয়ে গেল। জাবালা একজন দাসী। বিভিন্ন মালিকের বাড়িতে কাজ করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। অতীতে জাবালা সুন্দরী ছিল। মালিকেরা নিজেরদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে ব্যবহার করত। একজন দাসীর মান মর্যাদা বা মতামতের ওপর কে গুরুত্ব দেয় যে, সে তার প্রতিবাদ করবে? দাসীর অর্থ হল মালিকের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। এটা তো নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে, তাই জাবালার কোনও উপায় ছিল না। আর্য মালিকদের কামনার যজ্ঞে স্বাহা হয়ে গিয়েছিল জাবালার যৌবন। সেই অসহায় সমর্পণের পরিনাম হল সত্যকাম।

কি বিচিত্র এই সৃষ্টি রহস্য! আবর্জনা থেকে রসগ্রহণ করে বনস্পতি ভরে ওঠে সবুজ সুষমায়। ফুলের সুগন্ধে ভরে যায় পৃথিবী। আবর্জনার দুর্গন্ধের ঘ্রাণ নেয় না পৃথিবী। ফুলের মুকুট পরে যখন বনভূমিতে সুগন্ধ ছড়ায় তখন আবর্জনা থেকে যায় কোন অতল গহ্বরে। জননীর জরায়ু ঠিক সেইরকম। পাষণ্ড বর্বরের বলাৎকাব জনিত কলুষ অমৃতময়ী জননীর গর্ভ থেকে দেবশিশু রূপে নেমে আসে ধরণীতে। অথচ সেই পবিত্র শিশু সমাজের চোখে ঘৃণ্য।

দাসী জাবালার গর্ভে যখন অমৃত শিশুটি জন্ম নিল, বলাৎকারের ঘৃণিত কালিমা মাতৃত্বের অমৃতধারায় ধুয়ে যায়। জাবালা শিশুটির নাম রাখে 'সত্যকাম'। সত্য-কামের নামই তার ভবিষ্যৎ প্রকট করেছে সর্বসমক্ষে।

বালকপুত্র সত্যকামকে জাবালা কি উত্তর দেবে? বলতে পারবে কি জীবনের সেই অবাঞ্ছিত, ঘৃণিত সত্য? বলতে পারবে কি নিজের অতীতের কালিমাময় কাহিনী!

হ্যাঁ, বলতে পারে জাবালা, নিজের জীবনের বিষ, অমৃত উজাড় করে দিতে পারে সর্বসমক্ষে—একমাত্র সত্যকাম ছাড়া। ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত নিজের অতীতের কালিমা পুত্রের সামনে তুলে ধরতে পারে না কোনও জননী। জননীও রক্তমাংসে গড়া মানুষ—তারও পদস্খলন স্বাভাবিক। একথা কে না জানে। কিন্তু সন্তানের সামনে জননীর আলোকিত দিকটি প্রকাশিত হয়ে থাকে। অন্ধকার দিকটি বিশ্বের দিকে রেখে সন্তানের দিকে আলোক বিচ্ছুরণ করা সব জননীর কাম্য। যেদিন তার অন্ধকার দিকটিতে সন্তান পা রাখে সেদিন সন্তান অন্ধ হয়ে যায় এবং জননীর হয় মৃত্যু।

আমি ভেবেছিলাম, জাবালা সত্যকামের কাছে তার জীবনের সত্য প্রকাশ করতে পারবে না। জাবালার জায়গায় আমি হলেও সেই কুৎসিৎ সত্য প্রকাশ করতে পারতাম না।

নিজের পিতৃপরিচয় সত্যকামের না জানাই ভালো। আবার পিতৃপরিচয় ছাড়া সত্যকাম আশ্রমে স্থানে পাবে না। তার সমস্ত যোগ্যতা বিফল হয়ে যাবে এই একটি প্রশ্নে। সত্যকামের মাতৃপরিচয় যথেষ্ঠ নয়। যে জননী সত্যকামকে জন্ম দিল, সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখল। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গৌতমের মতো কঠোর জ্ঞানগর্ভ গুরুকে সন্তুষ্ট করতে শেখালে সেই মানুষটির পরিচয় কিছু নয়। কারণ সে নারী। উপরন্তু একজন দাসী। নারী হওয়া যদি জাবালার অপবাধ, তাহলে সেজন্য দায়ি বিধাতা। জাবালা যদি দাসী এবং 'সেবা' যদি পাপ, তাহলে সেই পাপের পুরোধা হল সমাজ—অর্থাৎ পুরুষ। অথচ বিধাতা পুরুষকে কেউ দোষ দেয় না। আজ সব অপরাধ জাবালার।

যদি জাবালা সত্য প্রকাশ করে তাহলে সত্যকাম 'বর্ণসংকর' হিসাবে গণ্য হবে। অতএব গৌতমের আশ্রমে তার স্থান হবে না।

যদি সত্যকাম ফিরে না আসে তাহলে আমি কি করব অথবা সে যদি নিজের জন্মরহস্য জেনে ফিরে আসে তাহলে আমার কি করা উচিত—আমি আকাশ-পাতাল ভাবছি। যে কোনও পরিস্থিতিতে সত্যকামকে গৌতমের শিষ্য হিসাবে দেখতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এক সপ্তাহের মধ্যে সত্যকামের ফিরে আসার কথা। কিন্তু সে এল না, আশ্রমে উপনয়নের সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি অত্যন্ত চিন্তায় আছি। সেদিন আচার্যকে প্রসন্ন দেখে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম—"সত্যাকমের কোনও খবর এসেছে? তার তো ইতিমধ্যে ফিরে আসার কথা, কিন্তু এল না কেন?" শান্তকণ্ঠে গৌতম বললেন—"সত্যকাম না আসতে পারে। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে সে আর কোন মুখে আমার কাছে আসবে?"

—"আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?" —উদ্বেগ চেপে আমি প্রশ্ন করি —দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌতম বলেন—"জাবালা একজন দাসী। সাধারণত একজন দাসীর জীবনে যা ঘটে, তার জীবনেও তাই ঘটে থাকবে। সত্যকামের পিতৃ পরিচয় জাবালার জানা নেই। যদিও জানা থাকে তাহলে সত্যকাম অবৈধ এবং বর্ণসংকর হবে। তাই সত্যকাম আর আশ্রমে নাও আসতে পারে। আশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সব কিছু জেনে সে গেছে।"

আমি প্রশ্ন করি—"অবৈধ কে? যে বিধিভঙ্গ করে না যে বিধিভঙ্গের পরিণতি ভোগ করে? সত্যকাম তো বিধিভঙ্গ করেনি, করেছে এই সমাজ—যে সৃষ্টি করেছে মানুষের মধ্যে আর্য এবং দাসের প্রাচীর। যে দাসীকে রক্ষিতা করে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে সে অবৈধ। যদি আপনার সন্দেহ সত্য হয় তাহলেও নারী পুরুষের মিলনবিধি রক্ষা করে সত্যকাম পৃথিবীতে এসেছে, সে অবৈধ হবে কেন? তাছাড়া বর্ণসংকরের সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষ তাহলে বর্ণসংকরও মনুষ্য সন্তান। মানুষের সমস্ত অধিকার তার প্রাপ্য। তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অবৈধ নয় কি?"

আমরা যুক্তিতে গৌতম মোটেই খুশী হননি। তীর্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"সমাজে যেটা চলে আসছে, সেটা বদল করাই কি তোমার লক্ষ্য? সব ব্যাপারে কেন মাথা গলাও। নিজের সন্তান এবং আশ্রমের ছাত্রদের সঠিক পথ দেখাও। সারা পৃথিবীর অবৈধ বর্ণসংকর শিশুদের তুমি মানুষের অধিকার দিতে পারবে না। সে ক্ষমতা তোমাকে কে দিয়েছে?"

বিরক্ত হলে কথা না বাড়িয়ে অন্যত্র চলে যাওয়াই উচিত মনে করেন গৌতম। বিশেষত আমার সাথে যুক্তি তর্ক করতে তাঁর ভালো লাগে না। কারণ যুক্তিতর্ক নারীসুলভ নয়, হোক পাছে সেটা ন্যায় সঙ্গত।

গৌতম তাঁর কাজে চলে গেলেন। আমি নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লাম। আমার বিবেক আমাকে যা নির্দেশ দেয় আমি তা পালন করতে অক্ষম। কারণ আমি এই আশ্রমের কর্ত্রী নয়, কর্তার আজ্ঞাকারী পত্নী। আমি চিৎকার করলেও আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ নিজ নিজ নীতিনিয়ম থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হবে না। আমার বুকফাটা-ই সার হবে।

আমার চিন্তার অবসান করে সেদিন সকালে সত্যকাম এসে উপস্থিত হয়। তাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে। তাহলে কি সে তার জন্মবৃতান্ত জানে না, অথবা ভাই নারদ ভুল তথ্য দিয়েছেন জাবালা সম্পর্কে।

আমাকে প্রণাম করতেই আমি সত্যকামকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার হাত থেকে অর্ঘথালা নিচে পড়ে গেছে। অর্ঘথালার চেয়ে পবিত্র মনে হল সত্যকাম। আমার হৃদয়ের সন্তাপ প্রশমিত হল।

সত্যকামের কপালে চুমু দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এত দেরি হল কেন বাবা? আমি ভাবলাম কোনও অসুবিধার জন্য তুই আসিসনি। মা ভালো আছেন তো?"

যেন আলো ছড়িয়ে পড়ল সত্যকামের উত্তরে দ্বিধা, সংশয় বা সঙ্কোচ নেই। সে বলে—

মা অসুস্থ ছিলেন, দাসী হওয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অসুস্থতাকে খাতির করে না। আমি বলি—অধিক পরিশ্রম করে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ছ। তিনি বলেন—"পরিশ্রম মানুষকে সুস্থ ও নীরোগ রাখে।" সেবাই আমার মহৌষধি। সেবায় যে সাত্ত্বিক আনন্দ পাওয়া যায় তা আর অন্য কোনও কিছুতে পাওয়া যায় না। মা'র দেখাশোনা করলাম। তার সাথে মালিকদের বাড়িতে কাজ করে তার পরিশ্রম লাঘব করা আমার কর্তব্য ভেবে থেকে গেলাম। মা সুস্থ হতে এলাম।"

কিন্তু এখানে উপনয়নের অনুষ্ঠান শেষ হতে আর মাত্র দুদিন আছে। সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করিসনি?

—"করেছি। কিন্তু আমার প্রথম কর্তব্য হল অসুস্থ মায়ের সেবা করা। এবছর উপনয়নের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আগামী বছর আবার আসব, কিন্তু আসব নিশ্চয়। আচার্য গৌতমের কাছে শিক্ষালাভ করা আমার জীবনের লক্ষ্য"—আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে সত্যকাম।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি—"মায়ের কাছে থেকে তোর বাবার পরিচয় জেনে এসেছিস?" নিজে প্রশ্ন করেও উত্তরের আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছে। আমার প্রশ্নে সত্যকাম অপমানিত বোধ করবে না তো? কিন্তু যতই অপ্রিয় হোক না কেন আশ্রমে সবাইয়ের সামনে সত্যকামকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

কোনওরকম বিচলিত না হয়ে সহজভাবে সত্যকাম বলে—'হ্যাঁ মা, আমি আমার মায়ের কাছে আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। এতদিন পর্যন্ত আমি মাকে ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ আমার জীবনে আমার বাবার কোনও ভূমিকা ছিল না। সবকিছুতেই আমার মায়ের রূপই প্রস্ফুটিত। আমি যার কাছে অবাঞ্ছিত, আমার জন্য যে অপরিহার্য নয়, তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ আমি খুঁজে পাই না। কিন্তু আচার্যের আশ্রমে নিয়মকানুন থেকে জানতে পারলাম সন্তানের ক্ষেত্রে মা যত মহিমাময়ী হোক না কেন সমাজের জন্য মা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করে আমি আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি।

সত্যকামের স্পষ্ট উত্তর আমাকে অবাক করে। দশ বছরের বালকের মুখ থেকে সমাজ সম্পর্কে গম্ভীর মন্তব্য শুনে মনে হল এ কথা সরল শিশু সত্যাকমের নয়—এই স্বর জাবালার। মায়ের কাছে যা শুনেছে সত্যকাম নিঃসঙ্কোচে তাই বলেছে। "তোর পিতা কে?" —একথা জিজ্ঞাসা করতে আমার কণ্ঠরোধে হয়। এই প্রশ্নের উত্তর সত্যকাম গৌতমকে দেবে—আশ্রমের সকলের উপস্থিতিতে। আমি এইরকম প্রশ্ন পুনর্বার কেন তাকে জিজ্ঞাসা করব? শিশুর নিজের মুখ থেকে তার বিড়ম্বিত জন্ম ইতিহাস শুনতে আমার মন চাইছে না। পূর্বাহ্ণে সভামণ্ডপে আচার্যগণ উপস্থিত হলেন। বহু বিশিষ্ঠ ধনী আর্যও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সত্যকামের পিতৃপরিচয় জানার জন্য সকলেই উৎসুক। উদার প্রকৃতিও ধ্যানস্থ হয়ে সত্যকামের সত্যঘোষণার জন্য কান পেতে আছে।

আচার্য গৌতম প্রশ্ন করলেন—"বৎস, আমি জানি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাও নি,

পেলে তুমি তোমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে, তোমার বাবা যখন আসেননি, তাহলে তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে তোমার বাবা সম্পর্কে কিছু জানতে পারনি। আমার অনুমান কি সত্য?"

—"সত্য আবার সত্য নয়ও" —বালক বলে।

—"তার মানে?"

—মা আমার পিতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিলেন কিন্তু পিতার নাম বলতে পারলেন না—বালক উত্তর দেয়।

—অর্থাৎ?

মাথা তুলে সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে সগর্বে সত্যকাম বলে—"আমার বাবা একজন আর্য মহাত্মা। কিন্তু তাঁর নাম আমার মা জানে না। আমার মা আমাকে বললেন যে—দাসী হওয়ার দরুন বহু আর্য প্রভুর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন এবং তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী 'সেবা' করেছেন। সেই সময় তিনি গর্ভধারণ করেন এবং আমাকে লাভ করেন। তাই ঐ মাহাত্মদের মধ্যে কে আমার পিতা তিনি বলতে পারবেন না।

উপস্থিত ঋষি ছাত্র এবং ঋষিপত্নীদেরমধ্যে মৃদুহাসির গুঞ্জন ওঠে। অপরের গোপন কথা সবাইকে আমোদিত করে। আশ্রমবাসীও এর থেকে মুক্ত নয়।

"তবুও তুমি আশা করছ যে এই আশ্রমে তোমার ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা আছে?" —কে একজন কর্কশস্বরে প্রশ্ন করে।

নম্রভাবে সত্যকাম বলে—"আমি কিংবা আমার মা কখনও মিথ্যাচারণ করিনি, আমার যোগ্যতা আছে কিনা তার বিচারক আপনারা।"

—"তুমি কি ব্রাহ্মণপুত্র যে এতবড় আশা করে এসেছে? তোমার মা একজন অভিজ্ঞা মহিলা, সমাজের নীতিনিয়ম তাঁর জানা। তিনি কি করে তোমাকে আশ্রমে পাঠালেন? তাঁর জানা উচিত ছিল যে তুমি পিতৃপরিচয়হীন দাসী পুত্র। এখানে সমস্ত ছাত্র ব্রাহ্মণপুত্র।" —আর একজন ঋষি নিষ্ঠুরবাণী শোনালেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত গৌতম গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিলেন। ঋষিদের এইরকম কটূক্তিতে আমি মর্মাহত হলাম। সেইসময় আমি কিছু বলব বলে ভাবছি, হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে জাবালা সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

জাবালাকে দেখে সত্যকাম বলে—"মা, তুমি কেন এলে? আমি তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম। আসলে আমাকে পাঠিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারনি। এই দুর্বল শরীরে এতটা রাস্তা কি করে হেঁটে এলে?"

পুত্রের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে জাবালা বলে—জানিস সত্য, তোকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আমার আর কিছুতেই মন লাগল না। মহর্ষির এতবড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তুই দিতে পারবি বলে আমার বিশ্বাস হল না। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়ে অল্পবয়সে তুই অনেক অভিজ্ঞ হয়েছিস। কিন্তু যত হলেও তোর তো বয়স কম।"

এইটুকু বলে জাবালা উপস্থিত সবাইকে নমস্কার জানায়। যৌবনকালে জাবালা যে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দারিদ্র, পরিশ্রম, ছেলের জন্য চিন্তা ও নিজের অসুস্থতার জন্য জাবালাকে ক্ষীণ দেখালেও তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ মলিন হয়নি। নিভে আসা হোমের শিখার মতো পবিত্র ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাকে। কয়েকজন ঋষি ও নিমন্ত্রিত ধনী আর্য জাবালাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। অনেকে প্রশ্ন করে—"জাবালা তুমি এখানে?"

জাবালা নম্রভাবে সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ, মহাপ্রভু! আমি সেই জাবালা দাসী। যৌবনকালে আপনাদের গৃহে কিছুকাল সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার ঠিক মনে নেই কার বাড়িতে কত দিন দাসী ছিলাম, কিন্তু একথা সত্যি যে সেটাই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, কারণ সেই সময়ে আমি সত্যকামকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। আমার নারীজন্ম সার্থক হয়েছিল। সত্যকাম তার পিতৃপরিচয় জানে না। কারণ আমিও জানি না তার পিতা কে। তবে সত্যকাম যে আপনাদেরই কারও সন্তান সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সত্যকামের পিতৃপরিচয় না পেলে যদি আচার্য গৌতম তাকে ফিরিয়ে দেন, সেই আশঙ্কায় অসুস্থতা স্বত্ত্বেও আমি না এসে থাকতে পারলাম না। আমার অনুরোধ, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ দিব্য দৃষ্টিতে জানতে পারেন যে সত্যকামের শরীরে কার রক্ত বইছে তাহলে দয়া করে তাকে স্বীকৃতি দিন। তাহলে দরিদ্র দাসীপুত্রটি গুরুকুল আশ্রমে স্থান পেতে পারে। এটা আমরা তথা আমার ছেলের জীবনের লক্ষ্য। শুধু এই কারণে তাকে আচার্যের শিষ্যত্বে থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

জাবালার সরল স্বীকারোক্তিতে আমার হৃদয় করুণায় ভরে ওঠে। আমার মাতৃহৃদয় জাবালর হৃদয়টা পরিষ্কার দেখতে পায়। পুত্রস্নেহে জাবালা পাগলিনি হয়ে গেছে এবং লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে নিজের জীবনের কলঙ্কিত কাহিনী নির্লজ্জের মতো সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছে—কয়েকজন ঋষিরপত্নীর এইরকম মন্তব্য আমি শুনতে পেলাম।

কে একজন বলল—"জাবালা তো সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা নয়, যে তার লজ্জাবোধ থাকবে সে তো নীচ জাতির দাসী, পতিতা। তার আবার মান অপমান কি? নিন্দা, অপবাদ তার দেহের ময়লা। তাকে খারাপ লাগবে কেন?"

আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না, উচ্চকণ্ঠে বললাম—"ভদ্রে! জাবালা লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করেছেন সত্যি, কিন্তু সে জন্য সে পতিতা নয়। যে আর্যসমাজ তাকে লাঞ্ছিত করেছে সেই সমাজের নিন্দিত হওয়ার কথা। জাবালাকে পতিতা বলে নারীজাতির অমর্যাদা করবেন না। জাবালা নিজের ইচ্ছায় নিজের পতন ঘটায়নি, তার পতন ঘটিয়েছে এই সমাজ। তাই কে পতিত? পতনের কর্তা না ভোক্তা?"

উপস্থিত আর্যরমণীগণ আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলেন। কারণ তাদের স্বামীরাই যৌবনকালে জাবালার প্রভু ছিলেন।

আমি দেখলাম জাবালার স্পষ্টোক্তিতে সংকোচ অনুভব করার পরিবর্তে ধনী আর্যগণ ক্রোধে কেঁপে উঠছেন। কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্দেশ্যে বা ধনী আর্যদের অপমান করার জন্য

জাবালা তাঁর জীবনের নিষিদ্ধ দ্বার আজ উন্মুক্ত করেনি, সে সত্য স্বীকার করেছ পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। প্রয়োজন হলে ছেলের জন্য জাবালা বাঘের মুখেও ঝাঁপ দিতে পারে। এতে জাবালাকে দোষ দেওয়ার কোনও কারণ নেই।

আমি গৌতমের ন্যায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। গৌতম সম্ভবত নারীমহলের মৃদুগুঞ্জন শুনতে পেয়েছিলেন। শুনতে পেয়েছিলেন আমার প্রতিবাদ এবং জাবালার প্রতি সমর্থনের স্বর। উপস্থিত আর্যগণ গৌতমকে শুনিয়ে বলতে থাকেন যে, পিতৃপরিচয়হীন বালক গৌতম আশ্রমে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়।

উপাধ্যক্ষ ঋষি মুদ্গল বললেন—"জাবালা! সন্তনের পিতৃপরিচয় কেবলমাত্র জননীই সঠিকভাবে দিতে পারে। পিতা কোনও দিনই বলতে পারবে না যে তিনি তার জনক। তুমি নিজে যখন জান না তোমার সন্তানের পিতা কে, তাহলে তুমি কিভাবে আশা করছ যে এখানে উপস্থিত কয়েকজন বিশিষ্ঠ আর্য নাগরিক তোমার সন্তানের পিতৃপরিচয় দিতে পারবে বলে। তুমি অনার্য বা পনি মালিকের বাড়িতেও দাসী থাকতে পার। সত্যকামের পিতা একজন দাসও হতে পারে, তাই সর্বশেষ কথা হল সত্যকাম দাসীপুত্র, তাই.....।"

উপাধ্যক্ষের বক্রোক্তিতে জাবালা নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে। আকুলস্বরে সে বলে—মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যাকে-তাকে আমার সন্তানের পিতা হিসাবে চিহ্নিত করে ছেলেকে আশ্রমে স্থান পাইয়ে দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি সত্য ছাড়া মিথ্যা জানি না। আমরা স্পষ্ট মনে আছে যে সময়ে আমি গর্ভধারণ করি সেইসময় যে সমস্ত মালিকদের কাছে কাজ করতাম তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছে। গর্ভোদয়ের পরে আবশ্য আমি বহু মালিকের ঘরে দাসী হিসাবে কাজ করেছি। কিন্তু অনার্য বা পনিদের বাড়িতে কখনও কাজ করিনি। তারা নিজের বাড়ির এবং চাষের কাজ নিজেরাই করে। তারা স্ত্রী জাতিকে সম্মান করে। বলাৎকার দাস সমাজে চলে না।"

এক যুবক ঋষি উত্তপ্ত কণ্ঠে বলেন—"দাস ও অসুরগণ আর্যনারীদের ওপর কিরকম অত্যাচার করেন তা সকলেরই জানা। অযথা বড়াই করছ কেন? নিজের সীমার মধ্যে থেকে কথা বলতে শেখনি? অতএব তোমার ছেলেকে কি রকম শিক্ষা দিয়েছ জানা গেছে।

হাতজোড় করে বিনয় সহকারে জাবালা বলে—"মহাপ্রভু আর্যদাস সংঘর্ষের সময় প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অসুরেরা ঐ ধরনের কাজ করে থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে তারা আর্যনারীদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করে। এটাই দাস সমাজ ব্যবস্থার রীতি। কিন্তু আর্যগণ পরাজিত দাসদের ভৃত্য ও তাদের নারীদের দাসী নিযুক্ত করা এবং দাসীদের রক্ষিতা হিসাবে রেখে সন্তান উৎপাদন করাটা নিজেদের অধিকার মনে করেন।"

জাবালার মুখে সমাজতত্ত্ব শুনে আর্য বুদ্ধিজীবিরা সন্তুষ্ট হলেন না। জাবালার বিরুদ্ধে একটার পর একটা কথা উঠতে থাকায় গৌতম তাঁর সিদ্ধান্ত জানবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে বললেন—"শান্তিঃ, শান্তিঃ.....।"

সব কোলাহল থেমে যায়। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছি গৌতমের সিদ্ধান্ত শোনার

জন্য—জাবালার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে গৌতম বললেন—"সুভদ্রে! আপনাকে দর্শন করে আশ্রমবাসী ধন্য হয়েছে। আপনার পদধূলিতে এই আশ্রম পবিত্র হয়েছে। আপনি সতী হন বা নাই হন আপনি সত্যবতী—সত্যকামের মহিয়সী জননী। সত্য অগ্নিসম আপনার জীবনের সমস্ত অবাঞ্ছিত কালিমাকে গ্রাস করে আপনার ব্যক্তিত্বকে দীপ্তিমান করেছে। আপনার ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে আমাদের অজ্ঞানতাও দূর হয়ে গেছে। এইরকম সত্যকে যে জননী সন্তানের সামনে প্রকাশ করতে পারে সে দাসী হতে পারে না। যার আত্মা ও বিবেক মুক্ত সে কি করে দাসী হবে? যে পুত্র নিজের জননীর কলঙ্কিত অতীতকে শ্লেষহীনভাবে উদাত্তস্বরে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পারে যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না। ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করলে মানুষ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয় না। কর্মদ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র হয়ে থাকে। মানুষ শূদ্র রূপে জন্মলাভ করে। সংস্কার কর্মের দ্বারা যে দ্বিজ হয়। বেদ অধ্যয়নের দ্বারা সে হয় বিপ্র। যখন তার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয় সে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয়। লাভ ক্ষতি, যশ নিন্দাকে ভ্রূক্ষেপ না করে সব পরিস্থিতিতেই ব্রহ্মজ্ঞানী সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। আপনি সত্যনিষ্ঠ হওয়ায় আপনি ব্রাহ্মণী এবং আপনার সন্তান বলে নয় তার সত্যনিষ্ঠতার জন সত্যকাম ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। আপনি তাকে পূর্বেই বেদমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। বেদপ্রিয় হওয়ায় সে দাস হতে পারে না। সে আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য। সত্যকামের গুরু হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে আমি গর্ব অনুভব করছি। সত্যকামের মতো শিষ্য পেয়ে এই আশ্রম গৌরবান্বিত হবে।"

গৌতমের উদাত্ত ঘোষণায় সভাস্থল স্তব্ধ। জাবালা তার জীবনে লাঞ্ছনা, কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই জানত না। গৌতমের মতো শ্রেষ্ঠ ঋষির এই রকম ব্যবহারে সে অভিভূত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই তার। তা দু'চোখে জলের ধারা। আমি জাবালাকে জড়িয়ে ধরতে সে আমার পায়ের ধূলো নেওয়ার জন্য নুয়ে পড়ে। আমি তার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট ছোট হলেও আশ্রমের আচার্যের পত্নী হওয়ায় আমি শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাকে প্রণাম করতে দিইনি, বরং আমিই তার পায়ের ধূলো নিলাম। তার কানের কাছে বললাম—'ভগিনী, তুমি আমার সত্যরক্ষায় সাহায্য করেছ, তোমার জন্যই সত্যকামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা হল। তোমার মতো সত্যবতীর পক্ষেই সম্ভব আমার স্বামীকে অনুপ্রাণিত করা।" একথা বলার সময়ে আমার চোখেও জল ভরে যায়। গৌতমের ন্যায় বিচারে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। গৌতম যে এত সহজে সত্যকামকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে, এটা আমরা বিশ্বাস ছিল না। আচার্যের বিরুদ্ধে আর্যগোষ্ঠী প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। কিন্তু সেই ঝড়ে আচার্য বিন্দুমাত্র আন্দোলিত হলেন না—বরং বনস্পতি আন্দোলিত হয়ে জাবালার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করে।

জাতি নির্ণয় কর্ম অনুসারী হবে না জন্মভিত্তিক হবে তা ছিল অত্যন্ত বিবাদপূর্ণ। কিছু লোক মত প্রকাশ করেন যে, জাতি জন্মভিত্তিক হবে আবার কেউ কেউ জাতি কর্ম বা গুণভিত্তিক হবে বলে মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ সুবিধা অনুসারে উভয় পন্থাকে সমর্থন করেন। এরা বলেন সুবিধাবাদী গোষ্ঠী। কিন্তু সুবিধাবাদী ছিলেন না। তিনি জাতিকে জন্মভিত্তিক না বললেও কাজ থেকে প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু আজ জাবালা গৌতমের হৃদয়

জয় করে নিয়েছেন। নারীজাতির প্রতি গৌতমের শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখে আমি গৌতমের পা-পূজো করব স্থির করলাম। সত্যকামকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করায় আশ্রমের ভিতরেই কিছু রক্ষণশীল আচার্য গৌতমের বিরোধীতা করছিলেন। তাদের দাস-বিদ্বেষী মন গৌতমের এই সিদ্ধান্তকে সহজে গ্রহণ করতে পারছিল না। তাঁরা ভাবছিলেন, গৌতমের মতো নিষ্ঠাবান ঋষি তাঁর সুন্দরী পত্নী অহল্যাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এইরকম আর্যবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছেন। আশ্রমের ভিতর অসন্তোষ দেখা দেয়। আমি সেদিকে কর্ণপাত করিনি। সত্য হোক মিথ্যা আমাকে খুশী করার জন্য যে গৌতম সত্যকামকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন—এই গুঞ্জন আমার আহত নারীত্বকে অনুরাগ রঞ্জিত করেছিল। শুধু স্বামীত্বের অহংকার নয়—পত্নীত্বেরও একটা অহংকার আছে বলে আমি এতদিন পরে অনুভব করে সন্তুষ্ট হলাম।

ঋতাম্ভরী ঊষার অনন্ত কপালে কে এঁকে দিয়েছে চুম্বনের অরুণ আলপনা। রাত্রির সমস্ত দুঃস্বপ্নকে নাশ করে উষাসুন্দবী সূর্যস্নান সেরে আকাশের বুকে স্বর্ণাভ পদচিহ্ন এঁকে নেমে আসছেন তপোবনের পবিত্র প্রাঙ্গণে।

অথচ পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষেব পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের উদায়াস্তের ব্যতিক্রম নেই। ইন্দ্রদেব কেন ক্ষুব্ধ? গৌতমের প্রতি ঈর্ষা না দাসবর্ণের প্রতি নিষ্ঠুরতা? গৌতম আশ্রমে অবশ্য জলের তেমন অভাব নেই। জলবন্টনের বৈষম্যহেতু আর্য-অনার্য বিদ্বেষ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করছে। "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম।" খাদ্যের সাথে শুধু দেহের নয়, মন বিবেক বুদ্ধির ও নিবিড় সম্পর্ক আছে। খাদ্যাভাব আর্য অপেক্ষা অনার্যদের বেশি পীড়িত করছে। আশ্রমে খাদ্যেব অভাব নেই, রাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের অযাচিত দান, ব্রহ্মচারীদের সংগৃহীত ভিক্ষান্নে আশ্রমবাসী দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু অনার্যগোষ্ঠীকে কে ভিক্ষা দেবে? —তারাও অভিমান বশত কারও কাছে হাত পাতবে না। তারা জোর করে রাজা ধনী সম্প্রদায়ের ও আশ্রমবাসীর সঞ্চিত খাদ্য ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু কারও দয়ার দান গ্রহণ করবে না। ভিক্ষা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ এবং ঋষিদের জন্মগত সম্মানজনক অধিকার। দাসবর্ণের বুভুক্ষু ভিক্ষা চাইলে সে হয় ঘৃণার পাত্র। দাসগোষ্ঠী যজ্ঞবিরোধী হওয়ায় ইন্দ্রদেবকেও তারা সন্তুষ্ট করতে পারবে না। তাই ভবিষ্যতে এক রক্তাক্ত সংঘর্ষ অপেক্ষা করছে।

আমার মনে হয়, জলবন্টনে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। দাসগোষ্ঠীর জলাভাব থাকলেও আশ্রমগুলিতে জলের অপচয় হচ্ছে। কিন্তু সে কথা গৌতমকে বললে তিনি ক্রুদ্ধ হন। তিনি দোষ দেন ইন্দ্রদেবকে। ইন্দ্রদেব জলদানে কার্পণ্য করায় গৌতম আশ্রমের পাশাপাশি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। এটা ইন্দ্রদেবের কূট চক্রান্ত বলে গৌতম মত প্রকাশ করেন। দাসগোষ্ঠীর দ্বারা গৌতম আশ্রমে অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য। তার ফলে গৌতমের যশ খ্যাতি ও একাগ্রতা নষ্ট হবে তদুপরি মহর্ষি থেকে দেবর্ষি এবং দেবর্ষি থেকে ইন্দ্রত্বলাভের আশা বিনষ্ট হবে। ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্য যাই হোক আমাদের বিয়ের পর থেকে অনাবৃষ্টি চলছে। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্র প্রভৃতি মহর্ষিদেরও একই

মত। গৌতম ও নিরূপায়। প্রায়ই যে কোনও অনুষ্ঠানে তিনি ইন্দ্রদেবকে আশ্রমে আমন্ত্রণ করতেন এবং আচার্য পত্নী হিসাবে অতিথিকে সন্তুষ্ট করা আমার কর্তব্য।

সোমরস দ্বাবা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার ঈঙ্গিত দিয়েছিলেন গৌতম। তার ফলে আমার অনেকসময় ব্যয় হত সোমলতা সংগ্রহে। সোমলতা সংগ্রহের অবসরে আশ্রমে থেকে মুক্তি পেয়ে আমি অরণ্যে মুক্ত বিহঙ্গীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং অনার্যপল্লীতেও কিছুটা সময় কাটাতে পাবতাম। সোমযজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করে বৃষ্টিব পরিমাণ বাড়াবার প্রতিশ্রুতি কে জানে কোন সাহসে দিচ্ছিলাম তাদের। সেই কারণেই তারা গৌতম আশ্রম তথা অন্যান্য আশ্রমগুলিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছিল। গৌতম সম্ভবত জানতেন যে আমাব ওপর অগাধ বিশ্বাস অনার্যগোষ্ঠীর। তাই অনার্যগোষ্ঠীর উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করা—এই দুটি কাজ সম্পাদন ব্যতীত গৌতমের অন্য উপায় ছিল না। এই দুটি কাজকে আমিও আমার প্রধান কর্তব্য ভেবেছিলাম। আমি আরও ভেবেছিলাম যে এই দুটি কাজ ভালোভাবে করতে পারলে আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হবে। গৌতমের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য আমি সবসময় চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি অনুভব করেছি, গৌতমেব সকল আজ্ঞা বিশ্বস্ততাব সাথে পালন করায় আমার কোনও দ্বিধা না থাকলেও কেন কে জানে গৌতম আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ক্রমশই তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছেন। আমার কার্যকলাপ ও গতিবিধির ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শুধু তাই নয় তিনি আমার পিছনে গুপ্তচরও নিযুক্ত করেছিলেন। মাধুর্য আমার সহপাঠী ছিলেন। বর্তমানে আশ্রমের একজন আচার্য, কিন্তু গৌতমের আদেশে তিনি আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করতেন এবং প্রতিটি সত্য-অসত্য গৌতমকে জানাতেন। আমি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার এমন কোনও গোপন কাজ ছিল না যার জন্য আমি গৌতমকে ভয় করব। কিন্তু গৌতম সন্দিগ্ধ কেন? তিনটি সন্তানের জননী আমি—এই আশ্রমে আমি সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটাচ্ছি। তিনি কি আমার চিত্তবৈকল্যের কোনও লক্ষণ দেখেছেন? নাহলে প্রতি পদে পদে আমাকে সন্দেহ করছেন কেন?

অবশ্য এর মধ্যে আমার সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আশ্রমবাসিনী নারী এবং আচার্যগণ আলোচনা করতেন। বিয়ের সময়ে আমি ছিলাম, অর্ধ প্রস্ফুটিত কুঁড়ি—কিশোরী। আমার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি। বিয়ের দশ বছরের মধ্যে আমি পূর্ণ যৌবনা যুবতীতে পরিণত হয়েছি। আমার সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ, সেটা গৌতমের সহ্য হয় না। আমার পাশে গৌতমকে অত্যন্ত ম্লান দেখায়। মাঝে মাঝে আশ্রমবাসিনী নারীগণ আমাদের দেখে হাহাকার করেন—"আহা, এইরকম নারীরত্নের গৌতমের মতো বয়স্ক, নীরস, সৌন্দর্যহীন স্বামী। বিধাতার একি বিধান? ব্রহ্মার কি বিচার? এইরকম গুঞ্জন কে বন্ধ করবে? গাছের পাতার মর্মরধ্বনি এবং পশুপাখির চোখে ঐ একই কথা। এই কথা গৌতম শুনেছেন। তাঁর অন্তরে কি হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়েছে? সেইজন্য নিজেকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার লক্ষ্যে আমার প্রতি রুক্ষ ও কঠোর হয়েছে? অবশ্য গৌতমের হীনমন্যতা সৃষ্টি হওয়ার আর একটি

যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এই দশবছরে গৌতম আমার চেয়ে বয়সে যতটা বেশি ছিলেন ততটাই বড় আছেন কিন্তু উচ্চতায় আমি তাঁর থেকে পাঁচ আঙ্গুল লম্বা হয়ে গেছি। আমার পাশে তাঁকে খর্ব দেখায়। অধিকাংশ মহর্ষিদের পত্নীগণ উচ্চতায় স্বামীদের হারিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। তার কারণও স্পষ্ট। পূর্ণবয়স্ক মহর্ষিগণ বালিকা বধূ বিবাহ করার সময়ে হয়তো তাদের মনে থাকে না যে, বধূটির শরীর পূর্ণ বিকশিত হলে তাঁকে বধূর পাশে খর্বকায় দেখাবে। গৌতম দীর্ঘকায় নন। তাই পূর্ণবয়সে আমার উচ্চতা গৌতমের চেয়ে বেশি হয়। আমার পাশে দাঁড়াতে গৌতম অস্বস্তি অনুভব করেন। সম্ভবত নিজের চেহারার সাথে আমার সৌন্দর্যের তুলনা করে হীনমন্যতার শিকার হতেন। আমি লক্ষ্য করেছি কোনও দীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষের সাথে আমার কথাবার্তা বলা গৌতম সহ্য করতে পারেন না। অকারণে ক্ষুব্ধ হন। আমরা সাথে রূঢ় ব্যবহার করেন। সব পুরুষের মনেই কি এইরকম ভাবনা জাগে? স্বামী স্ত্রীর চেয়ে সববিষয়েই শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত এমনকি উচ্চতায়ও।

এখন আর কি উপায়? কিন্তু এখানে আমার দোষ কোথায়? গৌতমের অযথা সন্দেহ ও রুক্ষ আচরণ আমাকে কষ্ট দেয়, আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় সন্দেহের মধ্যে বেঁচে থাকা অসম্ভব মনে হয়। গৌতমের সন্দিগ্ধমন প্রতিদিন আমাকে লাঞ্ছিত করে। প্রেমহীন জীবন কাটান যায়, কিন্তু সন্দেহের শরাঘাতে বেঁচে থাকাটা মাঝে মাঝে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। আশ্রমে অতিথি সৎকারের দায়িত্ব আমার। অতিথিদের সন্তুষ্ট করলে আশ্রমের সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হবে—একথা গৌতম আমাকে বারবার ঈঙ্গিতে বলেন। অথচ আশ্রমে কোনও সুপুরুষ অতিথি আমার আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার পর আমাকে গৌতমের সন্দেহের অগ্নিবলয়ে দগ্ধ হতে হয়।

অতিথিরা অন্য কোনও ঋষিপত্নীর আতিথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে তোমার আতিথ্য খোঁজেন কেন?

"অসময়ে অহল্যার কুটীরে অতিথিদের পদধ্বনি কেন শোনা যায়?"

—অতিথিদের সন্তুষ্ট করার কি মন্ত্র তুমি জানো অহল্যা?

—তোমার দিকে তাকালেই অতিথি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। মধুর কটাক্ষে কি মন্ত্রে অতিথিকে মুগ্ধ কর?

—"অতিথি সৎকারে তোমার ক্লান্তি নেই.....।"

"আমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা না করতে পারার পিছনে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার প্রলোভন প্রছন্ন নয় কি?"

বিশেষত ইন্দ্রদেব—"দেবাধিপতি স্বর্গাধীশ বাসব পূর্বে বহুবার আমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন। কর্মব্যস্ততার অজুহাতে আমার সাদর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে প্রকারান্তরে আমাকে আঘাত করেছেন, কিন্তু এখন তিনি যেন আমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকেন, এমনকি বিনা নিমন্ত্রণেও নানা অজুহাতে তিনি আমার আশ্রমে উপস্থিত হন। আমাকে ধন্য করার জন্য নয়—সম্ভবত নিজে ধন্য হওয়ার জন্য। অকাতরে নানা অনুদান দেন গৌতম আশ্রমে। এর

কারণ কি অহল্যা? কে বাসবের আকর্ষণ? তুমি ব্যতীত আশ্রমে সবাই পুরাতন। তাহলে তুমি কি বাসবের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু?"

আমার মনে হয় অন্যান্য অতিথি অপেক্ষা বাসবের আতিথ্যে তুমি অধিক যত্নশীল। বাসবের জন্য বিভিন্ন ধরনের সোমপানীয় যত্নসহকারে প্রস্তুত করো কেন? তোমার কাছে বাসবের বিশিষ্ঠ অতিথির আসনলাভ করার রহস্য খুলে বলবে কি?

স্বামীর অবহেলা সহ্য করা যায় কিন্তু অযথা সন্দেহ সহ্য করা যায় না। গৌতমের এই ধরনের প্রশ্নবানে আমি প্রতিনিয়ত জর্জরিত হই। এতবড় জ্ঞানী-গুণী বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিকে কি উত্তর দেব?

প্রকৃতপক্ষে কি বাসব বিশিষ্ঠ অতিথি নয়? বাসবের আগমনে গৌতম নিজে কি অধিক তৎপর হন না। সমগ্র আশ্রম তৎপর হয়ে ওঠে বাসবের আগমনে। ইন্দ্রস্তুতিতে মুখর হয়ে ওঠে তপোবন। আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ বাসবকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। আমি যদি বাসবের প্রতি অধিক যত্নশীল হই তাহলে গৌতম এমন কুৎসিৎ কটাক্ষ করেন কেন? শরীর মন বিষিয়ে যায়। গৌতমের সঙ্কীর্ণ ভাবনা ও ঘৃণিত সন্দেহ আমার চোখে তাকে ঘৃণ্য করে তোলে। ইচ্ছা হয় চিৎকার করে প্রতিবাদ করব। আমি যা করছি গৌতমের নির্দেশেই করছি—একথা সমগ্র পৃথিবীকে জানিয়ে দেব। কিংবা গৌতমের নির্দেশে যে আসবে তাকেই পাদ্যার্ঘ দিয়ে আতিথ্য জানাব না। আমার সন্তান—আমার তপোবন পশুপাখি দাসপল্লীর প্রিয়জনদের নিয়ে সরল সাধারণ জীবন কাটাব। স্বর্গলাভ বা মোক্ষলাভের সাত্ত্বিক কামনা আমার নেই। আশ্রমে আসা দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা এমনকি ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করে আমার কি ইচ্ছাপূরণ হবে?

গৌতম যদি আমার কার্যকলাপে সন্দেহ করেন তাহলে নিজেই নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত অতিথিদের সেবা করুন। আমাকে এই দায়িত্ব দিলেন কেন?

গৌতমের সন্দেহপূর্ণ বাক্যবাণে মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ করে ওঠে। মনে করি গৌতমের অযথা সন্দেহকে সত্যে পরিণত করে প্রতিশোধ নেব কি? যে যেটা নয়, তাকে যদি সেই প্রসঙ্গে দোষারোপ করা হয়, তাহলে প্রকারান্তরে তাকে সেই দোষযুক্ত কাজটি করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

পরমুহূর্তেই মনকে শান্ত করার চেষ্টা করি। যে যাই ভাবুক, আমার মন জানে আমি কি, আমার মন জানে আমি গৌতমের প্রতি বিশ্বস্ত কি না! নিজেকে দীক্ষিত করার জন্য আমি কি কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছি। একজন সৎকার্য থেকে বিরত হওয়ার অর্থ তার মন নির্মল নয়। পাপের ক্ষুদ্র কীটটি কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। মানুষের নিজের মনই পাপপুণ্যে আধার। আমি আমার নিজের মনকে দৃঢ় করি। নিজকর্মে ব্রতী হই। কেন জানি না আমার মনে শান্তি নেই। কি এক গোপন অসন্তোষ জমা হয় মনের কোনও সূক্ষ্মকোণে। বিভিন্ন কারণে গৌতম ও সন্তুষ্ট নয়। নানা প্রকার উত্থান পতনের মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয় তীব্র গতিতে। যজ্ঞের অন্য নাম অধ্বর। তাই যজ্ঞ কিভাবে হিংসাকে প্রশ্রয় দেয়? যে কাজ অহিংসক, সেটাই

তো যজ্ঞ। অথচ যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া এবং যজ্ঞকে কেন্দ্র করে আর্য ও দাসের মধ্যে যে বীভৎস হিংসাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তা কিভাবে যজ্ঞের লক্ষ্য সাধন করবে? তাই প্রতিটি যজ্ঞ আমাকে ব্যথিত ও বিব্রত করে।

অন্নলাভ, যশলাভ, ধনলাভ এবং জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য যদি লোককল্যাণ না হয় তাহলে তাহা অপূর্ণ। গৌতম সম্ভবত জনকল্যাণের প্রতি ততটা সচেতন নয়, যতটা সচেতন আশ্রমের কল্যাণ, আর্যকল্যাণ এবং আত্মউত্থানের নিমিত্ত। আমি জানি গৌতমের মনে দাসদের প্রতি ততটা হিংসাভাব নেই, যতটা ঘৃণাভাব আছে। প্রতিটি যজ্ঞের পূর্বে আমি ভাবি—ভগবান মানুষের মনে ভালোবাসার বীজস্থাপন করেছেন অথচ ঘৃণা ও হিংসা ত্যাগ না করার জন্য তদুপরি প্রেমভাব এবং কল্যাণ কামনার উষ্ণতার অভাবে সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। তাই মানুষের মন সর্বদা সন্তপ্ত। এমনকি মহর্ষি গৌতমের মনেও শান্তি নেই। মহর্ষি গৌতমের হৃদয়ের প্রেমবারির স্পর্শে ভালোবাসার বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে বিশ্বজনীনতার মহাদ্রুম সৃষ্টি হতে পারত। গৌতমের হৃদয়ের একবিন্দু প্রেমসুধায় অহল্যার সন্তাপিত অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হত। জগতের জন্য প্রেমদান করতে গৌতমকে অনুবোধ করতে পারি, কিন্তু নিজের জন্য প্রেমভিক্ষা কবব কেন? পতিপ্রেম পত্নীর বিবাহগত অধিকার। অধিকার কি ভিক্ষা করা যায়? অধিকার সাব্যস্ত করতে হয়। তাই গৌতমের প্রেমাস্পদা হওয়ার জন্য আমি সাধনায় ব্রতী হই। গৌতমের সন্দেহের জন্য অতিথি সৎকার করতে মন না চাইলেও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমি নীরবে অতিথি সৎকার করি। কিন্তু যেদিন ইন্দ্রদেব অতিথি হবেন বলে শুনি, কেন জানি না আমার মধ্যে প্রতিবাদের তীব্র ঝড় সৃষ্টি হয়। সেদিন আমি অতিথি সৎকারের কোনও আয়োজন করিনি। প্রথমেই সোমলতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সোম পানীয় প্রস্তুত করা বেশ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমি কিছু করিনি। ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলাম। ফুল, ধূপ, নৈবেদ্য পাদ্যঅর্ঘের আয়োজন করিনি, অতিথি কুটীর পরিষ্কার করিনি।

অসুস্থার ভান করে নিজের ঘরে শুয়ে থাকলাম অসময়ে। গৌতম নিজে অতিথি সেবা করুন। অতিথিকে সুসন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপালাভ করার জন্য গৌতম আমাকে বিনিয়োগ করেন বলে আমার মনে হয়। অথচ অতিথি সন্তুষ্ট হলে আমি হলাম সন্দেহভাজন। ইন্দ্রদেব যদি আমার আতিথ্যে সন্তুষ্ট না হতেন তাহলে কি গৌতম খুশী হতেন? এর দ্বারা তাঁর যশোক্ষয় হবে। গৌতম ইন্দ্রের কৃপা থেকে বঞ্চিত হবেন। আজ গৌতমের মন জানার জন্য হোক বা প্রতিবাদ করার জন্যই হোক, আমি স্থির করলাম অতিথির সাথে দেখা করব না।

প্রাতঃস্নান সেরে গৌতম ফিরে এসেছেন। তাঁর প্রাতঃকালীন পূজার্চনার সমস্ত আয়োজন করেছি। কিন্তু আমাকে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হওয়ার সাথে গৌতম বিরক্তও হলেন। কোনও বিশিষ্ট অতিথি বিশেষত ইন্দ্রদেবের আশ্রমে আসার কথা হলে আশ্রমের নিয়ম শৃঙ্খলার সম্বন্ধে গৌতম অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হলে যতটা লাভ। ইন্দ্রদেব অসন্তুষ্ট হলে তার চেয়ে অধিক ক্ষতি। আশ্রমে সমস্ত অনুদান বন্ধ করে দেবেন। মূলত জলদানে বাধা পড়লে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। রাজা এবং ধনী সম্পদায় অর্থ

দিতে পারে—জলদানের শক্তি তাঁদের নেই। জলের জন্য তাঁরাও ইন্দ্রদেবের ওপর নির্ভরশীল।

আজ সেই কারণে গৌতম অধিক সতর্ক। আমার কর্তব্যে অবহেলা দেখে তাঁর বিরক্ত ও বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু সত্যকাম সেদিন আমার কপালে 'সুধাঞ্জন' লেপন করছিল। অসময়ে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে সে ভেবেছিল আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। গৌতমের সন্দেহ প্রবণতা আমাকে এমন শ্বাসরুদ্ধ করে যে অধিকাংশ সময় আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়। 'সুধাঞ্জন' লেপনে কিঞ্চিত উপশম হয়। আমার কর্তব্যে অবহেলা দেখে যতটা না ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, নির্জন কক্ষে কিশোর সত্যকামকে আমার মাথা টিপে দিতে দেখে অধিক ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

রুক্ষকণ্ঠে তিনি সত্যকামকে তিরস্কার করেন—"সত্যকাম! তোমার তো এখন ভিক্ষায় যাওয়ার সময়। তুমি এখানে কি করছ? তুমি কি আশ্রমের নিয়ম জানো না? আমি লক্ষ্য করছি আচার্যা তোমাকে বিশৃঙ্খল হওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? শীঘ্র ভিক্ষায় যাও। নাহলে আজ উপবাস থাকতে হতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময়ে ধনী এবং বণিকগণও ভিক্ষাদানে কুণ্ঠিত। ভবিষ্যতে ইন্দ্রদেবের করুণা না পেলে তারাও একমুঠো অন্ন পাবে না। মানুষ তো আর স্বর্ণ, রৌপ্য, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভক্ষণ করে জীবনরক্ষা কবতে পারে না। তাই তারা ভবিষ্যতে বিপদ আশঙ্কা করে খাদ্যসঞ্চয় করতে ব্যস্ত। ঠিক সময়ে না গেলে তুমি ভিক্ষা পাবে না। তাছাড়া আশ্রমে এত মহিলা থাকা সত্ত্বেও আচার্যার সেবার জন্য তুমি কেন এত ব্যস্ত!"

গৌতমের শ্লেষপূর্ণ বাক্য সত্যকামের মতো নিষ্পাপ কিশোর প্রাণকেও ব্যথিত করে। সত্যকাম শান্ত কণ্ঠে সত্য কথা বলে—"গুরুদেব! বাড়ি ছেড়ে আসবার পর আমি আমার মায়ের পদসেবা করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আজ এখানে মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে আমি কি করে স্থির থাকব? মায়ের সেবা তো ঈশ্বর আরাধনার মতো আমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। অবশ্য মা আমাকে তাঁর কোমল পদসেবার সুযোগ দিলেন না। আমার ব্যাকুলতা দেখে শুধুমাত্র কপালে 'সুধাঞ্জন' লেপনের অনুমতি দিলেন। মা কে ছেড়ে এসে আমি এখানে মা পেয়েছি। সেজন্য আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেও আমার দুঃখ নেই।"

এইটুকু বলে মাথা নত করে সজল নয়নে সত্যকাম চলে গেল ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। সত্যকামের প্রতি শ্লেষপূর্ণ ভর্ৎসনার পিছনে গৌতমের কুৎসিৎ কটাক্ষ প্রচ্ছন্ন আছে বুঝতে পেরে আমার মাতৃহৃদয় ক্ষুণ্ণ হয়। ছিঃ গৌতম এত সন্দেহ প্রবণ এবং সংকীর্ণমনা। পুত্রবৎ সত্যকামকেও আমার সাথে একান্তে দেখে সহ্য করতে পারছেন না। নারী ও পুরুষের মধ্যে এক জৈবিক কুৎসিৎ সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনও স্বর্গীয় সম্পর্ক যদি গৌতমের মতো মহর্ষি দেখতে না পান তাহলে সাধারণ সন্দিগ্ধ স্বামী স্ত্রীর জীবন কিভাবে দুর্বিষহ করে তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আদেশসূচক গম্ভীব স্বরে গৌতম আমাকে বললেন—'ইন্দ্রদেব

আসবেন, তিনি আমাদের মহান অতিথি। অতিথি হলেন দেবতা। অতিথির সেবায় নিষ্ঠা থাকলে অসুস্থতা তো ছার মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করা যায়। তোমার মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব লক্ষ করে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। শয্যাত্যাগ করো এবং আমার পত্নী হিসাবে অতিথি সৎকারের সমস্ত আয়োজন করো। ইন্দ্রদেব যেন অসন্তুষ্ট না হন। তার ফলে শুধু আমার বা আশ্রমের নয় সমগ্র আর্য ভূখণ্ডেরও প্রভূত ক্ষতি হবে। গৌতম আশ্রমের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে। এর জন্য তুমিই দায়ী হবে।"

গৌতমের আদেশের প্রতিবাদ করার প্রশ্ন নেই। আচার্য পত্নীর কর্তব্য আমাকে করতে হবে। ইন্দ্রদেব প্রসন্ন হলে পঞ্চনদীতে জলের জোয়ার আসবে। গৌতম আশ্রম সমেত এই ভূখণ্ড অনাহার ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাবে। তারপর গৌতম নিশ্চিন্ত হয়ে তপস্যা করবেন দেবর্ষি কিংবা.সম্ভবত ইন্দ্রপদ লাভ করার জন্য স্বামীর পদোন্নতির জন্য স্ত্রীকেই বলি হতে হবে।

গৌতমের নির্দেশ অনুসারে আমি রাগ অভিমান ত্যাগ করে অতিথি সৎকারের আয়োজনে লেগে পড়লাম।

কিন্তু আমি যে আজ অতিথি সৎকারে কুণ্ঠা প্রদর্শন করেছি, সেকথা আশ্রমে কারও অজানা নেই। আমি স্বামীর ইচ্ছার বিরোধীতা করি, স্বামীর সাধনার পথে বাধা সৃষ্টিরকারিণী ইত্যাদি নানা আলোচনা হয়। গৌতমের স্বামীত্বের অহংকার এতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রীর আবার স্বতন্ত্র ইচ্ছা কি? স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রী নরকেও ঝাঁপ দিতে পারে। তার দ্বারাই সে নরক থেকে স্বর্গে উত্থিত হয়। স্বর্গলাভের জন্য স্ত্রীর তপস্যা করার প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত কথা আমার ভালো লাগে না। আমার স্বতন্ত্র আত্মসত্তার নীরবে প্রতিবাদ করে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিলনা। আমি ভাবি, সত্যি কি একদিন স্বামীর খ্যাতি ও পদোন্নতির জন্য আমাকে অসহায়ভাবে নরকে ঝাঁপ দিতে হবে! সেই পুণ্যের ফলে আমার আবার স্বর্গলাভ এবং মোক্ষপ্রাপ্তি হবে না কি? না, আমি নরকবাসকেই শ্রেষ্ঠ মনে করব। নরকে অন্তত নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাস্তিভোগের সুযোগ থাকবে। তার ফলে আত্মসত্তার রক্তক্ষরণ কিছুটা উপশম হতে পারে।

স্বামীর ইচ্ছা ও সিদ্ধিপথে নিজেকে স্বাহা করার প্রতিজ্ঞা করলাম। তাছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গৌতম আমার হাতে যে কুশ বেঁধেছিলেন, সেই বলয়ের মধ্যে আমি বন্দিনী।

যাইহোক, ইন্দ্রদেব এলেন না, আশ্রমের সবাই উৎকণ্ঠার সাথে প্রতীক্ষা করছিলেন। আমার মধ্যে যে উৎকণ্ঠা ছিল না তা নয়। সবাই নিরাশ হলেন। গৌতমের নৈরাশ্যের মধ্যে আশঙ্কা, সন্দেহ এবং আমার প্রতি ক্ষোভ ও বিরক্ত প্রকাশ পাচ্ছিল।

সেদিন সান্ধ্যহোমের পূর্বে স্বামীর পা ধুয়ে দেওয়ার জন্য হাতে জল নিতে তার মধ্যে ইন্দ্রদেবের প্রতিবিম্ব দেখে আমি চমকে উঠলাম। বুকের কাঁপুনিতে হাতের জল পড়ে গেল। স্বামীর পা ধোওয়া হল না। এটা কি মনের ছায়া!

মুনি ঋষিরাও মানুষ—মাঝে মাঝে মুনি ঋষির মনেও পাপের পদধ্বনি শোনা যায়। ছিঃ আমি কি পাপের প্রশংসা করছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দেখলেই পাপের প্রশংসা করতে মন চায়। দুরাচারী পাপকে জয় না করলে রাজা বিশ্বামিত্র আজ মহর্ষি হতেন না। পৃথিবীর অনেক রাজার মতো পার্থিব জীবন কাটিয়ে জনমানস থেকে বিস্মৃত হয়ে যেতেন। রাজা হিসাবে লোকে তাঁকে ভয় করত—কিন্তু আজ প্রতিটি জনপদ থেকে তিনি যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান পাচ্ছেন, সেটা পেতেন না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশ অমৃত তুল্য। মহর্ষি আশ্রমে এলে আমার মন সতেজ হয়ে ওঠে। তিনিও আমার আতিথ্যে অত্যন্ত খুশী হন। আচার্য পত্নীর কর্তব্য হিসাবে আমি অতিথি সেবা করি না। অতিথি সেবায় আনন্দ পাই বলেই আমি অতিথি সেবা করি। দেবতা হোক বা দানব অতিথিরূপে যে আশ্রমে আসে, সেই আমার পূজ্য। তাই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, কণ্ব, দুর্বাসা, রুদ্রাক্ষ, ঋচা যে আশ্রমে আসে আমার সেবা ও আদর অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো স্বতঃপ্লাবিত হয়ে থাকে। বিশেষত বিশ্বামিত্রের আগমন আমাকে অসীম আনন্দ দেয়। পাপের বীভৎস গহ্বর থেকে পুণ্যের দেবভূমিতে উঠে আসা এই মহর্ষির বাণী মনপ্রাণকে পার্থিব আবিলতার উর্ধ্বে নিয়ে যায়। প্রবৃত্তি মার্গ থেকে পরমার্থের দিকে প্রেরণ করে।

"আর্যকরণ" অনুষ্ঠানে সেদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন। সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে তার ভাষণ শোনার জন্য আমি সভাগৃহে গেলাম। গৌতমের বাঁ পাশে গিয়ে বসলাম। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলছিলেন—"এই ভূখণ্ডে যেমন বহু প্রকারের ভূমি আছে, ভূমির বিজেতাও ভূমি অনুযায়ী নানা প্রকার ফল ভোগ করে। পার্থিব ভূমির বিজয় দ্বারা সাম্রাজ্য লাভ হয়। রাজাগণ সেই পার্থিব ভূমি বিজয়েই সমগ্র জীবন ব্যয় করেন। আমিও আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় এই ভূমি বিজয়ে অপচয় করেছি। ফলস্বরূপ পেয়েছিলাম—লোভ, মোহ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার.....।

দেহভূমির বিজয় দেহ সাম্রাজ্যকে স্বরাজে পরিণত করে। আবার ভোগভূমির বিজয় স্বর্গপ্রাপ্তির আনন্দ প্রদান করে। সেই বিজয়ীবীরের দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন সবকিছুই দিব্যকর্মে পরিণত হয়।"

বিশ্বামিত্র নিজের অনুভূতিই ব্যাখ্যা করছিলেন। আশ্রমবাসী অভিভূত হয়ে শুনছিলেন তার অমৃতবাণী।

সহসা উন্মত্ত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয় রুদ্রাক্ষ। তার পিছনে আরও কয়েকজন উন্মত্ত দাসযুবক আশ্রমে প্রবেশ করে যজ্ঞবেদীতে পদাঘাত করার পর মহর্ষি গৌতমকে অপমান করে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতে তারা মহর্ষিকে অপমান করে। বিশেষত রুদ্রাক্ষকে সেদিন অত্যন্ত উগ্র মনে হচ্ছিল। রুদ্রাক্ষকে এইরকম ক্রুদ্ধ হতে আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু এর কারণ কি? বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ইত্যাদি মহর্ষিগণ সমগ্র বিশ্বে আর্যকরণে ব্রতী হয়েছেন, সেই দুষ্কর কার্যে অরণ্যে থেকে অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে গৌতমের আশ্রমে এসে তাঁর সাথে পরামর্শ করেন। রুদ্রাক্ষ সমেত দাসগণ 'আর্যকরণ' শব্দটির বিরোধী,

তাদের মতে আর্যকরণ শব্দটি সংকীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। মানবীকরণ শব্দটি উপযুক্ত হত। মানুষের মধ্যে অনেকে আছেন যারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নয়। এমনকি আর্য নামে পরিচিত শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও এমন স্বার্থপর, ক্রোধী, প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তি আছে যারা মনুষ্য পদবাচ্য নয়। মানুষের প্রথমে মানুষ হওয়া উচিত। আমি মনে মনে সেই দাসযুবকদের সমর্থন করতাম।

কিন্তু সেজন্য হঠাৎ এইরকম উত্যক্ত হয়ে যজ্ঞভঙ্গ করার তো কোনও কারণ নেই। তাদের অভিযোগ শুনে সবাই নির্বাক। গৌতম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

কিছুকাল যাবৎ এই ভূখণ্ডে অনাবৃষ্টি চলছে। ইন্দ্রদেব করুণাবশত যতটুকু জলদান করেছেন এই ভূখণ্ডে তার বেশিরভাগ ব্যয় করেন আর্যগণ। পনি, দাস ও অনার্যদের জমিতে অত্যন্ত কম পরিমাণে জল দেওয়া হয়, তার ফলে তাদের কৃষিকাজ ও ব্যবসায় অসুবিধা হচ্ছে। এমনকি দৈনন্দিন কাজকর্ম করাও সম্ভব হচ্ছে না। আসল কথা ইন্দ্রদেব গৌতম ঋষির ওপর অসন্তুষ্ট সেই কারণে গৌতম আশ্রম সমেত আশপাশের অঞ্চলের প্রতি তিনি উদাসীন। বিশেষত আর্যকরণের উদ্যোক্তাগণ যখন গৌতম আশ্রমে এসে পৌঁছান, তখন শুধু ইন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে নয়, গৌতমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ পত্র পৌঁছায়। বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়।

এই অঞ্চলের অনার্যগোষ্ঠী শুধুমাত্র ইন্দ্রবিরোধী নয়, তার গৌতমেরও বিরোধী। তাদের মতে ইন্দ্রদেব যতটা দাস বিরোধী, তার চেয়েও বেশি গৌতম বিরোধী। সেই কারণে অপেক্ষাকৃত কম জলদান করে গৌতম আশ্রম তথা আশপাশের অনার্যপল্লীর লোকেদের কষ্ট দিচ্ছেন। নানা কারণে ইন্দ্রদেব গৌতমের প্রতি অসন্তুষ্ট। বাল্যকালের বৈরিতা পরবর্তী জীবনে বরনারী অহল্যাকে লাভ করে গৌতম ইন্দ্রদেবের বিদ্বেষভাজন হয়েছেন। উপরন্তু গৌতম অহংকারী তথা ক্রোধী-স্বভাব এবং সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি তাঁকে অধিক ক্ষুণ্ণ করেছে। ইন্দ্রদেব ত্রিলোকপালক হওয়ায় যখন যেমন সাহায্যের প্রয়োজন তখন গৌতম ইন্দ্রদেবের স্তুতি করেন, কিন্তু কাজ হয়ে যাওয়ার পরই ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে যাবতীয় অপপ্রচার করে থাকেন। বারম্বার ইন্দ্রদেবকে অবজ্ঞা করে তার পৌরুষে আঘাত করেন। তাছাড়া দেবর্ষি পদপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য গৌতমের কৃচ্ছ্রসাধনা ইন্দ্রদেবকে খুশী করার পরিবর্তে বিব্রত করছে। গৌতম ব্রহ্মার অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। ব্রহ্মা গৌতমের এত অনুরাগী যে অহল্যার মতো সুন্দরী কন্যাকে বয়স্ক গৌতমকে সম্প্রদান করলেন। এই বিবাহে অহল্যা সুখী হবে না এবং তাদের দাম্পত্য জীবনও সুখের হবে না জেনেও শিষ্যপ্রেমে ব্রহ্মা কন্যাকে বলি দিলেন। গৌতমের তপস্যায় যদি ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন, তাহলে দেবতাদের প্রভাবিত করে তাকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করে দেওয়া বিচিত্র ব্যাপার নয়। অবশ্য ইন্দ্রদেব জানেন—ইন্দ্রপদ চিরস্থায়ী নয়। সৎ কর্মের জন্য তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করেছেন। তাঁর আচরণে কোনও ব্যতিক্রম হলে তথা তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন যদি কেউ থাকে তাহলে ইন্দ্রপদ তিনিই প্রাপ্ত হবেন। এমন কি ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্র নাও হতে পারে।

কিন্তু নিজের বাল্যশত্রু গৌতম এই দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হবে এটা ইন্দ্রদেবের সহ্য না হওয়াই

স্বাভাবিক। সেইজন্য যে কোনও উপায়ে তাকে বিচলিত এবং সাধনাভ্রষ্ট করার জন্য তিনি সর্বদা ব্যস্ত। এইসব কারণে গৌতম আশ্রমই এই ভূখণ্ডে অনাবৃষ্টি ও অনাহারের শিকার হয়েছে। প্রথম মানুষকে মানুষের মতো দেখো, তারপর মানুষকে আর্য করবে। এটাই অনার্যদের অভিযোগ।

শান্ত কণ্ঠে বিশ্বামিত্র বলেন—"শোনো রুদ্রাক্ষ, ক্রোধ পরিত্যাগ করো। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ভগবান প্রদত্ত জীবনের অপব্যয় না করাই শ্রেয়। অনাবৃষ্টির জন্য এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কালোমেঘ ঢেকে আসছে, সেইজন্যই গৌতম আশ্রমে অখণ্ড যজ্ঞ হচ্ছে, তোমরা যদি যজ্ঞভঙ্গ কর তাহলে 'বৃষ্টি'র ক্ষীণ আশাও দূরীভূত হবে।"

অট্টহাস্য করে রুদ্রাক্ষ বলে—"অগ্নিতে শুধুমাত্র ঘি আহুতি দিলেই তা যজ্ঞ হয় না। তাহলে গৌতমের এই অখণ্ড যজ্ঞ বিফল হত না। গৌতম সম্ভবত আর্যদের জলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করছেন, তাহা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করায় বৃষ্টি আমাদের সবাইর প্রতি অকরুণ। গৌতম নিয়ম লঙ্ঘন করায় বৃষ্টি আমাদের সবাইর প্রতি অকরুণ। সৃষ্টির প্রারম্ভে এখানে গৌতম আশ্রম ছিল না, যজ্ঞ হত না, কিন্তু বৃষ্টি হত যথারীতি। অতীতে যেখানে অনার্যদের বসতি ছিল সেখানেই আজ গৌতম আশ্রম। অতএব গৌতম আশ্রম যে কোনও জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। আমাদের দাবি—গৌতম তাঁর আশ্রম স্থানান্তরিত করুন। তার ফলে এই অঞ্চলের প্রতি ইন্দ্রদেবের করুণার উদ্রেক হতে পারে।"

এই দাবিতে গৌতম ক্রুদ্ধ এবং আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাহলে প্রকৃতপক্ষে গৌতম কি তার মনকে যজ্ঞোদ্দিষ্ট করতে পারেননি? সেইজন্য অনাবৃষ্টি ও অনাহারের অভিশাপ নেমে আসছে!

পিতার কথা মনে পড়ল। তিনি বলেন—"সৎ ভাবনায় যে আহুতি দেওয়া হয় তাহাই যজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ। মানুষের এমন কোনও মনোবৃত্তি নেই যা যজ্ঞে অর্পণ করা যায় না। এমন কি বিদ্বেষ, ক্রোধ ও যজ্ঞোদ্দিষ্ট হলে তাহা নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে যায়।" আর্যগণ যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণ সোমরস অর্পণ করায় সোমলতা বর্তমানে দুর্লভ হয়ে উঠেছে। অথচ হৃদয়ের সোমরস-ই হল যজ্ঞের প্রাণ। এই অনন্ত দ্যুলোক, অগণিত ভূলোক, অসংখ্য সূর্য, লোক লোকান্তর সোমভাবনার সম্মুখে রেণুমাত্র। যদি গৌতমের মনে সোমভাবনার সরস্বতী প্রবাহিত হত, তাহলে এই অর্বাচীন রুদ্রাক্ষের কি এত স্পর্দ্ধা হত? আমি গৌতম বিরোধী নয়—কিন্তু রুদ্রাক্ষ এবং তার গোষ্ঠীর বিরোধীও নয়। বরং তাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ায় সবাই ভাবে আমি আর্য তথা গৌতম বিরোধী। আমার ছাত্রীজীবন থেকে আমার ওপর এই দোষারোপ চলছে, কিন্তু আজ গৌতমের সাথে রুদ্রাক্ষের এইরকম ব্যবহার আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে।

মনে মনে ভাবি, তাহলে কি আমার বিরুদ্ধে গৌতমের অভিযোগ সত্যি। আমার অযথা প্রশ্রয়ের জন্য দাসযুবকেরা বিনা অনুমতিতে আশ্রমে প্রবেশ করে অনাধিকার উপদ্রব করছে? মনে ক্ষোভ জাগে। আশ্রম অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অর্থ, আমিও তাদের কাছ থেকে দূরে চলে

যাই—সেটাই তারা চায়। গৌতম পত্নী হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আমার সমস্ত সৎভাবনা মূল্যহীন হয়ে গেছে। বোধহয় আমি অপাত্রে স্নেহ দান করেছি।

গৌতমের ক্রোধ আমার ক্ষোভ এবং রুদ্রাক্ষ ইত্যাদির উত্তেজনা লক্ষ্য করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাদের উদ্দেশ্যে বললেন—"হে শক্তিমান দাস যুবগোষ্ঠী তোমাদের শক্তি অসীম. কিন্তু শক্তির সদুপযোগ হল পুণ্য, অসদুপযোগ হল পাপ। পরিধির জন্য"রথের চাকার অরগুলি যেমন যথাস্থানে থোকে সেইরকম এই পৃথিবীর মানুষ যদি সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে আধার ও আশ্রয় করে তাহলে সংসারে শান্তি ও সহবস্থান সম্ভব হয়। শক্তি উচিত পথে পরিচালিত হয়। মানুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ের পরিকল্পনা করে, তখন এই ভিন্ন বিশ্বাসই সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নামে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। এই সংগ্রামের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের করালগ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠের নেতৃত্বে আর্যকরণ অভিযান শুরু হয়েছে। আর্যকরণের অর্থ হল একটা বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে সহাবস্থান করা। পরমেশ্বরের পরিধি থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল সীমালঙ্ঘন। সাম্প্রদায়িক বিচারে যে ভিন্ন ঈশ্বরকে কল্পনা করে সে আস্তিক হয়েও অন্যের বিশ্বাসকে প্রশ্ন করে ও নাস্তিকের মতো কাজ করে। তাই ঈশ্বরের আনন্দময় পরিধির মধ্যে মানবজাতিকে একত্র করাই হল আর্যকরণ অভিযানের উদ্দেশ্য। তোমরা এর অন্তরায় হচ্ছ কেন? কিন্তু জেনে রাখ সৎপথের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হওয়া বিঘ্নগুলির সূক্ষ্ম বিনাশক পরমেশ্বর সদা জাগ্রত। তিনি সমস্ত বিঘ্ন নাশ করবেন। তোমরা যদি সৎকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করো তাহলে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছ বলে ধরে নাও। তাই পরিণতি সম্পর্কে আমি বা কি বলব? সেটা তো তোমাদের আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছি।"

এই কথায় দাস যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং নিমেষের মধ্যে আশ্রমের শান্ত পরিবেশে প্রলয় সৃষ্টি হল। হিংসা ত্যাগ করায় বিশ্বামিত্র অস্ত্র ধরলেন না। গৌতম তো হিংসাভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধনারত। তাঁর মনে হিংসা থাকতে পারে, কিন্তু কারও বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধরতে পারবে না। তাহলে দাসদের এই মুর্খামি থেকে কে আশ্রম রক্ষা করবে? আজ কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করল না।

পিতার কথা মনে পড়ল। তিনি সবসময় এই কথাটা বলেন—"জীব স্বভাবত মুক্ত, কিন্তু ভগবৎ বিমুখ হওয়ায় সে মুক্ত হতে পারে না। কোনও বস্তু ভগবৎ শক্তি থেকে পৃথক নয়। বস্তু জড় হোক বা জীব সে ভগবৎ শক্তির সাথে অদৃশ্য রজ্জুতে সংযুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে এই দাসগোষ্ঠী পার্থিব বিকাশের পথে অগ্রণী হওয়ার ফলে ভগবৎ শক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে এবং গৌতম অনাবৃষ্টির কারণ বলে দোষারোপ করছে। তারা নিজে যদি ইন্দ্রের শক্তিকে স্বীকার করত, পরমাত্মাজ্ঞানে ইন্দ্রের স্তুতি করত তাহলে অভীষ্টপূরণকারী স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্রদেব কখনও নিষ্ঠুর হতেন না। এই অঞ্চলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠত না। গৌতম ও নিজের অবদমিত অহংকারের জন্য নিজের প্রার্থনা

যজ্ঞোদ্দিষ্ট করতে পারছেন না। প্রতিদিন বেদপাঠের মাধ্যমে ইন্দ্রের স্তুতি করলেও তাতে আন্তরিকতা নেই। এখন দাসগোষ্ঠীও ইন্দ্রবিরোধী। তারা ইন্দ্রদেবকে পরমশত্রু মনে করে। তাই ইন্দ্রদেবের স্তুতি করার প্রশ্ন কোথায়? আশ্রমের ঋষি এবং দাসগোষ্ঠী পরস্পরকে দোষারোপ করে পরিস্থিতি জটিল ও পরিবেশ দূষিত করছেন। এর পরিণতি আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই পরিস্থিতি থেকে এই ভূখণ্ডকে কে উদ্ধার করবে? পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে অভয় দিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন—"আর্য-অনার্যের শান্তিপূর্ণ সহবস্থান যদি এখানে সম্ভব নয়, তাহলে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু সেজন্য সময়ের দরকার এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও করতেও হবে। তোমরা যদি মনে করো গৌতম এখান থেকে চলে গেলে আর অনাবৃষ্টি হবে না, তাহলে অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যাপারে গৌতমের চিন্তা করা প্রয়োজন। তোমাদের স্বার্থহানী করে সে কখনও দেবর্ষি হতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের তো ধৈর্য ধরতে হবে.....।"

এইরকম এক অশুভ বাণী কেন উচ্চারিত হল মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে? উত্তেজিত অনার্য-যুবকদের শান্ত করার জন্য বিশ্বামিত্র কখনও মিথ্যা কথা বলবেন না। তাহলে কি বিশ্বামিত্রের জবানীতে নিয়তি কথা বলছিল?

কিন্তু আমি আমার কন্যা গৌতমীকে ছেড়ে এই অরণ্যের সীমা পার হতে পারব না। না-না আমি এর বিরোধীতা করব, দরকার হলে.....।

এইটুকু চিন্তা করতেই বুক কেঁপে ওঠে। সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর কেঁপে ওঠে। মনে হল সংস্কারের সেই প্রাচীর এত দৃঢ় যে তাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করলে ঐ ভাঙ্গা দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সেটাই মুক্তির একমাত্র পথ। গৌতম এবং আমার পুত্রদের ছাড়তে পারব না, তাছাড়া আমার কন্যা গৌতমী এবং প্রিয় দাসপল্লী ছেড়েও যেতে পারব না। একমাত্র সমাধান বৃষ্টি—ইন্দ্রদেবের করুণা। অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট বেশিদিন চললে আর্য-অনার্য সংঘর্ষ সুনিশ্চিত, তদুপরি গৌতম আশ্রম স্থানান্তরও সুনিশ্চিত।

ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করতে আমি বদ্ধপরিকর। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথায় ভরসা করে দাস যুবকেরা চলে যায়। ভাগ্যক্রমে আজ বিশ্বামিত্র উপস্থিত থাকায় নিশ্চিত প্রলয় থেকে রক্ষা হল। এই ঘটনা গৌতমের সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জলবন্টনের অসমতাহেতু অনার্যদের হিংস্র আচরণ স্বাভাবিক। আশ্রমে যজ্ঞভঙ্গ ও রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমাগত এইসব ঘটনায় আচার্য গৌতমের তপস্যায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি তো দূরের কথা দেবর্ষি হওয়ার দুরাশায় পরিণত হবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। একমাত্র উপায় ইন্দ্রতুষ্টি।

এই পরিস্থিতিতে অহল্যাই তার অলৌকিক সৌন্দর্য, মধুর ব্যবহার, অবিস্মরণীয় আতিথ্যের দ্বারা ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করে আশ্রমকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। এই বিষয়ে আশ্রমে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। অনাবৃষ্টি দূর হলে আশ্রম তথা তপোবনে শান্তি বিরাজ করবে তারপর গৌতম হিমালয় যাত্রা করবেন। দেবর্ষি পদ লাভ না করা পর্যন্ত গৌতম হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

হিমালয় যাত্রার পূর্বে শতানন্দের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ায় তাকে মিথিলা নরেশ জনক ঋষির রাজগুরু নিযুক্ত করার পরিকল্পনায় গৌতম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শতানন্দই গৌতমের নাম উজ্জ্বল করবে। শরৎভানু ও চিরকারীর দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করে গৌতম নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেদিন শতানন্দ সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য গৌতম মিথিলা যান। সেখানে থেকে ফিরে আসার পর ইন্দ্রদেবকে নিমন্ত্রণ করা হবে। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সামযজ্ঞের আয়োজন করার জন্য উপাধ্যক্ষ মাধুর্য, সত্যকাম এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীদের নির্দেশ দিয়েছেন গৌতম।

গৌতম চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রদেবের সারথি মাতলি বিমর্ষভাবে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বিনয় সহকারে জানালেন—"বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট দিনে আশ্রমের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করতে পারায় ইন্দ্রদেব দুঃখিত। আজ তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছেন আচার্য গৌতমের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। তাছাড়া অনাবৃষ্টিজনিত সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অলোচনা করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে এসে জানলাম আচার্য গৌতম আশ্রমে অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইন্দ্রদেবের আশ্রমে আসা সঙ্গত কি না সে কথা জানার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষের পত্নী হিসাবে আপনার অনুমতি পেলে তিনি আসবেন। নচেৎ ফিরে যাবেন। এখন তিনি তৃষ্ণা অনুভব করায় শীঘ্র আপনার মতামত জানালে তিনি আশ্রমে এসে তৃষ্ণা নিবারণ করবেন অথবা যতশীঘ্র সম্ভব ইন্দ্রলোকে ফিরে যাবেন। চিরস্রোতা ঝরণাগুলিও এখন ক্ষীণস্রোতা। অরণ্যের পক্ষীকূলও তৃষ্ণায় কাতর। তাই দয়া করে আপনি আপনার মত প্রকাশ করুন।"

আমি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করলাম না, আশ্রম থেকে ইন্দ্রদেব তৃষ্ণার্ত ফিরে যাওয়ার কথাটা কি করে সমর্থন করি। গৌতম ফিরে এলে আমার ওপরই ক্রুদ্ধ হবেন। তাছাড়া অতিথিকে ফিরিয়ে অধর্ম অর্জন করব কোন সাহসে? উপাধ্যক্ষ এবং অন্য সকলের চোখে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান জানাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেলাম। দ্বিধাহীন কণ্ঠে ইন্দ্রদেবকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালাম। শরৎভানুকে মাতলির সাথে পাঠিয়ে ইন্দ্রদেবকে সম্ভাষণ জানিয়ে আনার নির্দেশ দিলাম।

শরৎভানু শুধুমাত্র সৌম্যদর্শন নয়—সুকণ্ঠও। মধুর কণ্ঠে নির্ভুল উচ্চারণে সামগান করে শরৎভানু ইন্দ্রদেবকে আশ্রমে নিয়ে আসে। শরৎভানুর সামগানে ইন্দ্রদেব অত্যন্ত প্রীত হন। অতিথি ভবনে বসে শরৎভানুর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে তার সাথে আলাপ করেন।

ইন্দ্র স্বভাবত সঙ্গীত প্রিয় ও কলাপ্রেমী। স্বর্গরাজ্যের গায়ক মরুৎগণের সঙ্গীত যুদ্ধ এবং শত্রুর সম্মুখীণ হওয়ার সময়ে ইন্দ্রদেবকে উৎসাহিত করে।

আজ শরৎভানুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্রদেব প্রস্তাব দেন—"প্রিয় পুত্র শরৎভানু! আমার সহপাঠী ও বন্ধুপুত্র হিসাবে তুমি আমার 'পুত্র তুল্য'। তোমার সঙ্গীত নৈপুণ্যে আমি বিস্মিত

ও বিভোর। অমি জানি আমার বন্ধু দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ আচার্য গৌতমের আশ্রমে গান্ধর্ব বিদ্যার বিশেষ স্থান নেই। আমি একথাও জানি যে সঙ্গীতের প্রতি তোমার আকর্ষণ তোমার পিতাকে ব্যথিত করেছে। তুমি ও শতানন্দের মতো বেদজ্ঞ ও শাস্ত্র বিশারদ সেটাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। তাই তোমার প্রতিভা এই আশ্রমে অবহেলিত। গান্ধর্ব বিদ্যাশিক্ষা, কলা ও সঙ্গীত প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত স্থান হল স্বর্গরাজ্য। আমি তোমকে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যেতে চাই। একসময় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। আজ তারা বিশ্ববিখ্যাত শল্য চিকিৎসক। স্বর্গরাজ্যে বাস করে দেবতা পদে উন্নীত হলেও তারা সমগ্র বিশ্বে শল্য চিকিৎসক হিসাবে সম্মানিত। তাই তুমি স্বর্গরাজ্যে গন্ধর্বদের কাছে সঙ্গীতে উচ্চশিক্ষা লাভের পর স্বর্গরাজ্যের দেবসভায় সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে থাকতে পারো কিংবা মর্তলোকে ফিরে আসতে পার। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে সঙ্গীত প্রশিক্ষণ পেলে তুমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গায়ক হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পিতামাতার অনুমতি নিয়ে তুমি স্বর্গরাজ্যে এলে আমি খুশী হব।"

গৌতম শতানন্দদকে নিয়ে মিথিলায় চলে যাওয়ার পর শরৎভানু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। তার প্রতিভা যে গৌতমের কাছে অবহেলিত সেটা স্পষ্ট। কিশোর হলেও হীনমন্যতার বিষজ্বালায় সে জর্জরিত হচ্ছিল। সহোদরের মধ্যে ঈর্ষাভাব সৃষ্টি হওয়ার পিছনে গৌতমের ভূমিকা গৌণ ছিল না।

পিতার প্রচেষ্টায় শতানন্দ জনকের সভায় স্থান পাবে এ-তো গৌরবের কথা। কিন্তু কারও কোনও সাহায্য ছাড়া নিজের প্রতিভায় শরৎভানু যে ইন্দ্রসভায় উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। এটা তো গৌরবের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গৌতম অনুমতি দেবেন না কেন? স্বর্গলাভের জন্য গৌতম নিজে কৃচ্ছ্রসাধনা করছেন, তাঁর কিশোর পুত্র নিজের প্রতিভায় স্বর্গরাজ্যে স্থান পেতে চলেছে, এতে গৌতমের সুনাম বৃদ্ধি হবে।

আমি অতিথিকে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবার পূর্বেই ইন্দ্রদেবের সাথে শরৎভানুর এইরকম অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে শুনে খুশী হলাম। শরৎভানুর উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে ইন্দ্রদেবের আগ্রহ ও অযাচিত সাহায্য আমাকে অভিভূত করে। গত কিছুদিন যাবৎ শরৎভানুর বিমর্ষভাব আমাকে বিচলিত করছিল।

শরৎভানু তার মেধা ও গুণ অনুযায়ী কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটাই ছিল আমার চিন্তা। তার ওপর চিরকারীর চিন্তা তো বলে শেষ হবে না। কেবলমাত্র প্রতিভাবান পুত্রটির কীর্তিতে গৌরবান্বিত হয়ে অন্য সন্তানের প্রতি নিস্পৃহ থাকা গৌতমের মতো মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু আমার মতো সাধারণ মায়ের পক্ষে তা সম্ভব নয়। মায়ের দুশ্চিন্তা সন্তানকে লক্ষ্যপথে পৌঁছাতে পারবে না জেনেও মা কি সন্তানের চিন্তা ত্যাগ করতে পারে? বৃক্ষ কি জানে না যে ঝড়ের হাত থেকে সে তার ফল ফুলকে রক্ষা করতে পারবে না, তা সত্ত্বেও শাখা প্রশাখা আন্দোলিত করে ঝড়কে বাধা দেয় নিজে বিপর্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু আমি শরৎভানুর চিন্তায় বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বেই ইন্দ্রদেবের করুণা তার ভবিষ্যৎ

নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমি বারংবার ইন্দ্রদেবের কাছে ঋণী হচ্ছি। ইন্দ্রদেবের কাছে ঋণী কে বা নয়? এমনকি আচার্য গৌতমও। ইন্দ্রদেবের করুণা ব্যতীত আর্য ঋষিগণ এবং আশ্রমগুলি বিপন্ন হত। ঋণ ভারে একদিন সমাধিলাভের পর পদ্মফুল হয়ে ইন্দ্রদেবের নৈবেদ্যে লাগলে হয়তো এই ঋণভার কিছুটা লাঘব হত। তাছাড়া আর কিভাবে ঋণমুক্ত হব? কিন্তু উপকারীকে কৃতজ্ঞতা জানানো হল প্রথম কর্তব্য।

শরৎভানুর কাছে সব কথা শুনে আমি প্রথমে ইন্দ্রদেবকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি ভেবেছিলাম গৌতমও আনন্দিত হবেন এবং ইন্দ্রদেবের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। তাঁর অপ্রত্যাশিত আগমনে যথাবিহিত আতিথেয়তা হতে পারল না বলে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। গৌতমে থাকলে অত্যন্ত খুশী হতেন বলে বললাম।

ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি সযত্নে সোমরস প্রস্তুত করলাম। সোমরস অধিক সুস্বাদু হওয়ার জন্য ঘন মধু মিশিয়ে 'মধুশার' প্রস্তুত করলাম। অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে একবারে পনের সের সোমমধু পান করে অত্যন্ত প্রীত হলেন ইন্দ্রদেব। আশ্রমকে প্রচুর দান করে সহর্ষে প্রস্থান করলেন। অনিবার্য কারণবশত পূর্ব নির্ধারিত দিনে আসতে না পারার জন্য গৌতমের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন। ইন্দ্রদেব ধার্মিকদের মঙ্গলাকাঙ্খী রূপে পরিচিত। আজ সেটা সত্যি বলে আমার কাছে প্রমাণ করে গেলেন।

গৌতমের অনুপস্থিতিতে আমি যে ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, সেজন্য গৌতম অত্যন্ত খুশী হবেন বলে আমি ভেবেছিলাম। তাই আগ্রহ সহকারে গৌতমের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছিলাম।

শতানন্দকে জনক ঋষির সাথে পরিচিত করিয়ে পরের দিন অপরাহ্নে শতানন্দসহ গৌতম ফিরে এলেন। তাঁর আসার পূর্বেই শরৎভানুর ইন্দ্রলোকে যাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। ভাই নারদ তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে পৌঁচেছেন। শরৎভানুর দায়িত্ব ইন্দ্রদেব ভাই নারদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। শরৎভানু ভাই নারদের অত্যন্ত আদরের ভাগ্নে। ভাই নারদের বীণার সাথে মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে সে সকলকে মুগ্ধ করে দেয়। ভাই নারদের হাতে বীণা থাকায় শরৎভানু তাকে এত ভালোবাসে বলে আমার মনে হয়। পিতা ব্রহ্মাও শরৎভানুকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন এবং ইন্দ্রলোক-ই তার প্রতিভা বিকাশের যোগ্য স্থান বলে মন্তব্য করেছেন। এখন শুধু তার পিতা গৌতমের আশীর্বাদ নিয়ে সে যাত্রা করবে।

মহর্ষি জনকের কুলগুরু হিসাবে শতানন্দের নিযুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে, গৌতম অত্যন্ত খুশী হয়ে ফিরেছেন। কিন্তু আশ্রমে পৌঁছেই আশ্রমবাসীদের কাছে ইন্দ্রদেবের আগমন বার্তা পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। শরৎভানুর উচ্চশিক্ষার জন্য ইন্দ্রদেবের অযাচিত প্রস্তাব তাঁর ভালো লাগে না। আমি যেমন আশা করেছিলাম, সেরকম কিছু ঘটল না।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের অযাচিত সাহায্যকেও গৌতম অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তাছাড়া পিতা আশীর্বাদ প্রেরণের দ্বারা প্রকারান্তরে ইন্দ্রদেবের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। গৌতম পিতা ব্রহ্মাকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। অবশ্য শরৎভানুর এর চেয়ে বেশি কিছু হত

না বলে তার ধারণা। তাই শরৎভানুর জন্য তিনি একরকম নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু এইরকম অপ্রত্যাশিতভাবে ইন্দ্রদেবের আশ্রমে আগমন এবং অযাচিত দানের পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে? গৌতমের অনুপস্থিতির সময়ে কেন এলেন? প্রকৃতপক্ষে এইসব অপ্রত্যাশিত—না পরিকল্পনা অনুযায়ী!

আশীর্বাদ নিয়ে শরৎভানু চলে যায় ভাই নারদের সাথে। আমি জানি, শিক্ষা শেষ হওয়ার পর সে আর মর্তে ফিরবে না। যেখানে তার প্রতিভার আদর নেই সেখানে সে কেন ফিরবে? ইন্দ্রলোক থাক্। তার প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হোক, সে ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আমার মাতৃহৃদয় নীরবে অশ্রুমোচন করে—এটাই মায়ের জীবন ও নিয়তি। মায়ের অশ্রুধারা সন্তানের জন্য আশীর্বাদ। বিদায়বেলায় ক্ষণিকের জন্য শরৎভানুর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভাই নারদের সাথে ব্যোমযানে উড়ে যাওয়ার সময় সে খুব খুশী হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চলে যাওয়ার পর আমি বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করি। অশ্রুধারা আমার হৃদয়ের ভার লাঘব করে।

প্রকৃস্থিত হয়ে আমি ভাবি, শতানন্দের জন্য কোনও চিন্তা ছিল না, আজ তার ভবিষ্যত ও নিশ্চিত হয়ে গেছে। শরৎভানুর জন্য বেশি চিন্তা ছিল এবার তার চিন্তাও গেল। থাকল শুধু চিররুগ্ন বিনয়ী আজ্ঞাকারী কনিষ্ঠপুত্র চিরকারীর চিন্তা। খুব শীঘ্রই গৌতম নিজের তপস্যার জন্য হিমালয়ে চলে যাবেন। চিরকারীর কি ব্যবস্থা করবেন? প্রত্যেক সন্তান সফল হোক এই কামনা করলেও সবাইয়ের ভাগ্যে তা হয় না। তা বলে অসফল, দুর্বল সন্তানকে কি মা বাদ দিতে পারে? চিরকারী থাকুক আমরা চোখের সামনে চিরদিন। আমার অন্তে ঋচা ও রুদ্রাক্ষ আছে। গৌতমীও বড় হয়ে যাবে। আছেন মাধুর্য ও সত্যকাম। চিরকারী সকলের প্রিয়। তার কোনও অসুবিধা হবে না। হয়তো ইন্দ্রদেব তার কোনও গুণ দেখে তাকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন। তার চিন্তাই আজ আমার বাঁচার প্রেরণা। গৌতমের মতো সংসার বিরাগী স্বামী নিয়ে আমার একাকিনী জীবনে স্বল্পভাষী দীর্ঘসূত্রী চিরকারীই একমাত্র কলরব। প্রলয়ের আঘাত নারী অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু সন্দেহের আঘাত নারীর পক্ষে অসহ্য। তার ওপর স্ত্রীর সতীত্ব ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে স্বামীর অযথা সন্দেহ এমনই দুর্বিষহ যে, মাঝে মাঝে সেই সন্দেহের প্রতিবাদেই স্বামীর সন্দেহকে সত্যে পরিণত করার জন্য অবচেতন মনে প্রতিজ্ঞার বীজ বোনা হয়ে যায় অজান্তে।

গৌতমের সন্দেহ প্রবণতা ও সন্দিগ্ধ স্বামীত্বের পরিচয় পেয়েছি বহুবার। কিন্তু সন্দেহের স্বরূপ এত ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ যে প্রতিবাদের স্বর যতই তীব্র হোক না কেন সেই আঘাতের ব্যাথা ও রক্তক্ষরণ প্রশমিত হবে না।

গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্রদেব আশ্রমে অতিথি হওয়ায় গৌতম সন্দেহের নিম্নতম স্তরে নেমে গেছেন। তিনি ক্ষুব্ধ। শরৎভানু ইন্দ্রলোকে চলে যাওয়ার পর আমার জননী হৃদয়ের বেদনা প্রশমিত না হতেই গৌতম এতবড় আঘাত করতে পশ্চাৎপদ হলেন না, সেটাই আমাকে অধিক ব্যথিত করল।

পূর্ব নির্ধারিত দিনে উপস্থিত না হওয়ায় গৌতমের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য অন্যত্র যাওয়ার সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। আমি কি তাঁকে ফিরিয়ে দিতাম? পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতাম না। সোমপ্রিয় ইন্দ্রদেবকে সোমমধু অর্পণ করতাম না। তাঁব অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করতাম? আশ্রমে দেওয়া দান গ্রহণ করতাম না? তাতে ইন্দ্রদেব ক্ষুণ্ণ হতেন না? ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট না করলে কি গৌতম খুশী হতেন! পূর্বে ইন্দ্রদেবের আতিথ্যে আমার সামান্য কুণ্ঠাভাব গৌতম বরদাস্ত করতেন না। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে নানা উপদেশ শুনিয়েছিলেন তাই গৌতমের অনুপস্থিতিতে অধিক যত্নসহকারে আমাকে উভয়ের কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। এতে আমার ত্রুটি কোথায়? ইন্দ্রদেব একজন রসিক পুরুষ এবং আমি সুন্দরী যুবতী। এটুকুই কি আমাকে গৌতমের প্রতি অবিশ্বস্ত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট? নারী পুরুষের একান্তে সাক্ষাৎ হলে তাদের মধ্যে জৈবিক সম্পর্কের সূত্রপাত হওয়া কি অবধারিত? কোনও যুক্তিসঙ্গত কথা ছাড়া আমার সমস্ত গুণাবলীকে অগ্রাহ্য করে আমার ললাটে সন্দেহের কালো দাগ টেনে দিয়ে আমাকে কি অপমান করেননি? তাছাড়া নিজের কিশোর পুত্রের সম্মুখে জননীর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কি পিতার ধর্ম? তাও আবার সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে। সারা পৃথিবীর নিন্দা নারী সহ্য করতে পারে কিন্তু সন্তানের সম্মুখে নিজের চরিত্র সম্পর্কে স্বামীর সন্দেহ কোনও নারী বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু আমাকে তাও সহ্য করতে হল। কি আর করতাম? আমার হৃদয়ের নীরব বিদ্রোহ এত তীব্র ছিল যে, আমাকে সম্পূর্ণ মূক করে দিয়েছিল।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে গৌতম যদি আমাকে নিভৃতে ভর্ৎসনা করতেন তাহলে আমার এত কষ্ট হত না। তিনি সর্বসমক্ষে একথা প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়, নিজের কুৎসিৎ কল্পনার বশীভূত হয়ে তিনি এত নিম্নস্তরে নেমে গেলেন যে, চিরকারীকে ডেকে আদেশ দিলেন—"আমি স্নান করতে যাচ্ছি, আমি ফিরে আসার আগে তুই তোর জননী অহল্যার শিরশ্ছেদ করবি। তুই আমার আজ্ঞাকারী পুত্র। পিতৃআজ্ঞা পালন পুত্রের কর্তব্য। তাই পুণ্য অর্জনের এই সুবর্ণ সুযোগ তুই হাতছাড়া করবি না। স্নানের পর আমি তোর মায়ের কলঙ্কিত মুখ আর দেখতে চাই না। তার জন্য আমার বহুকষ্টে সঞ্চিত পুন্য ক্ষয় হবে।" কুণ্ঠিত, ত্রস্ত, বিব্রত কিশোর চিরকারী পিতাকে প্রশ্ন করে—"কিন্তু মাতৃহন্তা হব কি করে? এতবড় অপরাধ কি করে করব?" —"পিতৃআজ্ঞা পালনের পুণ্যবলে সেই অপরাধ দূর হয়ে যাবে। তাছাড়া যে আদেশ দেয় সেই হত্যাকারী তুই স্ব-ইচ্ছায় জননীকে হত্যা করছিস না, তুই শুধুমাত্র আজ্ঞা পালন করছিস। অস্ত্রদ্বারা নরহত্যা সংঘটিত হয়, শিরশ্ছেদ করে অস্ত্র কিন্তু নরহত্যার অপরাধ অস্ত্রের নয়, যে অস্ত্র উত্তোলন করে তার। তাই তোর কোনও পাপ বা অপরাধ হবে না।" তার্কিক গৌতম যুক্তির সাহায্যে চিরকারীকে প্রভাবিত করলেও পুনর্বার কুণ্ঠিত কণ্ঠে চিরকারী প্রশ্ন করে—"কিন্তু আমার মায়ের অপরাধ কি, তা না জেনে আমি তাকে হত্যা করব কিভাবে?

—"তোর জননী তোর পিতার প্রতি অবিশ্বস্তা, আমার অনুপস্থিতিতে নারীপ্রেমী, কামুক ইন্দ্রদেবকে একান্তে আতিথ্য দান করে সন্তুষ্ট করায় তার চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে। আমি তাকে সন্দেহ করি। আমার সন্দেহ-ই প্রমাণ—তাই অন্য কোনও প্রমাণ না চেয়ে শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর।"

এইটুকু বলে গৌতম নদীর দিকে প্রস্থান করলেন। স্তব্ধ চিরকারী ব্যথিত হৃদয়ে বসে থাকে। চতুর্দিকে তার কাছে বিভীষিকাময় মনে হল।

রান্না শেষ করে খাওয়ার জন্য আমি চিরকারীকে ডাকলাম, সে আমার ডাক শুনতে পেল না। ভাবলাম ভাইয়ের অনুপস্থিতে একা খেতে তার ইচ্ছা করছে না। শতানন্দ তো গৌতমের আদরের পুত্র। এই শতানন্দ ও চিরকারীর মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রীতি। ছুটির দিনে একসাথে খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলো। তাই ছেলেটার একা একা লাগছে ভেবে আমি তাকে কোলে টেনে বললাম—"কিরে ভাইয়ের জন্য মন খারাপ করছে, সে তো উচ্চশিক্ষার জন্য গেছে, যখন খুশী ফিরে আসবে। ইন্দ্রদেব অত্যন্ত উদার এবং স্নেহশীল পুরুষ। আমার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে আটকে রাখবেন না। আমি অনুরোধ করলে শিক্ষা শেষ হলে শতানন্দকে স্বর্গে স্থান না দিয়ে মর্তে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর মর্তেও গান্ধর্ব বিদ্যার প্রসার হবে।"

আমার মুখে ইন্দ্রদেবের প্রশংসা শুনে চিরকারী চমকে ওঠে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়ার চেষ্টা করে। আমার মুখে কি দেখল কে জানে—অকস্মাৎ তার কঠোর মুখ কোমল হয়ে গেল। আমার বুকে মাথা রেখে সে কেঁদে ফেলে তার হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল মাটিতে। নিরীহ, কোমলস্বভাব চিরকারীর হাতে অস্ত্র দেখে আমিও বিস্মিত। পশু পাখিকে আঘাত করা তো দূরের কথা, কাঠ সংগ্রহ করতে গেলে গাছের শুকনো কাঠও কাটে না। পাছে তাদের আঘাত লাগে। অত্যন্ত অহিংস আমার চিরকারী। পশুবলি সে সহ্য করতে পারে না, রক্ত দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলে আজ তার হাতে কে তুলে দিল তীক্ষ্ণ অস্ত্র? আমার বুকে মাথা রেখে চিরকারী বলে—"মা" ইন্দ্রদেবের নাম তুমি আর উচ্চারণ করো না। তোমার মুখে তাঁর প্রশংসা পিতার সন্দেহকে দৃঢ় করছে। ইন্দ্রদেবের সাথে তোমার সম্পর্ককে পিতা সন্দেহ করেন, সেইজন্য তোমাকে হত্যা করে গৌতম আশ্রমকে পাপশূন্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পিতার আজ্ঞাপালন করা পুত্রের ধর্ম। কিন্তু মাতৃহত্যা পুত্রের ধর্ম কি না সেটাই আমার মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া নারী "অঘ্না"। যতবড় অপরাধ করলেও নারী বধ্য নয়। তাই পিতার আজ্ঞা শাস্ত্রসম্মত কি না সে বিষয়েও আমার দ্বন্দ্ব রয়েছে। তুমি আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও এবং আমার দ্বন্দ্বের সমাধান করার জন্য আমাকে একা ছেড়ে দাও।"

পুত্রের মুখে এইরকম কথা শুনে ক্ষোভে অপমানে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া উচিত মনে হল আমার। কিন্তু কুৎসিৎ দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা হওয়ায় প্রতিবাদে আমি অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠলাম। রোষপূর্ণ নেত্রে চিরকারীর দিকে তাকিয়ে বললাম—"বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই আমার, কিন্তু তোকে আমি মাতৃহত্যার পাপে দোষী হতে দেব না। তোর

পিতার যদি আমার ওপর সন্দেহ হচ্ছে তাহলে তিনি স্বহস্তে আমাকে বধ করুন।" কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে চিরকারী। সহসা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে গভীর চিন্তায় ডুবে যায় সে। আমি জানি, বিলম্বে হলেও পিতার আদেশ পালন করবে সে। কিন্তু তার পূর্বে সে শতবার ভাববে। হৃদয়ের অনুমোদন ব্যতীত সে কোনও কাজ করবে না, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে চিরকারীকে মাতৃহত্যার অপরাধে ভাগী করব না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয় আমার চিরকারীকে জঘন্য অপরাধ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি আশ্রম থেকে দ্রুত গভীর অরণ্যের দিকে চললাম। চিরকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময়ে আমার তার সম্মুখে না থাকাই শ্রেয়। তাহলে সে মাতৃহন্তা হওয়ার দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে। যার অর্থ আমি আর কখনও চিরকারীর সামনে আসব না।

সম্মুখে ক্ষীণ জলধারা বাহু প্রসারিত করে ডাকছে। মানুষের তৃষ্ণা নিবারমের পক্ষে জলধারা ক্ষীণ হতে পারে, কিন্তু আমার ক্ষীণ শরীরকে স্থান দেওয়ার জন্য তা পর্যাপ্ত। পিছন থেকে ডাকছে আমার প্রাণপ্রিয় চিরকারী—মা-মা—সম্ভবত সে পিতার আদেশ পালন করতে বদ্ধ পরিকর। তার দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। কোথায় আত্মগোপন করব? বনচারী চিরকারী অরণ্যের কোন নিভৃত স্থান বা না জানে? তাহলে কি আমার নিষ্পাপ নিরীহ পুত্র মাতৃহত্যা পাপের ভাগী হবে—অপরাধবোধে অভিশপ্ত হয়ে যাবে তার অবশিষ্ঠ জীবন।

আমার সম্মুখে আর কোনও পথ নেই। আত্মগোপনের একমাত্র স্থান হল নদীগর্ভ। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই, ভয় পুত্রের অনিচ্ছাকৃত পাপের।

গৌতম! এবার তোমার সাধনার পথ নিষ্কণ্টক। সমস্ত সংকীর্ণ ভাবনা থেকে অহল্যা তোমাকে মুক্তি দিচ্ছে। কিন্তু আমার চিরকারীকে তুমি মুক্তি দাও তোমার নিষ্ঠুর পিতৃত্বের বন্ধন থেকে। তাকে তার পথে চলতে দাও। একবার চিরকারীকে কোলে নিয়ে আদর করার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, এ জন্মে আর তার সাথে দেখা হবে না। পিছনে তাকালে তাকে দেখা যেত, কিন্তু তার কোমল হাতে গৌতম নির্দেশিত শাণিত অস্ত্রকে গ্রহণ করতে পারব না।

একবার তিনপুত্রকে স্মরণ করলাম, আশীর্বাদের অনন্ত আলিঙ্গনে। জড়িয়ে ধরলাম তাদের বুকের মধ্যে। তারপর মুক্ত করে দিলাম তাদের এবং নিজেকে সমস্ত পার্থিব বন্ধন থেকে। ঝাঁপ দিলাম নদীবক্ষে। নদীও আমাকে কোলে নিতে কুণ্ঠিতা। কার সুদৃঢ় বাহু আমাকে নদীগর্ভ থেকে তুলে নিল শূন্যমার্গে। আমি অচেতন হয়ে গেলাম।

সচেতন হতে আমার চারপাশে পারিজাতের সুগন্ধ। তাহলে কি আমি ইন্দ্রদেবের নন্দনকাননে মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলাম এতক্ষণ? কিন্তু চোখ খুলে দেখি আমি শুয়ে আছি আমার পর্ণকুটীরের তৃণশয্যায়। নদী থেকে কে আমাকে তুলে নিয়ে এল?

আমার ক্লান্ত কপালে কে দিচ্ছে কোমল স্পর্শ? আমার চিরকারী?

আমার চোখ মুছে দিয়ে শাশ্বত আশ্বাসের স্বরে প্রথা বলে—কোথায় গিয়েছিলে ঘর ছেড়ে? সামান্য কথায় জীবন হারিয়ে দিলে সংসার চলে? পারিজাতের সুগন্ধ আর একবার ভরিয়ে দেয় আমার দেহমন। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রথার দিকে তাকাই—"তাহলে কি

সর্বারিষ্ট খণ্ডনকারী ইন্দ্রদেব নদী থেকে তুলে আমাকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়েছেন? প্রথা সব বুঝতে পারে। সে বলে—না গো অহল্যা, ইন্দ্রদেব নয়, তাঁর প্রিয় হাতি ঐরাবত মর্ত ভ্রমণে এসে নদীর তীরে বনবিহার করছিলেন, তোমাকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখে নিজের শুভ্র শুঁড়ে তোমাকে তুলে এনে আশ্রম প্রাঙ্গণে শুইয়ে দিয়ে গেছে, তোমাকে তো সে চেনে।"

—"এই পারিজাতের সুগন্ধ....." আমি জিজ্ঞাসা করি।

—"ইন্দ্রদেবের বাহন ঐরাবতের প্রতিটি লোমে পারিজাতের সুগন্ধ.....।" প্রথা জানায়।

—"কিন্তু ঐরাবত তো ইন্দ্র নয়, তার কি দরকার ছিল আমাকে জল থেকে তুলে আশ্রমে নিয়ে আসার। আমি স্ব-ইচ্ছায় সমাধিলাভ করতাম, সব অশান্তি মিটে যেত—" ক্ষোভে অভিমানে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়।

শান্তস্বরে প্রথা বলে—"আত্মবিসর্জন মহা পাপ।"

—"মাতৃহত্যা থেকে ত' বড় পাপ নয়—আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিই। গৌতমের ওপর আমার রাগ হচ্ছিল। ছেলেকে কোথায় সৎবুদ্ধি দেবে তা নয়—পাপের পথে উৎসাহিত করছেন।"

অবিচলিতভাবে প্রথা জানায়—"চিরকারীকে মাতৃহত্যা করতে হত না। স্নান সেরে আশ্রমে ফিরেই চিরকারীকে ডেকে গৌতম তার আদেশ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন মাতৃহত্যার প্রয়োজন নেই।"—তাহলে কি গৌতমের সন্দেহ দূর হয়েছে?"

আমার বুক থেকে একটা রুদ্ধ অভিমান সরে যায়। তাহলে গৌতমের মিথ্যা সন্দেহ দূর হয়েছে—তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। দাম্পত্যজীবনে এইরকম ঘটে। যে নিজের স্ত্রীর প্রতি অধিক আসক্ত সে তার সম্পর্কে ততটাই রক্ষণশীল। নিজের ঘরে অন্য পুরুষের ছায়াও সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত গৌতম নিজের আসক্তি প্রকাশ করেন না। কিন্তু গৌতম অহল্যানুরাগী। আমি প্রকৃতিস্থা হলাম। প্রথাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"স্বামী প্রসন্ন হয়েছেন তো? আমার ওপর তাঁর বৃথা সন্দেহ দূর হয়েছে জেনে খুশী হলাম। কিন্তু চিরকারী যদি দীর্ঘসূত্রী না হত তাহলে আমার নিষ্প্রাণ দেহের সামনে গৌতম হাহাকার করত.....।"

আমার কণ্ঠস্বরে পত্নীত্বের অহংকার ছিল। প্রথা সে কথা বুঝতে পারে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—"না, অহল্যা। তোমার হত্যাদেশ প্রত্যাহারের পিছনে গৌতমের স্বার্থ ছিল। চিরকারী তোমাকে হত্যা করলে, নরহত্যার দোষ গৌতমেরই হত। সেকথা তিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন। ইতিমধ্যে চিরকারী বহু চিন্তাভাবনা করে পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ভাগ্য ভালো, তার পূর্বেই তুমি আশ্রম ছেড়ে অরণ্যে চলে গিয়েছিল, তা না হলে কি অঘটন যে ঘটত.....। গৌতম ফিরে আসার মধ্যে গৌতম আশ্রম ভেদ করে পাপ ছড়িয়ে পড়ত সমগ্র পৃথিবীতে.....।'

পাপ পুণ্য সম্পর্কে প্রথা আরও কত কথা বলছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পারছিলাম না। আমার ওপর সন্দেহ দূর হয়েছে বলে নয়, কিংবা আমার জীবন কাম্য বলেও নয়। নিজে

নারীহত্যার দোষে দোষী হবেন জেনে ঐ হিংস্র আদেশ প্রত্যাহার করেছেন গৌতম। ক্ষোভ ও বিদ্রোহে আমার অন্তর [illegible] হয়ে যায়। নিষ্ফল আক্রোশে আমি না হয় ভেঙে পড়েছিলাম, কিন্তু গৌতম ছিলেন সুপ্ত আগ্নেয় গিরির মতো শান্ত, অটল, গম্ভীর। ভিতরে ভিতরে তিনি সন্দেহে হিংস্র [illegible] জ্বলছিলেন। তবে তাপে আমি যেন সহজে দগ্ধ হচ্ছিলাম। শুধু ভস্মীভূত হওয়া [illegible] বাকি ছিল।

চিরকারী নিরুদ্দিষ্ট। শতানন্দ ও শরদ্বান আমাকে ছেড়ে দূরে আছে। সেটা আমার পক্ষে [illegible] হলেও অসহ্য নয়। তাদের দূরে থাকাটা তাদের কৃতিত্ব। শতানন্দ জনক রাজ্যে পৌরোহিত্য করতে যাচ্ছে এবং শরদ্বান ইন্দ্রলোকে খ্যাতিলাভ করেছে। মা হিসাবে আমি গর্বিত। কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দুঃখেই চিরকারী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। মূর্চ্ছিত অবস্থায় এবারও যখন আমাকে আশ্রমে নিয়ে আসে, তখন মাতৃহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিল চিরকারী। আমার চেতনা ফেরার পর সে তখন আমার মুখোমুখি হতে পারবে না বলে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে প্রথাকে বলে—"আমি আমার মায়ের হত্যাকারী অযোগ্য পুত্র। আমার দুই ভাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু আমি পিতার নাম উজ্জ্বল করতে অক্ষম। সেইজন্য পিতা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হতেন। মা কখনও আমাকে অনাদর করেননি বরং আমি দুর্বল, অক্ষম বলে আমার প্রতি তাঁর অধিক স্নেহ। অথচ পিতার ভয়ে হোক কিংবা তাঁর আজ্ঞাকারী পুত্রের বাহবা পাওয়ার জন্য আমি আমার জননীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পিতা তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেও আমি নিজেকে মাতৃহন্তা মনে করি। আমি কি করে মায়ের দিকে তাকাব—'মা', 'মা' ডাকার সময়ে আমার মাথা কাটা যাবে না কি? তাই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি গভীর জঙ্গলে যাচ্ছি। আমি জানি ক্ষমাশীলা জননী আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আগামী জন্মে আমি যেন মায়ের গর্ভে জন্মাই ...।"

এইটুকু বলে কাঁদতে কাঁদতে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চিরকারী চলে গেল। কেউ তাকে আটকাতে পারল না। গৌতম ধ্যান থেকে ওঠার সময়ে চিরকারী অন্তর্ধান হয়েছে। সে কি কেমন ধ্যান, যাতে পৃথিবী প্রলয়ের ধ্বনিও দুন্দুভিত হয় না।

আমার চেতনা ফেরার পর কাঁপা গলায় প্রথা চিরকারীর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার হৃদয়বিদারক কাহিনী আমাকে শোনায়। চিরকারী..... চিরকারী..... কাঁদতে কাঁদতে আমি আবার মূর্চ্ছিতা হয়ে যাই।

গৌতম স্থিত প্রজ্ঞ।

সুখে দুঃখে তিনি নির্বিকার। তার মনে কি ভাবনা জাত হয়েছিল তা শুধু তিনিই জানেন। চিরকারীর গৃহত্যাগে আমি মৃতবৎ পড়েছিলাম বহুদিন। সময়ের মহৌষধ ক্রমশ আমাকে ওপার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। যখন চোখ খুলি, চিরকারীর চেহারা আমার সামনে। মনে মনে গৌতমকে দোষ দিই। দায়ি করি। গৌতম দায়ি করেন আমাকে। গৌতমের সন্দেহভাজন

হওয়ার মতো কাজ যদি আমি না করতাম, তাহলে তিনি কেন আমাকে সন্দেহ করতেন? যদি সন্দেহ না করতে তাহলে পুত্রকে মাতৃহত্যার আদেশ দিতেন না, আর চিরকারী-বা নিরুদ্দিষ্ট হত কেন? তাই চিরকারীকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করার জন্য আমিই দায়ী বলে গৌতম প্রথার কাছে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমি কার কাছে অভিযোগ করব? প্রথা বেশীরভাগ গৌতমের স্বপক্ষে। তাছাড়া অভিযোগ করে কি পাব? গৌতমকে দোষী সাব্যস্ত করে কি ছেলেকে ফিরে পাব?

আমাদের দুজনের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। চিরকারী চলে যাওয়ার পর কথাবার্তাও বন্ধ। কিন্তু গৌতমের দৃষ্টিতে সন্দেহের সংলাপ নিজে নিজেই ফুটে উঠত। খর্বকায় হয়ে আমার পাশে দাঁড়ালেই তাঁর চোখে সন্দেহ বেশি কদাকার দেখাত। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনও উপায় ছিল না। আমি নিঃসঙ্গভাবে নির্জন ঘরে পড়ে থাকি।

খবর পেয়ে ভাই নারদ এসে পৌঁছালেন। স্বর্গরাজ্য থেকে শরৎভানুর খবর এনেছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীতে সে গন্ধর্বদেরও ছাড়িয়ে গেছে। সে গন্ধর্বদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। স্বর্গরাজ্যে দেবতাদের অহংকার ও একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শরৎভানু দেবতা নয়, গন্ধর্ব ও নয়। কিন্তু শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাকে গন্ধর্বনায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ দেবতাগণ মর্ত্যবাসী হওয়ায় তাকে অনুকম্পা দেখান, কিন্তু দেবলোকের নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। স্বর্গলোকে সে যেন অপাঙক্তেয়। গন্ধর্বদের অলৌকিক শক্তি থাকলেও দেবতারা তাদের হীন মনে করেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাদের যজ্ঞের ভাগ নেই, এমনকি সোমামৃত পান করার অধিকারও নেই। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য এই গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ অকুণ্ঠচিত্তে নিজেকে উৎসর্গ করেন, বিনিময়ে তারা ভোগ করে দেবতা ও ঋষিদের অভিশাপ। অপবাদ নিন্দাই তাদের নিয়তি। স্বর্গরাজ্যে থাকলেও গন্ধর্বদের বাসস্থান পৃথক গন্ধর্বলোক। দেবলোকে তারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করতে পারে, কিন্তু বসতি স্থাপন করতে পারবে না। স্বর্গলোকে এই ধরনের নানা বৈষম্য। শরৎভানু ইন্দ্রদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় স্বর্গরাজ্যের রাজনীতির নানা দোষত্রুটি উত্থাপন করলেও ইন্দ্রদেব বিমুখ হন না। উপরন্তু তিনি শরৎভানুর বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করেন। ইতিমধ্যে গন্ধর্বদের অনেক দাবিও তিনি পূরণ করেছেন। পূর্বে দেবী সরস্বতী ও দেবী গায়ত্রীকে পণবন্দি রেখে গন্ধর্বরা দেবতাদের অসহায় করেছিল। সেই পণ অনুসারে যজ্ঞের সময়ে বেদমন্ত্র পাঠের সাথে সাথে বেদমন্ত্র গানও করা হল। বাগ্‌দেবীর সুললিত কণ্ঠে বেদমন্ত্রের গান সমধুর সামগানে পরিণত হল। সংগীতকলার সমাদরের ক্ষেত্রে সেটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। বর্তমানে শরৎভানুর প্ররোচনায় গন্ধর্বগণ দাবি জানিয়েছেন যে, নৃত্য সঙ্গীত ইত্যাদি ললিতকলায় পারদর্শী ব্যক্তিদের পণ্ডিত আখ্যা দেওয়া হোক। গন্ধর্ব বিদ্যাও দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠালাভ করুক। পৃথিবীর সবাই যদি শরৎভানুর পিতা গৌতমের মতো তর্কনিষ্ঠ হন, তাহলে পৃথিবীর গাছপালাও নির্বাক হয়ে যাবে, জলদগম্ভীর আকাশ স্থবির হয়ে যাবে। জলধারা জড়ে পরিণত হবে মেঘের গ্রন্থিতে। তাহলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি হবে?

সরস জীবনযাপনের জন্য নৃত্য, গীত আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র চিত্ত বিনোদনই শিল্পকলার উদ্দেশ্য নয়, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করাও শিল্পকলার লক্ষ্য। তপস্যার মতো রসসাধনাও আধ্যাত্মিক উত্তরণের মাধ্যম হওয়ায় রসসাধকও মহর্ষি ও দেবর্ষি হিসাবে গণ্য। নারদ রসসাধক হয়ে দেবর্ষিরূপে গণ্য হতে পারেন—তাহলে গন্ধর্ব তথা মানুষ শিল্পের সেবা করে, রসসাধনায় উৎকর্ষতা লাভ করলে দেবর্ষির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন না কেন? এই বিষয়ে দেবতাদের বিরোধিতা করার অর্থ বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া। দেবলোকে এই ধরনের বৈষম্য থাকা অশোভনীয় বলে শরৎভানু দাবি করেছে। এমনকি 'মামা'কেও আঘাত করতে পশ্চাৎপদ হয়নি। কিন্তু তার গণতান্ত্রিক সাম্যনীতি ও সৎসাহস ইন্দ্রদেবকে মুগ্ধ করেছে। শরৎভানুর দাবিগুলি ইন্দ্রদেব বিচার বিবেচনা করছেন।"

শরৎভানুর প্রশংসা করার পর ভাই নারদ শতানন্দের খবরও দিলেন। আসার সময়ে তিনি মিথিলা রাজ্যে কিছুদিন ছিলেন। শতানন্দের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞ মিথিলা নরেশের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। অচিরেই শতানন্দ জনকরাজার কুলগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করবে।

হাসতে হাসতে ভাই নারদ বললেন—"তোর মত ভাগ্যবতী জননী আর কে আছে অহল্যা! বড় ছেলে শাস্ত্রজ্ঞ, ছোট ছেলে সঙ্গীতজ্ঞ.....।" এইটুকু বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু বর্ষণ হতে থাকে। আনন্দাশ্রু কম বেদনাশ্রু বেশি। সেটা ভাই নারদের চোখে বাদ যাবে কি করে? তিনি'ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুখ দুঃখের সাক্ষী।

আমার মন ভোলাবার জন্য তিনি বললেন—"ছেলেদের খ্যাতিতে গর্বে তোর বুক ফুলে যাওয়ার কথা। অথচ.....।"

—"তুমি কি বুঝবে আইবুড়ো দেবর্ষি? শতপুত্রের কীর্তির আনন্দের মধ্যে একটি অবহেলিত অকৃতকার্য পুত্রের জন্য জননীর ব্যথা কম হয় না, বরং শতগুণ বৃদ্ধি হয়। যে ছেলেটি দুর্বল সেই হল মায়ের বুকের কোমল দুর্লভ দুঃখ। তাকে ঘিরেই মায়ের জীবন মরণ। অহল্যার সামনে তুমি আর কারও গৌরব গাথা বলো না।" প্রথা আমার মনের ব্যথা বোঝে। আমার মনের কথা ভাই নারদকে বলে দেয়, যা আমি বলতে পারিনি। ভাই নারদ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার অশ্রুসিক্ত মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন—"ধৈর্য ধর অহল্যা, তোর ছেলে হারায়নি, সে আছে।"

হারানিধি পাওয়ার মতো আমি বললাম—আমার সোনা হারায়নি, কোথায় আছে? তুমি দেখেছ? এতক্ষণ বলোনি কেন?

ভাই নারদ আরও গম্ভীর স্বরে দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করেন—"এই পৃথিবীতে কেউ হারিয়ে যায় না অহল্যা। সবাই নিজের নিজের জায়গায় যেখানে হোক থাকে। আমরা খুঁজে পাইনা বলে—'হারিয়ে গেছে' বলাটা কি ঠিক? তুই কি সমগ্র পৃথিবীতে চিরকারীকে খুঁজেছিস? —তাহলে—।"

নিমেষের মধ্যে আমার সমস্ত উৎসাহ ভস্মস্তূপে পরিণত হল। আমি আর একটাও কথা বললাম না। অভিমান, অসফল ক্রোধ, অসহায়তা সব কিছু মিলে আমি মৃতপ্রায়। নিষ্প্রভ

চাঁদের মতো ম্লান হয়ে বসে থাকলাম। আর কোনও আশা নেই, চিরকারীকে আমি কোনওদিন খুঁজে পাব না। সারাজীবন তার জন্য দুঃখ পাওয়াই আমার নিয়তি।

ভাই নারদ আমার মনের কথা বুঝলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—চিরকারী যেখানেই থাকুক, ভালো থাকবে। সবাইর স্নেহভালোবাসা লাভ করবে। প্রায়শ্চিত্ত করবে তার সিদ্ধান্তর জন্য। তার তপস্যা কি তোকে খুশী করে না। ঋষিপুত্র আর কি করত? অবশ্য আমি নিশ্চয় তার খোঁজ করব। পৃথিবীর সব জায়গায়ই আমার যাতায়াত। হয়তো এখানেই কোনও অরণ্যে রয়েছে, ফলমূল খাচ্ছে। মনের পরিবর্তন হলে নিজেই ফিরে আসবে। সে জানে তুই তার জন্য কত কষ্ট পাচ্ছিস। তাই দেরি হলেও সে ফিরে আসবে অহল্যা। এখন তুই মনকে শান্ত করে অরণ্যে চিরকারীর খোঁজ কর। প্রাণ খুলে তাকে ডাক। দেখি, মায়ের ডাক সে কি করে উপেক্ষা করে.....।"

শানিত কণ্ঠে প্রথা বলে—অহল্যা আর অরণ্যে ভ্রমণ করতে যায় না—গৌতমের নিষেধ। একবার অরণ্যে গিয়ে ঐরাবতের দ্বারা জীবনরক্ষা পায়, আবার কোনও বিপদে পড়লে ইন্দ্রদেব ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে উপস্থিত হতে বাধ্য হবেন। ইন্দ্রদেবের অযাচিত সাহায্য গৌতম গ্রহণ করতে পারবেন কি? ভাই নারদ সব জেনেও অজানা। সরল বালকের মতো গৌতমকে প্রশ্ন করেন—"অহল্যাকে বন্দিনী করে রেখেছ কেন ভগ্নিপতি মহাশয়? তালা বন্ধ করে দিয়ে যাও না কি? কাকে ভয়? চিরকারীর মতো অহল্যা নিরুদ্দেশ হবে না! অহল্যা কি ছেলেমানুষ যে রাগের বশে তোমাকে ছেড়ে অরণ্যে হারিয়ে যাবে। সেরকম হলে তোমার মতো তর্কবাগীশ মোক্ষকামী, শুষ্ক, নীরস, দার্শনিক স্বামীর কাছে এতদিন থাকত না। কতদিন হারিয়ে যেত। যদি হারায়, নিজের ইচ্ছায় নয়, তোমার অসাবধানতার জন্য হারিয়ে যেতে পারে। এবার অহল্যার প্রতি একটু যত্নশীল হও। স্বামী হওয়াটা কি এত সহজ ব্যাপার ভেবেছ? শিব, বিষ্ণু ইন্দ্রদেবকে দেখো। স্ত্রীর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়েও নিজ নিজ সাধনায় মগ্ন রয়েছেন। তুমি যদি প্রেমিক নয়, তাহলে কি স্বামী হয়েছ? প্রেম কি মোক্ষপথের বাধা? যদি তাই হয়, তাহলে বিয়ে করার প্রয়োজন ছিল না। বিয়ে করবে সংসারীও হবে, আবার জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি থেকে দেবর্ষি। দেবর্ষি থেকে দেবেন্দ্র হওয়ার জন্য নিরন্তর সাধনা করবে। দাম্পত্য জীবন নষ্ট'ত হবেই, আমি কি এইসব জানি না। সেইজন্যই বিয়ে করিনি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ভেবে দেখ, তুমি বিবাহের সমস্ত ধর্ম পালন করছ ত?"

রসিকতার ছলে আমাদের দাম্পত্য জীবনের গভীর দুর্বলতার ওপর আঘাত করেছেন ভাই নারদ। ক্ষুণ্ণ হলেও গৌতম কিছু উত্তর দিতে পারেন না। শুধু এইটুকু বললেন—"বিবাহের কিছু নিয়মশৃঙ্খলা অহল্যাকে মানতে হবে। ইচ্ছামত অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো কি তার শোভা পায়। কখনও অনার্যপল্লীতে, কখনও নদীর জলে। ঐরাবতের চড়ে ভ্রমণ ও পারিজাতের প্রলোভন থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। সেইজন্যই তার অরণ্য ভ্রমণ নিষিদ্ধ। এটা আমার আদেশ।" গৌতমের অযৌক্তিক শাসনে ভাই নারদও কম ক্ষুণ্ণ হননি। আমার পক্ষ হয়ে ভাই নারদ বললেন—ঐরাবত অহল্যার বাল্যসঙ্গী। ইন্দ্রদেব যখন

ব্রহ্মাদর্শনে আসতেন, তখন বালিকা অহল্যার কাছে ঐরাবত ছিল প্রিয় খেলনা। ঐরাবতও অহল্যাকে প্রাণাধিক ভালোবাসে। রম্যবনের কোন পশুপাখীই বা অহল্যাকে ভালবাসে না, যে ঐরাবতকে দোষ দেবে। তাই অসাবধানতাবশত অহল্যা জলমগ্ন হওয়ায় ঐরাবত তাকে উদ্ধার না করে কি করত? অহল্যার সলিল সমাধি হলে কি আপনি খুশী হতেন? কি অদ্ভুত ভাবনা আপনার ভগ্নিপতি মহাশয়? পারিজাত ফুল কার বা প্রিয় নয়? যার প্রিয় নয় তার প্রাণে সৌন্দর্যবোধই নেই। অহল্যা'ত আমাদের বরাবরই কলানুরাগিনী। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীরও পারিজাতের লোভ। অহল্যা'ত সামান্য মানবী। পুষ্পপ্রীতি কি অপরাধ? আমার ছোট্ট কথাটা শুনুন মহর্ষি। অহল্যার আত্মাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। স্বামীত্বের অহঙ্কারে অহল্যার শরীরকে বন্দী করতে পারেন, কিন্তু আত্মাকে বেঁধে রাখতে পারবেন কি? আমি সংসারী না হলেও সমগ্র সংসারের অভিজ্ঞতা আমার নখদর্পণে, যা হওয়ার হয়েছে নিজের সংসারটাকে আর ধ্বংস করবেন না। সামনে দুঃসময় আসছে। অহল্যাকে অসুখী করে একা একা দুঃসময়কে অতিক্রম করতে পারবেন না। সতী বিনা শিব হলেন শব। অহল্যাকে ছাড়া মোক্ষলাভ করে সুরলোক প্রাপ্তির দুরাশা করবে না। এটা আমার সতর্কীকরণ নয়, শুভেচ্ছু হিসাবে পরামর্শ।

ভাই নারদের মুখে দুঃসময় আসছে শুনে আশ্রমবাসীগণ অজানা আশঙ্কায় ম্লান হয়ে যান। গৌতমকেও চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। আমার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। আমার মাথার ওপরে'ত আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। দুঃসময়কে আমার আর কি ভয়!

কে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, নীলাশোক বনে আমার শোক প্রশমিত হবে, আমি জানি না। কে জানে কোন দেবতার আশীর্বাদ লাভের জন্য আমি নিজে নিজেই নীলাশোক বনের দিকে এগিয়ে যাই। অশোক ফুল স্পর্শ করলে আমার যেন মনে হয় আমি চিরকারীকে আদর করছি। চিরকারীর যখনই অভিমান হত, নীলাশোক বনে আত্মগোপন করে আমার ওপর রাগ দেখাত। গৌতম আশ্রমের চারপাশে দিগন্ত প্রসারী গভীর নীলাশোকের বন। নীলাশোক বন আমার জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। গৌতম সেটুকু অন্তত বারণ করেনি। তাই প্রতিদিন আমি আনমনা হয়ে নীলাশোক বনে পৌঁছে যাই এবং শোকবিস্মৃত হয়ে যাই। আমার মনে হয় চিরকারী আছে—আমার কাছেই আছে। গুচ্ছ গুচ্ছ নীলাশোক চিরকারীর অভিমানের মতো মনে হয়। মনে হয় যেন ফুলের পাপড়ি সরিয়ে দিলে আমার ছেলের থমথমে মুখ দেখা যাবে, কিন্তু ফুলের কষ্ট হবে ভেবে আমি তার পাপড়ি সরিয়ে চিরকারীকে খুঁজি না। বোধহয়, ভয় করে যদি চিরকারীর মুখ দেখা না যায়। কত মিথ্যা আশ্বাসে মানুষ বেঁচে থাকে, বোধহয় বেঁচে থাকার লিপ্সা মানুষের শ্রেষ্ঠ লিপ্সা।' তাই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও মানুষ বেঁচে থাকে।

পুণ্যতোয়া নদীর ধারে ধারে অন্তরঙ্গ কামনার মতো এই ঘন নীলাশোক বন চিরকারীকে হারাবার শোক ভুলিয়ে দেয় সত্যি, কিন্তু নীলাশোকের মৌনছায়া কেমন যেন উদাস করে দেয় আমাকে। তা সত্ত্বেও যখন মন ভারাক্রান্ত হয়, তখন এখানে আত্মগোপন করে আত্মবিস্মৃত

হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে হয়। অনুভব করি চিরকারীর চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যভাবনাও মনকে ছুঁয়ে যায়।

মৃতা কন্যা প্রসব করে ভেবেছিলাম আর বাঁচব না। যখন গৌতমীকে আমার কোলে স্থান দেওয়া হল না, তখনও আমার মন হতাশায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃখকে তার জায়গায় রেখে আমি বেঁচে থাকলাম। চিরকারী হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ অতিক্রম করে আজও আমি আবার বেঁচে উঠছি। বিচিত্র মানুষের মন। তা না হলে মানুষ একবারেই মরে যেত, বারম্বার মরত না। আশা কল্পলতা। সেই লতায় বিশ্বাসের ফুল স্বপ্নের সুরভিতে জীবনকে সুরভিত করে নিরন্তর। সেই সৌরভে মানুষ কত মরণ থেকে মুক্ত হয়।

আমি ধীরে ধীরে সেই সুরভিতে চিরকারীকে হারাবার শোক থেকে মুক্ত হচ্ছিলাম। চিরকারী হারায়নি একদিন নিশ্চয় পাওয়া যাবে এই আশায় নিজের দুঃখকে আঁকড়ে ধরে আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠছিলাম। আলোর সান্ত্বনায় অন্ধকারকে অতিক্রম করার সাহস পাচ্ছিলাম। কিন্তু আলোর সান্ত্বনায় অন্ধকার ঢেকে আসবে বলে কি আম জানতাম?

কার মৃদু কোমল স্পর্শে আমার উদাস স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আকাশ মন্থন করে বসন্ত নেমে আসে আমার শূন্য অঙ্গনে। আমার নিবিড় ভাবলোকে গন্ধবহ অবুঝ বাঁশী বাজায়। কামনার বীণায় মধুর ছন্দ নিজের থেকে বেজে ওঠে আমাকে উন্মনা করে দেয়। বসন্তের মৃদু মৃদু হাসিতে আমি ভেসে যাচ্ছিলাম অতল কামনার মহাসমুদ্রে।

হে দুঃসহ বসন্ত, তোর এ কি পরাভব! অনন্ত কালের পরিধিতে কে এই অচেনা সহযাত্রী। বিনা অনুমতিতে যাকে ডেকে এনেছিস আমার অঙ্গনে।

এতদিন পর্যন্ত এই চির পরিচিত মাটির মধুগন্ধ আমি কি করে আঘ্রাণ করিনি? আমার তন্ময় ভাবতরঙ্গে জীবনের এই উষ্ণতাকে কি করে অনুভব করলাম না?

নীলাশোক বনে একাকী নিজেকে আবিষ্কার করে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে এ কার ছায়া? কিংবা আমার অন্তরের সেই কামনার আমি হলাম ছায়া।

যে মাধবীলতার কুঞ্জে আমি প্রতিদিন বসে থাকি দেখি একটা পারিজাত ফুল আমার পথ চেয়ে রয়েছে। নীলাশোকের ছায়ায় পারিজাত ফুটল কি করে? এ কি স্বর্গের পারিজাত! তাহলে'ত তার দিকে হাত বাড়ানো গৌতমের নিষেধ। সেদিন ঐরাবতের শরীর থেকে পারিজাতের সুগন্ধ উড়ে এসে আমাকে সুগন্ধা করেছিল, তাতেই গৌতমের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ঙ্কর। আজ যদি এই ফুলটা নিয়ে যাই, তাহলে গৌতম কি ভাববেন? ভাববেন, স্বর্গের পারিজাত ইন্দ্রদেব ব্যাতীত আর কে দেবে আমাকে!

ইচ্ছা করছিল, এই দুর্লভ পুষ্পটিকে তুলে নেওয়ার জন্য, এই প্রলোভন উন্মত্ত করেনি, শান্ত করেছিল অশান্ত দগ্ধ হৃদয়কে। কিন্তু আমি প্রলোভনকে দমন করলাম। গৌতমের কঠোর স্বামীত্ব আমাকে পাষাণ করে দিয়েছিল। গৌতমের প্রাণ কোন উপাদানে গড়া, যেখানে পুষ্পপ্রীতি নেই। প্রতিদিন পারিজাতের মায়া আমাকে হাতছানি দেয়। কে সেই অজ্ঞাত পূজারী, পারিজাতের নৈবিদ্য রেখে যায় আমার বসার জায়গায়।

আমি সেদিন বিশ্বাস করে ঋচাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি নীলাশোক বনে এলে ঋচা ও তার তিন মেয়ে এবং গৌতমীকে (আমার মেয়ে) নিয়ে আসে। তাদের কোলে নিলে আমি যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ আর কোথাও পাই না। সেইটুকু সময় আমি চিরকারীর কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই যে আমার তিন ছেলে নিজ নিজ পথে আমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ঋচার চার মেয়েই আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছে। কখনও কখনও রুদ্রাক্ষও আসে। অন্যান্য দাস যুবকেরাও আসে। সময় কেটে যায় ভালোভাবে।

আমার প্রশ্ন শুনে ঋচা বলে—"স্বর্গগঙ্গার পবিত্র জলে স্নান না করে প্রতিদিন ঐরাবতকে এই নদীর জলে স্নান করতে সে দেখেছে। নীলাশোক বনেও সে কিছু সময় বিচরণ করে। পারিজাত ফুল ঐরাবত ব্যাতীত আর কে রাখবে তোমার জন্য? এত চিন্তার কি আছে? পারিজাত অম্লান ফুল। প্রতিদিন একটি একটি সঞ্চয় করে মালা গেঁথে গৌতমকে প্রীতি উপহার দেবে।" ঋচার কণ্ঠে গৌতমের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ ছিল। কিন্তু আমার মধ্যে কেন এই গোপন উল্লাস? পুষ্পবিলাস ঐরাবতের ইচ্ছাকৃত না প্রভু নির্দেশিত?

যাই হোক পারিজাত আমার জন্য নিষিদ্ধ। নীলাশোকের ঘন ছায়াই আমার আশ্রয়, কারণ আমি মর্তনারী। মর্তনারীর জন্য পারিজাত নিষিদ্ধ—কিন্তু পারিজাত প্রীতিও নিষিদ্ধ। ললাটের জটিল রেখার মতো প্রেমের মধুময় বেদনা আমার হৃদয়ে অনায়াসে লেখা হয়ে গেল সেদিন।

সেদিন নীলাশোক বনে ঋচা ও রুদ্রাক্ষ নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে সমগ্র সংসার ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল যে উন্মুক্ত প্রকৃতি তাদের প্রেমলীলা অবলোকন করছে। ভুলে গিয়েছিল যে তাদের চারকন্যা অদূরেই ঐরাবতের সাথে খেলা করছে, যে কোনও মুহূর্তে 'মা', 'মা' করে ছুটে আসবে।

আমি বিবাহিতা। তিন সন্তানের জননী। নারী পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক ব্যতীত প্রেম কি আমি জানি না। জানি না প্রেমের রোমাঞ্চ কি—জানি না, প্রেম চেতনার কত ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। আবার কত গভীরতম অবচেতনে পৌঁছে দেয়। প্রেমে যে এত আদর ভালবাসা, মান অভিমান থাকে আমি সত্যি জানতাম না। ঋচা ও রুদ্রাক্ষকে দেখে আজ অনুভব করলাম।

ঋচা ও রুদ্রাক্ষের প্রেমলীলা আমাকে বিচলিত করেছে। আমাকে জানিয়ে দেয় আমি বঞ্চিতা। স্বামীর প্রেম আমি কণামাত্রও পাইনি। পুত্র উৎপাদনের জন্য স্বামী আমাকে ব্যবহার করেছেন। নিজের স্বার্থের জন্য আমার শরীরকে গ্রহণ করেছেন। আমার সুখানুভবের সূক্ষ্মগ্রন্থিকে তিনি এখনও স্পর্শ করেননি। একরকম শূন্যতার সাথে বোঝাপড়া করে এতদিন যেন আমি নিজের সাথেই প্রতারণা করেছি। বেদাঙ্গ সাহিত্য ও বেদার্থ তত্ত্বের মহান জ্ঞানী, ন্যায়সূত্রের ধারক—আচার্য গৌতমের পত্নীর মিথ্যা অহংকারকে সম্বল করে আমি যেন আমার ভিতরের অহল্যাকে অবজ্ঞা করছিলাম। আদর্শ পত্নীর অভিনয় করছিলাম। অনন্ত আকাশের দিকে না তাকিয়ে জলাশয়ে চন্দ্র সূর্যের প্রতিফলনকে জীবন মনে করে কি মিথ্যা জীবন আমি বেঁচে ছিলাম!

কঠোর অনুশাসনে কত কত অজানা শিহরণ আমি মরুভূমিতে হারিয়ে দিয়েছি। কত অশ্রুত উতলা স্বরকে আমি ধ্বনিত হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছি।

কেবলমাত্র তত্ত্বকে আধার করে ভয়কাতর শ্বাসরুদ্ধ জীবনযাপন করেছি। নিজেকে আবিষ্কার করার মুহূর্তগুলিকে রক্তাক্ত করে দিয়েছি কঠোর নিষেধাজ্ঞায়। ভোগের মুহূর্তেও আস্বাদনের মধুরতা বিন্দুমাত্র লাভ করিনি। প্রেমের মধুগুঞ্জনে কান পাতার মুহূর্তে শুনেছি—তত্ত্বই জীবন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুঃবর্গ প্রাপ্তির মধ্যে প্রেম হল এক ভ্রান্তি। ওরে দুষ্টু বসন্ত! বারম্বার তোর মধুর স্পর্শে কেন আমায় উতলা করছিস? কি লাভ! আমার নবীন যৌবনকে উপেক্ষা করে আমার স্বামী বাণপ্রস্থে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যেদিকে তাকাই দেখি প্রেমের মহিমা। ফুলে ভ্রমরের চুম্বন, বৃক্ষলতার আলিঙ্গন, পক্ষীদম্পতির প্রেমভরা কূজন, সমীরণে সুরভির মিলন; প্রেমের মহিমা অপার। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত প্রেমের মহিমা সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। প্রেম যে ভাবরাজ্যের সম্রাট, সেকথা বুঝিনি। আজ ঋচা ও রুদ্রাক্ষের প্রেমালাপ শুনে জেনেছি প্রেমের বিলাসভূমি শুধুমাত্র হৃদয়রাজ্য নয়, দেহ, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ সবই প্রেমের পারিজাত বন। প্রেমই শ্রেষ্ঠ আবেগ। প্রেম থেকেই জন্ম নেয় ভক্তি, করুণা, দয়া, ক্ষমা, বাৎসল্য ও সখ্যতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমই আকর্ষণকারী রজ্জু। প্রেমবিহীন শৃঙ্গার পশুরাজ্যেও স্পৃহনীয় নয়। এ পর্যন্ত আমি যে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করছি, সেখানে শৃঙ্গার থাকতে পারে কিন্তু প্রেমের দুন্দুভি শোনা যায়নি। এতদিন প্রেমহীন জীবন কিভাবে কাটালাম? এরকম জীবন'ত আমি চাইনি। বঞ্চিত প্রেমের হাহাকারে আজ চতুর্দিক ব্যাথার আলাপ করে চলেছে।

হঠাৎ দেখি আকাশে মেঘ নেই, ঝরণা, নদী, পুষ্পউদ্যান, শষ্যক্ষেত্র নিদারুণ শুষ্কভূমিতে পরিণত হয়েছে। গাছের ডাল থেকে ঝরে পড়ছে কুঁড়ি, পক্ষী দম্পতি। জলধারা মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। এইসবের মধ্যে আমি কিন্তু মরুদ্যান হয়ে থাকতে চাই। আমি প্রেমিকা হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমি খুঁজছি আমার স্বপ্নের প্রেমিককে।

গৌতম! তুমি কি প্রেমের এই দুঃনির্বার প্রবাহকে স্বীকার করবে। আমার স্বপ্নগুলিকে মরীচিকা বলে তুচ্ছ করে দেবে?

দেহ এবং মন নিয়ে প্রেম। দেহ ব্যতীত প্রেম সম্ভব কিন্তু মন ব্যতীত প্রেমের স্থিতি নেই। দেহ না হয় দূরত্বের অধীন, কিন্তু মন কি দূরত্ব মানে? যেখানে দেহ ও মন উভয়ের দূরত্বকে তপস্যা আখ্যা দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে এড়িয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রেম এক বিড়ম্বনা।

ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মন হল শ্রেষ্ঠ। মনের সহযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয় কার্যকারী নয়। নিষ্ফল স্বপ্নের ক্ষোভে মন যেখানে ক্ষতবিক্ষত, সেখানে কর্মের প্রেরণা আসবে কি করে? আমার বিক্ষুব্ধ মন শান্ত তপোবন পার হয়ে এক কল্পিত প্রেমলোকে পৌঁছে যায়।

বছরের প্রত্যেকটি ঋতু সুন্দর। সৌন্দর্যে একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন। জীবনেও সব ঋতু আসে। প্রত্যেক ঋতুর আহ্বান ভিন্ন। সন্তানের জননী হলে কি জীবনের আহ্বান রুদ্ধ হয়ে যায়?

জীবাত্মা অবিনশ্বর, কিন্তু বিনাশশীল দেহেই তার বাস। আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে দেহকে কি সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা যায়? দেহ যদি কিছু নয়, তাহলে দেহের বিকাশের জন্য মানুষ বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে কেন?

সেদিন আশ্রমে দেহতত্ত্বের এক আলোচনায় গৌতমের বক্তব্য শোনার পর দেহবাদ সম্পর্কে আমার যুক্তি নিভৃতে গৌতমের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করলাম। দেহবাদ সম্পর্কে বহুবার গৌতমের সাথে আমার তর্ক হয়েছে। প্রতিবার ঋষি গৌতমের কণ্ঠে শুনেছি তত্ত্ব ও দর্শন। আজও তার পুনরাবৃত্তি করলেন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"অহল্যা, তুমি একজন সাধারণ নারী হওয়ায় অধিকমাত্রায় দেহ সচেতন। কারণ দেহকে তুমি প্রত্যক্ষ দেখতে পারছ, দেহ একটা বস্তু। তাই আত্মোন্নতির চেষ্টা না করে দেহসুখই তোমার লক্ষ্য। কিন্তু অহল্যা, দেহ তোমার, কিন্তু তুমি স্বয়ং দেহ নয়। দেহের মধ্যে বাস করা কালীন তুমি দেহের প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে যেও না। দেহ তোমার প্রভু নয়, তুমি দেহের প্রভু। দেহরূপী জতুগৃহে লোভ, মোহ, কাম ইত্যাদি আবেগ রজ্জু দ্বারা তোমার প্রকৃত সত্তা বন্দী, তাই তোমার মন ও চেতনা মুক্ত নয়। অগ্নির সামান্য স্পর্শে জতুগৃহ ধ্বংস হওয়ার মতো সামান্য আঘাতে তোমার সুন্দর শরীরও নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অন্তর্মুখী হয়ে দুষ্ট কাম থেকে দূরে থাক। তুমি যে প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছ, তা কামজড়িত। তাই সেই প্রেম সংকীর্ণ। তার থেকে বিরত হও।"

অনেক শুনেছি গৌতম দর্শন। শুনে শুনে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। কিন্তু আজ আমার মধ্যে চেতনার সংঘাত দেখা দিয়েছে। চেতনার প্রতিটি স্তর প্রেমময়। প্রেম দেহবোধে সীমাবদ্ধ না হলেও দেহবোধ অলীক বলে অবজ্ঞাও করতে পারছে না। গৌতমের তত্ত্বের পিছনে সত্য থাকতে পারে, কিন্তু আজ তাঁর সবকথা 'মিথ্যা'র মতো শোনাচ্ছে। গৌতমের তত্ত্ব ও সত্যের প্রতিকূল স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্য দূরন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগছে। সেই স্রোতে আমি যেন গৌতমের কাছ থেকে বহুদূরে ভেসে যাচ্ছি। ইচ্ছা করছে গৌতমের প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা ও নীতি নিয়মের বাঁধ ভেঙ্গে মরুভূমিতে লুপ্ত হয়ে যেতে।

চতুর্দিকে আমি শুনতে পাচ্ছি কুহুতান, ভ্রমরের গুঞ্জন, প্রেমের আহ্বান। কিন্তু কে সেই অজানা আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদ। বিপন্ন বাস্তব থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? গৌতম?

এই প্রলয় থেকে গৌতম আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি যে হৃদয়সত্তার অন্বেষণে বেরিয়েছি, তাতে ভোগলিপ্সা নিহিত। অতএব সেই যাত্রাপথে গৌতম আমার সহায়ক হবেন না।

আমার চোখে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে, আমার ভাবভঙ্গিতে, চলার ছন্দে গৌতম সম্ভবত প্রলয়ের সূচনা পেয়েছিলেন। গৌতমের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করব বলে ঐরাবতপ্রদত্ত পারিজাত ফুলটি খোঁপায় গুঁজে আশ্রমে ফিরেছিলাম, সেদিন গৌতম ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রলয়ের আর দেরি নেই। প্রলয় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রীয় স্বামীত্বের অধিকারে বিনা বাক্যব্যয়ে গৌতম আমাকে আশ্রমে বন্দী করে রাখলেন। নদীতে স্নান করতে গেলে আমাকে তালা দিয়ে যেতেন। প্রথাকেও চাবি দিতেন না। এমনকি আশ্রমে ধ্যানস্থ হওয়ার

সময়ে বা অন্যত্র যেতে হলে আমাকে গৃহবন্দী করে যেতেন। ফিরে এসে নিজের হাতে তালা খুলতেন। মানবিকতা বিরোধী এইরকম কাজের কৈফিয়ৎ ছিল একটাই—"স্বামী যতটুকু অধিকার দেয়, ততটুকুই স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর নিয়মশৃঙ্খলা। স্বামীর ইচ্ছার বাইরে স্ত্রীর কোনও অধিকার নেই। যদি স্ত্রী সেরকম অধিকার দাবি করে তার নাম স্বেচ্ছাচার।"

—"এটা বেদের কোন পংক্তিতে আছে?" একবার প্রশ্ন করেছিল মাধুর্য।

—"বেদ রচনা শেষ হয়নি—সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা প্রণয়নের শাস্ত্র মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিদিন লেখা হচ্ছে।" —এটা ছিল গৌতমের রুক্ষ উত্তর।

আমার সতীত্ব সম্বন্ধে গৌতম সন্দিহান। তাই তিনি আমাকে গৃহবন্দী করে অন্যত্র গমন করেন। আশ্রমে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আমার ভিতরের অপমানিতা নারীসত্তা বলে—গৃহের দ্বার রুদ্ধ করতে পারেন মহর্ষি-স্বামী, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করতে পারবেন না। একদিন সব বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে। আমার স্নায়ুতে ক্রান্তির নহবত দুন্দুভিত হয়েছে। এই তালা আমাকে বন্দিনী করতে অপারগ।

চতুর্দিক থেকে শোনা যাচ্ছে ক্রন্দনের রোল। আমার হারানিধি চিরকারীর কান্নার সাথে মিশে যাচ্ছিল ঋচা, গৌতমী, রুদ্রাক্ষ, অশ্বধ্বজ, বিকট প্রভৃতির ক্ষুধার্ত আর্তনাদ।

কদাকার সন্দেহ তার কুৎসিৎ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল রুদ্ধদ্বারের ওপাশে। আমি এখন এক আলাদা অহল্যা। একটা মানুষ তার জীবনকালের মধ্যে কতবার জন্ম নেয়, কতবার মৃত্যুবরণ করে তার হিসাব রাখা সম্ভব নয়। ভ্রমরের গুঞ্জন, পাখির কলতান আমি আর শুনতে পাই না, আমার মধ্যে দেহবোধের কোনও উন্মাদনা নেই। ক্রমশ আমি নীরস বেলাভূমিতে পরিণত হচ্ছি। উতাল সমুদ্র আমার কাছে বারম্বার এসে ফিরে যাচ্ছে, সাগরের আবেগময় স্পর্শে আমি শুধুমাত্র সিক্ত হচ্ছি, নিমজ্জিত হচ্ছি না। আমার জায়গায় আমি আমার সিক্ত ভাবনা নিয়ে আছি। আমার বুকে ধ্বনিত হচ্ছে মানুষের চলার শব্দ। কিন্তু সে আঘাত আমার পদাঘাত বলে মনে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে, জননী বক্ষের অমৃতের ওপর নির্ভরকারী অসহায় ক্ষুধাতুর শিশুর হাত পা ছুঁড়ে আব্দার করার কোমল স্পর্শের মতো। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসছে ক্ষুধার আর্তনাদ। পৃথিবী খাঁ-খাঁ করছে। ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ। বর্ষা নেই, ইন্দ্র রুষ্ট।

সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে গত সাতবছর যাবৎ ক্রমাগত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ লেগে আছে। বিশেষতঃ গৌতম আশ্রম সমেত বিদেহ রাজ্য, এবং গঙ্গা উপত্যকার কোশল রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, শতুদ্রী, পরুষ্ণী মরুৎবৃধা, বিতস্থা, অসীকায়া, বিপাশা ইত্যাদি নদীর জলপ্রবাহ নির্ভর করে ইন্দ্রদেবের ওপর। ধীরে ধীরে নদীতে জলপ্রবাহ ক্ষীণ হওয়ায় বৃষ্টিও ক্ষীণ। ইন্দ্রদেবের স্তুতি ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। সপ্তসিন্ধুর আশ্রমগুলিতে অনাবৃষ্টির তেমন কোনও প্রভাব ছিল না কারণ আর্যরাজাগণ রাজ্যের শস্যভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য মজুত করে রাখতেন এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্য ঋষিদের

আশ্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী যোগান দেন। তাছাড়া আশ্রমে বহু সংখ্যায় দুগ্ধবতী গাভী থাকায় খাদ্যভাব দুধ, ছানা, দই ইত্যাদির দ্বারা পুরণ হয়ে যেত। আর্যঋষিদের স্তবস্তুতি এবং যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রদেবও স্বর্গরাজ্য থেকে খাদ্য-পানীয় সাহায্য করতেন। তাই রাজা এবং ঋষিদের ক্ষেত্রে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ ছিল একধরণের বিলাস। কারণ এই অনাবৃষ্টির অজুহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান করার জন্য ঋষিগণ শিষ্যদের মাধ্যমে বহু অর্থ এবং খাদ্য পদার্থ ভিক্ষারূপে সংগ্রহ করতেন। দিনরাত বৃষ্টিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশ্রমে যজ্ঞ উৎসব, ভুরিভোজ লেগে আছে। দেবতারা আশ্রমে অতিথি হন। অনেকক্ষেত্রে ইন্দ্রদেব স্বয়ং আর্যদের সাহায্য করছেন। বৃষ্টি হবে, জলসম্পদ বৃদ্ধি হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ইন্দ্রের আগমনের উদ্দেশ্যে আশ্রমগুলিতে বর্ণাঢ্য উৎসব ও সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু অনার্যপল্লীগুলি ইন্দ্রকৃপা থেকে বঞ্চিত ছিল। দুর্ভিক্ষকালীন সমস্ত অনুদান আর্যদের হাতে থাকায় দাসদের ভাগ্যে কিছুই জুটত না। দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ শিকার ছিল দাসগোষ্ঠী। রাজ-অনুদান তাদের জন্য উদ্দিষ্ট হলেও তার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় তারা পাষণ্ড হয়ে উঠেছিল। পেটের জ্বালায় তারা যজ্ঞ হবি ভণ্ডুল করত, ঋষিদের ভয়ভীত করে আশ্রমের গাভী ফলমূল নৈবিদ্য ইত্যাদি জোর করে নিয়ে যেত। তাই যাগযজ্ঞ করে ঋষিগণ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করলেও দাসদের উৎপাতে নিজেদের বিপন্ন মনে করেন। আশ্রমে শান্তি ছিল না। চতুর্দিকে ক্ষুধার আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে।

গৌতম আশ্রমেও যজ্ঞের আয়োজন চলেছে। এবার দুর্ভিক্ষ ভয়াল রূপ ধারণ করেছে, আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। পৃথিবীর সাথে আকাশের সম্পর্ক যেন গৌতমের কুৎসিত সন্দেহের শানিত অস্ত্রে ছিন্ন হয়ে গেছে।

সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ইন্দ্রদেবকে আর্যদের প্রতি এত নির্দয় হতে কখনও দেখা যায়নি। যজ্ঞ শেষ হতে না হতেই ইন্দ্রদেব স্বয়ং এসে উপস্থিত হতেন, অজস্র সম্পদ দান করতেন, বৃষ্টির জলে স্নিগ্ধ হত তপোবন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ ইন্দ্রদেব গৌতমের যজ্ঞ হবি গ্রহণ করছেন না। নিকট ভবিষ্যতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই বিপদের সময়ে ভাই নারদ এসে উপস্থিত হলেন, সকলের মনে আশার সঞ্চার হয়, হয়তো তিনি সুসংবাদ এনেছেন, বোধহয় ইন্দ্রদেব অচিরেই জলদান করবেন।

কিন্তু ভাই নারদের কথায় আশ্রমে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। ভাই নারদ সর্বসমক্ষে গৌতমকে অভিযুক্ত করে বললেন—"তোমার ইন্দ্রস্তুতিতে আন্তরিকতার অভাব ইন্দ্রের অজানা নয়। যাকে তুমি এত সন্দেহ করো, যার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রতি তোমার এত ঘৃণা, আবার তার স্তুতি কর কিভাবে? কাজের সময় খোশামোদি, কাজ শেষ হয়ে গেলে অপবাদ। তুমি যে তোমার স্ত্রীকে বন্দিনী করে রাখো শুধুমাত্র ইন্দ্রের লাম্পট্য সাব্যস্ত করার জন্য—একথা আর্যাবর্ত থেকে স্বর্গলোক সর্বত্র প্রচারিত। যে ইন্দ্রকে তোমার এত সন্দেহ, তাকে আবার আশ্রমে আহ্বান করছ কেন? যে স্ত্রীকে এত সন্দেহ, তারই ওপর ইন্দ্রের আতিথেয়তার দায়িত্ব ন্যস্ত করছ?" গৌতম কিছু উত্তর দিতে পারেন না। রাজা লম্পট হলেও

তাকে স্তুতি করতে হয়। মাধুর্য বলেন—"সঙ্কটের কারণ উল্লেখ না করে এর নিরসনের উপায় বলুন।"

—"গৌতম এই আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকা পর্যন্ত এই অঞ্চলে অনাবৃষ্টি চলবে, অনাবৃষ্টি থেকে দুর্ভিক্ষ, এবং দুর্ভিক্ষের জন্য দাসগোষ্ঠীর উৎপাত লেগে থাকবে। ইন্দ্র গৌতমের যজ্ঞের হবি গ্রহণ করবেন না এবং বৃষ্টিদানও করবেন না।

—"তাহলে গৌতম অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করুন" —দূর থেকে কার উত্তপ্ত স্বর শোনা গেল।

ক্রুদ্ধ স্বরে গৌতম বললেন—"আমি ইন্দ্রকে চিনি, সে কিভাবে সন্তুষ্ট হবে আমি জানি। সে নিশ্চয় আমার আশ্রমে আসবে। অবশ্য আমি খুব শীঘ্রই তপস্যার জন্য হিমবন্ত পাহাড়ের পাদদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন এই আশ্রম ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু এইরকম দোষারোপ স্বীকার করে আশ্রমের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না।"

কুটিল হাসি হেসে ভাই নারদ বললেন—"আমি তোমাদের মতো আর্যঋষিদের নাড়ী-নক্ষত্র জানি। পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে তপস্যার জন্য নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তপস্যার শেষে ব্রহ্মর্ষি হওয়ার মধ্যে সময়ের পরিবর্তন হয়ে যায়, এর জ্বলন্ত উদাহরণ ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে যখন দীর্ঘকাল নিদারুণ খরা ও দুর্ভিক্ষ চলছে সেইসময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র আটটি নাবালক পুত্রকে স্ত্রীর কাছে রেখে, রাজ্য ছেড়ে সরস্বতী নদীর তীরে ঋষঙ্গ তীর্থে তপস্যা করতে চলে যান। তখন ত্রিশঙ্কু যদি তাঁর পরিবারকে সাহায্য না করতেন তাহলে বিশ্বামিত্রের বংশলোপ পেত। অথচ স্ত্রী পুত্রদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে তিনি এমন কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন, যার ফলে তিনি মহর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষি পদে উন্নীত হন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বহু বাধা বিঘ্ন অপসারণ করে ত্রিশঙ্কুকে তিনি ইক্ষাক্ষু বংশের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বর্তমানেও অনেক আর্যঋষি দুর্ভিক্ষ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য হিমবন্ত পর্বতের পাদদেশে চলে গেছেন। গৌতমও একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। আমার বিশ্বাস, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সরে যাওয়ার পর গৌতম ব্রহ্মর্ষি পদবাচ্য হবেন। আর একটা দুর্ভিক্ষের পরে ইন্দ্রপদও লাভ করতে পারেন। কিন্তু দেবলোকের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব। কারণ যে আশ্রমের সামান্য জল সমস্যার সমাধান করতে না পেরে তপস্যা করতে চলে যায়, সে দেবলোকের অধীশ্বর হয়ে ত্রিলোকের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করবে কিভাবে? তাই একমাত্র উপায় হল ইন্দ্রকে স্তুতি করে জলসম্পদ লাভ করা। গৌতম ইন্দ্রকে ভালোভাবে চেনেন। তাই ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করুন। অধিক বিলম্ব হলে ক্ষুধাতুর দাসগণ বিদ্রোহ করবে। তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।"

শান্তকণ্ঠে গৌতম নির্দেশ দিলেন—"সোমযজ্ঞের আয়োজন করো।"

দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ করাই হল যজ্ঞ। ত্রিলোকের সমস্ত দুর্লভ সম্পদের অধিকারী ইন্দ্রদেবের কিসের অভাব, আর গৌতমই বা কোন দুর্লভ বস্তু ত্যাগ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন?

যজ্ঞের লক্ষ্য হল দেবতাদের তৃপ্তিসাধন করা। তার দ্বারা কাম্যকর্মের অভীষ্ট সাধন হয়। কিভাবে গৌতম ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিসাধন করবেন?

কেবলমাত্র যজ্ঞের হবি নয়, প্রতিটি ভোগ্যবস্তু প্রথমে দেবতাকে অর্পণ করে পরে ভোগ করা হল আর্যধর্ম। কোন ভোগ্যবস্তু গৌতম দেবতাকে অর্পণ করেননি বলে দেবতা রুষ্ট? তাহলে কি দেবতার সন্তুষ্টির জন্য সেই দুর্লভ বস্তু অর্পণ করতে হবে। গৌতম জানেন, তাঁর কোন ভোগ্যবস্তুটির ওপর ইন্দ্রের লোলুপ দৃষ্টি। গৌতমের অজানা নয়, কেন গৌতম আশ্রমের চতুর্দিকে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে, তিনি এটাও জানেন—কেন ইন্দ্রদেব তাঁকে পদ চ্যুত করতে উদ্যত। ভয় ঈর্ষা এবং ভোগলিপ্সা ইন্দ্রদেবকে গৌতম বিরোধী করে তুলেছে। আশ্রমের সবাইকে হতোৎসাহ মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে নানাভাবে গৌতম ইন্দ্রদেবকে অপমান ও রুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। পরিণতি স্বরূপ সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ। সোমপ্রিয় হলেও ইন্দ্রদেব কি এইসব ভুলে সোমযজ্ঞে সন্তুষ্ট হবেন?

আশ্রমে সোমযজ্ঞের আয়োজন শুরু হয়েছে। যজ্ঞের কার্যভার সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সোমযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় যজ্ঞায়ুধ আহরণে সবাই ব্যস্ত। নানাবিধ সোমপাত্র ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। দর্ভ (কুশ) সমিধ ইত্যাদি বিধিবদ্ধভাবে সংগৃহীত হয়েছে। আমি ব্যতীত সকলেই তৎপর, আমার কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। আমি জানি সোমযজ্ঞের বিধি অনুযায়ী গৌতম আমার সাহায্যপ্রার্থী হবেন। সোমরস প্রস্তুত করায় আমার খ্যাতি আছে। গৌতম আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী থাকাকালীন, আমার তৈরি সোমরসে যে ইন্দ্রদেবের অত্যন্ত আসক্তি তা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া আমার প্রতি ইন্দ্রদেব যে বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন তা কে না জানেন? গৌতমকে আমি জানি—জানি তার স্বামীত্বের অনুশাসন। নিজের পদমার্যাদাকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন হলে ইন্দ্রদেবের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। বিপদের সময়ে তিনি এক প্রকার, আর বিপদ কেটে গেলে অন্য গৌতম। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি আমাকে নিয়োজিত করবেন—তখন সেটা আমার পত্নীধর্ম হিসাবে গণ্য। আশ্রমের অধ্যক্ষের পত্নী হিসাবে অতিথি সৎকারে যাতে ত্রুটি না হয়—তাঁর কঠোর নির্দেশ আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার পর প্রতিবারের মতো গৌতম ক্রুদ্ধ হবেন। কুৎসিত সন্দেহের দৃষ্টিবাণে আমার সূক্ষ্মতম সত্তাকে রক্তাক্ত করবেন—"তুমি কি এমন করলে যে ইন্দ্র এত প্রীত—তোমার হাতে কি মধু সঞ্চিত আছে যা ইন্দ্রদেবকে পরিবেশন করা মাত্রই সোমরসকে রসসিক্ত করে তোলে? অন্যদের সোমরসে এত মধুরতা'ত ছিল না। ইন্দ্রদেব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তোমার রূপসুধা পান করছিলেন না তোমার প্রস্তুত করা সোমসুধা পান করছিলেন? যে মধুর দৃষ্টিতে তুমি ইন্দ্রদেবকে দেখছিলে, আমার দিকে'ত সেভাবে কখনও তাকাও নি? ইন্দ্রদেব আশ্রমে পদার্পণ করা মাত্রই তুমি এমন আনমনা, বিহ্বলা হয়ে যাও কেন? এই কি আর্যনারীর পত্নীধর্ম? আমি তোমাকে সন্দেহ করি অহল্যা, তোমার সতীত্বের ক্ষণভঙ্গুরতা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে বিয়ে করে আমি দগ্ধ হচ্ছি অহল্যা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আগুন আমাকে দগ্ধ করছে, আমার একাগ্রতা নষ্ট করছে—আমি তোমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে যেতে চাই। তুমি আমার সাধনায়

বাধাস্বরূপ। তোমাকে ত্যাগ করলেই আমি তপস্যার বলে ব্রহ্মর্ষি পদে উন্নীত হতে পারব, তুমি আমার পক্ষে শুভা নও, বিঘ্না.....।”

সবকথা গৌতম মুখে বলেন না। তাঁর ঘৃণিত দৃষ্টি, শানিত বাক্য, নিষ্ঠুর ব্যবহার সর্বোপরি তাঁর বীতস্পৃহতা তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে তোলে। মাঝে মাঝে বিনা কারণে ইন্দ্রদেবের ভোগবাদকে কুৎসিত ভৎর্সনা করে তিনি পরোক্ষে আমাকেই ভৎর্সনা করেন।

ইন্দ্রদেব আশ্রমে অতিথি হয়ে এলে প্রতিবারই আমি বিপন্ন বোধ করি। একদিকে গৌতমের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, অন্যদিকে ইন্দ্রদেবের সৌম্য, অনুরাগরঞ্জিত ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ আমাকে দু'ভাগ করে দেয়। ঋষিপত্নী অহল্যা এবং চিরন্তন নারীসত্তার প্রতিনিধি অহল্যার তুমুল সংঘর্ষ আমাকে বিচলিত করে।

সেই প্রহসনের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। গৌতমের সাথে কোনওরকম সহযোগিতা করব না বলে পূর্বের মতো প্রতিজ্ঞা করি। যজ্ঞকর্তা গৌতম নিজের যজ্ঞনিষ্ঠতা প্রমাণ করুক। মহর্ষি গৌতম! অহল্যাকে পদোন্নতির সোপান করে অভীষ্টসিদ্ধির পর তাকে পদাঘাত করা তোমার স্বামীত্বের অধিকার হতে পারে, কিন্তু অহল্যার অনাদৃত পত্নীত্ব সেই অধিকার ধূলিসাৎ করতে বদ্ধ পরিকর। সাধু সন্তদের পাদস্পর্শে তপোবনের বাতাবরণ মনোরম হয়ে উঠেছিল। বনস্পতি এবং পশুপাখিদের অনুরাগী বন্ধুর মতো শান্ত, স্নেহময় মনে হচ্ছিল। শুধুমাত্র গৌতম আশ্রম বা সপ্তসিন্ধু অঞ্চল নয় পৃথিবী থেকে দুর্ভিক্ষ দূর করে মানবজাতির দুর্গতিনাশের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিশাল সোমযজ্ঞে যোগ দেওয়ার জন্য ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্ব-ইচ্ছায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বহু আর্যরাজা এবং ঋষির সমাবেশ দাসদের মনে ভীতিসঞ্চার করার সাথে সন্দেহও সৃষ্টি করছিল। সাধারণত যজ্ঞ অহিংস। কিন্তু প্রত্যেকটি যজ্ঞে হিংসা ও বর্ণভেদের ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্যঋষিগণ যতই অহিংস এবং সাত্ত্বিক হন না কেন তাদের নিষ্ঠুরতার অজস্র উদাহরণ দাসগোষ্ঠীর কাছে আছে। যজ্ঞানুষ্ঠান করে ইন্দ্রদেবের সাহায্যে শত শত দাসযুবকের শিরশ্ছেদ করে আর্যরাজা ও ঋষিগণের নিজেকে নিষ্কন্টক করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

এইরকম বিরাট যজ্ঞের আয়োজনে রুদ্রাক্ষ প্রভৃতিদের উদ্বিগ্ন হওয়া এবং সেইজন্য অস্ত্র সংগ্রহ করে যজ্ঞভঙ্গ করার প্রস্তুতি নিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এই সমস্যার সমাধানের ভার গৌতম আমাকে দিয়েছিলেন। আমার ওপর দাসযুবকদের অগাধ আস্থা। সোমযজ্ঞের উদ্দেশ্য আমি তাদের বুঝিয়ে বলেছি। এই যজ্ঞের দ্বারা তাদের অন্নকষ্ট দূর হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। গৌতমের এই সোমযজ্ঞ সফল হোক—এটাই ছিল আমার কামনা। কিন্তু এই যজ্ঞে ইন্দ্রতুষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করব না বলে স্থির করে নিস্পৃহ ছিলাম। আমার নিস্পৃহতাকে কয়েকজন ঋষি ও ঋষিপত্নী গৌতমের সাথে অসহযোগিতা বলে প্রচার করেছিলেন। যদি আমি এই যজ্ঞের বিফলতা কামনা করতাম এবং গৌতমের কাজে অসহযোগিতা করতাম তাহলে দাসপল্লীতে গিয়ে সোমযজ্ঞের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করতাম কেন?

সসীম স্পৃহার পরিধিতে থাকলে মানুষের মন স্বার্থপর চিন্তার দুর্গন্ধে দূষিত হয়। তার হৃদয়ে প্রীতির ধারা শুষ্ক হয়ে যায়। কিছু আর্যঋষি এবং আর্যরাজার স্পৃহা শুধুমাত্র আর্যদের স্বার্থের বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে দাসদের সুখ সমৃদ্ধির কোনও স্থান ছিল না। আর্যদের ক্রীতদাস হয়ে থাকাই তাদের নিয়তি একথা বলতে তাদের কোনও দ্বিধা ছিল না।

বাস্তবে অসীম স্পৃহাই মানুষকে নিস্পৃহ করে। যে সবাইর আপনার, সে নিস্পৃহ এবং নিশ্চিন্ত। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা মানুষকে অশান্ত এবং অস্থির করে। এই শিক্ষা আমি পেয়েছি পিতা ব্রহ্মার কাছে। বাল্যকাল থেকে আমার স্নেহের পরিসীমা আর্য, দাস, বনস্পতি পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সবার মধ্যেই পরিব্যপ্ত। তাই আমি নিস্পৃহ হতে বাধ্য। গৌতমের মত তত্ত্বজ্ঞানী যদি সেটা না বোঝেন তাহলে আমার কি দোষ?

আশ্রমে নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। এটাই মানুষের প্রকৃতি। যে কোনও শুভকাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কিছু লোক আনন্দ পায়। ঋষি হলেও তার থেকে বাদ যাবে কেন?

গৌতম অত্যন্ত চিন্তিত, সোমযজ্ঞ কিভাবে সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ জাগে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ আশ্বাস দিয়ে বলেন—"হে মহর্ষি, দৃঢ়সংকল্প হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞপথে অগ্রসর হও। তোমার যজ্ঞ নিশ্চয় সফল হবে। বিশ্বাস ও প্রসন্নতার সাথে যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করো। কারও প্রতি সামান্যতম অবিশ্বাস পোষণ করে সন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করলে শুভফলের পরিবর্তে অশুভফলই প্রাপ্ত হয়। বিশ্বস্ততার সাথে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করলে তিনি নিশ্চয় তোমার অভিষ্টসাধন করবেন। হে ঋষি শ্রদ্ধার দ্বারা যে কোনও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞকারী শ্রদ্ধার দ্বারাই যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন।" বিনয় সহকারে গৌতম ঋষিগণের উপদেশ গ্রহণ করলেন, এবং শ্রদ্ধা সহকারে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে আমার নিকটে এলেন। সেইসময় আমি দাসপল্লীতে যজ্ঞবার্তা প্রচার করে ফিরেছি। আশ্রমের কোলাহলের মধ্যে আমার চিরকারীর জন্য মন কাঁদে। কে জানে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ছেলেটা কি খাচ্ছে, কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা! পিতার আদেশে না হয় আমার শিরঃচ্ছেদ করত, নিরাপদে আশ্রমে থাকতে পারত। আমার জীবন কি সন্তানের জীবনের চেয়ে মূল্যবান? সংসারে আমার কি আবশ্যকতা আছে, কিন্তু আমার কাছে আমার সন্তানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন সে এমন কাজ করল, তার ফলে তার মাকে যে সে মৃত্যুদণ্ডের অধিক দণ্ড দিয়েছে। সে কথা যদি সে জানত। নিরাশার মধ্যে ভোরের তারার মত আশা ঝিক্‌মিক্ করে। সমগ্র আর্যাবর্তের মুনিঋষি, ধনী-দরিদ্র যজ্ঞদর্শনে উপস্থিত হবেন। ভাই নারদও আসবেন, যদি কেউ আমার হারানিধির খবর দেয় কিংবা যদি কেউ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। একবার তাকে পেলে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখব—গৌতমের চোখে পড়লেই সন্দিগ্ধ বিচারে দায়িত্বহীন কঠোর নির্দেশ দিয়ে ছেলেকে বিপন্ন করবে।

যদি কেউ চিরকারীর খবর না জানে। কিংবা যদি কেউ বলে যে চিরকারী দাসদের ক্রীতদাস হয়ে অত্যাচারিত হচ্ছে—অথবা অনুতপ্ত চিরকারী অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যদি

খবর আসে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে চিরকারী..... না..... .এরকম অশুভ কথা চিন্তা করব না।

নিজের ভাবনায় আমি নিজে দগ্ধ হচ্ছি, নিজের অশ্রুতে প্লাবিত হচ্ছি, আমার এই শোকে কেউ অংশীদার নয়.....।

আবার চিন্তা ফিরে যায় শতানন্দ ও শরৎভানুর দিকে। জনকঋষির সাথে শতানন্দ কি আসবে। ভাই নারদ কি শরৎভানুকে নিয়ে আসবেন?

পিতাব এই বিরাট সোমযজ্ঞে যোগ দিতে তারা কি সত্যি আসবে? চোখ ভরে তাদের দেখলে কি জননী হৃদয়ের সন্তাপ দূর হবে? না... না... বরং তাদের দু'জনকে দেখামাত্রই চির অবহেলিত, অনাদৃত, চিরকারীর স্মৃতি আমাকে অধিক ব্যাকুল করবে। হয়ত সর্বসমক্ষে চিরকারীর জন্য রোদন করে প্রাণ হারাব, এবং সেটাই হবে পৃথিবীর অবহেলিত বুভুক্ষু মানুষের জন্য অনুষ্ঠিত সোমযজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ হবি।

যেমন দৃষ্টি তেমন সৃষ্টি। গৌতমের দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে মিলিত হওয়ামাত্রই আমি আর গৌতম পত্নী অহল্যা রইলাম না। আমার ভিতরের রক্তাক্ত নারীসত্তা গৌতমের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—"তোমার পদোন্নতির সোপান হতে আমি বাধ্য নই, ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করার অনুরোধ আমি রাখতে পারব না—তার অর্থ এই নয় যে আমি তোমার সাথে অসহযোগিতা করছি। যজ্ঞের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমি প্রস্তুত। আমার কথায় রুদ্রাক্ষের বিশ্বাস জন্মেছে। ঋচা এবং রুদ্রাক্ষের নেতৃত্বে দাসগণ তপোবনের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার শপথ নিয়েছে। আমাদের কন্যা গৌতমী সামগান করে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবে। যজ্ঞকালে দাসগণ তপোবনে পশুপাখিও শিকার করবে না। তাদের দ্বারা হিংসা বা যজ্ঞভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা নেই। বরং তোমার প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষা কাতর কিছু আর্যঋষি যজ্ঞভঙ্গের কারণ হতে পারে। অযথা দাসদেব দোযারোপ করে উত্যক্ত না করার জন্য আমি সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। মাধুর্য এবং সত্যকাম শান্তি ও সংহতি রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। অতএব চিন্তার কোনও কারণ নেই। চিরকারীর স্মৃতি আমাকে বিচলিত করছে—আমার একাগ্রতা নেই। তাই সোমসংগ্রহ, সোমরস প্রস্তুত এবং ইন্দ্রদেবের আতিথেয়তার দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও।"

বাস্তবিক আশ্রমের অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ এই দায়িত্বপালন করতে পারবেন। মাধুর্যের পত্নী মধুক্ষরা যেমন সুন্দরী তেমনই গুণবতী। সোমরস প্রস্তুতিতে সে পারদর্শী। মহর্ষি স্বয়ংসিদ্ধের কন্যা মধুক্ষরা পিতার আশ্রমে থাকার সময়ে বহুবার সোমামৃত প্রস্তুত করে ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করেছে।

আশ্রমে মাধুর্যর আচার্যপদে যোগ দেওয়ার চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় ছিল মাধুর্যপত্নী মধুক্ষরার আশ্রমে পদার্পণ। শুধুমাত্র নামের সামঞ্জস্য নয়, মাধুর্য এবং মধুক্ষরার মন এবং আত্মার সাম্য ও সংযোগ ছিল প্রজাপতির অভিজ্ঞ বিচারের নিদর্শন। আমার সৌন্দর্য অতুলনীয় এবং সৌন্দর্যে মধুক্ষরা আমার সাথে তুলনীয় বলে আশ্রমবাসীরা বলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে মধুক্ষরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। মধুক্ষরার সৌন্দর্যের খ্যাতি আশ্রম থেকে

আশ্রমে প্রচারিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলে গৌতম আশ্রম এখন সৌন্দর্যের বিপণিতে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয় মধুক্ষরার রূপের আকর্ষণে বহু সাধু সন্ন্যাসী আশ্রমে অনাহুত অতিথি হয়েছেন। কুমারী অবস্থায়ই মধুক্ষরা ইন্দ্রদেবের শ্রদ্ধাস্পদা ছিল। আজও ইন্দ্রদেব মধুক্ষরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সোমযজ্ঞে আচার্য মাধুর্যের পত্নী মধুক্ষরাও সোমপ্রস্তুত করে ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করতে পারবে। যেই করুক না কেন ইন্দ্রতুষ্টিই সোমযজ্ঞের উদ্দেশ্য। তাই গৌতম এতে আপত্তি করবে না ভেবে আমি এই প্রস্তাব গৌতমের কাছে রাখলাম। শোনামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে গৌতম বললেন—"অধ্যক্ষপত্নী অহল্যা থাকতে কালকের শিশু মাধুর্যের পত্নী মধুক্ষরা কেন ইন্দ্রের আতিথেয়তার কাজে অগ্রণী হবে? যদি মধুক্ষরার আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র জলদান করে এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয় তাহলে কি বিপত্তি ঘটবে জানো? আশ্চর্য হয়ে আমি প্রশ্ন করি—"জলসমস্যা দূর হলেই সব সমস্যা দূর হওয়ার কথা, আবার কি বিপদ আসবে?"

—"যজ্ঞের খ্যাতি মাধুর্যই লাভ করবে। সমগ্র জগত তার প্রশংসায় মুখর হবে। মাধুর্যপত্নীর আতিথেয়তায় তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রদেব তাকেই অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে পারেন। অন্যদেরও আমার ওপর আস্থা চলে যাবে। আশ্রমবাসী আর আমাকে মানবে কেন? দাসদেরও আমার প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রম থাকবে কি? তুমি কি আমার এই দুর্গতি চাও অহল্যা? এই আশ্রমে তোমার উপস্থিতিতে মধুক্ষরা ইন্দ্রদেবকে আপ্যায়ন করার ফলে তোমার এবং আমার মর্যাদা হানি হবে। তাই ইন্দ্রের আতিথেয়তা তোমাকেই করতে হবে।"

—"কিন্তু তুমি'ত হিমবন্ত পর্বতের পাদদেশে তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। মাধুর্য তোমার দায়িত্ব বহন করলে তুমি নিশ্চিন্তে তপস্যা করতে পারবে.....। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই উত্তপ্তস্বরে গৌতম বলে—"আমি স্ব-ইচ্ছায় অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমার সামনে আমার শিষ্যকে অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করা ভিন্ন ঘটনা।"

—"মাধুর্য তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। শিষ্যের কৃতিত্ব এবং উন্নতির মাধ্যমে গুরুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলে প্রত্যেক সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে তুমি বলে থাক।.....

আমার মুখে এইরকম কথা শুনে গৌতম খুশী হলেন না। নীরস কণ্ঠে বললেন—"হ্যাঁ, সেকথা আমি এখনও বলছি। কিন্তু গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত না হয়ে শিষ্য নিজের জন্য স্বতন্ত্র আসন প্রস্তুত করুক, এবং সেই আসন অধিক মহিমান্বিত হোক তাতেই শিষ্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। পিতা বাণপ্রস্থ গ্রহণের পূর্বেই পুত্রের গৃহকর্তা হওয়া হীন সংস্কার ব্যতীত কিছু নয়। অযথা তর্ক না করে তুমি সোমযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হও। যজ্ঞকর্মে বাধা সৃষ্টি করো না। স্বামীর অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীর ধর্ম। সেখানে তর্কের কোনও স্থান নেই।"

স্বামীর প্রয়োজন অনুযায়ী স্ত্রীকে ব্যবহার করা কি স্বামীর ধর্ম? মনে মনে একথা ভাবলেও মুখে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু এই মিথ্য এবং স্বার্থ-সম্বলিত বন্ধনকে নিমেষে ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য আমার ভিতরের অবহেলিত পত্নীত্ব চিৎকার করে ওঠে—"না, ইন্দ্রদেবের জন্য সোম প্রস্তুত করে আমি তাঁকে পরিবেশন করব না।"

আমার প্রতিজ্ঞা শুনে গৌতম বিচলিত হলেন। তাঁর সুন্দরী পত্নী ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করতে সম্মত হবে কি না সেই চিন্তা তাকে বিহ্বল করে। সোমযজ্ঞের পূর্বে গৌতমকে আর্য এবং অনার্য সকলকে আহ্বান জানাবার পরামর্শ দিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠঅগস্ত্য এবং লোপামুদ্রা। তার ফলে অনার্যরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না এবং যজ্ঞকর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। তপোবনের শান্তি সমন্বয় রক্ষাই যজ্ঞের প্রথম সোপান। তারপর যজ্ঞানুষ্ঠান।

মহর্ষি গৌতম বাগ্মী, তাঁর প্রভাবশালী বক্তব্য অখণ্ডনীয়। দাস এবং আর্যঋষিগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন—"আমি সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছি, এই যজ্ঞের মাধ্যমে সকলের কল্যাণ হবে। মানুষের বিচারভেদে বৃষ্টির জলের তারতম্য হয় না। যজ্ঞের সুফলে আকাশ সমগ্র ভূখণ্ডে সমপরিমাণ জলদান করবে। আর্য-দাস সকলের অন্নকষ্ট দূর হবে। ইন্দ্রের রাজ্যে বাস করে প্রজাগণ উদ্যোগী না হয়ে আলস্যপরায়ণ, কলহপ্রিয় এবং অনিষ্টকারী হলে ইন্দ্রকৃপা বারি অকাতরে ঝরে না। তাই সবাই মিলিতস্বরে ইন্দ্রদেবকে প্রার্থনা করলে জলসম্পদের অক্ষয় স্রোত, শুষ্ক মরুভূমিতে প্রবাহিত হবে এবং দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে পৃথিবী রক্ষা পাবে। আমি এই আশ্রমের অধ্যক্ষ অর্থাৎ সেবায়েত। অধ্যক্ষপত্নী হিসাবে দেবী অহল্যা সেবাকারিণী। প্রথমে আমরা দু'জন নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি। আমি অধ্যক্ষ হিসাবে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করব, দেবী অহল্যা সোমামৃত দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করবেন। তপোবনের শান্তি শৃঙ্খলারক্ষা করে আপনারা সবাই যজ্ঞফল ভোগ করবেন। এটুকু আমার অনুরোধ।"

গৌতমের ওজস্বিনী বক্তৃতায় দাসগণ মন্ত্রমুগ্ধ। সেইসময় আমার তরফে প্রথা ঘোষণা করে—ইন্দ্রদেবের আতিথেয়তার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই, মধুক্ষরা সেই দায়িত্ব পালন করবে।

সহসা তপোবনে অশান্ত কোলাহল শোনা যায়। দাসগণেরও ধারণা যে রুষ্ট ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করা একমাত্র অহল্যা ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অতীতে মধুক্ষরার ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু যেখানে অহল্যা উপস্থিত সেখানে অন্য কারও আতিথেয়তায় ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হবেন বলে কারও বিশ্বাস হয় না। ইন্দ্রদেবের আতিথেয়তায় আমি কেন কুণ্ঠিতা তা আশ্রমবাসীরা কমবেশী জানলেও দাসগণ সে কথা জানে না। যেখানে গৌতম বিশ্বকল্যাণে ব্রতী, সেখানে আমার কর্তব্য বিমুখ হওয়াটা তাদের নিরাশ করে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দাসগণ আমাকে বিশ্বাস করে যজ্ঞফলে ভরসা করেছিল। এখন আমার মনোভাব জেনে তারা সদলবলে আমার শরণাপন্ন হয়। এই পরিস্থিতি গৌতম জেনেশুনেই সৃষ্টি করেছেন বলে আমার মনে হয়, তা নাহলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার অনাগ্রহ সম্বন্ধে জানাবার প্রথার কি প্রয়োজন ছিল?

আমার জীবন যেন এক অভিশাপ। সংসারে যা কিছু দুর্লভ সবই আমার হাতের নাগালে অথচ আমি সুখী হতে পারছি না। গৌতমের মতো জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে স্বামী হিসাবে পাওয়া যে কোনও নারীর পক্ষে তপস্যার পুণ্যফল ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অথচ আমি বিনা

তপস্যায় গৌতমকে লাভ করেছি, কিন্তু বাস্তবে কি আমি গৌতমকে পেয়েছি? হাতের নাগালের দ্রব্যটি কি প্রাপ্তি? হাত ধরে আমি গৌতমকে প্রাপ্ত হয়েছি, তিনি আমার স্বামী, প্রভু। কিন্তু গৌতম কি আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন? তিনি তো কত দূরে, বহু উর্ধ্বে। আমি তাঁকে স্পর্শ করতে পারি না। তিনি কখন কোন তত্ত্বের পক্ষ অবলম্বন করেন তা আমার বুদ্ধির বাইরে। তত্ত্বের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে তাঁর কাছে অকাট্য যুক্তি থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিবলে তিনি নিজের বক্তব্যকে নিশ্চিত করতে পারেন। ইন্দ্রদেবের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কোথায় উধাও হয়ে গেল? আমার আতিথেয়তায় তার সন্দেহ কি নিরসন হল? আজ গৌতমের ভাষণের পর আমি দাসগণের ভুল ধারণার শিকার হলাম। তাদের ধারণা—জনহিতার্থে গৌতম যে মহাযজ্ঞ করছেন আমি তাতে সহযোগিতা করছি না। অধ্যক্ষপত্নী হিসাবে আমি ইন্দ্রদেবের আতিথেয়তায় অনাগ্রহী অতএব আমার কর্তব্যে ত্রুটি হচ্ছে না কি? গৌতম আশ্রমে আমি ব্যতীত অন্য কারও আতিথেয়তায় ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হবেন না। অথচ আমি সেই দায়িত্ব পালন না করার অর্থ হল যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এই যজ্ঞভঙ্গ হলে আর্য অপেক্ষা অনার্যগণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা রাজ-অনুদান, ইন্দ্রের করুণা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। বাঁচার প্রশ্ন কোথায়? আমি তাদের যজ্ঞের উদ্দেশ্য বুঝিয়েছি, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছে। আশার প্রদীপটা সামান্য জ্বলামাত্রই আমি নিজে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিছি। তার ফলে দাসগণ বিচলিত হওয়ার সাথে আমাকে ভুল বোঝাটাও স্বাভাবিক।

তারা সদলবলে আমার কাছে আসে। ঋচা এবং রুদ্রাক্ষ তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। খাদ্যাভাবে আমার কন্যা গৌতমীও শীর্ণ হয়ে গেছে। অথচ আমি আশ্রমে দিব্যি ভোজন করছি, আমার অভিমানী গৃহত্যাগী চিরকারী অন্নাভাবে কোথায় হাহাকার করছে কে জানে? কঙ্কালসার শিশুগুলি জুলজুল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারাই সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে অনুরোধ জানাতে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলে এসেছে। আমি সম্মত না হলে তারা জলস্পর্শ না করে আশ্রমের সামনে ধরণায় বসবে।

বহুবার আমি ঋচা ও রুদ্রাক্ষকে সাহায্য করার কথা ভেবেছি, কিন্তু গৌতমের ক্রোধের শিকার হতে চাইনি। গৌতমের অগোচরে আশ্রমের ভিক্ষালব্ধ খাদ্যপদার্থ বিতরণ করা আমার অধিকারভুক্ত নয় বলে জানি। ভালো কাজও মন্দ উপায়ে সম্পন্ন হলে তার ফল ভালো হয় না। তাছাড়া ঋচা রুদ্রাক্ষ এবং দাসগণের বর্তমানে আশ্রমের সাথে যে সম্পর্ক তাতে তারা কোনওরকম সাহায্য নিতে সম্মত হত না। বরং এই সাহায্য তাদের অপমানিত করত। দাসগণ কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। প্রকৃতির প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে এই উন্নত আদি সংস্কৃতি তারা প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা কারও দয়ার অপেক্ষা রাখে না, এমনকি ইন্দ্রদেবেরও স্তুতি করে না।

তারা অনাহারে মরবে কিন্তু কারও কাছে হাত পাতবে না। আজও তারা এই যজ্ঞানুষ্ঠান ও বর্ষার আহ্বানকে ইন্দ্রের দান বলে মনে করে না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—গৌতমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রকৃতির বিপুল জলরাশি অবরুদ্ধ করে অন্যায় করছেন। এর ফলে

দাসগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ইন্দ্রদেব তুষ্ট হলে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। তার দ্বারা ইন্দ্রদেবের বদান্যতা প্রমাণিত হবে না। শুধু ইন্দ্রদেব তাঁর ভুল বুঝতে পেরে বিচার পরিবর্তন করবেন।

তারা যা ভাবুক না কেন এই বিপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য যজ্ঞাভিমুখী যে হয়েছে সেটাই আমার সান্ত্বনা। আমি কোন মুখে তাদের বলব যে আর্যদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে যে অহং-র লড়াই চলছে তার লক্ষ্য আমি অহল্যা।

আমি কি আমার স্বামীর সিদ্ধিপথে বিঘ্নস্বরূপ, কারণ আমি নারী। আমাকে সিদ্ধির সোপান করে আমার প্রেম ভালবাসাকে পদদলিত করে স্বর্গলাভ করলেও দোষারোপ করতে থাকবে যে আমিই সিদ্ধিপথে কণ্টক, কারণ আমি নারী, কিন্তু সেইটুকুই আমার অভিমান। সেই অভিমান কি বিপন্ন পৃথিবীর হাহাকারের চেয়ে বড়। এই বুভুক্ষু জনতার মধ্যে আছে আমার পুত্র কন্যা—আমার চিরকারী আমার গৌতমী এবং অগণিত শিশু। অমি'ত এই মহা প্রকৃতির একটা অংশ। প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে গেলে আমার অস্তিত্ব কোথায়? জীবনের আনন্দ জীবনে আনন্দ নয়। ব্রহ্মাপুত্রী হয়ে আমার মাঝে মাঝে ভ্রম হয় কেন?

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সমর্পণ করব আমার পার্থিব শরীর এবং অপার্থিব অনুভব এই জননী স্বরূপা মহা প্রকৃতিকে। এই প্রতিজ্ঞা করা মাত্র আমি আর আমি হয়ে থাকলাম না। আমি পৃথিবীতে পরিবর্তিত হলাম।

ব্রহ্ম অমৃত-ভোগ মৃত্যু। জীবের এ কি বিচিত্র দশা। সব জেনেও সে অজ্ঞানের মতো কাজ কেন করে? আমার শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় জগৎ কল্যাণের জন্যে উৎসর্গ করব বলে প্রতিজ্ঞা করার পরেও দেহ ও মনের এই প্রচণ্ড সংঘাত কেন? একদিকে পার্থিব সুখ, অন্যদিকে পরমেশ্বর একদিকে জ্ঞান, যশ এবং সাত্ত্বিক অভীপ্সা, অপরদিকে আমার ভুবন ভোলানো রূপ এবং উদ্‌ভ্রান্ত যৌবন। এক পক্ষে প্রত্যক্ষ ভোগের জীবন। অপর পক্ষে সাধনা সাপেক্ষ যজ্ঞনিষ্ঠা—উভয় অভিলষিত-আকর্ষণীয়।

কিন্তু হায়! আমার মন আত্মা থেকে বহুদূরে বিচরণ করছে। পার্থিব বাসনার মধুর সঙ্গীতের উত্তাল মূর্ছনায় আমার কান ও দেহের ভোগতন্ত্রী সমূহ মুগ্ধ।

গৌতমের আশ্রমে আমি এতবছর কাটালাম, তপোনিষ্ঠ গৌতমের সংস্পর্শে এসে বুঝেছি জীবাত্মার লক্ষ্য এবং জগতের কল্যাণের পথ এক—কিন্তু বিঘ্ন অনেক। সৎমার্গ ব্যতীত সিদ্ধির সব দ্বার রুদ্ধ, কিন্তু বিঘ্নের দ্বার সকল অনায়াসেই খুলে যায়। একটা বিঘ্ন সমগ্র জীবনের তপস্যাকে নিষ্ফল করে দিতে পারে বলে কি আমি জানি না?

আমার হৃদয় হল প্রেমের দগ্ধভূমি—যেখানে শুধু অনাদৃত পত্নীত্বের ভগ্নস্তূপ। সেই দগ্ধভূমিকে যজ্ঞভূমিতে পরিণত করে সোমভাবনায় অমৃত মনোহর করে দেওয়ার সাধনায় আমি ব্রতী হলাম। জানিনা আমার ললাটের লিখনে কি আছে, সিদ্ধি না অভিশাপ। যাই হোক সোমযজ্ঞের মহামুহূর্ত আসন্ন।

সোমযজ্ঞ শ্রেষ্ঠযজ্ঞ। এই যজ্ঞে প্রচুর সোমরস আহুতি দিতে হবে। ইন্দ্রদেবের

আতিথোষ্টির জন্য প্রচুর সোমপানীয় আহ্বায়কের দক্ষিণে রাখাই হল যজ্ঞবিধি। সোমরস বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে অরণ্য পর্বতেও সোমলতা দুর্লভ। সেটাই গৌতমের চিন্তার কারণ।

দুধ, ঘি, যবানু, চরু পায়েস, ছানা ইত্যাদি সোমযজ্ঞের হবি হিসাবে অর্পণ করা যায় না। সোমযজ্ঞের হবি হল কেবল সোমরস। তাই গৌতম একা নয় সকলেই চিন্তাগ্রস্ত।

সেদিন মাধুর্য বললেন—"আচার্য, সোমরস সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেবী অহল্যার। বাল্যকাল থেকে তিনি বনচারিণী। অরণ্য পর্বত নদী ও প্রকৃতির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সোমলতা তিনি নিশ্চয় পাবেন। সোমের নিষ্ঠা তাঁর কাছে বিদ্যমান। দেবী অপালা কিভাবে দুর্লভ সোমলতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন? তাই সোমের চিন্তা ত্যাগ করে আপনি সোমভাবনায় নিমজ্জিত হন। শুধুমাত্র যজ্ঞ হবি নয়, প্রতিটি ভোগ্যবস্তু প্রথমে দেবতাকে অর্পণ করে তারপর ভোগ করাই হল আর্যধর্ম। চরম সমর্পণ ভাবনায় দৃঢ় থাকাই এই মুহূর্তে কাম্য।"

মাধুর্যের কথা শুনে সরলা মধুক্ষরা বলে ফেলে—"আচার্য'ত যোগী তাঁর আর ভোগ্যবস্তু কি? শুধুমাত্র অহল্যা ব্যতীত অন্য কোনও কিছুতেই আচার্যের মোহ নেই...।"

একথা শোনামাত্রই গৌতমের মুখ কালো হয়ে যায়। আমার বুক কেঁপে ওঠে। অসাবধানতায় এ কি কথা বলল মধু। আমি কি ভোগ্যবস্তু? আমি গৌতমের ধর্মপত্নী, কিন্তু ভোগ্যবস্তু নয়। আমি কঠোর দৃষ্টিতে মধুর দিকে তাকাতেই সে অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। মাধুর্য মধুর তিরস্কার করেন—"আমার স্ত্রী হলে কি হবে—নির্বোধ কিশোরী।"

মনে সোমভাবনা না থাকলে সোমলতা কি করে পাবে? মনে পড়ছিল দেবী আপনার সোম অন্বেষণের কথা। দেবী অপালা নিজের রোগমুক্তির জন্য সোম সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে নিজের দুঃখ ভুলে জগতের দুঃখ মোচনের জন্য অধর পাত্রে সোম অর্পণ করলেন ইন্দ্রদেবকে। আমি কিন্তু নিজের কোনও অভীষ্ট পূরণের জন্য সোমলতা অন্বেষণ করছি না। জগতকে দুর্ভিক্ষমুক্ত করার জন্য আমার প্রাণে আজ সোম-অন্বেষা জেগেছে। জগতের বুভুক্ষুদের মধ্যে আছে আমার পুত্র চিরকারী এবং কন্যা গৌতমী। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে যজ্ঞের সুফল শুধু আমার পুত্র-কন্যাই পাবে অন্যেরা পাবে না। বর্ষার জল কি পর আপন, আর্য-অনার্যের তফাৎ করে?

কিন্তু যদি সোমলতা পরীক্ষা করার জন্য আমার দন্তপংক্তিকে সোমনিষ্কাষণকারী 'গ্রাব্য' এবং অধরকে করি দ্রোণ কলস তদুপরি ইন্দ্রদেব যদি যজ্ঞানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করে আমার অধর পাত্রে সোমামৃত পানে আগ্রহী হন, তাহলে আমি কি করব? কিংবা সোমরসে যদি ইন্দ্রদেব তুষ্ট না হন, মধুক্ষরার কথা অনুযায়ী আমি কি স্বয়ং হবি হয়ে যাব?

এইরকম ভাবনা এক মধুর ভীতিতে আমায় প্রকম্পিত করছিল।

বসন্ত ঋতু। পাঁচদিন ব্যাপী সোমযজ্ঞে এককালীন ইন্দ্রদেবকে সোমহবি অর্পণ করার জন্য যোলজন ঋত্বিককে বরণ করা হয়েছে। তাঁরা আশ্রমে এসে পৌঁচেছেন। এই ঋত্বিকদের মধ্যে চারজন প্রধান হোতা, চারজন উদগ্রাতা, চারজন অধ্বর্যু ও চারজন ব্রহ্মা। এই সোমযজ্ঞ

সূত্রযজ্ঞের অন্তর্গত হওয়ায় যজমান গৌতম হলেন ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে প্রধান ঋত্বিক। তাঁর স্ত্রী হিসাবে যজমান এবং প্রধান ঋত্বিকের পত্নীর গুরুদায়িত্ব আমার মাথায়। প্রধান ঋত্বিকের সাথে আমাকে যজ্ঞবেদীতে উপস্থিত থাকতে হবে। ইন্দ্রতুষ্টির জন্য আমার উপস্থিতি অনিবার্য। সম্মতি অসম্মতির প্রশ্ন কোথায়?

হে বর্ষাদাতা ইন্দ্রদেব, বসন্ত এসেছে পৃথিবী কিন্তু পুষ্পহীনা। এখন নবপত্রের উন্মেষ ঘটত, গন্ধবহ আর মধুবহর মধ্যে হৃদয় দেওয়া নেওয়া চলত বৃক্ষের গ্রন্থিতে সবুজ পাতার কম্পন সৃষ্টি হত। কিন্তু কোথায়? পৃথিবীর মেঘ তৃষার লগ্ন বয়ে গেছে। কি করে মেঘ সব সত্যকে ভুলে গেল? আকাশ মিথ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃষ্টিবাহী মেঘকে অন্য কোন অজানা আকাশে নির্বাসিত করল? কি অপরাধ বসুমতীর? কি প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক?

সোম পাহারা দিয়ে সারারাত বসে আছেন যজমান গৌতম এবং তার পত্নী আমি। গৌতম ধ্যানস্থ। আমি আমার ভাবনায় মগ্ন। প্রথম দিন ঋত্বিক বরণের কাজ শেষ হয়েছে। যজমান এবং প্রধান ঋত্বিক হিসাবে চুল, দাড়ি, নখ ইত্যাদি কেটে স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করে গৌতম ইন্দ্রস্তুতি করেন। তারপর প্রথানুযায়ী অধ্বর্য্য তাকে দীক্ষিত করেন। আমাকে দীক্ষা দেন প্রতিপস্থাতা। এখন আমি দীক্ষিতা। চতুর্থ দিনে "বসতীবরী" জল এনে আমি ঘরে রেখেছি। এখন রীতি অনুযায়ী রাত জেগে আমি এবং গৌতম সোম পাহারা দিচ্ছি। গৌতম যজ্ঞভাবনায় মগ্ন। আমি কিন্তু আনমনা—।

গভীর অরণ্যে যখন আমি সোমলতা সংগ্রহ করছিলাম, তখন প্রহরী হিসাবে কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে পাঠিয়েছিলেন গৌতম। সবাই জানবে আমার সুরক্ষার জন্য শিষ্যদের আমার সাথে পাঠিয়েছেন গৌতম। কিন্তু আমি জানি, সুরক্ষা নয়—আমার প্রতি সন্দেহবশত এই ব্যবস্থা। সন্দেহের বেত্রাঘাতে সোমসংগ্রহের একাগ্রতা কি করে আসবে? বহুদিন নিরাশ হয়ে ফেরার জন্য গৌতম বিরক্ত হন। সোমভাবনা ব্যতীত যে সোমলতা পাওয়া যায় না সেকথা আমি এবং গৌতম উভয় জানি। তাই গৌতমের সন্দেহ এবং আমার একাগ্রতার অভাব সোমভাবনার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকথা জেনেও আমার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত থেকে ক্ষান্ত হননি গৌতম।

সেদিন আমি গৌতমকে বললাম—"আমার সাথে মধুক্ষরা থাক, আমরা দু'জনে মিলে সোমলতা খুঁজলে নিশ্চয় সফল হব। দু'জন থাকলে ভয়েরও কারণ নেই। ব্রহ্মচারীদের পাঠাভ্যাসের সময় অপচয় করে আমাদের সাথে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।"

সহসা গৌতম উত্তর দিলেন—"মিলিতভাবে সোমলতা সংগ্রহ করলে ইন্দ্র মধুক্ষরার ওপর সন্তুষ্ট হবে এবং মাধুর্যও তার প্রশংসাভাজন হবে। এত কম বয়সে ইন্দ্রের প্রশংসা শুনলে আত্মগৌরবে মাধুর্যের কর্তব্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইন্দ্রের প্রশংসা হজম করার বয়স মাধুর্যের হয়নি।

গৌতমের কথা যত উদার হোক না কেন তাঁর মনের সন্দেহ আমার কাছে স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও আমি বললাম—"মধুক্ষরা থাক, আমি একা যাব সোমসংগ্রহে। অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ

কাজ। শিষ্যদের আমাকে অনুসরণ করার দরকার নেই। আত্মরক্ষার শক্তি আমার আছে। বাল্যকাল থেকে আমি গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়াই।"

—"তখন তুমি ছোট ছিলে, এখন পূর্ণ যুবতী। দস্যুরা যেভাবে উৎপাত করছে, কখন তোমাকে বলাৎকার...।"

এই বীভৎস বাক্যটি শেষ করার আগে আমি বাধা দিয়ে বললাম—"থাক, এইরকম কথা বলে আর্যমানসের নিন্দা করো না। দস্যু আর্যদের সৃষ্টি। মানুষকে বিভক্ত করছে আর্যমানস। অনার্যরা মাঝে মাঝে আর্যনারীদের সাথে অসৎ ব্যবহার করে—এটা ঠিক, কিন্তু তুমি ভালো করে জানো অনার্য দস্যুরা আমাকে শ্রদ্ধা করে। অনেক সময়ে তারা আমার রক্ষক হয়েছে, আজ ভক্ষক হবে কি করে? তথাপি সঙ্গে সত্যকাম যাক। সে আমার কাছে থাকলে আমি চিরকারীর দুঃখ ভুলে যাই।"

এই প্রস্তাবে গৌতম সম্মত হলেন। চিরকারী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার জন্য সম্ভবত গৌতম নিজেকেই দায়ি করেন। তাই চিরকারীর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি প্রতিবাদ করতে পারেন না।

সৌম্য, শান্ত সত্যকাম নিশ্চয় কোনও ধনী আর্য বা মুনিঋষির পুত্র হবে। তার মুখের প্রশান্তি তার সংস্পর্শে আসা যে কোনও নারী পুরুষের মনে শান্তির চন্দন লেপে দেয়। সত্যকাম সঙ্গে থাকায় পথের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। মনে হয় চিরকারী যেন আমার সাথে মা মা করে ঘুরছে। কোথায় হারিয়ে যাবে চিরকারী? এই পৃথিবীতে কেউ কি হারিয়ে যায়? সবাই এই ঋতম্ভরা বসুন্ধরার কোথাও না কোথায় আছে। সেখানে আছে সূর্য, চন্দ্র, রোদ-বৃষ্টি আর ঋতুসমূহ। আছে নদ-নদী, জননী বসুধার উদার বাৎসল্য সর্বত্র বিরাজমান। তাই নাবদের কথা ঠিক। আমার পুত্র চিরকারী হারায়নি—কিন্তু আমি তাকে পাচ্ছি না। পাচ্ছি না গৌতমের সন্দেহের জন্য। চিরকারীর অন্তর্ধান যখন আমাকে বিচলিত করে, গৌতমের সন্দেহ তখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার মধ্যে একটা প্রতিশোধ পরায়ণতা জাগে। কিন্তু সেই প্রতিশোধের স্বরূপ স্পষ্ট হয় না। আমি মনকে সান্ত্বনা দিই। ফুল, পাতা, শিশিরকণায় চিরকারীর মুখ দেখি। আমার ছেলের নিষ্পাপ কোমল মুখ সত্যকামের মুখে তথা পৃথিবীর সব শিশুর মুখে চিত্রিত হয়ে যায়।

সোমলতা দুর্লভ। কিন্তু তা পাওয়া যায়। যেমন পেয়েছিলেন অপালা। আমিও সোমলতা পাব, চিরকারীকে পাব, কিন্তু সোমভাবনা নিয়ে খুঁজতে হবে। চিরকারীর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করে আমি সত্যকামের কাছাকাছি এলাম। জননী হৃদয় এমনই যে সেখানে কারও স্থানাভাব হয় না।

যদি আমি সোমলতা পেয়ে যাই, এবং এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ইন্দ্রদেব দর্শন দেন তাহলে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হবেন এবং পূর্ণাহুতি না হতেই বৃষ্টি ঝরে পড়বে নিদাঘতপ্ত ধরাবক্ষে। ইন্দ্রদেব যদি অপালাকে অরণ্যের মধ্যে দর্শন দিয়ে থাকেন তাহলে আমাকে দেবেন না কেন?

সত্যকামের জননী জবালার উপদেশ মনে পড়ল। সত্যকামকে দেখার জন্য নয়, আমাকে দেখার জন্য কয়েকদিন পূর্বে সে এসেছিল। সত্যকাম আশ্রমে স্থান পাওয়ার পর সে মাঝে মাঝেই আসে। দাসী হলেও তার উচ্চ সংস্কার আমাকে মুগ্ধ করে। জবালার পা ছুঁয়ে প্রণাম করাটা ঋষিপত্নীদের পছন্দ না হলেও আমি সর্বসমক্ষে তাই করি। এবার তার সাথে দু'দিন ধরে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে। আমার সোমসংগ্রহের কথা শুনে দৃঢ়স্বরে সে বলেছিল—"আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয় সোমলতা প্রাপ্ত হবে এবং ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। অনুর্বরা অহল্যা পৃথিবী তোমার নিষ্ঠাবলে বর্ষাস্নাত হবে—হবে উর্বরা এবং সষ্যশামলা।"

খুশী হয়ে আমি বলেছিলাম—"তুমি আশীর্বাদ করলে অরণ্যের মধ্যে আমি ইন্দ্রদেবের দর্শন পাব অপালার মতো। আমি অরণ্য থেকে আশ্রমে ফেরার আগেই বর্ষার জল প্লাবিত করবে আশ্রম প্রাঙ্গণ। গৌতমকে হাত পেতে ইন্দ্রদেবের কাছে জল ভিক্ষা করতে হবে না। এর ফলে গৌতম নিশ্চয় সন্তুষ্ট হবেন।"

জবালা আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বলে—"মেয়ে! তুমি সংসারী হয়েও সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা। তুমি যেমন সরল, সংসার তেমন সরল নয়। অপালার আখ্যান শুনেও তুমি অপালাকে চিনতে পারলে না। চিনতে পারলে না স্বামীর সন্দিগ্ধ মনকে? ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে এখনও সংসারের সন্দেহমুক্ত নয় অপালা। স্বামীর সন্দেহর তাপ প্রবাহে তার কোমল যৌবন ঝরে গেল। নারী পুরুষের গোপন সাক্ষাৎকে সংসার সন্দেহ করে। তোমার স্বামী মহর্ষি গৌতম'ত সহজেই...।"

জবালা ঠিকই বলেছে। তাই সোমলতা সংগ্রহ করে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাব। অপালার মত দাঁত দিয়ে সোমরস নিষ্কাষণ করব না।

ভাই নারদ বলেন, আমার নাকি একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিছু কিছু পুষ্পলতা আমার আকর্ষণে নিজে থেকেই আমার ওপর এসে পড়ে।

শিশুকালে আমাকে গাছের তলায় শুইয়ে রেখে প্রথা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করছিল। বসন্তকাল। আমার ওপর এমন পুষ্পবৃষ্টি হয় যে, আমি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেলাম। পুষ্পস্তূপের ভিতর থেকে আমাকে খুঁজে পাওয়া প্রথার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। ভাগ্যক্রমে ভাই নারদ সেখানে এসে পৌঁছান এবং আমাকে উদ্ধার করেন। আমি তখন সংজ্ঞাহীন। তারপর দমকা বাতাসে আমি চোখ খুলে তাকাই—সংজ্ঞা ফিরে আসে। আর এক নববসন্তের পূর্বাহ্নে আমি আনমনা হয়ে লতাকুঞ্জে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না কখন অজানা বনলতা আমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছে, আমার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা। আমার ক্ষীণতনু বনলতিকার সাথে মিশে একাকার। এমন সময়ে অদিনের মেঘ ঝরে পড়েছিল আমার ওপর। আমার শরীরের সমস্ত গ্রন্থি যেন উন্মোচিত হয়েছিল নবরোমাঞ্চে, অনায়াসে আমি বন্ধনমুক্ত হয়েছিলাম।

ভাই নারদ বলেন—আমি প্রকৃতি, আমি পৃথিবী, আমি ঋতম্ভরা বসুন্ধরা। তাই প্রকৃতির

সাথে আমার অভিন্ন সম্পর্ক। অথচ আজ সোমলতা আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। "সায়ংহোমের" পূর্বেই আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। তাহলে কি আজও আমি সোম সংগ্রহ করতে পারব না? গৌতমের সোমযজ্ঞ কি বিফল হবে? দুর্ভিক্ষ দূর হবে না? অনার্যপল্লীতে কি মড়ক দেখা দেবে?

এটা সেটা নানাকথা ভাবছি। কখনও পারিজাত বনের স্বপ্ন আবার কখনও পাতালপুরীর দুঃস্বপ্ন। সত্যকাম পিছনে থেকে গেছে। পাহাড়ের চড়াইয়ে এক নির্জন জায়গায় আমি এসে পৌঁছেছি। কে যেন কোমল বাহুপাশে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। কে যেন আমার গাল, চিবুক, অধর স্পর্শ করছে। কে আমায় মধুস্পর্শে রোমাঞ্চিত করছে? কে?

প্রকৃতিস্থা হয়ে নিজের দিকে তাকাই। স্রষ্টার এ কি অপূর্ব লীলা। কোমল সোমলতা চারদিক থেকে আমায় আলিঙ্গন করছে। আমার গাল, চিবুক, অধর ছুঁয়ে আমায় আদর করছে। সেই স্পর্শে আমার জড় নারীত্বের গ্রন্থি খুলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার হাত যে বন্দী, সোমলতা সংগ্রহ করব কি করে? সোমলতা ধরা দিয়েও অধরা। হাতের মুঠোয় পেয়েও প্রাপ্তি উপলব্ধি হচ্ছে না। অপ্রাপ্তি যদি শূন্য পিঞ্জর, তাহলে প্রাপ্তি হল বন্ধন। মুক্তি কোথায়? মুক্তিদাতা কে?

কার যেন বলিষ্ঠ বিশ্বস্ত হাত এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সেই হাতের স্পর্শে সোমলতার বন্ধন উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের মধ্যে সোম কিশলয় ঝরে পড়েছে। আমি সোমলতা প্রাপ্তি হয়েছি? ইন্দ্রদেব নিশ্চয় তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমার মুক্তিদাতা কে? আমার পুত্র সত্যকাম? স্বামী গৌতম?

না, আমার সম্মুখে উপস্থিত ইন্দ্রদেব। তাঁর স্পর্শে আমি সোমপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি আমি মুক্ত? সম্মুখে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন জগতের ত্রাণকর্তা ইন্দ্রদেব। তাঁর কাছ থেকে মুক্ত হলে গুরুর নির্দেশে আমার পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকবে আমার সত্যকাম। তার কাছে মুক্তি পেলেও স্বামী গৌতমের কঠোর অনুশাসন ও সন্দেহের কারাগার।

আমি অনুনয় করে বললাম—'ইন্দ্রদেব, আপনার আরাধনার জন্য এই সোমসংগ্রহ। আপনি সোমযজ্ঞের সিদ্ধিদাতা। সোম-হবি আপনারই প্রাপ্য। কিন্তু এখানে নয়— যজ্ঞবেদীতে। আমার স্বামী গৌতম সোমযজ্ঞের যজমান এবং প্রধান ঋত্বিক, তাঁর অনুপস্থিতিতে পূর্ণাহুতি সম্ভব নয়। পঞ্চম দিনে আপনাকে সোমরস অর্পণ করা হবে। আজ যজ্ঞের তৃতীয় দিন। যজ্ঞের সকল নিয়ম যথাবিধি পালন করা উচিত। গৌতম অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। নিয়মভঙ্গের অর্থ যজ্ঞভঙ্গ। তাই পঞ্চমদিনে যজ্ঞহবি গ্রহণ করে করুণাবারিতে আশ্রমকে প্লাবিত করার জন্য আগমন করুন। আমি নানাভাবে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। বর্তমান আমার পথ ছেড়ে দিলে পুনরায় কতৃজ্ঞ হব। 'সান্ধ্যহোমের' পূর্বে ফিরে না গেলে আমার স্বামী...।"

"অনর্থ করবেন?" আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্রদেব বললেন—"কিন্তু আমি বরদাতা নয়—তুমি বরদাত্রী অভীষ্ট দেবী। তোমার প্রতিশ্রুতি তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম।" এইটুকু বলে তিনি আমার দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হলেন। আমি দ্রুত আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলাম। সত্যকামের সাথে দেখা হওয়ামাত্র আনন্দে অধীর হয়ে বললাম জানিস সত্য, ইন্দ্রদেব এসেছিলেন। তাঁর কৃপায় আমি সোমলতা পেয়েছি, তোর সাথে দেখা হয়নি?

সত্যকাম স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে খুশী হয়েছে বলে মনে হল না। নীরবে মাথা নিচু করে আমাকে অনুসরণ করে।

এতগুলো সোমলতা আমি সংগ্রহ করেছি দেখে আশ্রমের সবাই খুশী হয়। ইন্দ্রদেবের সহসা আবির্ভাব ও প্রস্থানের কথা আমি গৌতমকে বললাম—গৌতমকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সত্যকামকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন—"অরণ্যে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি? অরণ্যে কি কারও সাথে দেখা হয়েছিল?"

—"বহুকষ্টে সোমলতার সন্ধান পাওয়া গেল। সোমলতা খুঁজতে খুঁজতে মা বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে সোমবন্ধনে পড়ে যান। দয়াপরবশ হয়ে ইন্দ্রদেব না পৌঁছালে মা সোমবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারতেন না। কিন্তু আমি ইন্দ্রদেবের দর্শন পেলাম না। মার কথায় জানতে পারলাম ইন্দ্রদেব মাকে দর্শন দিয়েছেন। দিব্যনারী হওয়ায় মা দেবতার দর্শন পেলেন।

—"পদ্মপ্রীতিই মধুপের মৃত্যুর কারণ হয়" —এইকথা বলে গৌতম নীরব হয়ে যান।

সত্যকামের কাছে একথা শুনে আমার মন বিষিয়ে যায়। ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব সম্পর্কে আমার কাছ থেকে শোনার পরেও সত্যকামকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করাটা গৌতমের কুৎসিৎ সন্দেহ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে গৌতমের সাথে আমার কোনও বিতর্ক হল না। আশ্রমে অতিথির ভিড়। সবাই যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত। যজ্ঞের সফলতার জন্য আর্য অনার্য উভয়ই ব্যকুল। ছোট ছোট পরিবারিক মতান্তর নিয়ে এই সমগ্র কর্মকাণ্ড ভণ্ডুল করাটা কেউই উচিত মনে করলাম না। তাছাড়া ঘরের কথা রাস্তায় আনা সমীচীন নয়। কিন্তু গৌতমের সন্দিগ্ধ কঠোর দৃষ্টি দুষ্প্রাপ্য সোমলতা প্রাপ্তির আনন্দকে নিষ্ফল ক্ষোভে পরিণত করে দিল।

"হে আধ্যাত্মিক রজনী! তোমাকে প্রণাম। আমরা দু'জনে একমন প্রাণ হয়ে রাত্রি জাগরণ করে সোম পাহারা দিচ্ছি। প্রেমময়ী এই অলৌকিক মদিরা ইন্দ্রকে সমর্পিত। ইন্দ্র এই সোমপান করে সন্তুষ্ট হন এবং যজমানের অভীষ্ট পূরণ করুন।" সংগৃহীত সোম একটি পাত্রে রেখে চন্দ্রচর্চিত বেদীর ওপর রাখলেন গৌতম। আমরা দু'জনেই নিদ্রাহীন। কিন্তু গৌতমের উচ্চারিত বাণী কি সত্য? প্রকৃতপক্ষে কি আমরা এক মন এক প্রাণ?

"হে ঐশ্বর্যশালী প্রভু! —হে ইন্দ্রদেব। আমার সবকিছু তোমাকে সমর্পিত। যজ্ঞে স্বাহা হওয়ার পর যা যজ্ঞাবশিষ্ঠ থাকবে, শুধু সেটুকুই ভোগ করব। বৃষ্টির জল বাষ্পাকারে পৃথিবী থেকে আকাশে গিয়ে পুনরায় বৃষ্টির জল হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ার মতো আমার সর্বস্ব

গ্রহণ করে বরদান রূপে আমার অভীষ্ট পৃথিবীতে ফিরে আসুক। পঞ্চসিন্ধুতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। আর্য-অনার্যের সহাবস্থান সুদৃঢ় হোক।" একাগ্রচিত্তে গৌতম প্রার্থনা করে চলেছেন।

গৌতমের বাণীর সত্যতা ও শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা, আমার মনের পাপ ছাড়া আর কি? সোমের এ কি মোহময় সুগন্ধ! আমি গৌতমের মতো একাগ্র-চিত্তে বসতে পারিনি। সোমের সুগন্ধে চন্দ্রকিরণও সুগন্ধিযুক্ত মনে হচ্ছিল। আমি কখন ইন্দ্রদেবকে স্মরণ করছিলাম, আবার কখন প্রেমময় চারুচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধচিত্তে প্রার্থনা করছিলাম— "হে সুধাকর! এই পৃথিবী নিরন্ন ও ক্ষুধিত। পৃথিবীকে বুভুক্ষা দানবের হাত থেকে রক্ষা করো। সোমপ্লাবনে মধুক্ষরা হোক ধরণী। নদীর মতো প্রেমের মধুসাগরে লীন হয়ে আমি জীবন সার্থক করি।"

আমার প্রার্থনায় চমকে তাকালেন গৌতম। তাঁর দৃষ্টিতে প্রশ্ন—"সাগর কে? কোথায় লীন হতে চাও? সোমযজ্ঞে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জড়িত করছ?"

—"ক্ষুদ্র স্বার্থ কি? ইন্দ্রপদ লাভ না সংসারের ক্ষুধানাশ?" আমার দৃষ্টি গৌতমকে প্রশ্ন করছিল। গৌতম আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

আমি ভাবছিলাম, গৌতমের সোমযজ্ঞ সফল করার জন্য আমি তাঁর কঠোর নির্দেশে সোম সংগ্রহ করেছি এবং রাত জেগে সোম পাহারা দিচ্ছি। কিন্তু জ্যোৎস্নার সুধাস্পর্শে আমাব অবচেতন উন্মুক্ত হচ্ছিল আমার সামনে। কারও নির্দেশে নয়, অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা জেগেছে বলেই সোমযজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য আমি বদ্ধ পরিকর।

আগামীকাল ইন্দ্রদেবকে তিনবার সোমবস অর্পণ করা হবে। প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন ও সায়ং সবনের সময়ে ইন্দ্রদেব উপস্থিত থেকে সোমহবি গ্রহণ করবেন। তাই প্রত্যুষে চৈত্ররথ আশ্রমে উপস্থিত হবে। উষ্ণ আতিথ্যে ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট না হলে হবি গ্রহণ না কবে ফিরে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি সেরকম হয় তাহলে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আকাল দেখা দেবে ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

আজ সান্ধ্যহোমের পূর্বে গৌতম অথর্ব বেদের নবম মণ্ডল ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করলেন। উক্ত অধ্যায়ে বৈদিক অতিথি সৎকারের মন্ত্র আছে, গৌতম বিশদভাবে তা ব্যাখ্যা করেন। সম্ভবত আমাকে কর্তব্য সচেতন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আমি ব্রহ্মাপুত্রী। আমি কি অতিথি সৎকার জানি না? রম্যবনে পিতা উপস্থিত থাকলে অতিথিদের মেলা বসে যায়। কোন অতিথিকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে তা' বাল্যকাল থেকেই আমার জানা। বিয়ের পর গৌতম আশ্রমে কোনও অতিথির অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। দেবতা, রাজা, ঋষি, দাস, ভিক্ষাপ্রার্থী যে আমার কুটীর দ্বারে উপস্থিত হয়েছে—আমি তাদের সমান দৃষ্টিতে দেখেছি। একইভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছি। এটা আমার বাল্যকালের সংস্কার। তা সত্ত্বেও গৌতম বলে চলেছেন—"অতিথি হলেন যজ্ঞের আত্মা। তাই অতিথি যে বস্তুতে সন্তুষ্ট হবেন, তাঁর রুচি অনুসারে সেই বস্তু শুদ্ধচিত্তে তাকে অর্পণ করতে হবে। অতিথিকে অর্পিত

সমস্ত বস্তু যজ্ঞসমাগ্রীর মতো পবিত্র ও শুদ্ধ। প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে অতিথিকে দেখা দেবদর্শনের সমান। অতিথির সাথে মধুর কণ্ঠে আলাপ করা যজমানের যজ্ঞবস্ত্র পরিধান করে অধ্বর্য্যর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার সমান। অতিথি সৎকার করে ফেরা ব্যক্তি যজ্ঞ উদ্‌যাপনের পরে যজ্ঞান্ত স্নান সেরে ফেরা ব্যক্তির মতো দেবোপম। যে অতিথিকে তুষ্ট করতে বিফল হয় তার গৃহের সুখ সমৃদ্ধি ও যশ কীর্তিকে স্বয়ং ভক্ষণ করে। সেইরকম ব্যক্তি গৃহের শত্রুতুল্য এবং বর্জনীয়।"

সোম জাগরণের সময়ে গৌতমের দিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কিত হচ্ছিলাম। আমাকে বর্জন করার জন্য গৌতম যেন অজুহাত খুঁজছেন। ইন্দ্রতুষ্টির ওপর নির্ভর করে বৃষ্টিপাত। কোনওটাই সহজ সাধ্য নয়। তাই এই সুযোগে সম্ভবত আমাকে বর্জন করে তপস্যা করার জন্য গৌতম হিমালয়ে চলে যাবেন। কিন্তু বর্জন, ত্যাগ ও উৎসর্গের মর্যাদা পাবে। অহল্যা ইন্দ্রকে তুষ্ট করতে সক্ষম না হওয়ায় পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দূর হল না তাই গৌতম অহল্যাকে ত্যাগ করে তপস্যা করতে হিমালয় চলে গেলেন—সবাই এটা জানবে। জগৎ তাঁর প্রশংসা করবে। অহল্যা হবে নিন্দিতা। কিন্তু এইভাবে অযথা প্রশংসার ভাগীদার হতে আমি দেব না গৌতমকে। আমি ইন্দ্রদেবকে নিশ্চয় তুষ্ট করব, প্রয়োজনে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করব না। আমাকে বর্জন করে তপস্যারত হওয়ার সামান্য অবকাশও সৃষ্টি হতে দেব না। কিন্তু গৌতমকে তার সিদ্ধান্ত থেকে কে সরাবে? স্বামীর দ্বারা বর্জিতা হওয়া যদি আমার অদৃষ্টে থাকে তাহলে আমি কি সেটা পরিবর্তন করতে পারব? কিন্তু আমি ইন্দ্রকে তুষ্ট করতে পারব না কেন? সোমলতা প্রাপ্ত হওয়ার পর ইন্দ্রতুষ্টি অসাধ্য নয়। সোমপ্রাপ্তি আমার মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন গুণের অভাব আছে আমার?

আমার অহংকার পরমুহূর্তেই আমাকে ভয় দেখায়। যার জন্য আমার অহংকার, সেই যে আমার অহংকার চূর্ণ করার জন্য অভিপ্রেত, তখন কি আমি জানতাম? মানুষের মধ্যে দেবতা না থাকতে পারে, কিন্তু দেবতার মধ্যে'ত মানুষ থাকে। মানুষ দিব্য হলে দেবতা হয়। মানুষের মতো দেবতারাও কূটনীতিতে দক্ষ। ইন্দ্রদেব'ত কূটনীতিতে পারদর্শী। তা নাহলে বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও আর্যনায়ক থেকে দেবরাজ হতে পারতেন না। গৌতমের সোমযজ্ঞ ভ্রষ্ট করার জন্য নাকি ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। তাই সোমহবি গ্রহণ করে ইন্দ্রদেবের সন্তুষ্ট হওয়ার আশা নিতান্ত ক্ষীণ বলে আশ্রমে আলোচনা হচ্ছে। যদি সোমযজ্ঞ বিফল হয় তাহলে গৌতমের সুনাম নষ্ট হবে এবং পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলের আর্যগণ তাঁর ওপর আস্থা হারাবেন। তাছাড়া ক্ষুধিত অনার্যরা বিদ্রোহ করবে। সিদ্ধি না পেলে সাধনা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা সুনিশ্চিত। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এই সোমযজ্ঞ এক আহ্বানে পরিণত হয়েছে! আমার আতিথ্যে ইন্দ্রদেবের সন্তুষ্ট না হওয়াটা আমার নারীত্ব এবং আচার্যর পদের অবমাননা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমার নারীত্বের ওপর আমার গভীর আস্থা। ইন্দ্রদেব যদি ইচ্ছা করে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তাঁর তঞ্চকতাই প্রমাণিত হবে। কোন মুখে অহল্যা আচার্যার সান্ত্বনা দেবে—।

"যজ্ঞভঙ্গ করোনা, যজ্ঞের ফল তোমাদেরও প্রাপ্য। সোমযজ্ঞের পর অমৃত বারিধারায় ধরিত্রীর এই তপ্ত ভূখণ্ড প্লাবিত হয়ে যাবে...।

সিদ্ধির রূপ মহিমামণ্ডিত। কিন্তু অসীম কষ্টলব্ধ ফল সিদ্ধি। সেকথা শুধু সিদ্ধ ব্যক্তিই জানে। বাইরের দর্শক এমনকি সিদ্ধিদাতাও সিদ্ধিপ্রাপ্তির পথে ভোগ করা কষ্টের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন না। সিদ্ধিপথে গৌতম বহুকষ্ট ভোগ করেছেন্। হে ইন্দ্রদেব গৌতমের অভীষ্ট সিদ্ধি হোক্। আমার অভীষ্ট? আমি নিজেও জানি না আমার অভীষ্টের স্বরূপ কি? তাই নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। চিন্তা গৌতমের জন্য। এই সোমযজ্ঞ সফল হলে সম্ভবত আমাদের দাম্পত্যজীবনে সোমধারা প্রবাহিত হবে। স্বাভাবিক হয়ে উঠব আমি—পঞ্চসিন্ধু অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

মহাভিষেকের মুহূর্ত উপস্থিত। জলপূর্ণ পাত্রে থেকে সোমলতা সতেজ হয়ে উঠছে। উদ্‌গাতা ও তাঁর অনুচরেরা এক বৃহৎ দ্রোণকলস যজ্ঞবেদীর নিকটে এনে রাখলেন। মেষলোমে প্রস্তুত দশাপবিত্র ছাঁকনি দ্রোণকলসের মুখে স্থাপন করেছেন গৌতম। এই পবিত্র ছাঁকনির মাধ্যমে বিশুদ্ধ মধুর দিব্যশক্তি প্রদায়িনী সোমরস বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়বে দ্রোণকলসে। উছলে উঠবে কলসের বিশাল বক্ষ। তারপর হবে সোমহবির অবর্ণনীয় স্বাহা।

আশ্রমে সবাই উৎকণ্ঠিত। মাঝে মাঝে সোমলতা থেকে পর্যাপ্ত রসক্ষরণ হয় না। বৃষ্টির অভাবে লতাপাতা প্রায় শুষ্ক। রাত থাকতেই ঋত্বিকগণ সোমসবনের প্রারম্ভিক কার্যের শুভারম্ভ করেছেন। অধ্বর্য্যু নদীর থেকে জল সংগ্রহ করেছেন, নদীও জলদানে অকরুণ। বহুকষ্টে সংগৃহীত জলের সাথে পূর্বে সংগৃহীত বসতীবরী জলের মিশ্রণ করেছেন ঋত্বিকগণ। অধ্বর্য্যু, প্রতিপস্থাতা, নেষ্টা ও উন্মেতা এই চারজন ঋত্বিক মহা অভিষেক সম্পন্ন করা মাত্র—জয় ইন্দ্রদেব মুক্তিদাতা ইন্দ্র, গতিদাতা ইন্দ্র ধ্বনিতে কম্পিত হচ্ছিল পৃথিবী। সোমলতা সবনের জন্য দ্রোণকলসের ওপর স্থাপনের সময়ে হোতা, উদ্‌গাতা, অতিথি, ঋষিকাগণ নানারকম স্তোত্র পাঠ করতে থাকেন। কিন্তু সোমরস অত্যন্ত ক্ষীণধারায় নিষ্কাষিত হওয়ায় সকলের মনে নৈরাশ্য ছেয়ে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সবনের পর যে পরিমাণ সোমরস সংগৃহীত হল তাহা ইন্দ্রদেবের যজ্ঞহবির জন্য পর্যাপ্ত নয়। বিশ্বামিত্র বললেন—"পর্যাপ্ত সোমহবি অর্পণ না করলে ইন্দ্রদেব অপমানিত হবেন এবং ফল বিপরীত হবে।"

"কিন্তু কার দোষ? দোষ'ত ইন্দ্রদেবের, যিনি বৃষ্টি কম করে সোমলতাকে নিষ্করুণ করেছেন।" আমার মুখে এইরকম কথা শুনে মাতা অরুন্ধতি জিভ কামড়ালেন। দেবতাদের আবার দোষ? মানুষ দোষ করলে দেবতা ক্ষুণ্ণ হন। তাই প্রথমে নিজের দোষ আবিষ্কার করে মনকে মুক্ত করতে হবে। যজমানের মনে কোনও দোষযুক্ত ভাবনা আছে কি?

সবাই তখন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে তাকায়। গৌতমের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামলাবার জন্য ভাই নারদ বলেন—'ইন্দ্রদেবের করুণা ব্যতীত সোমক্ষরণ অসম্ভব। তিনি স্বয়ং বর্ষাদান করে সোমসবন করেন এবং নিজেই সেই সোম সেবন করেন।

বর্তমান ষোড়শী গৌতমী ষোড়শী নামক স্তোত্র পাঠ করুক এবং প্রধান ঋত্বিকা অহল্যা তৃতীয় সবন করুক। আমার বিশ্বাস এই তৃতীয় সবনে দ্রোণকলস পূর্ণ হয়ে যাবে। ইন্দ্রদেবের নারীপ্রীতি কার বা অজানা? নারীকে সমান অধিকার দিতে তিনি অগ্রণী। তাই অহল্যা সবন কার্যে অংশগ্রহণ না করলে সোমক্ষরণ হবে না। এটা সম্ভবত ইন্দ্রজাল।"

প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় সবনের ফলাফলের জন্য ঋত্বিকগণ চিন্তিত ছিলেন। যদি এই অন্তিম সবন বিফল হয় তাহলে সোমযজ্ঞও বিফল হবে। মহর্ষি নারদ যখন এই প্রস্তাব দিলেন তখন সেটা অগ্রাহ্য করার যুক্তি কেউ খুঁজে পেলেন না। সম্ভবত ব্রহ্মাণ্ডের নাড়ী-নক্ষত্র জানা মহর্ষি নারদের ইন্দ্রমন অজ্ঞাত নয়।

প্রথা আমাকে বলে—"যাও অহল্যা, স্বামীর সোমযজ্ঞ সফল কর। তুমি ব্যতীত গৌতম অসম্পূর্ণ। তোমার স্পর্শ ব্যতীত সোমসবন সফল হবে না। স্ত্রীলোকেদের যজ্ঞাধিকার প্রথা বহির্ভূত নয়। তাহলে কুণ্ঠা কেন? উপস্থিত আচার্যগণ প্রথার কথা সমর্থন করেন। কাল বিলম্ব না করে আমি সোম সবনের জন্য উপস্থিত হলাম। গ্রাব্য স্পর্শ করামাত্রই সুগন্ধিত সোমরসে দ্রোণকলস পূর্ণ হয়ে গেল। আমার আদরের গৌতমীর সামগানে আকাশ মুখরিত হল এবং রত্নখচিত স্বর্ণময় চৈত্ররথ যজ্ঞবেদীর নিকট উপস্থিত হল, রথ থেকে অবতরণ করলেন প্রসন্নবদন ইন্দ্রদেব। আনন্দ কোলাহলে সামগান হারিয়ে গেল। সর্বপ্রথম ইন্দ্রদেব গৌতমীকে আদর করে বললেন—"গীতিময়ী, তোমার স্থান'ত ইন্দ্রলোক। একদিন তুমিও শরৎভানুর মতো ইন্দ্রলোকে স্থান পাবে ও বাগদেবীর মতো সম্মানিতা হবে, তোমার পিতামাতা ধন্য।" গৌতমীর পিতামাতা হিসাবে ইন্দ্রদেব ঋচা ও রুদ্রাক্ষকে অভিনন্দন জানালেন। এর ফলে আর্যগণ ক্ষুণ্ণ হলেন। যজ্ঞস্থলে যেতে যেতে এক বিতর্কের সূত্রপাত করে দিলেন ইন্দ্রদেব।

আমার যেমন ভালো লাগছিল, গৌতমকে ততটাই অপ্রসন্ন লাগছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছিলেন না।

দ্রুতগতিতে সোমহবি গ্রহণ করে নিমেষে দ্রোণকলস নিঃশেষ করে দিলেন ইন্দ্রদেব। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ পরিণত হবে অমৃত কলসে। ইন্দ্রের সামান্য কটাক্ষে আকাশ কলসের বুক চিরে ঝরে পড়বে বর্ষামৃত। পুনর্বার শুষ্ক পৃথিবী পরিণত হবে শস্যভরা জননী। অপেক্ষার মুহূর্ত গড়িয়ে যাচ্ছে—বরদান কোথায়? আকাশে বর্ষার সংকেত নেই। আকাশের গুরুগম্ভীর বুকে নিজের বর্ণময় ধনুক রেখে ইন্দ্রদেব সগর্বে বসে আছেন নিজের আসনে। পূর্ণাহুতির পর আর কোন 'স্বাহা'র অপেক্ষা?

সব কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছে। পূর্ব শত্রুতার শোধ নিচ্ছেন ইন্দ্রদেব। গৌতমকে পরাজিত ও বিফল মনোরথ করার প্রতিজ্ঞায় তিনি যেন অটল। অশুভ আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত। আশঙ্কিত অতিথিগণ নিজ নিজ আশ্রমের পরিস্থিতি সামলাবার জন্য স্বগৃহে ফিরে যাচ্ছেন। ইন্দ্রদেবকে বিদায় প্রণতি জানাবার সময়ে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে অভয়মুদ্রা। কিন্তু অভয়ই সংকেত দেয়, সম্মুখে ভয় আছে। অশুভ আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছে কেন?

ইন্দ্রদেবকে পরাজিত করে আমার স্বামীর কষ্টসাধ্য যজ্ঞফল হরণ করার জন্য আমার মধ্যে উদ্‌গ্র কামনা জেগেছে। আবার আমার অহংকার আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে—"অহল্যা, ইন্দ্রের সন্তুষ্টিবিধানে অকৃতকার্য হওয়াটা একা তোমার পরাজয় নয়—এই সৃষ্টিরও পরাজয়—বসুন্ধরার পরাজয়।" ইন্দ্রদেবের অহংকার চূর্ণ করার এই সর্বনাশী প্রতিজ্ঞা কেন আমার মনে এই মুহূর্তে জন্ম নিল? অঙ্কুরোদ্‌গমের পূর্বেই ভ্রূণের সৃষ্টি ও বিকাশ না জানি কত যুগের।

ভাই নারদ বললেন—"শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে অভীষ্ট পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইন্দ্রদেব অভীষ্টদাতা। কিন্তু উপযুক্ত সময় না হলে কে কি করতে পারে?"

এইটুকু বলে ভাই নারদও অন্তর্ধান করলেন। আশ্রম নির্জন হয়ে গেল। ইন্দ্রদেব প্রস্থানোদ্যত হলে আমার অহঙ্কারী স্বামী অত্যন্ত বিনয় সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করলেন—"হে প্রভু, আপনার বরদান ব্যতীত এই রজনী কালরজনীতে পরিণত হবে। বৃষ্টিদানের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ফিরে গেলে অনার্যরা বিদ্রোহ কববে। আশ্রম ধ্বংস করবে। বৃষ্টির আশায় তারা এতদিন শান্তিরক্ষা করেছে। দেখুন, দূরে দাঁড়িয়ে তারা কিরকম হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।" আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাদের সকরুণ দৃষ্টি। "জল দাও", "অন্ন দাও" এই কাতর প্রার্থনায় তারা মূক, নির্বাক।

ইন্দ্রদেব বললেন—"অভীষ্ট পূরণের প্রতিশ্রুতি কে দিয়েছিল? আমি তো এরকম প্রতিশ্রুতি দিইনি...।"

—"কিন্তু যজ্ঞের উদ্দেশ্য তো দেবতার অজ্ঞাত নয়। প্রত্যেকবার যজ্ঞহবি গ্রহণের পর আপনি নানারকম অনুদান ও সাহায্য দিয়ে থাকেন। আজ এই মহাসঙ্কটের সময়ে তার ব্যতিক্রম কেন?" —গৌতম প্রশ্ন করেন। শানিত দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রদেব বললেন—"নিজের মনকে প্রশ্ন করুন মহর্ষি গৌতম! এই যজ্ঞের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট? প্রকৃতপক্ষে এই যজ্ঞে কি বহুজন স্বার্থ নিহিত? অনার্যদের জীবনরক্ষা এই যজ্ঞের লক্ষ্য না তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচাটা লক্ষ্য? তাছাড়া কোনও ন্যস্তস্বার্থ এর সাথে জড়িত নয় ত?"

ইন্দ্রদেবের এই কটাক্ষ আমারও ভালো লাগে না। গৌতম ভিতরে ভিতরে ক্রোধে কাঁপছিলেন। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশের সময় এটা নয়। শান্তকণ্ঠে তিনি বলেন—"কিন্তু ইন্দ্রদেব, আপনি ত দাসদমনকারী দেবতা। আজ দাসস্বার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন কেন?"

—"যখন আমি দাসদমন করেছি—আর্য রাজা ও ঋষিদের অনুরোধে করেছি। আমার পিতা একজন দাস। আমি দাসবিরোধী হব কেন? অযথা আমাকে দোষারোপ করার পুরাতন অভ্যাস এখনও ভুলে যাওনি।" ইন্দ্রদেব ও গৌতমের তর্ক সৃষ্টি হতেই প্রথা প্রমাদ গনে।

উভয়ের মাঝে প্রবেশ করে সে বলে—"অতিথিবর! আজ আপনি অতিথি হিসাবে অবস্থান করাটাই যজমানের অভীষ্ট। সেইটুকু করে আশ্রমকে ধন্য করুন। অন্য বর চাইছি না।'

—"কার অতিথি? কে যজমান?" ইন্দ্রদেবের প্রশ্ন।

—"মহর্ষি গৌতম এবং দেবী অহল্যা" —প্রথার উত্তর।

আনন্দে হেসে উঠে ইন্দ্রদেব বলে—"গৌতম'ত আমার সহপাঠী বন্ধু, অহল্যা আমার বন্ধুপত্নী। এখানে যজমান এবং দেবতার বিচার কেন? এই শান্ত তপোবনে বিশ্রাম করে আমি খুশী হব। হে নমস্যা প্রথাদেবী। জীবন হল সবচেয়ে বড় দাতা। আমবা জীবনের উদারতাকে না দেখে কৃপণতাকে খুঁজে বার করে কষ্ট পাচ্ছি। সেই কষ্ট আমার, গৌতমের অহল্যার এবং অন্য সবাইর। জীবনের সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারলে কষ্ট দূর হত। সম্ভবত গৌতম আশ্রম জীবন সত্যের সিদ্ধিভূমি। আমি আপনার সশ্রদ্ধ অনুরোধ রক্ষা করছি।"

ইন্দ্রদেবকে প্রণাম জানিয়ে গৌতম তাঁকে অতিথিভবনেব দিকে নিয়ে চললেন। গৌতমকে অনুসরণ করতে করতে ইন্দ্রদেব বললেন—"নদী সংলগ্ন তোমার এই অতিথিগৃহ অত্যন্ত মনোরম। তোমার অনুপস্থিতিতে এক অপরাহ্নে অল্প সময়ের জন্য এখানে বিশ্রাম করে যতটা তৃপ্ত হয়েছিলাম, তার চেয়ে অতৃপ্তি ছিল বেশী। যাইহোক সেই অতৃপ্তি আজ রজনীর বিশ্রামান্তে দূর হয়ে যাবে। দেবী অহল্যার আতিথ্য ত্রিভূবনে আর কোথাও পাইনি। আর একবার তাঁর আতিথেয়তার জন্য লালায়িত ছিলাম।"

আগ্রহ সহকারে গৌতম বললেন—"এই অতিথিগৃহে যিনি অবস্থান করেন, তিনি আমাদের কাছে দেবতা! তাঁর পাদ্য অর্ঘ এবং আতিথ্য অহল্যার প্রধান পবিত্র কর্তব্য, সে বিষয়ে ত্রুটি হলে আমি তাকে ক্ষমা করব না। একথা সে জানে। তাছাড়া ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যার অতিথি সেবার গুণ সহজাত। আপনার আতিথেয়তায় ত্রুটি থাকবে না।"

—"আমি কৃতজ্ঞ" —ইন্দ্রদেব আন্তরিকভাবে গৌতমকে ধন্যবাদ জানালেন। গৌতমের দৃষ্টিতে আমার প্রতি স্বামীত্বের আদেশ ছিল। ইন্দ্রতুষ্টির জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করলাম।

সেই রাত্রি ছিল কালরাত্রি। মধ্য রাত্রে এক বিরাট ধূমকেতুর সাথে সংঘর্ষ হল বৃহস্পতি গ্রহের। সেই সংঘর্ষে বৃহস্পতি গ্রহে অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি হয়ে প্রলয় দেখা দিয়েছিল। সংঘর্ষের পর পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই সংঘর্ষে বৃহস্পতি গ্রহের উপরিভাগে একটা কালো দাগ সৃষ্টি হল। সংঘর্ষের পর অগ্নিপিণ্ড ও উত্তপ্ত বাষ্প পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে দেয়। এই মহাজাগতিক ঘটনায় জগত ভস্ম হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সবাই দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। মুনি ঋষিগণ ইষ্টনাম স্মরণ করেন। ধ্যানযোগে গৌতম জানতে পারেন—কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। এই ধরনের মহাজাগতিক ঘটনা সহস্র বছরে একবার ঘটে। এই ঘটনায় ইন্দ্রদেবের হাত আছে না কি?

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি ইন্দ্রদেবও অস্থিরভাবে উদ্যানে পদচারণা করছেন। কিভাবে অতিথির কষ্ট দূর হবে, আমার মাথায় কোনও বুদ্ধি আসছে না।

গৌতমকে অনুরোধ জানালাম—ইন্দ্রদেবের কাছে গিয়ে এই কষ্টের জন্য তার কি প্রয়োজন জানার জন্য। গৌতম ধ্যান থেকে উঠে ইন্দ্রদেবের কাছে যেতে তিনি বললেন—"কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না, বৃহস্পতি ও ধূমকেতুর সংঘর্ষের ফলে বৃহস্পতির আকাশে জলকণাবিহীন মেঘ সৃষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু সেই জলকণাবিহীন মেঘ সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর আকাশে। তাই এই উত্তাপ ও দহন। শুধুমাত্র প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।"

—"কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করব? জলদাতা'ত স্বয়ং আপনি। মেঘে জলকণা ভরে দেওয়া আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কেন এই ছলনা? আমাদের আতিথ্যে কি কোন ত্রুটি হল?" ব্যাকুল কণ্ঠে গৌতম প্রশ্ন করেন।

গৌতমের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইন্দ্রদেব জিজ্ঞাসা করলেন—"রাত্রে ভিতর থেকে তালাবন্ধ কর কাকে? কাল রাত্রে আমার ঘরে পানীয় জলের কলস রাখতে দেবী অহল্যা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন। তৃষ্ণায় অধীর হয়ে আমি তোমার দ্বারে করাঘাত করলাম। মনে হল, ভিতর থেকে তালাবন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছ।" গৌতম অপ্রতিভ হন। কাকে তিনি তালা বন্ধ করেছিলেন? নিজেকে'ত নয়—তাহলে কি আমাকে? ইন্দ্রদেব ও গৌতমের কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। এতদিন বাইরে যাওয়ার সময় গৌতম আমাকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন জেনে আমি আশ্চর্য হলাম। তাহলে কি নিজের স্বামীত্বের ওপর গৌতমের ভরসা নেই? তিনি কি ভাবলেন যে আমি তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে এই প্রলয় রাত্রে ইন্দ্রদেবের সাথে গোপনে মিলিত হব? এটা ভাবামাত্রেই ঘৃণা ও বিদ্রোহে আমি শিউরে উঠলাম। মনে পড়ল, ইন্দ্রদেবের ঘরে পানীয়জল রাখতে যাওয়ার সময় গৌতমের নিষেধাজ্ঞার কথা— "ইন্দ্রদেব প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করেছেন, এই অবস্থায় তিনি আর জলপান করেন না। —শত্রু ও দাসদের রক্তপান করেন। তাছাড়া সোমপানের পর তার লম্পট প্রবৃত্তি জাগা স্বাভাবিক। এই সময়ে ইন্দ্রের সম্মুখে তোমার না যাওয়া উচিত।" অতিথি সম্পর্কে গৌতমের এই ধরনের অশালীন মন্তব্য শুনে আমার খারাপ লাগে। অতিথি জলপান করুন বা না করুন তাঁর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল রাখা আমার কর্তব্য। অথচ কর্তব্যের পথে আমার স্বামীই অন্তরায়। সম্ভবত সেইজন্য ইন্দ্রদেব প্রলয়ের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কি উপায়?"

ধীরে ধীরে প্রলয় থেমে আসছে। তথাপি অগ্নিবলয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রাত্রি প্রভাত হওয়ার সময়ে এই সংঘাত এই মহাজাগতিক দ্বন্দ্ব সমাহিত হয়ে যাবে। এই ভেবে গৌতমের নির্দেশে পুনরায় শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলাম।

প্রথার কথা শোনা গেল—"জল আবশ্যক ইন্দ্রদেব?" —"না দেবী, প্রলয়কালীন এই তৃষ্ণা জলে মেটে না। এই তৃষ্ণা সোমামৃতেই নিবৃত হতে পারে। অহল্যার হাতে প্রস্তুত সোমপানীয় দ্রোণকলসে গচ্ছিত আছে।"

ইন্দ্রদেব অতিথিগৃহের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং আকাশ শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, উত্তাপ হ্রাস পায়নি।

ওঠো অহল্যা, ইন্দ্রদেবের ভিক্ষার মুহূর্ত উপস্থিত। সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও তোমার শ্রদ্ধালাভের জন্য ভিক্ষার থালা নিয়ে তোমার দ্বারে উপস্থিত। হে অহল্যা! স্বার্থকে স্বাহা করে পৃথিবীকে ইন্দ্রের অভিশাপ মুক্ত করো। পৃথিবীমাতা তোমার কাছ থেকে বলিদান চান। দেবী অহল্যা ভুলবশত আহুতির পূর্ণ মুহূর্তটি হাতছাড়া হয়ে গেলে স্বাহা হওয়ার মহান লগ্ন আর তুমি পাবে না। নিজেকে বলি দেওয়ার পূর্বে ভোগভাবনা ত্যাগ করে ত্যাগভাবনায় উদ্বুদ্ধ হও। হে অহল্যা, অহঙ্কারই পৃথিবীতে আকাল সৃষ্টিকারী শত্রু। ইন্দ্রদেব, গৌতম এবং তুমি নিজ নিজ অহঙ্কারে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত না হচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত সোমযজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্ভব নয়।

পাহাড় নদী এবং সমুদ্র। কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্থক নয়। সবাইর মহিমা ও মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। শুধু রূপ রঙ ভিন্ন। পাহাড় উচ্চতায় মহান, নদী মহান তার দীর্ঘ প্রবাহে এবং সমুদ্র মহান তার অকল্পনীয় গভীরতায়। উচ্চতা ব্যপ্তি এবং গভীরতা কে মুখ্য কে গৌণ? প্রত্যেকেই স্বস্থানে গরিমাময়। তারা পরস্পর সংযুক্ত হলে পাহাড় হয় জলকল্প। নদী হয় চিরস্রোতা সিন্ধু হয় অনন্ত জলাধার। তাই পৃথিবীকে প্রলয় থেকে রক্ষা করার জন্য আজ নিরভিমান সংযোগের ভাবনা আবশ্যক। হে অহল্যা! তোমার দ্বারে অতিথি ইন্দ্রদেব উপস্থিত। ওঠো, ভিক্ষার মুহূর্ত আসন্ন। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার মুহূর্ত উপস্থিত।

শৈলশিখর থেকে নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমি সিন্ধুতটে উপস্থিত। আমার সম্মুখে অনন্ত অমৃতের ভাবসিন্ধু। আমার বুকের ভিতর থেকে সব শূন্যতা উধাও হয়ে গেছে। সব ক্ষত শুকিয়ে সমান হয়ে গেছে। সমুদ্র আমার পূর্ণতার পথ নির্দেশ করছে। সমুদ্রের মতো পূর্ণ আর কে? অন্তর বাহির, তটদেশ, দিগ্‌বলয় সব ভরপুর।

ক্ষণিকের জন্য সমুদ্রের বুকে দুঃখের গহ্বর সৃষ্টি হলে সেখানে ভাবতরঙ্গ মাথা তুলে নিজেকে সাব্যস্ত করে। আবার সমান হয়ে যায় সমুদ্রের বুক। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় শূন্যতার গহ্বর। সেখানে তরঙ্গ থাকে না, গহ্বরও থাকে না।

সব জায়গায় অসীম নিস্পৃহতা, অখণ্ড নির্লিপ্তভাব আকাশ ও পৃথিবীকে সমুদ্রের আলিঙ্গনের ছন্দ। কে দাতা? সমুদ্র, আকাশ না পৃথিবী? পূর্বাহ্নে আকাশ যখন অসংখ্য হীরের টুকরো সমুদ্রের বুকে উজাড় করে দেয়, সমুদ্র সেটা নিজের সম্পত্তি ভেবে নিজের অতল ভাঁড়ারে সঞ্চয় করে রাখতে পারত। কিন্তু নীল ফেনিল সুতোয় টুকরো টুকরো হীরের মালা গেঁথে পৃথিবীর বুকে পরিয়ে দিচ্ছে প্রীতির গুরুগম্ভীর সম্ভাষণে। সেই অপার্থিব মালা গলায় পরে পৃথিবী চিরদিন সম্ভ্রান্ত ভঙ্গীতে হাসতে পারত। কিন্তু সেই ফেনিল হীরের মালা পৃথিবীর বুক স্পর্শ করলে কেন তার চোখ ভিজে যায়? কি এমন না বলা অপূর্ণতা পৃথিবীর? কত নিস্পৃহ পৃথিবীর মন! পৃথিবী তার ভিজে বুকে শুধু স্মৃতির কয়েকটি ঝিনুক গ্রহণ করে হীরের মালা সাদরে ফিরিয়ে দেয় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বুকে।

কিন্তু সমুদ্র'ত দাতা। সে কি বাধা মানে? নিরন্তর দেওয়ার সাধনায় ঢেউ ভাঙ্গে সমুদ্র। পৃথিবী সমুদ্র আকাশের সম্পর্ক শুধু ভালোবাসা নাও—ভালোবাসা নাও' এই মন্ত্রে ধ্বনিত।

দূরে সমুদ্রের বুকে কয়েকটা ছোট ছোট নৌকা ঢেউতে দুলছে। মুক্ত মনে, আনন্দে দোল খাচ্ছে। চিন্তা, ভয় কিছু নেই। নৌকাগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে বুভুক্ষু মানুষে। চারদিকে ক্ষুধার্তের আর্তনাদ।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। দরজায় কার মৃদু মধুর করাঘাত। তন্দ্রালস শরীর কার সান্নিধ্য খুঁজছে। গৌতম কোথায়? এত তাড়াতড়ি কি প্রাতঃস্নানে চলে গেছেন? দরজায় অতিথি। স্বপ্নের স্বর সত্যের সঙ্গীত হয়ে মন্ত্রিত করছে আমাকে—

বলিদানের সময় উপস্থিত। আমি কে? আমি উষর, বর্ষাতুরা পৃথিবী; আমি প্রতীক্ষিতা অহল্যা,— আমি স্পর্শরহিতা অহল্যা—

আমার হাতে পায়ে স্বপ্ন এবং অভীপ্সার কঠোর শৃঙ্খল। বাইরে তালাবন্ধ। গৌতম চাবি নিয়ে নদীতে গেছেন। বন্ধ দরজার ওপাশে বিশিষ্ঠঅতিথি ইন্দ্রদেব। অপমানে জর্জরিতা আমি অহল্যা। আমাব প্রতি স্বামীর অবিশ্বাসের প্রমাণপত্র ঝুলছে অতিথির সামনে। কোথা থেকে এল এত সাহস—শক্তি, আজ আমি বিদ্রোহিনী। আমার প্রখর নিঃশ্বাসে ভেঙ্গে গেল অনাদিকালের রুদ্ধ কারাগার। উন্মুক্ত হয়ে গেল কুটীরের দ্বার। দবজায় দণ্ডায়মান পরম মনোহর, একান্তকাম্য অতিথি দেবরাজ ইন্দ্র। আমার দেহের প্রতিটি ভাবকোষে তাঁর সৌন্দর্য চমকাচ্ছে।

যদি চাঁদ খুঁজতে খুঁজতে আকাশ পাওয়া যায়, একমুঠো মাটি চাইলে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাওয়া যায়, মানুষ খুঁজতে গিয়ে ঈশ্বর পাওয়া যায়, জলকণা খুঁজতে খুঁজতে যদি পাওয়া যায় রত্নগর্ভা সমুদ্র, জীবন খুঁজে যদি অমরত্ব পাওযা যায়। নিজস্ব মুহূর্তটি খুঁজতে গিয়ে যদি মহাকাল হাতে ধরা দেয়, তাহলে মানুষের মনের অবস্থা কি হয়?

আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা নেই। আমি চেয়েছিলাম গৌতমের যজ্ঞসিদ্ধি। তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর জন্য বৃষ্টিভিক্ষা করেছিলাম, চেয়েছিলাম ক্ষুধার্তের অন্ন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর অধীশ্বর স্বয়ং ইন্দ্রদেবকে যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে আমার কি অবস্থা হবে?

আমি উচ্চারণ করলাম—"প্রিয়তম প্রভু! বরদানের মুহূর্ত উপস্থিত। এই পৃথিবীকে রক্ষা করুন। আমি ভিক্ষাপ্রার্থী!"

—"অহল্যা! প্রার্থী কখনও ভিক্ষা করে না। বিনা দানে সে প্রতিদান চায় না। আজ আমিও প্রার্থী। দেবী, বরদান করো। তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। জীবনে আমি কখনও প্রার্থী হইনি, গ্রহীত' হইনি। শুধু দাতার জীবন কাটিয়েছি। দাতার দুঃখ আমি ব্যতীত আর কে জানে? দাতারও অভাব আছে, অপূর্ণতা আছে। সেই অপূর্ণতার আকর্ষণে আজ আমি তোমার দ্বারস্থ। আমাকে পূর্ণ করো দেবী!"

আমার চেতনায় গৌতম প্রকট হলেন। স্বপ্ন দেখার মত অস্পষ্টস্বরে আমি বললাম—"জগত মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।"

—"একথা সত্য অহল্যা, কিন্তু এই মিথ্যা জগতই সত্যের পীঠস্থান। মিথ্যা জগতেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়। স্বর্গলোকে অভীষ্ট কোথায়? মিথ্যা জগত ছাড়া আর কোথাও তপস্যা করার অবসর নেই। এখানেই ত্যাগ করা যায়। মিথ্যা জগতের মধুর ভ্রান্তিই ব্রহ্মসত্যকে উপলব্ধ করায়। এস অহল্যা। তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।"

আমার অপূর্ণ, অনুর্বর, অনাবৃষ্ট ইচ্ছাগুলি আমাকে অসহায় করে তোলে; চরম ত্যাগের মুহূর্তে কোনও তর্ক বিতর্ক বার্তালাপ থাকে না।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আলুলায়িত আমার কবরী। প্রসাধনহীনা—নিরাভরণা। আমি গৌতমপত্নী অহল্যা।

—"কি বর চাইছেন প্রভু?" আমি জোড়হস্ত। তাঁর মনোরম হাতে তিনি আমার করতল স্পর্শ করলেন। স্পর্শের আকর্ষণে জড়ও জীবন্ত হয়ে যায়। এ কি মধুর কম্পন আমার অন্তরে? অননুভূত সুখ খুঁজতে খুঁজতে আমি যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হতে চলেছি। আমার হাতের স্পর্শের চেয়ে অধিক কিছু কি আমি বলতে পারতাম? সামান্য স্পর্শে এত শক্তি? আমার লৌহবন্ধন উন্মুক্ত হয়ে গেল স্পর্শের শক্তিতে। নিজেকে মুহূর্মুহু হবি করে দেওয়ার পথে পৃথিবীর কোনও শক্তি প্রতিবন্ধক হল না।

মহাকালেব বুকে সেই কাঙ্খিত মুহূর্তগুলি ছিল নিঃশর্ত। সেখানে লাভ-ক্ষতি, নিন্দা-খ্যাতি, অতীত-ভবিষ্যৎ, স্বর্গ-নরক বরদান অভিশাপের দ্বন্দ্ব ছিল না। অথচ প্রতিশ্রুতি, বরদান, প্রতিদানের কঠোর শয্যার ওপর পা রেখে সেই মুহূর্তগুলি নেমে এসেছিল দেহ থেকে মনোভূমিতে।

আমার এটুকু উপলব্ধি হয়েছে যে, এত কঠিন শৃঙ্খল সত্ত্বেও আমার অন্তরে এমন একজন কেউ ছিল যে আমাকে অগম্য স্থানে উড়ে যাওয়ার জন্য প্রেরিত, শৃঙ্খলভাঙ্গা মানুষের সহজাত প্রবৃতি। সম্পর্ক যখন শৃঙ্খলে পরিণত হয়, তখনই সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। শৃঙ্খল ছিন্ন করার মুহূর্তগুলি অত্যন্ত দুর্বার। শৃঙ্খলভঙ্গের বিষাদ এবং মুক্তির আনন্দে বিষাদ প্রফুল্লিত ভাবাবেগের সেই মুহূর্ত ছিল মধুর যন্ত্রণাদায়ক।

সেই ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে তত্ত্ব ও জ্ঞান নির্বাসিত। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বিচার সে মুহূর্তে কোথায়? সেই মুহূর্ত শুধু অকপট সমর্পণের মুহূর্ত। নিজেকে অপরের কাছে উজাড় করে দেওয়ার মুহূর্ত। সেই মুহূর্ত ছিল প্রেমের মুহূর্ত। যে প্রেমে প্রতিপক্ষ নেই, দেওয়া নেওয়ার হিসাব নেই, সেই মুহূর্তের আকর্ষণ এত দুর্বার যে, সেখানে পাপ-পুণ্য, নীতি-নিয়ম যেন অন্ধ এবং বধির।

আমার মধ্যে তখন ছলনা ছিল না। সেই মুহূর্ত অনাবিল প্রেমের মুহূর্ত। তখন আমি বিভাজ্য নয়। পুরোপুরি ইন্দ্রের। সেই মুহূর্ত ভ্রান্তির মুহূর্ত ছিল না—ছিল ক্রান্তির মুহূর্ত। প্রলয়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিল সেই মুহূর্ত প্রেমের সেই মুহূর্ত ইন্দ্রের জন্য নিঃশর্ত অকপট ছিল

কিনা আমি জানি না। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে প্রেম নিঃশর্ত। দেহভোগের বাসনা সেই প্রেমের শর্ত নয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে দেহভোগ কি প্রেমের শর্ত? তাই প্রেমের উপলব্ধিতে ইন্দ্রের অপূর্ণতা পূর্ণ হল কি না আমি জানি না। আমি কিন্তু পরিপূর্ণা।

আমি ইন্দ্রলুব্ধা ছিলাম না—আমি ছিলাম ইন্দ্রমুগ্ধা। ইন্দ্রের মাধ্যমে আমি উত্তরণের সোপানে উঠে যাচ্ছি পৃথিবী থেকে পৃথিবীর অতলে, আকাশ থেকে আকাশের উর্ধ্বে। ইন্দ্রিয়ানন্দ থেকে ইন্দ্রানন্দে পরমানন্দের উপলব্ধিতে। ইন্দ্রানন্দ সোমরস পানের মতো অপার্থিব।

আত্মমুক্তি না জগতের মুক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর ইন্দ্রদেব পেয়েছেন। আত্মমুক্তির পথে ইন্দ্র সর্বদা বাধা সৃষ্টি করেন। আত্মমুক্তি কি গৌতমের যজ্ঞের লক্ষ্য ছিল? অপরিণত জ্ঞান, সাধনা বয়স এবং অনুভূতিহীন উত্তরণ, মুক্তি ও অমরত্ব কামনা করা বিড়ম্বনা। দেবতাগণ মানুষের এই দুরাকাঙ্খার বিরোধ করেন। সম্ভবত সেইজন্য ইন্দ্র গৌতমের বিরোধিতা করেছেন এবং আমাকে দান করেছেন সত্যের অন্তরঙ্গ অনুভূতি।

স্বাহা হল যজ্ঞের আত্মা। যজ্ঞমন্ত্রে অন্তিম ও শ্রেষ্ঠভাগ স্বাহা। সু-আহুতি স্বাহার শ্রেষ্ঠ গুণ। ইন্দ্রদেবের কাছে আমি নিজেকে স্বাহা করে দিলাম।

আমার মিথ্যা শরীর হল সত্যের সিদ্ধিভূমি। আমি ছিলাম কন্যা, পত্নী, গৃহকর্ত্রী। কিন্তু আমি 'নারী'তে পরিণত হয়েছিলাম না। ইন্দ্র স্পর্শে আমি 'নারী' হয়ে গেলাম। আমি পূর্ণ হলাম। পূর্ণ থেকে পূর্ণ কেড়ে নেওয়ার শক্তি কার আছে? যদিও থাকে পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে আমি পূর্ণই থাকব।

"হে ইন্দ্রদেব! আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে পূর্ণতার উপলব্ধি দিয়েছ, আমার জড়ীভূত নারীত্বকে উজ্জীবিত করেছ।"

আমি ইন্দ্রদেবকে প্রণাম জানাই। রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। পাখিরা কি গতরাত্রের মহাপ্রলয়ের সম্মুখীণ হয়নি? তাদের কূজনে'ত কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। ইন্দ্রদেব প্রস্থানদ্যোত। বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন। ইন্দ্রদেব নির্লিপ্ত নির্বিকার। কিন্তু তিনি যে তৃপ্ত, সেকথা স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত নয়।

"অহল্যা—আমি তৃপ্ত। তোমার দান অতুলনীয়। চিরআরাধ্যা প্রেমের দেবী রূপে তুমি চিরদিন আমার অন্তর বেদীতে পূজিত হবে। আজকের এই দেহসঙ্গমের স্মৃতি, তোমার দেহের সুরভী আমার দেহের সকল গ্রন্থিতে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করবে। তোমার স্বামীর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি তোমার মুক্তিদাতা নয়—তোমার ভাগ্য বা নিয়তিও নয়। আমি তোমার পরীক্ষকও ছিলাম না। তুমি নিজেই নিজের পরীক্ষা, ভাগ্য ও নিয়তি। এখন তোমার জন্য সাধনার দ্বার উন্মুক্ত। আমাকে বিদায় দাও এবং নিজেকে রক্ষা করো।"

ইন্দ্রের বিদায় আমাকে আঘাত দেয় না—কারণ আমি জানি, আমি মর্তনারী। ইন্দ্র আমার ভাগ্যবিধাতা হতে পারেন না। এই বিদায় অবধারিত। কিন্তু গৌতমের পদশব্দে এইরকম

অবস্থায় আমাকে ছেড়ে লম্পট পুরুষের মতো চলে যাওয়াটা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। তাহলে কি ইন্দ্রদেব ভাবের সম্রাট নয়—সে কি ভোগসর্বস্ব একজন সাধারণ পুরুষ? আমার ক্ষণভঙ্গুর সুন্দর দেহভূমিতে বিজয় পতাকা উড়িয়ে গৌতমকে পরাজিত করাটাই কি ছিল সেই প্রেমের লক্ষ্য? তাহলে তো প্রেম ছিল না, ছিল একটা ভ্রান্তি। আমি কি ইন্দ্রযোগ্যা ছিলাম না? ছিলাম ইন্দ্রভোগ্যা? দুঃখ আত্মগ্লানিতে আমি ম্রিয়মান হয়ে গেলাম। ইন্দ্র সগর্বে গৌতমের সম্মুখীণ হলে তাকে পরম প্রেমিকের স্থান দিয়ে বাকি জীবন পূর্ণতায় রঞ্জিত করতাম। প্রেম নির্ভীক, প্রেম নিরহঙ্কার, প্রেম নিঃস্বার্থ। অথচ নিজের স্বার্থে কামুক পুরুষের মতো ঋষির কোপের ভয়ে অসহায় অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রের পলায়ন আমার সত্যের উপলব্ধির ওপর কালো দাগ টেনে দেয়। প্রেম না ভ্রম? পাপ না পুণ্য? উচিত না অনুচিত?

কিন্তু আমি যা করেছি জেনে শুনে করেছি। যখন আত্মা প্রেমের জন্য সমর্পিত হয়ে যায়, তখন দেহ সত্তা হাবায় এবং আত্মার সাথে দেহও সমর্পিত হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে আমার মনে গ্লানি বা পাপবোধ ছিল না। মিলনের সুখ এবং বিরহের দুঃখ এই দুইয়ে আমার নারীত্ব আজ পূর্ণগর্ভা।

মানুষ নির্জনে পাপ করে। কিন্তু নির্জনতা কোথায়? অন্তর্যামী বিশ্বকর্তা তো সর্বত্র উপস্থিত। আমরা জাগ্রত না থাকলেও তিনি আমাদের অন্তরে সদা জাগ্রত। আমাদের অন্তরের সংকল্প বিকল্প তিনি জানেন। পাপ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে পাপ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে এবং পাপকর্মের পরেও তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে সব দেখেন। মানুষের পাপ মানুষও দেখতে পারে না—পাপ করার সময়ে সে অন্ধ।

একাকী কোনও মানুষ পাপ করার সময়ে প্রভু দ্বিতীয় হয়ে তার পাশে উপস্থিত থাকেন। এটা জানতে না পেরে মানুষ পাপ করে। কেউ পৌঁছাবার পূর্বে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই ইন্দ্রদেব যখন গৌতমের পদশব্দ শুনে পালিয়ে যেতে উদ্যত হন তখন আমি জানতাম যে পাপ লুকানো যাবে না। আমাদের দু'জনের মধ্যে যা ঘটেছে সেটা আমি 'পাপ' বলে স্বীকার করতাম না, যদি ইন্দ্রদেবকে আমার চোখে 'পাপী'র মতো না দেখাত। ইন্দ্রদেবের বীরত্ব, তেজস্বীতা, নির্ভিকতা, শ্রী, সৌন্দর্য কোথায় গেল? সম্মুখে গৌতমকে দেখে হীনবল এবং নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন কেন? তাঁর চির উন্নত মস্তক নত হয়ে গেল। তাঁর বজ্রবাহু ছিন্ন শাখার মতো অসহায় দেখায়। তার দর্পিত দৃষ্টি কাতর প্রার্থনায় করুণ দেখাচ্ছে। ইনি কি পরমবীর আর্যরক্ষক, মানব থেকে দেবতা, দেবতা থেকে দেবরাজ পদে উন্নীত ঐশ্বর্যশালী স্বর্গপতি ইন্দ্রদেব? ইনি কি আমার কল্পনার প্রেমিক ইন্দ্রদেব? আমি তো ভেবেছিলাম প্রেম শক্তি বৃদ্ধি করে। তাহলে কি এটা প্রেম ছিল না? এ কি শুধু কামলিপ্সা? হে ভগবান, ইন্দ্রদেবের এই করুণ রূপ আমাকে না দেখিয়ে থাকলে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম।

ইন্দ্রদেবের 'প্রেমিক রূপে' নিমজ্জিত হয়ে আমি সারা জীবন প্রেমিকা হয়ে কাটিয়ে দিতে

পারতাম। আমার চোখের সামনে এইসব ঘটনা কেন ঘটল? সম্ভবত আমার পাপ সম্পর্কে আমাকে সচেতন করার জন্য নাটকের এই অভাবিত অন্তিমদৃশ্য।

আগুনের মতো জ্বলছে মহর্ষি গৌতমের দৃষ্টি। ভয়ে বিবর্ণ রূপবান ইন্দ্রদেব। বজ্রগম্ভীর স্বরে ভর্ৎসনার বাণী উচ্চারিত হয় স্বামীর কণ্ঠে। তপোবনে পাপের এ কি কদর্য লীলা! জিতেন্দ্রিয় সাধন ভূমিতে সংযমের কি শোচনীয় পরিণতি; ত্যাগের তীর্থে ভোগের কি বিভৎসতা!

—"বাসব! তুমি তো দেবরাজ, দেবতার প্রতিনিধি স্বর্গের অধিপতি, আর্যরক্ষক পরম শক্তিমান এবং জগতের অভীষ্টদাতা। তোমার প্রাণপ্রিয়া পত্নী শচীদেবী এবং অসংখ্য অপ্সরা রয়েছেন স্বর্গলোকে। মর্তের এই মূঢ়া নারী তোমার শক্তি ও পৌরুষের ওপর পদাঘাত করে তোমাকে কামুক, লম্পটে পরিণত করল। এত ক্ষুদ্র তুমি? তুমি ইচ্ছা করলে এই সামান্য নারীকে আমার কাছ থেকে জয় করে নিতে পারতে। চোরের মতো লুকিয়ে এই কামাতুরা নারীকে ভোগ করে তুমি স্বয়ং নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছ। সপ্তসিন্ধুতে তোমার দর্পচূর্ণ হয়েছে। আজ থেকে তুমি আর পূজ্য নয়। ঘৃণিত, নিন্দিত। আমি অভিশাপ দিচ্ছি—শত সুন্দরীদের ভোগ করলেও নপুংসক পুরুষের মতো তোমার কামজ্বালা কখনও প্রশমিত হবে না। জন্মজন্মান্তরে তুমি কামবাসনায় দগ্ধ হবে। জার পুরুষ! এখন তোমাকে ঘৃণিত পাপের প্রতিরূপ এক মার্জারের মতো দেখাচ্ছে। শতধিক তোমার ইন্দ্রত্বকে।"

গৌতমের এইরকম তেজস্বী রূপ পূর্বে কখনও দেখিনি। ইন্দ্রের মার্জাররূপ আমার কল্পনাতীত। আমার পরম পুণ্যবান স্বামীর কাছে ইন্দ্রকে দেখাচ্ছে পাপের কুৎসিত ছায়ার মতো। গৌতমের ভর্ৎসনা শুনে বিনা বাক্যব্যয়ে পরম প্রতাপী ইন্দ্রদেব সত্যিই মার্জারের মতো পালিয়ে যায়। মাথা থেকে পড়ে যায় মণিময় মুকুট। সেটা তুলতে তার সাহস ছিল না। রথে আরোহনের মনোবলও তাঁর নেই। পিছন দিকে না তাকিয়ে অরণ্যের কন্টকিত পথে চোরের মতো পালিয়ে যান। পৃথিবীর মৃদু কম্পন মনুষ্যকৃত অসীম বৈভবকে মুহূর্তে ধুলিসাৎ করে দেয়, এক কণা অগ্নি অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে নিমেষে ভস্মীভূত করে দেয়, এক বিন্দু বিষ অমৃতকে বিষময় করে তোলে—সেইরকম আমার জীবনের সমস্ত পুণ্য ক্ষণিকের পাপে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

অগ্নি থেকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার মতো পবিত্রতা থেকে পবিত্রতা এবং পুণ্য থেকে পুণ্যই উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ প্রেমভাবে, পুণ্য সংকল্পে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। তাহলে আমার স্বামী ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কেন? তাহলে আমার দেহসমর্পণ কি কামনা জড়িত ছিল? নিজেকে আমার পাপিনী মনে হচ্ছে না কেন? দেহ সম্পর্কের বৈধতা অবৈধতা নিয়ে যদি পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় তাহলে অধিকাংশ আর্য রাজা, ঋষি এমনকি দেবতাদের মহাপাপী আখ্যা দেওয়া উচিত। বৈধতার বাইরে তাঁরা কত পরনারীকে না ভোগ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র অহল্যার জন্য পাপের পৃথিবী কে গড়ল? কে এই পাপের কর্তা? আমার পিতা—স্বামী—প্রেমিক—এই সমাজ?

আমি আকাশ পাতাল ভাবছি। কোথায় বর্ষা? কোথায় সিদ্ধি? আমার বলিদানের ফল কি এই কলঙ্ক, অভিশাপ?

আমি নিজেই যজ্ঞ, নিজেই স্বাহা। আবার নিজেই আত্মাহুতি দিয়ে পরিত্যক্ত দগ্ধভূমিতে পরিণত হয়েছি।

গৌতম কি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন? পুণ্য ও তপস্যার বাইরে কখনও তিনি আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন? পুণ্যলাভ ও তপস্যার বাইরেও যে জীবন প্রবাহিত, সে কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এখন আমার কি কর্তব্য? ইন্দ্রদেবকে অনুসরণ করব? তাঁর শরণাপন্ন হব? ছিঃ, যে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, সে আমাকে কি রক্ষা করবে? আমাকে রক্ষা করার ইচ্ছা থাকলে, গৌতমের অভিশাপ অর্জনের জন্য কি আমাকে ত্যাগ করে যেতেন? গৌতমের সম্মুখে সগর্বে বলতে পারতেন—"আমি তোমার পত্নীর দেহভূমিতে প্রেমের স্বাক্ষর রেখেছি। অপূর্ণা অহল্যা পরিপূর্ণা নারী হয়েছে। যে পুরুষের স্ত্রী পরপুরুষ গমন করে সেখানে ব্যর্থ স্বামীত্বই বেশিরভাগ দায়ি। তুমি আমাকে লম্পট, কামুক, দুশ্চরিত্র আখ্যা দিয়েছ, কিন্তু আমার স্ত্রী শচী আমাকে নিয়ে তৃপ্ত—সে আমার প্রতি বিশ্বস্তা। অহল্যা তোমার জীবনের এক শিক্ষা। হে তর্কনিষ্ঠ মহর্ষি! কোন পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্যলিপ্সু পরনারী ভোগী ইন্দ্র নেই? প্রেমবিধুরা দেহবিহ্বলা অহল্যা বা কোন নারীর মধ্যে নেই? কখনও ভেবেছ কি সে কথা? কোনও দিন খুঁজেছ তার প্রতিকার? কখনও স্বীকার করেছ এই সত্যকে? সৌন্দর্য ও নারী নিয়ে বাজি ধরে তর্ক ও তত্ত্বের ফলাফল এটাই হয়েছে। ব্রহ্মার ইচ্ছায় তুমি অহল্যাকে বিয়ে করেছিলে। অহল্যা কি ইচ্ছা, আকাঙ্খা, স্বপ্নবিহীনা শুধু দেহসর্বস্ব এক নারী?

কিন্তু জিতেন্দ্রিয়তার অহংকারে তুমি অহল্যার দেহকেও জয় করতে অক্ষম হয়েছ। এইরকম দাম্পত্য অভিশাপ সম। তাই আমাকে অভিশাপ দেওয়ার আগে নিজের কর্মের দ্বারা তুমি নিজেই অভিশপ্ত হয়েছ। ছাত্রাবস্থা থেকে তোমার প্রতি আমার ঈর্ষা ছিল। কিন্তু আজ তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা হচ্ছে। পরপুরুষগামী নারীর স্বামীকে লোকে শুধু দয়া করে না— হীনবীর্য ভাবে। তুমি অহল্যার যোগ্য পুরুষ নয়। তাই আমি অহল্যাকে প্রেমিকারূপে বরণ করছি। শক্তি থাকলে আমার প্রেমবন্ধন থেকে অহল্যাকে উদ্ধার করো ......'

কিন্তু এসব শুধু আমার ভাবনা মাত্র। ইন্দ্র অন্তর্ধান করেছেন। গৌতমের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব? সুরক্ষিত পত্নীত্ব প্রার্থনা করব? না, এরপর আমাদের আর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকা সম্ভব নয়। বহুদিন থেকে আমাদের দেহসম্পর্ক ছিল না। মহর্ষি গৌতম রূপের পূজারী নয়। রূপ তাঁর দৃষ্টিতে শুধু মায়া। অথচ সেই মায়ায় মুনি ঋষি দিক্‌ভ্রষ্ট হন। গৌতমের দৃষ্টিতে শরীর তুচ্ছ, আত্মা শরীরের ঊর্ধ্বে। আমার শরীর হয়তো আমার অবচেতনে ইন্দ্রদেবের পৌরুষের প্রতি লুব্ধ ছিল। কিন্তু গৌতমের জ্ঞানগর্ভ ব্যক্তিত্ব কি আমাকে মুগ্ধ করেনি? তাহলে আমি ইন্দ্রদেবের মধ্যে গৌতমকে খুঁজছিলাম কেন? বাসবের মধ্যে আমি আমার

স্বামীকেই প্রেমিক রূপে খুঁজছিলাম, সে কথা আমি ব্যতীত আর কে জানে? ইন্দ্রদেবের আলিঙ্গনে তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্তরাত্মা 'গৌতম', 'গৌতম' কাঁদছিল কেন? আত্মাকে প্রমাণ করতে পারে এমন কেউ কি পৃথিবীতে আছে? গৌতম শুধুমাত্র স্বামী ছিলেন, প্রেমিক নয়। ইন্দ্রদেব প্রেমিক রূপে এলেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামদানবের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রেমদেবতার ছদ্মবেশে এসেছিলেন। কিন্তু আমি চণ্ডালিনী, সেকথা বুঝতে পারলাম না, কিংবা বুঝে না বোঝার অভিনয় করেছিলাম? যখন জানলাম। ততক্ষণে কামদানব আমার পুণ্য ও সংযমকে গ্রাস করেছে। এত সাফাই দিয়ে আর কি লাভ? গৌতম আমাকে ক্ষমা করলেও আমি আমার পূর্বস্থানে ফিরে যেতে পারব না। গৌতমের সেই ক্ষমা, দয়া ও ঘৃণার রূপান্তর মাত্র।

অবশ্য এই ঘটনা গৌতম ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। গত রাত্রের প্রলয়ের পর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে কুটিরের বাইরে এসে উদ্যানে গাছের তলায় শুয়ে পড়েছে প্রথা। সে গভীর নিদ্রায় অচেতন। অন্ধকার দূর হয়নি। নিজের স্বামীত্বের অহংকার বজায় রাখার জন্য ঘটনাটা চেপে রেখে তিনি হয়তো আমাকে গৃহে স্থান দিতে পারেন। সর্বসমক্ষে স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করতে পারেন। সংসারে কত স্বামী-স্ত্রী এইরকম ছলনার জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু গৌতম কিংবা আমি ছলনা বরদাস্ত করতে পারব না। তাই এখানেই শেষ।

গৌতম আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। জল্লাদের মতো দেখাচ্ছে তার রোষজর্জর মুখ। রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"আমরা দু'জন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে বল অহল্যা, লম্পট ইন্দ্র কি আমার ছদ্মবেশে এসেছিল? বলো, অন্ধকারে... তুমি কি বাসবকে গৌতম ভেবে......।"

গৌতমের মুখ এখন করুণ দেখাচ্ছে। গৌতম জানেন কোনটা সত্যি। গৌতম একথাও জানেন, স্বামীর ছদ্মবেশে স্বয়ং ঈশ্বর এলেও অনুভবী পত্নী স্পর্শমাত্রেই জানতে পারবে স্বামী না পরপুরুষ! তা সত্ত্বেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণ কি?

স্ত্রীর অজ্ঞাতে পরপুরুষের সাথে দেহসম্পর্ক ঘটলে স্ত্রী পতিতা হয়ে যায়, কিন্তু স্বামীত্বে আঁচ আসে না, স্বামীত্বের অহংকার আঘাত প্রাপ্ত হয় না। আমাকে রক্ষা করার জন্য নয়, নিজেকে রক্ষা করার জন্য গৌতমের এই শিশুসুলভ প্রশ্ন। আমি নির্লিপ্তস্বরে উত্তর দিলাম—"ছদ্মবেশে নয় স্বরূপেই ইন্দ্রদেব এসেছিলেন।"

গৌতমের মুখ কালো হয়ে যায়। "তার মানে তুমি স্বইচ্ছায়......কিংবা লম্পট ইন্দ্র তোমাকে বলাৎকার করে......গৌতমের উৎসুক প্রশ্ন। —"অহল্যাকে বলাৎকার করার শক্তি দেবতা অসুর মানুষ কারও নেই। আমি সোমযজ্ঞে স্বাহা......আমি পশুযজ্ঞে বলি......স্বামী আমি ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করেছি। বর্ষাদাতা ইন্দ্রদেব জগৎরক্ষা করবেন—এটাই তোমার লক্ষ্য ছিল।... বলত বলতে আমার চোখ জলে ভরে যায়। সে ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ না করে গৌতম

পুনরায় প্রশ্ন করেন—"আমার মন বলছে তুমি অজ্ঞতা বা বলাৎকারের শিকার হয়েছ। সত্য প্রকাশ করে আমার ক্রোধ প্রশমিত করো মূঢ়া নারী। নচেৎ অভিশাপ ভোগ করতে হবে।

—"যদি অজ্ঞাতে আমি ইন্দ্রভোগ্যা হয়েছি কিংবা যদি আমি ইন্দ্রের বলাৎকারের শিকার হয়ে থাকি, তাহলে আমার সতীত্ব আছে কি না? এইরকম একটা প্রশ্ন আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আমি ভাবলাম—গৌতমের তত্ত্ব অনুযায়ী শরীর মূল্যহীন, তাহলে যদি অজ্ঞাতে ইন্দ্রদেবকে গৌতম মনে করে কিংবা বলাৎকারের অসহায়তায় আমি পরপুরুষের ভোগ্যা হয়েছি, তাহলে আমার আত্মা কলুষিত হবে কি না, সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক গৌতম যে উত্তর দেবেন তা আমার জানা।

আমি কি আত্মায় গৌতমকে চাইছিলাম, শরীরে ইন্দ্রকে। শরীর আত্মার অধীন। শরীরের পতন ও মৃত্যু আছে। আত্মা অবিনাশী।

সিংহাসন অপবিত্র হলে কি দেবতা অপবিত্র হয়ে যান?

তত্ত্বজ্ঞানী গৌতমের বাণী আজও আমার হৃদয়ে গুঞ্জরিত হচ্ছে।—

"তোমার সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক। আমি তোমার শরীর দেখছি না, তোমার আত্মাকে দেখছি।" প্রতিনিয়ত এই বাণী শুনেছি। শুনতে শুনতে সম্ভবত আমার অবচেতনে গৌতমকে পরীক্ষা করার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা বীজ থেকে মহাক্রমে পরিণত হয়েছে। গৌতমের সন্দেহ সেখানে জল ও উত্তাপ জুগিয়েছে। আমার শরীর যদি শুচিতা হারিয়েছে, গৌতম আমাকে গ্রহণ করবেন না ত্যাগ করবেন? আমার পরীক্ষায় গৌতমের হার না জিৎ? তথাপি গৌতম যদি আমাকে গ্রহণ করেন, আমি নিজে তাঁর জীবন থেকে সরে যাব। সমাজের চোখে আমার মর্যাদা রক্ষার জন্য নয়, নিজের পৌরুষের অহঙ্কার সাব্যস্ত করার জন্য আমাকে গ্রহণ করবেন।

আমার মধ্যে গৌতম ও ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব আর নেই। আজ আমি কারও নয়। ইন্দ্র কিংবা গৌতম।

নম্রকণ্ঠে আমি বললাম—"স্বামী, কামাসক্ত বাসব প্রেমদেবতার ছদ্মবেশে এসে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষণিকের জন্য সমাজের নিয়ম সেই ইন্দ্রজালের মোহে আমি ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি কি ক্ষমার যোগ্য? আমি কি আমার প্রিয় আশ্রমে থাকতে পারব?"

"যে কোনও পরিস্থিতিতেই হোক তুই জারপুরুষ ভোগ্যা নারী—তোর শুচিতা নষ্ট হয়েছে, তোর পত্নীত্বের অধিকার খর্ব হয়েছে। তুই ক্ষমনীয়া নয়...... অভিশপ্তা......। কিন্তু তুই এই আশ্রমেই থাকবি। এই পবিত্র তপোবন আজ কলঙ্কিত। শুধু তোকে নয় আমি পরিত্যাগ করছি এই আশ্রম এই বনভূমি। তোর নারীত্বের সকল গৌরব আজ অস্তমিত। তোর মুখ দেখলে চেতনা কালিমালিপ্ত হবে। তাই সকল আশ্রমবাসী মুনি ঋষি, ঋষিপত্নী ও ঋষিকুমারীগণ তোর পাপে প্রভাবিত হয়ে ভ্রষ্ট হওয়ার আগে আমি সবাইকে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে চলে যাচ্ছি। সেখানে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব। সেখানে অধ্যক্ষ হবে আমার শিষ্য মাধুর্য। আমি তোর স্বামী হওয়ার অপরাধে পাপখণ্ডনের জন্য কঠোর তপস্যায় রত হব।"

ইতিমধ্যে আশ্রমবাসী একত্রিত হয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুনি ঋষিগণ ঘৃণিত দৃষ্টিতে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। ভেবেছিলাম, এই দুর্ভাগ্যে মাধুর্য আমার পক্ষ নেবে। মধুক্ষরা অন্তত আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। কিন্তু গৌতমের ঘোষণায় মাধুর্যকে প্রসন্ন দেখায়। গৌতম আশ্রমের অধ্যক্ষ পদের জন্য সে কি আগ্রহী ছিল? ইন্দ্রের অন্তরঙ্গ হয়েছি বলে মধুক্ষরা কি আমাকে ঈর্ষা করছে? একজনও আমার অভিশাপের বিরোধিতা করল না!

ঘৃণায় আর একবার দৃষ্টি রক্তিম করে গৌতম বললেন—"একবার চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ ভ্রষ্টা নারী, তোর পাপের ঝড়ে কিভাবে এই তপোবন বিধ্বস্ত হয়েছে। তোর কলঙ্কের উত্তাপে পাখিরা বৃক্ষচ্যুত হয়েছে। পত্র পুষ্প দগ্ধ হয়েছে। তোর পাপে আমার যজ্ঞ নষ্ট হয়েছে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বর্ষার সম্ভাবনা নেই। সম্মুখে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। আশ্রমবাসী কেন তোর পাপের ফল ভোগ করবে? তোর পাপের ফল ভোগ করার জন্য তুই একা এখানে জড়বৎ পড়ে থাকবি। যে সৌন্দর্যের অহঙ্কারে তুই ইন্দ্রকে পরাজিত করার অহংকাব পোষণ করতিস, সেই সৌন্দর্য দর্শন করার জন্য তোর সাথে থাকবে শুধু তোর কদাকার পাপ। এইরকম ভয়ানক পাপ করে লজ্জায় তুই পাথর হয়ে যাসনি কেন? এই কলঙ্কিত মুখ সবাইকে দেখাচ্ছিস কি করে? উপরন্তু সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছিস যে, তুই সজ্ঞানে ইন্দ্রের কামানলে ঝাঁপ দিয়েছিস। অহল্যা তোকে শতকোটি ধিক্। জীবিত থেকে সহস্র বছর ধরে তিল তিল করে দগ্ধ হবি। অনুতাপেও তোর আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়।"

—"দেহাসক্ত দেবরাজ ইন্দ্রের কুৎসিৎ কামবাসনা দেখার পর এবং ইন্দ্রের কাপুরুষ মার্জার রূপ দেখার পর জিতেন্দ্রিয় গৌতমকে পরমেশ্বরের মতো দেখায়। অশ্রুতে অবগাহন করে করজোড়ে বিনম্রকণ্ঠে মিনতি করলাম—স্বামী! আপনার কাছে সত্য গোপন করলে হয়তো এতবড় অভিশাপ আমাকে ভোগ করতে হত না। কিন্তু পাপ গোপন করার পাপও কম বড় পাপ নয়। সেই পাপ থেকে বিরত হয়ে আমি সর্বসমক্ষে লজ্জাহীনার মতো মুক্তকণ্ঠে আমার পাপ স্বীকার করেছি। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অভিশাপের কি কোনও প্রতিকার নেই?"

গৌতমের এমন উদার শান্তরূপ আগে কখনও দেখিনি। মৃদু গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন—তপস্যা এই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কামভাব এবং রামভাব উভয়ই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও ঐ দুটির অহরহ সংঘাতে সচরাচর কামভাবের জয় হয়ে থাকে। যেদিন তোর কামদগ্ধ মনোভূমিতে রাম রমণীয় ভাবের উদয় হবে। সেদিন তুই রামদর্শন করবি এবং শাপমুক্ত হবি। অহল্যা, অভিশাপই তোর জন্য আশীর্বাদ হোক্।"

তপঃ

হে আমার প্রণম্য তপস্যা! অভিশপ্তা অহল্যার প্রণাম গ্রহণ করো। পরিপূর্ণতা আমাকে নির্লিপ্ত করেছে। প্রাপ্তির মুহূর্তগুলো একের পর এক হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। প্রাপ্তির মেঘমল্লার শেষ হয়নি, অভিশাপের আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে আমার ওপর।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বে আমি ছিলাম পরম সৌভাগ্যবতী। এখন আমি অভিশপ্তা অহল্যা। কিন্তু আমি আমার প্রাপ্তি ও পূর্ণতায় এমন মগ্ন ছিলাম, সেই মুহূর্তে আমি অভিশাপের বিভৎসতা উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি ছিলাম ইন্দ্রমগ্না। গৌতম মাধুর্য, আশ্রম নীতি নিয়ম প্রথা সবই মিথ্যা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, জীবনে একমাত্র ইন্দ্র সত্য এবং ইন্দ্রিয় সুখই শ্রেষ্ঠ সুখ। ইন্দ্রপ্রাপ্তি পরম প্রাপ্তির মতো মনে হয়েছিল।

কিন্তু চতুর্দিক নির্জন হয়ে যাওয়ার পর নিসঙ্গতা যখন আমাকে গ্রাস করতে থাকে, তখন আমার অন্তরে কে যেন আমাকে প্রশ্ন করে—"প্রকৃতপক্ষে তুই কি ইন্দ্রকে পেয়েছিস? কোথায় তোর ইন্দ্র? ইন্দ্রপ্রাপ্তি যদি পরম প্রাপ্তি তাহলে এই নিঃসঙ্গতা কেন? কেন এই আত্মবিষাদ? কয়েক মুহূর্ত পূর্বে ইন্দ্রতুষ্টি এবং আত্মতুষ্টি ছিল আমার আকাঙ্খা।

আকাঙ্খাও এত দুঃখদায়ক হতে পারে। অভিলাষ যদি যথার্থ না হয়...... তাহলে সে যে অসীম দুঃখের কারণ, আমিই তার প্রমাণ।

বৈরাগ্য ও অনুশাসনের কঠোরতায় আমাকে পেয়েও পেলেন না গৌতম। —আমাকে ভোগসর্বস্ব মনে করে ইন্দ্র আমাকে পেলেন এবং হারালেন। পূর্বে যা প্রাপ্তি ও পরিপূর্ণতা মনে হচ্ছিল। পর মুহূর্তেই চরম অপ্রাপ্তি ও শূন্যতা আমাকে গ্রাস করে।

ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার দেহভিমানী সত্ত্বা কয়েক মুহূর্ত ভোগদেবতার কাছে অকপট সমর্পণে ইন্দ্রমগ্না হয়েছিল। অথচ স্বামী হয়েও গৌতম সেটুকু পাননি। এই অভিশাপ চিরদিন আমার ললাট লিখন হয়ে থাকবে, আমি জানি। আমার সুন্দর শরীর পাপের স্বাক্ষর বহন করে আজ কুৎসিৎ, তাও আমি জানি। আমার দিকে একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে কে কোথায় অন্তর্ধান হয়েছে। আশ্রমের পশু-পাখিগুলোও সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলেনি। গতরাত্রের প্রলয়ে পর্ণকুটির ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। আর কি থাকল? অন্যান্য মুনি ঋষিদের আশ্রম আমার জন্য রুদ্ধ। সংসারের চোখে আমি মহাপাতকী।

ইন্দ্রের পাপ আমার পাপের মতো বিশাল নয়, কারণ বহুনারীসঙ্গ ইন্দ্রের ধর্ম। পত্নীবিরাগ জনিত অপরাধে গৌতম অপরাধী নয়, কারণ গৌতম মহর্ষি এবং জিতেন্দ্রিয়। নানা জটিল মানসিকতায় যে পাপ সংঘটিত হয়ে গেল, তা শুধুমাত্র অহল্যার দ্বারাই সংঘটিত হল, কারণ অহল্যা নারী, তার কোনও পদমর্যাদা নেই। গৌতমের 'পত্নীপদ'ই অহল্যার একমাত্র পদবী।

যে পদবী অহল্যাকে কোনও অধিকার দেয়নি। কারণ পত্নীত্বের অধিকার থাকে পতির হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে নিমেষে সেই অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করতে পারেন। এই পাপে ইন্দ্রদেবের ইন্দ্রপদ তো গেল না। শচীদেবী তাঁকে পতি-পদ থেকে অপসারণ করলেন না। ইন্দ্রের পাপের তুলনায় গৌতমের অভিশাপ তুচ্ছ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। অভিশাপ এইটুকুই—"তোমার কামজ্বালা যেন কখনও প্রশমিত না হয়, সহস্র কামেন্দ্রিয় দ্বারা কামভোগ করলেও অতৃপ্ত কামবাসনা এবং পরনারী ভোগলিপ্সায় জন্মজন্মান্তর তুমি দগ্ধ ও ঘৃণিত, নিন্দিত হতে থাকবে।" এই অভিশাপে শুধু ইন্দ্রদেব অভিশপ্ত হলেন না, অভিশপ্ত হল ত্রিলোকের নারী সমাজ। এই অভিশাপকে অস্ত্র করে ইন্দ্রদেবের ভোগলালসায় আরও কত অহল্যা বলি হবে, সেটা মহর্ষি গৌতমের তর্কনিষ্ঠ বিচারে কেন স্থান পেল না?

সংসারের নিয়ম বড় বিচিত্র। কোনও পরিস্থিতিতে একবার যদি তুমি কোনও অপরাধ কর, তাহলে অপরাধ করা তোমার চিরাচরিত প্রবৃত্তি বলে ধরে নেওয়া হবে। তারপর অতীত থেকে মুক্তি পাওয়া আর সম্ভব নয়। তোমার ললাটে তোমার অতীত অমলিন অক্ষরে লেখা থাকবে এবং তোমাকে এক গর্হিত জীবনপথে রাস্তা দেখাবে। সেইজন্য সমাজে এত অপরাধ, এত পাপ! তুমি একবার জলে ডুবলে আর জলে কি ভয়? যাই হোক আজও আমি পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্বে পড়েছি। এতবড় পাপ করার পরেও নিজেকে পাপিনী মনে হচ্ছে না কেন? ভাবছি শরীরেরও ব্যঞ্জনা আছে। দেহের অপবাদ কেন?

ভেবেছিলাম, সবাই চলে গেলেও প্রথা আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমি আমার মাকে দেখিনি। ছোটবেলায় তাকে মা মনে করে তার কোলে হেসে খেলে বাল্য কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পা দিয়েছি। ছোটবেলায় কতবার পড়ে গেছি, প্রথা গায়ের ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়েছে আবার হাত ধরে পথ চলতে শিখিয়েছে। আজ যৌবনে যদি ভুল করে থাকি, তাহলে প্রথা কি আমাকে পায়ে ঠেলে চলে যাবে? কাল রাতে প্রলয়ের তাপে অস্থির হয়ে উদ্যানের গাছের তলায় সে শুয়ে পড়েছিল ঘুম ভাঙ্গেনি তাঁর। নাই ভাঙ্গুক, প্রলয়ের সময় এখনও শেষ হয়নি। প্রলয় অন্তে প্রথা কি হাত ধরে রাস্তা দেখাবে না? কিন্তু প্রথা এইরকম অচেতনের মতো শুয়ে আছে কেন? সে সচেতন থাকলে সম্ভবত আমার দেহ ভূমিতে এই প্রলয় সংঘটিত হত না। কিন্তু প্রথা কোথায়? প্রথাকে খুঁজতে খুঁজতে এ আমি কি দেখছি? গতরাত্রে ঐ পুরাতন গাছটা ভেঙ্গে পড়ে প্রথার জীর্ণ শরীরটা ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। যেন পঞ্চভূত শরীরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিয়েছে মাটির ওপরে। প্রথার মৃতদেহ পড়ে আছে। প্রথার সৎকার করার অবসরও তাদের হল না।

যদি নিজেকে আমার নমস্যা প্রথার ওপর উজাড় করে দিতে পারতাম! চোখের জলে ধুয়ে দিতাম তার রক্ত—দীর্ঘশ্বাসে উষ্ণ করে দিতাম তার হিমশীতল দেহ প্রলয়ের ঝড়ে উড়ে যাওয়া তার প্রাণ পাখিকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারতাম কান্নার মৃদু আহ্বানে... সব নিরর্থক। আমার কাছে ফিরবে না প্রতিজ্ঞা করেই সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে গৌতমের অনুগামিনী হত। তা না হলে গৌতমের অভিশাপের মূল্য কি?

ভাবলাম প্রলয়ের অবশিষ্ঠ দিয়ে প্রথার চিতা প্রস্তুত করব, একাই তার সৎকার করব কিন্তু না আমার হাতে প্রস্তুত চিতাগ্নিকেও উপেক্ষা করল প্রথা। প্রলয় অনলের অবশিষ্ঠ অগ্নিকণাটি মরুৎ স্পর্শে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, এবং আমার চোখের সামনে প্রথার শরীর ভস্মীভূত হয়ে গেল। প্রথাকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করব ভেবে অগ্নিকে আলিঙ্গন করে আমি জর্জরিত হয়ে গেলাম। আমার স্পর্শে অগ্নিদেবও নির্বাপিত হলেন। কেবল ভস্মস্তূপ, প্রথার ভস্মস্তূপের ওপর আমি লুটিয়ে পড়লাম—আজ আমি সম্পূর্ণ একাকিনী। ব্যর্থতা ক্ষোভ ও দুঃখে প্রথার চিতাভস্মে আমার শরীর ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে গেল। চেতনা হারিয়ে কত জন্ম জন্মান্তর আমি মৃতবৎ পড়ে ছিলাম। তার হিসাব আমি তো রাখিনি—আর কে-বা রাখবে? চোখ খুলে দেখলাম চারদিক থেকে মেঘ ঢেকে এসেছে আমার নিদাঘ শুষ্ক চোখে। তাহলে কি যজ্ঞ সমাপ্ত পূর্ণাহুতি উত্তীর্ণ, সিদ্ধি উপস্থিত। হে আকাশ—আমার মাথার ওপর পাছে ভেঙ্গে পড় কিন্তু মেঘসহ ভেঙ্গে পড়, সেটাই আমার সিদ্ধি। তোমার জলদানে আমার বলিদান সফল হবে। চেতনা ফিরে পেয়ে আমি জলবিহ্বল হয়ে গেলাম। সহসা বৃষ্টির মতো আমার দু'চোখে বর্ষণ শুরু হয়। আমার অন্তঃরাত্মা চেতনা ও কাঁদছিল। আমার অশ্রু কি প্রলয়কেও প্রলয় পয়োধি জলে ভাসিয়ে দেবে।

নিজের দুঃখকে চরম দুঃখ বলে ভেবে মানুষ ভাবে তার চোখের জলের তুলনায় সমুদ্র কিছু নয়। তার চোখের জলে পৃথিবী সহ সমুদ্রও ডুবে যাবে। ঠিক সেইরকম আমার দুঃখ আমরা কাছে সর্বলোকের চরম দুঃখ বলে মনে হচ্ছিল কাঁদতে কাঁদতে ভয় পাছে পৃথিবী প্লাবিত হয়, অরণ্য পর্বত ভেসে যায় যদি সেই অশ্রু তরঙ্গে। সেই তরঙ্গ উত্তুঙ্গ হলে চন্দ্র সূর্য ও আকাশ থেকে পড়ে যাবে, আকাশ জলমগ্ন হবে চোখের জলের বন্যায়।

কিন্তু একি, আমার চোখের জলে পাতাবিহীন গাছের গোড়াটাও ভেজেনি।

একটা গাছের দুঃখ আমার দুঃখের চেয়ে বেশি। আমার চো জল শুকিয়ে গেল অথচ গাছের গোড়া ভিজল না। আমার মতো কত মানুষ, জীবজন্তু, বনস্পতি রয়েছে এই মহাপ্রকৃতিতে। তাদের দুঃখ একত্রিত হলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ডুবে যাবে। সেই তুলনায় আমার দুঃখ কত তুচ্ছ। কি এমন দুঃখ আমার! কৃতকর্মের ফলই আমার দুঃখ। আমার পাপের জন্য সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন—চলে গেল বা কখন? সবই তো রয়েছে আমার চারপাশে। গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, রোদ-বৃষ্টি আর দাস দানব নামে পরিচিত এই পৃথিবীর সন্তানেরা আমার কাছে থেকে দূরে থাকলেও আমার চারপাশেই আছে। শুধু মানুষ ও দেবতাগণ আমাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু দেবতাদের সহোদর দানবেরা তো আমার কাছেই রয়েছে, কিন্তু গৌতমের অভিশাপে সবাই স্তব্ধ, হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, আমার সাথে কেউ দেখাও করছে না দুঃখে। দেবতারা একবার দেবত্ব প্রাপ্ত হলে আর কি করেন—নিজ নিজ বাহনে চেপে জগৎ পরিক্রমা করেন। যে পূজার্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞ করেন তাকে সম্পদ উজাড় করে দেন, যে না করে তাকে অভিশাপ দেন। ইন্দ্রদেবের সেই

অভিশাপের ভয়েই কি আমার এই পাপ। আজ মনে হচ্ছে, অভিশাপ বরং পাপের চেয়ে ভালো।

দেবতাগণ সকলেই বিলাসী। শিবেরও আছে শ্মশান বিলাস। বিষ্ণুর সমুদ্র বিলাস। ভাই নারদের আকাশ বিলাস, আর ইন্দ্রদেবের রমণী বিলাস। দেবতারা ভাবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বর এবং জগতের ভাগ্যবিধাতা। ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ, শত্রুতাও কম নয়। 'ভক্ত' আখ্যা দিয়ে কিছু চাটুকারের মাধ্যমে নিজের গুণকীর্তন শুনতে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী। দেবতারা ঋষিদের চাটুকার হিসাবে মেনে নেওয়ায় অসুরেরা ঋষি বিরোধী। সমাধানের পথ—অসুর বধ। বাল্যকাল থেকেই আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু তারা সম্ভবত আমাকে বিশ্বাস করে না; কারণ আমি আর্যনারী এবং ঋষিপত্নী। তারা কি ভেবেছে আমি মোহিনী নারী? প্রেমের মায়াজালে তাদের গৌতমের শরণাগত করেছি, অথচ কোথায় বৃষ্টি, কোথায় জীবন?

সম্ভবত সেই কারণেই তারা গৌতমের অভিশাপের প্রতিবাদ করেনি। উপরন্তু যে ইন্দ্র তাদের দমনকারী আমি তাকেই দেহ সমর্পণ...। থাক্ সেই পাপের স্মৃতি আর মনে করব না।

ভেবেছিলাম আমাকে একা পেয়ে তারা হয়তো নানারকম অত্যাচার করবে কিংবা প্রতিশোধ নেবে। হয়তো আমার নারীত্বকে অপমান করবে? করলে বা উপায় কি? বর্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি গৌতমের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছি। কিন্তু বর্ষা কোথায়? কোথায়-বা ইন্দ্রকরুণা? ইন্দ্রের পাপ তাঁর পবিত্র জন্মভূমিকে কলঙ্কিত করেছে। আমি আর্যনারী—তাই শত্রুপক্ষ। আমি কি আমার হৃদয় চিরে দেখাতে পারব যে তাদের প্রতি আমার কোনওদিন কোনও বৈরীভাব ছিল না—তাদের দুঃখে আমি দুঃখী।

শত্রুতা কখনও রক্তগত নয়, ব্যক্তিগত অথচ কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কলহকে কেন্দ্র করে সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। দেশ খণ্ডিত হয়। কলহের বীজ মহাদ্রুমে পরিণত হয়। ব্যক্তির সদিচ্ছা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ছিন্ন ফুলের পাপড়ির মতো কোথায় চলে যায়। কিন্তু সেই ঝড় সদিচ্ছার ফুল থেকে সুগন্ধ উড়িয়ে দিতে পারে না। ঝড় বিধ্বস্ত ফুল তখনও সুগন্ধ ছড়ায়। অবশ্য ধ্বংসের গন্ধ সেই সুগন্ধকে ছাপিয়ে যায়। সেইরকম ঋষি আশ্রমে আর্য-অনার্য শত্রুতার প্রলয়ের মধ্যে থেকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি-বা কি করে অসুরদের শুভেচ্ছু হতে পারতাম? ভূলুণ্ঠিতা হয়ে আমি অপেক্ষা করে থাকলাম আর এক প্রলয়ের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। এটাই সম্ভবত শেষ। কম্বোজ, যবন, বর্বর, শক্ হরিত, কিরাত প্রভৃতি অনার্যরা কি আমাকে জীবন্ত রাখবে? প্রভাত হওয়ার পূর্বে আমার দেহ থাকবে প্রাণ থাকবে না। কিম্বা প্রাণটাই থাকবে দেহ অক্ষত থাকবে না।

রুক্ষ নিদাঘ প্রকৃতিকে শোষণ করার মতো নিঃসঙ্গতা জীবনের সমস্ত রস শুষে নেয়। চতুর্দিক থেকে বিষাদ এমনভাবে ঘিরে ধরে যে বিষাদও আর অনুভূত হয় না। শুধু নিঃসঙ্গতা ঢোল পেটায় আমার চেতনায়। শুধু পাতাঝরার হাহাকার ছাড়া আর কিছু আমি শুনতে পাই

না—শোনা যায় না আমার কামনার বিকট হুঙ্কার। শোনা যায় না—নিজের বাসনার বিভীষিকাময় ঝঙ্কার, হতাশার আর্তনাদ। চেতনা সম্পূর্ণ স্পর্শরহিত— একেই বলে জড়—মৃতবৎ।

কিন্তু অন্তরের একাকীত্ব যখন নিজেকে বিদীর্ণ করে পৃথিবীর আকাশে শাখা প্রশাখা মেলে দেয় তখন অন্তরের একাকীত্ব কোথায় চলে যায়! সূর্যালোকে দীপশিখাটিকে যেমন স্তিমিত দেখায়। সেইরকম আমার দুঃখ হাহাকার ও স্তিমিত হয়ে যায়। মনে হয়, পৃথিবীর দুঃখ, দৈন্য বিষাদের বেলাভূমিতে আমার দুঃখের তরঙ্গগুলি লীন হয়ে যাচ্ছে। আমার অন্তরের দুঃখ বিষাদ অন্তর্হিত হয়ে যায়। বিষাদের সাথে লড়াই করার জন্য কি করে এত শক্তি অবশিষ্ট থাকে মানুষের মধ্যে? স্বার্থপরতা কত দুর্বল অসহায় করে দেয় মানুষকে। সেইজন্য নিজের ক্ষুদ্র দুঃখের কাছে মানুষ হেরে যায়—অথচ পৃথিবীর বিশাল দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি মানুষ নিজের মধ্যেই পায়।

পৃথিবীর উদার কপালে নিঃস্বার্থ চুম্বন এঁকে দেওয়ায় যে আনন্দ ও রোমাঞ্চ থাকে, তা সব রোমাঞ্চের উপরে। সন্তানের কপালে চুম্বনটি এঁকে দিলে হয়তো সেই রোমাঞ্চ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার শতানন্দ, শরৎভানু, চিরকারী, গৌতমী এরা সব কোথায়? আমার পাপ আমাকে যত না কষ্ট দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে আমার উপেক্ষিত পত্নীত্ব, অবহেলিত মাতৃত্ব। গৌতম যা কিছু করেছেন নিজের যশ খ্যাতি এবং ব্রহ্মর্ষিপদ লাভের জন্য—আমার এই ধারণা হয়তো ভুল হতে পারে, আমি স্বীকার করছি। গৌতমের মতো জ্ঞানী মহর্ষির জ্ঞান ও বুদ্ধির হিমালয়কে স্পর্শ করা আমার সাধ্যাতীত। তাই আমার পত্নীত্ব উপেক্ষিত। কিন্তু বৌদ্ধিকতার অভাবে বাৎসল্য বিষে পরিণত হয় না বাৎসল্য অমৃত। অমৃতের ভাণ্ডারে এক কণা বিষ মিশে গেলে তা বিষ হয়ে যায়, কিন্তু বাৎসল্যে যত নিন্দা, ভর্ৎসনা অভিশাপ উজাড় করে দিলেও সে মন্থনে শুধু অমৃতই নিঃসৃত হয়। চিরকারীর অন্তর্ধান, শতানন্দের নির্লিপ্ততা, শরৎভানুর ইন্দ্রলোকে স্থায়ী বসবাস আজ আমার কাছে ভর্ৎসনার মতো মনে হচ্ছিল। এসব আমার মাতৃত্বের উপেক্ষা ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তাদের প্রতি আমার বাৎসল্য অগাধ অশ্রুজলে প্লাবিত হয়ে দুকূল উপচে পড়ছিল। তা' আমার পূর্বজন্ম এবং পরজন্মকেও প্লাবিত করছিল। আমি যাকে স্মরণ করি, যার ধ্যান করি সবাইকে দেখায় আমার শতানন্দ, শরৎভানু, চিরকারী ও গৌতমীর মতো। সেখানে গৌতম ইন্দ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ সবাই গৌণ হয়ে গেলেন—সবাই যেন অজ্ঞান শিশু। গৌতম এত জ্ঞানী হয়েও কত অজ্ঞান। ত্রিকালদর্শী হয়েও আমার আগত পাপকে দেখতে পারলেন না। ইন্দ্রকে অতিথিভবনে ছেড়ে ভোর না হতেই আমার শয্যা থেকে উঠে গেলেন। শক্তি সামর্থ থেকেও যে সাহায্য না করে সে নিষ্ঠুর। জ্ঞানী হয়েও যে অন্যের অজ্ঞানতা দূর করতে না পারে, সেও নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর। গৌতম জ্ঞানী হয়েও আমার অজ্ঞানতা দূর করতে না পারাটা কি শুধু আমার দোষ?

সহানুভূতির জন্য যার হৃদয় সর্বদা রুদ্ধ। কাছে থেকেও যে মানুষ সুখ দুঃখ অজ্ঞানতা

অনুশোচনার সঙ্গী নয়, সে নিজের হয়েও নিজের নয়। সহানুভূতি ও করুণার দ্বারা দূরে থাকা অপরিচিত ও নিজের হয়ে যায়। গৌতম নিজের হয়েও যদি নিজের হলেন না, আর ইন্দ্রদেব পর হয়েও আপন হলেন তাহলে তার পিছনে কি কোনও যুক্তি নেই? শত্রু যদি দুঃখে সহানুভূতি দেখায় তাহলে সেও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়। আমার গর্ভপাত, চিরকারী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার সময়ে আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে ইন্দ্রদেব স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি যদি শ্রদ্ধার অধিকারী হন তাহলে কি অন্যায়?

কিন্তু এসব আমি কাকে বলছি? আমার কথা শুনতে এখানে কে আছে? না গৌতম, না ইন্দ্র। তাহলে এই যুক্তি করছি কেন? পাপকে প্রতিপাদন করার জন্য? পাপ-পুণ্য কি যুক্তি দিয়ে সাব্যস্ত করা যায়? কিন্তু সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে অন্যহাতে আমার সর্বস্ব লুট করলেন কেন ইন্দ্রদেব? এটাই কি পুরুষের প্রবৃত্তি? নিঃস্বার্থ সাহায্য কি জগতে বিরল? গৌতম অভিশাপ দিয়েছেন—আমি বায়ুভক্ষণ করে সবার কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকব। নিজের অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মার কাছে কেউ কি কখনও অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে? মানুষের চোখ সব কিছু দেখতে পারে না। যা দেখে তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না। গৌতমের দিব্যচক্ষু যে এসব দেখতে পারল না, সেটাই আশ্চর্য লাগছে। কিছু মহৎ উদ্দেশ্যে দেখেও অদেখা হলেন কি মহর্ষি? মানুষের প্রকৃতি ও রক্তে বিষয় বাসনা নিহিত। মুনিঋষির চোখের দিকে তাকালে আমি তাদের অন্তরের ভাব বুঝতে পারি। যা মনে থাকে তা কি পাপ নয়? পাপের কত রূপ আমি দেখেছি—আজ সেকথা কাকে বলব? বলে কি লাভ? আমার পাপ তো ধুয়ে যাবে না। বরং সেকথা প্রকাশ করলে পৃথিবী পাপময় হয়ে যাবে।

স্বপ্নে বিভিন্ন ভোগ্যবস্তু পেয়েও যেমন মন তাতে তৃপ্ত হয় না। সেইরকম বিয়ে করেও আমি বিয়ের সুখ পাইনি। কর্মফল কামী ব্যক্তি মায়াজনিত তুচ্ছ ক্ষয়িষ্ণু সুখ পেলেও নিরবিচ্ছিন্ন সুখ পায় না। ঠিক সেইরকম বিবাহ সুখ থেকে বঞ্চিতা হয়ে ইন্দ্রের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করে আমার সুখ বাসনা কি চরিতার্থ হয়েছে? কিন্তু সেজন্য কি আমি একা দায়ি? বাসব স্বর্গবাসী—আমি মর্তবাসিনী। স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে ব্যবধান জেনেও বাসবের প্রতি কেন এই অদম্য আকর্ষণ? সেই আকর্ষণের অন্তিম পরিণতি যে দুঃখ বিরহ, কলঙ্ক এবং অভিশাপ, তা জেনেও মূঢ়মন শৃঙ্খলার মধ্যে রইল না কেন? প্রকৃতপক্ষে এটা প্রেম না অভাববোধের তৃপ্তিসাধন। একটি বস্তু চোখে এক দেখালেও তা এক নয় অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি। সেইরকম দাম্পত্য জীবনে দম্পতি একাত্ম হয়ে একটি জীবন কাটাচ্ছে বলে মনে হলেও তারা এক নয়—অনেক অসমতার একটা সমাজকৃত বোঝা পড়া। আমাদের কি বোঝাপড়া ছিল? যদি না ছিল—সে দোষ কি আমার একার?

আমার পাপের স্বপক্ষে যদি যুক্তি আছে এবং দোষ যদি আমার একার নয়, তাহলে হিংস্র জীবজন্তু এবং দানবের কবলে আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে আশ্রমের সবাইকে নিয়ে গৌতম যখন হিমবন্ত পাহাড়ে চলে গেলেন তখন আকাশ ধরাশায়ী হল না কেন? একটি পাপের

পৃথিবী অপরটি পুণ্যের এইভাবে পৃথিবী দু'ভাগ হল না কেন? সম্পূর্ণ পাপবিহীন পৃথিবী কি সম্ভব?

মৃত্যুর আতঙ্কে মানুষ প্রতিনিয়ত মরে। কিন্তু জীবনের আতঙ্কে এখন আমি তিলতিল করে মরছি। আমার পাপ সবাই দেখতে পেল, কিন্তু আমার অনুতাপ কেউ দেখতে পেল না। এটাই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠসৃষ্টি চিন্তাশীল মানুষের নিয়তি। সেই অসহায়তা আমাকে মরণের অধিক দুঃখ দিচ্ছে।

আমি স্নেহশীলা জননী অহল্যা হয়েও আজ বর্জিত। গৌতম এবং অন্য ঋষিগণ আমাকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। গৌতম বোধহয় চেয়েছিলেন আমার মৃত্যু হোক কিন্তু হত্যার অপরাধ তাঁকে স্পর্শ না করুক। তা না হলে এমন জনশূন্য করে চলে গেলেন কি করে? শত্রুকেও এইরকম শাস্তি কেউ দেয় না। ভেবেছিলাম এই দুঃসময়ে মৃত্যু আমাকে আশ্রয় দেবে—কিন্তু মৃত্যুও আমার প্রতি বিরূপ। অভিশাপের প্রচণ্ডতায় হিংস্রজন্তুরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এরা সবাই আমার পরিচিত। সেই ভয়ঙ্কর বাঘটি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে, একদিন রুদ্রাক্ষের শরাঘাত থেকে আমি তাকে রক্ষা করেছিলাম। সর্পরাজের বিশাল উদরে আত্মগোপন করব ভেবেছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখে সে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। হয়তো অভিশপ্তা বলে আমাকে সবাই উপেক্ষা করছে। আমার দুঃখে কিংবা বা রৌদ্রতাপে সবাই শক্তিহীন, নিস্তেজ হয়ে গেছে।

যদি মৃত্যু আমার প্রতি বিমুখ, তাহলে তো বাঁচতে হবে। সম্ভবত বাঁচাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। মরণে প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? বিহঙ্গ নিনাদিত বনভূমি আজ স্তব্ধ। ভ্রমরশোভিত পদ্মসমৃদ্ধ সরসী আজ শুষ্ক। ছায়াপ্রদ বিশাল বৃক্ষরাজি প্রলয়ে বিধ্বস্ত। পুষ্পশোভিত পর্বতমালা রৌদ্রতাপে অগ্নিময়। আমার অনার্য মিত্ররা কোথায় গেল? শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর অরণ্যে আমি জীবনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। জীবন আশ্রয় খোঁজে, কে আমাকে আশ্রয় দেবে?

যে জন্মগ্রহণ করেছে, তার বাঁচার জন্য পৃথিবীতে অজস্র উপাদান রয়েছে। জীবন ধারণের বিভিন্ন উপাদানে সংসার পরিপূর্ণ। স্বামী ও পুত্রদের সাহায্য ব্যতিরেকে কি বাঁচা যাবে না? আমার স্বামী পুত্রেরা কি আমার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না? পৃথিবীতে সবাই নির্ভরশীল—রাজা প্রজার ওপর নির্ভর করে। গুরু নির্ভর করে শিষ্যের ওপর, প্রভু ভৃত্যের ওপর। দেবতাও ভক্তের ওপর নির্ভর করে মহিমাময়। স্বামী পুত্র ছাড়া আর কার ওপর নির্ভর করে বাঁচাতাম? আমাকে বাঁচতেই হবে। মৃত্যু আমার কাম্য নয়, তাতে জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু শাপমোচনের পথ রুদ্ধ। অভিশপ্তা হয়ে আমি মরতে চাই না। যদি আমি পাপ করে থাকি তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তুত।

মাঝে মাঝে পৃথিবী রসাতলগামী হয়, প্রলয় সিন্ধুতে বিলীন হয়ে যায়। তখন মনে হয় সব শেষ। আর মাথা তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু কালের রসাতলগামী অতল সমুদ্রের জলকে অবজ্ঞা

করে ধৈর্যের পাহাড় মাথা তুলে আকাশের সম্মুখীণ হয়। বৃক্ষহীন নিষ্পত্র পাহাড় দাঁত দেখিয়ে পৃথিবী অন্তরীক্ষ সূর্য চন্দ্রকে উপহাস করে। কালক্রমে সেই পাহাড় সবুজে ভরে ওঠে অবশেষে সুশীতল ঝরণা ঝরে পড়ে তার বুকে। করুণার বারিধারা পাহাড় থেকে পৃথিবীর জন্য ঝরে পড়া মাত্রই তার দুঃখ দূর হয়ে যায়। তা না হলে ঝরণা কি পাহাড়ের বুকে কুলকুল স্বরে গান গাইতে পারত? আর পাহাড়ও কি স্নেহমগ্ন হয়ে শুনত? এইত' জীবন! কোথা থেকে আসে এই প্রেরণা, পতন থেকে উত্থিত হওয়ার আত্মশক্তি?

পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীত সেই জলে ডুবে যায় না। প্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হলেও এক টুকরো ভূমি প্রলয় অতিক্রম করে উঠে আসে ওপরে, সৃষ্টি হয় নতুন পৃথিবী। এটাই সত্য। তাহলে অথৈ সমুদ্রের মধ্যে আমি একমুঠো মাটি খুঁজব না কেন?

মানুষের অন্তঃকরণ এক রক্তস্নাত যুদ্ধভূমি। সেখানে সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায় ভোগ ও মোক্ষের নিরন্তর যুদ্ধ চলেছে। সংঘর্ষ ব্যতীত সত্য এবং অসত্য কি মুখোমুখি হয়? মাঝে মাঝে সত্য অসত্যর দ্বন্দ্ব এত তীব্র হয়ে ওঠে যে মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। আজ আমার সেই অবস্থা। কখনও গৌতম অসত্য, ইন্দ্র সত্য, আবার কখনও ঠিক বিপরীত। মাঝে মাঝে সত্যের রূপ মহান, পরমুহূর্তে অসত্যের আকর্ষণীয় রূপ। বর্তমানে আমি সত্যকে ছেড়ে দিয়েছি—অসত্যকে আশ্রয় করার সিদ্ধান্ত ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। গৌতম এবং ইন্দ্র উভয়েই আমাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমি কাকে ত্যাগ করেছি? গৌতমকে আমি ত্যাগ করিনি। এখনও আমি গৌতমপত্নী অহল্যা। ইন্দ্র কখনও আমার ছিলেন না। ইন্দ্র ক্ষণিকের মোহ। মোহের স্বপক্ষে যত যুক্তিই থাক না কেন, মোহ ভুল পথে চালিত করে। তাই আমার ইন্দ্রমোহ কাটলেই শাপমুক্তির পথ সহজ হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত কি মোহ কাটে?

প্রবল ঝড়ে বিশাল বৃক্ষ যেমন আন্দোলিত হয়। আমিও সেইরকম বিচলিত বিব্রত। আমার কর্তব্য এবং লক্ষ্যস্থল কিছুই ঠিক করতে পারছি না। গৌতম আমাকে ত্যাগ করেননি, অভিশপ্ত করেছেন, শাপমুক্ত হলে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন—এটা তাঁর মহানতা। কিন্তু আমার শাপমুক্তি কি সম্ভব? বেঁচে থাকলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু আমার পরিস্থিতিতে কি বেঁচে থাকা সম্ভব? আবার ভাবি, যে সকল দ্রব্যের জন্য শরীরে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল দ্রব্য থেকে মহৌষধি তৈরি করলে রোগের উপশম হয়। কর্ম-ই কর্মবন্ধন ক্ষয় করতে সমর্থ। কিন্তু সেই কর্মটি ভগবত কর্ম হওয়া আবশ্যক। পিতা ব্রহ্মার বাণী, আজ নির্জনে আমি শুনতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমাকে কর্ম করতে হবে। ভগবত কর্ম আবার কোনটা? আমাকে সেই কর্মের পথ কে দেখাবে?

পথ অন্বেষণে দগ্ধ বনভূমিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াই। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর। গৌতমের কথানুযায়ী, বায়ুভক্ষণ করে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটে

না। নিকটস্থ নদীর ক্ষীণ ধারায় স্নান করে তাপ ও তৃষ্ণা দূর করব ভেবে অগ্রসর হতেই জলে ইন্দ্রের দান মেঘ ও বৃষ্টির কথা মনে পড়তেই তা থেকে বিরত হলাম। এক দগ্ধ বৃক্ষের তলায় বসে বাহ্য চিন্তারহিত হয়ে ভাবলাম বহির্জগতের দ্বার আমার জন্য রুদ্ধ। তাই হৃদয়স্থ পরমাত্মার শরণ নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ধ্যানস্থ হয়ে আমি অন্তরস্থ বিশ্বশক্তিকে স্মরণ করতে লাগলাম। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে মানুষ নগন্য জীব হলেও কত শক্তিশালী। তা না হলে জীবনের এত বড় বড় বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও সে আবার জীবনকে ভালোবাসতে পারত না। আমি কি আবার জীবনকে ভালোবাসতে পারব? কে আমাকে হাত ধরে ভালোবাসার মধুকুঞ্জে নিয়ে যাবে? গৌতম—ইন্দ্র—আমার সন্তানেরা! আজ তারা কোথায়?

রূপ, ঐশ্বর্য, প্রচেষ্টা ও সাধনা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে সফলতা দিয়ে থাকে, মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী মনে করে। কিন্তু যখন মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয় তখন মানুষ নিজের চেয়ে অন্য কাউকে বেশি শক্তিশালী মনে করে— সেখানেই ওঠে ভাগ্যের প্রশ্ন, যার কর্তা অদৃশ্য। সেই অদৃশ্য সত্তাটিকে ঈশ্বর মনে করে নিজের অসহায়তাকে স্বীকার করে নেয় এবং ভাগ্যকে দায়ি করে এবং বিফলতার ভয়াবহ হতাশা থেকে নিজেকে রক্ষা করে। ভাগ্যের স্যাথে লড়াই করার জন্য সেই অদৃশ্য সত্তার কাছে শক্তি প্রার্থনা করে। সেখানেই মানুষ সৎ মানুষে পরিবর্তিত হয়। সে ঈশ্বর নয়, কিংবা অসুর নয়।

এসব কথা আমরা আকস্মিক ভাবনা নয়—এটা আমার সংস্কার। পিতা এবং ভাই নারদের কাছে শুনেছি। আমার রূপের অহংকার খর্ব হয়েছে, ব্রহ্মাপুত্রী বা গৌতমপত্নীর অহংকারও আর নেই। আমার ঈষৎ ভ্রূবিভঙ্গে পৃথিবী পদানত হওয়ার ভ্রান্তি ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। আমার কর্মের প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তর বিষময় হয়ে গেছে। গ্লানি ও দুঃখে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অশ্রুতেও ইন্দ্রের দান স্বরূপ জলকণা আছে বলে আমি ঘৃণায় অশ্রুমোচন থেকে বিরত হলাম।

আবার ভাবি, জলকণাকে ঈশ্বরের দান না ভেবে আমি ইন্দ্রের দান ভাবছি কেন? ঈশ্বর জলের স্রষ্টা। শুধুমাত্র বাহুবলে ইন্দ্র জলের অধিকারী। জল বর্জন করলে রৌদ্রদগ্ধা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে আমার বলিদানের কি ফল? আমি বাঁচব আমার এই পৃথিবীর জন্য। মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

নিবৃত্তিমার্গ আসক্তিরূপী বন্ধনকে ছিন্ন করে কিন্তু শঠ ভক্তের মতো ভণ্ডামি করে জগতে নিজের ভক্তির প্রদর্শনী করলে কি কেউ আসক্তি থেকে মুক্তি পায়? তাই ঠিক করলাম বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু ভোগ্যবস্তু প্রয়োজন ততটুকুই সংগ্রহ করব। উপভোগ দ্বারা আমার যে তীক্ষ্ণ জ্ঞান উদয় হয়েছে, তার দ্বারা আমি স্বয়ং নির্বেদ প্রাপ্ত হয়েছি। গৌতমের শুষ্ক উপদেশে আমি এইরকম নির্বেদ হতে পারিনি। কিন্তু ক্ষুধার তাড়না সব দুঃখকে পরাস্ত করেছে। ভাবছি, আহারের জন্য বৃক্ষেরা কি ফল ভিক্ষা দেবে না? আমার দৃষ্টিতে নদী সরোবর কি শুষ্ক হয়ে যাবে? থাকার জন্য পাহাড় পর্বতের গুহা কি সব রুদ্ধ হয়ে গেছে? পশুপাখি কি নিঃসঙ্গকে

সঙ্গদান করবে না? প্রকৃতি কি তার সৃষ্টিকে রক্ষা করে না? মন নিঃসঙ্গ হলেও সঙ্কল্প করলে বিশ্ব কি বন্ধু বয়ে দাঁড়ায় না। আমার প্রতি যদি সকলেই নির্দয়, তাহলে প্রলয়কালে চেতনা হিসাবে কে আমাকে পথ দেখিয়ে চলেছেন?

প্রলয় সমাপ্ত হলে পরমাত্মা সৃষ্টি রচনায় উদ্যোগী হন। সেইরকম আমিও প্রলয় থেকে উঠে জীবনের সংকল্প করলাম। জীবাত্মা অবিনাশী হলেও বিনাশশীল দেহে বাস করেন। দেহ-ই আত্মার অন্যতম সাধন। তাই এই সাধনকে ব্যবহার করে আত্মার জ্যোতি জ্বালাবার জন্য অহংকার ত্যাগ করে আমাকে নিষ্কাম নিস্পৃহ সমিধ হতে হবে বলে আমার অন্তর থেকে কে যেন নির্দেশ দেয়। নিজেকে যজ্ঞ ও স্বাহা করে ইন্দ্রতুষ্টি করেছি ভেবেছিলাম, সেখানে ছিল অহংকার ও বাসনা।

এইরকম আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কালরাত্রি ঘনিয়ে আসে। কেউ কোথাও নেই। কাকে ভয়? কিন্তু কেন কেজানে মনে হল অভিশাপের এই রাত বুঝি আর শেষ হবে না। অন্ধকারের মধ্যে অহল্যার সমাধি সুনিশ্চিত। পুনরায় পাপভাবনা ও গ্লানিতে আমি মৃতকল্প হয়ে পড়ে রইলাম। অন্ধকার সমেত আকাশ আমার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। কোথায় বজ্রপাত হল। আকাশ ভেদ করে বৃষ্টি ঝরছে। ভেবেছিলাম দুঃখের রাত বুঝি পোহায় না, অভিশাপ মোচন হয় না। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রলয়ের অলঙ্ঘ্য সংবিধানকে মানুষের অভিশাপ লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই সূর্য ওঠে। বাতাস বইতে থাকে। অমৃত জলধারা উজাড় হয়ে গেল পৃথিবীর বুকে। সোমভাবনায় অবগাহন করে আমি প্রেম করুণা ও শ্রদ্ধায় দ্রবীভূত হলাম। তাহলে আমার বলিদান সফল হল। অবশেষে যজ্ঞের ফল পাওয়া গেল।

কে আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে? কে? গৌতম? হ্যাঁ, এ'ত গৌতমের কণ্ঠস্বর—সেই মন্দ্রগম্ভীর ওঁকার।

মহে নঃ অদ্য বোধয়
উষো রায়ে দিবিত্মতী
যথা চিন্নোঅবোধয়ঃ
সত্যশ্রবসি বায়্যো সুজ্যতে অশ্বমুহুতে

মুদ্রিত চোখে আমি উষা দর্শন করছি। মৃদুকণ্ঠে প্রার্থনা করছি—"হে উষাদেবী! তোমাকে জাগরিত কর, হে দীপ্তিময়ী! আত্মৈশ্বর্য প্রদান করে বহু পতিত আত্মাকে তুমি উদ্ধার করেছ। বহু আধ্যাত্মিক সাধনায় মানব হৃদয় দিব্য জ্যোতি লাভ করেছে তোমার স্পর্শে। সেই সাধনার জন্য আমাকে আশীর্বাদ করো।

ইন্দ্রদেবের প্রতি আর বিরাগ ছিল না। অমৃত বারিধারায় এই সন্তাপিত পৃথিবীকে তিনি সুশীতল করেছেন। পৃথিবী শস্যশ্যামলা হবে। আমার বলিদান সার্থক হয়েছে।

সেই পবিত্র বর্ষার জলে স্নান করে নির্জন স্থানে বিধিপূর্বক কুশাসনে উপবেশন করে শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ওঁকার জপ করে মনকে বশীভূত করার চেষ্টা করলাম। কে আমার ধ্যানভঙ্গ করছে?

মরুৎগণ কার বার্তা নিয়ে এসেছে আমার কাছে? এই প্রেমপত্র কার? হে প্রেম—তোমার পিছনে ছুটে আমি বহু দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু প্রেমকে দোষ দিয়ে লাভ কি? প্রেম কি আমার সাধনা ছিল? আমার প্রেমে কি হব্য গুণ ছিল—সমিধের নিষ্কাম নিষ্ঠা ছিল? আজ অন্তর্মুখী হওয়ার চেষ্টায় একটা অদৃশ্য জগতের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মরুৎগণকে আমি কি করে অগ্রাহ্য করব? মরুৎগণ কেবলমাত্র জগতের প্রাণশক্তি নয়, চিন্তাশক্তিও। ইন্দ্রদেবের মিত্র হলেও অন্য কারও শত্রু নয়। হিমবন্ত পর্বত থেকে মধুগন্ধ বয়ে এনেছে। তার হাতে বসন্তের চিঠি। আমার ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। ধ্যান ত্যাগ করে আমি প্রেমপত্র পড়ছি বিভোর হয়ে—

হে আমার প্রেমের দেবী অহল্যা, —তোমাকে অভিশাপ দিয়ে আমি নিজেই আজ অভিশপ্ত। প্রিয়তমা অহল্যা, তোমার প্রেমলাভ করার জন্য আমি জীবনব্যাপী সাধনা করেছি। কিন্তু সেই সাধনাই আমাকে তোমার কাছে থেকে দূরে নিয়ে গেছে। আমি জানতাম, সাধনা যদি প্রেমলাভের জন্য উদ্দিষ্ট, তাহলে তা তখনই সিদ্ধি প্রদান করে যখন তা পরিণত হয় নৈর্ব্যক্তিক চেতনায়। আবার একথাও জানতাম আশ্রমিকের সাধনা পথে প্রথম বাধা হল সেখানেই যেখানে ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী অংশটি চরম দুর্বলতায় পরিণত হয়। অহল্যা, আজ তোমাকে একথা বলতে আমার কোনও কুণ্ঠা নেই—তুমিই ছিলে আমার হৃদয়ের এক শক্তিশালী দুর্বলতা। পাছে সেই দুর্বলতা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যায় সেইজন্য আমি কঠোরতার এক কর্কশ বর্ম দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম এবং উচ্ছ্বাসকে।

ত্রিভুবনে অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার মেলে বধূবেশে যখন তুমি এলে আমি ত্রস্ত হলাম বুকের প্রতিটি স্পন্দনে। সেই সময় কুৎসিৎ সন্দেহের এক কদাকার ছদ্মবেশ ধারণ করলাম আমি। অহল্যা, এই সন্দেহ তোমার প্রতি ছিল না। তা ছিল সৌন্দর্যকে ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করা পুরুষকুলের কামুকতার প্রতি। এমনকি তোমার ব্রহ্মচারী ভাই নারদ, তোমার পিতৃস্থানীয় পিতামহ ব্রহ্মা, দেবতা এবং ঋষিগণ তথা দানবেরাও মুক্ত ছিল না এই সন্দেহ থেকে। আমার ভয় ছিল, এই অতুলনীয় সৌন্দর্য এরা অক্ষুণ্ণ রাখবে না। একদিন না একদিন ভ্রষ্টাচারীরা তাকে নষ্ট করবে। আমি বোধহয় সেই সৌন্দর্যের সুরক্ষা করতে পারব না। আমি জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ভাব নয়, ভোগ। তাই আমার সাধনা প্রকম্পিত হচ্ছিল তোমার সুরক্ষার চিন্তায়। তুমি পুরুষ নও, অপরূপ সৌন্দর্যময়ী পত্নীর স্বামী নও, তুমি কি করে জানবে যে তোমার মত বরনারীর স্বামী কি জ্বালায় দগ্ধ হয় সারা জীবন!

জ্ঞানের উচ্চস্তরে থেকে তখন আমি বুঝতে পারিনি যে, আমার ব্যক্তিত্বের শুধু একটা দিক তুমি দেখতে পারছ। আমার প্রেমভাবনার কর্কশ বর্মটিকেই শুধু তুমি দেখেছিলে, সেই কর্কশতা ভেদ করে অনুরাগের রাগাত্মক মর্মকে স্পর্শ করতে পারনি বলে আমি তখন ভাবতেও পারিনি। কি করে ভাবব? আমি তো অনুভব করেছি তোমার সাথে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। তুমি আমার অন্তর বাহির চিনেছ, আমার ভাবনার বাইরে তোমার স্বতন্ত্র কোনও ভাবনা থাকবে না। তাই প্রেমিকের মন নিয়ে তোমার অনুরাগ অন্বেষাকে আমি

বোঝার চেষ্টা করিনি। প্রেমের পারদর্শিতায় বিচলন থাকে না, থাকে স্থিরতা। আমার স্থিরতাকে পারদর্শিতা না ভেবে শাস্ত্রীয় স্বামীত্বের অহংকার ও অনুশাসন ভাববে বলে আমার স্বপ্নও আমাকে সজাগ করেনি।

বিবাহের পূর্বে আমার আশ্রমে আমারই তত্ত্বাবধানে তুমি ছিলে বালিকা ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচর্য ও জিতেন্দ্রিয়তার মহত্ত্ব আমি তোমাকে বুঝিয়েছিলাম। তখন তুমি দেহবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলে, আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম পরিণতির কথা ভেবে। সেটা ছিল আমার চরম পরীক্ষার সময়। তখন তুমি ছিলেন আমার শিষ্যা আর আমি ছিলাম তোমার পিতা ব্রহ্মার বিচারে পরীক্ষার্থী। তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে যে কি কষ্টকর ছিল, তা তুমি কি করে জানবে। পার্থিব বাসনা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তুমি যেন আমার জন্য, এক পরীক্ষা হয়ে জন্মেছিলে। ভোগবাদী ইন্দ্রের কাছে তুমি কিন্তু কোনও পরীক্ষা বা প্রশ্ন ছিলে না, যা ছিলে তার সহজ উত্তর হল ভোগ্যবস্তু। একদিন না একদিন সে তোমাকে অধিকার করবে বলে ঈঙ্গিত দিয়েছিল। তোমার প্রতি তার আকর্ষণের কথা সে সগর্বে ঘোষণা করেছিল। কেন কে জানে এটা আমাকে উদভ্রান্ত করেছিল। বহুদিন থেকে ইন্দ্রের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা ছিল। ঈর্ষাপরায়ণা বলে নারীর দুর্নাম আছে, কিন্তু পুরুষও কম ঈর্ষাপরায়ণ নয়। পুরুষের বাহ্য রূপের মতো তার ঈর্ষাও দৃঢ় এবং শক্তিশালী। তফাৎ এইটুকু যে, নারী নিঃসঙ্কোচে নিজের ঈর্ষা প্রকাশ করে। ঈর্ষা উদ্রেককারী ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা প্রকট করে। নিজের ঈর্ষাকে বিজ্ঞাপিত করায় নারীর কোনও কুণ্ঠা নেই। কিন্তু পুরুষ যথেষ্ঠ গম্ভীরতার সাথে ঈর্ষাকে গোপন রাখতে পারে। ঈর্ষা উদ্রেককারী ব্যক্তির প্রতি ব্যবহারে নয়, কাজে শত্রুতা করার সুযোগ খোঁজে। ঈর্ষার ক্ষেত্রে নারী নাগিনী হলে পুরুষ সর্পরাজ। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। মানুষের বিকাশের সাথে ঈর্ষাও জন্ম নেয়। বিশেষত সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষের পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষার উদ্রেক হয়, তার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে। ছাত্রাবস্থা থেকে ইন্দ্র এবং আমার মধ্যে ঈর্ষাই ছিল দৃঢ় যোগসূত্র। ইন্দ্রের রূপের প্রতি আমার ভীষণ ঈর্ষা। ইন্দ্রের রূপের কাছে আমার নিজেকে কুৎসিৎ মনে হত ইন্দ্রের ঐশ্বর্যও ঈর্ষারও কারণ ছিল। রূপসী তরুণীরা এমনকি ঋষিপত্নীরাও যেভাবে ইন্দ্রমুগ্ধা ছিলেন, তাতে কোন পুরুষ বা ইন্দ্রের রূপের প্রতি ঈর্ষাতুর না হবে। যে না হবে সে কাপুরুষ নয়ত পুরুষোত্তম। আমি কাপুরুষ নয় পুরুষোত্তমও নয়। তাই আমার ঈর্ষার রূপ ছিল বিকট। সেইজন্য আমি অত্রিকন্যা অপালা বর্ণিত কুষ্ঠরোগ উপশমের কাহিনী বিশ্বাস করিনি। কোনও রূপসী তরুণীকে ভোগ না করে ইন্দ্র যে বরদান করবে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। যদি সে অত্রিকন্যাকে ভোগ না করে তাকে রোগমুক্ত করে থাকে তাহলে তার একটাই কারণ, অত্রিকন্যা কুষ্ট রোগাক্রান্তা ছিল বলেই ইন্দ্র নিজের ভোগলিপ্সাকে দমন করেছে। আমি ইন্দ্রকে জানি—জানি তার প্রবৃত্তি। তাই যখন সে তোমার ওপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করে, তখন আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে। তোমার জন্য এই চাঞ্চল্য আজ নয়, তোমার বালিকা বয়স থেকে।

আমার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও তপোনিষ্ঠার প্রতি ইন্দ্র ঈর্ষাতুর ছিল। আমরা দু'জনেই ঈর্ষার শিকার হয়েছিলাম। দু'জনের মধ্যে ঈর্ষার মূল কারণ ছিল অহংকার। ইন্দ্রের ছিল রূপ, ঐশ্বর্য আর ইন্দ্রপদের অহংকার। আমার জ্ঞান, তপস্যা ও অধ্যক্ষপদের অহংকার। এতবড় খ্যাতিসম্পন্ন গুরুকুল আশ্রমের অধ্যক্ষপদ ইন্দ্রপদ থেকে কোনও অংশে কম ছিল না। তা সত্ত্বেও ইন্দ্রদর্শন মাত্রেই একটা বিচিত্র হীন মনোভাব আমার বিচারবুদ্ধিকে খর্ব করে দিত। আমি জানতাম মর্তের এই অধ্যক্ষপদ স্বর্গের ইন্দ্রপদের চেয়ে মহিমাময় তা সত্ত্বেও আমার অবচেতনে ইন্দ্রপদের লালসা আমাকে অস্থির করত। মর্তলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য নয়, ভোগ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ইন্দ্রকে ক্ষমতাচ্যুত করার দুরন্ত বাসনায় আমি পীড়িত হচ্ছিলাম। ইন্দ্রও মর্তলোকে এলে আমার গুরুকুলের খ্যাতিকে ঈর্ষা করত। তাছাড়া আমার জিতেন্দ্রিয়তা এবং তপস্যা তার ঈর্ষার অন্যতম কারণ। কিন্তু নিজে জিতেন্দ্রিয় হওয়ার সাধনা না করে আমার সাধনাকে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করত সর্বদা। বিচিত্র মানুষের মন। নিজের উত্তরণের পথ খোঁজার পরিবর্তে অপরকে রসাতলগামী করে নিজের উচ্চতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করে। সেই কারণে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা। এই ক্ষুদ্রতা বনস্পতি ও পশুসমাজে নেই। সূর্যালোক আহরণের জন্য বৃক্ষেরা অনুশীলন করে। অপরকে খর্ব করে নিজেকে উচ্চ করার দৃষ্টান্ত বৃক্ষ সমাজে নেই। সেই অনুশীলন মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত কম। তাই অহংকার ও ঈর্ষার মতো দুটি শত্রুর দ্বারা আমরা উভয়ই প্রতিমুহূর্ত রক্তাক্ত হচ্ছিলাম। অবশ্য আমাদের মধ্যে কিছু প্রভেদ ছিল। আজ তুমি বিশ্বাস কর বা না কর একথা সত্য যে ইন্দ্র কামভাবনায় জর্জরিত থাকার সময়ে আমি রামভাবনায় মগ্ন ছিলাম। ইন্দ্র যখন তোমাকে ভোগ করার প্রতিজ্ঞায় অটল আমি তখন তোমাকে ভোগমোক্ষের মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এটা ইন্দ্র ও গৌতমের সংঘর্ষ ছিল না— 'কামভাব' ও 'রামভাবে'র সংঘর্ষ, ভোগ ও ত্যাগের সংঘর্ষ। আমরা দুজনে 'ভোগ' ও কাম এবং 'ত্যাগ' ও 'রামে'র প্রতীক হয়ে দুটি বিপরীতধর্মী ক্রান্তিতে পরিবর্তিত হয়েছিলাম। তুমি ছিলে এই সংঘর্ষের এক মঞ্জুল সমাধান। সমস্ত হলাহল ও হল্য থেকে মুক্ত অহল্যা। একাধারে ছিলে ভোগের প্রতিমা এবং মোক্ষের হোমশিখা। সেইজন্য আমি তোমাকে ইন্দ্রমুগ্ধা হিসাবে সহ্য করতে পারতাম না। আমরা দূরদৃষ্টি আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল—যেদিন অহল্যা আর অহল্যা থাকবে না, যেদিন তাকে কলঙ্কস্পর্শ করবে সেদিন ভোগের জয় হবে, কামভাবের জয় হবে, ইন্দ্রের জয় হবে। স্বামী হিসাবে তোমাকে অসুন্দরতার কবল থেকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য ছিল, সেইজন্য আমি অত্যন্ত অধিকার সচেতন হয়ে উঠেছিলাম।

মনে হত, সূর্য চন্দ্রও যেন তোমার ওপর দৃষ্টিপাত না করেন। বনস্পতি এবং মরুৎ ও তোমাকে স্পর্শ করত না। তোমার পায়ের স্পর্শ যেন ভূমিও উপভোগ না করে। তোমার চুলের গন্ধ নদীর জল আঘ্রান না করত। তোমার দৃষ্টিমধু যজ্ঞবেদীতে হবি হয়ে ঝরে পড়ত না, তোমাকে সিক্ত করে নববর্ষা নিজে রোমাঞ্চিত হত না। নিদাঘ তোমার স্নিগ্ধ স্বেদে আদ্র হত

না। কোকিল যদি তোমার মধুর স্বর আহরণ না করত, তোমার সৌন্দর্যের চন্দ্রিকায় চন্দন স্নিগ্ধ হত না। তোমাকে আলিঙ্গন করে বসন্ত পুষ্পবতী হত না। তোমার প্রশ্বাসে হোমশিখা তরঙ্গায়িত হত না। তপোবনের পশুপাখিও তোমার শুশ্রূষার স্পর্শ পেত না। আমি ব্যতীত অন্য কেউ তোমার প্রেমে দগ্ধ হত না। এমনকি তোমার ক্রোধ ও অভিশাপে আমি ব্যতীত আর কেউ ভস্মীভূত হত না। তোমার অবিনশ্বর আত্মা যদি তোমার নশ্বর দেহ ত্যাগ করত, তাহলে সেই আত্মার সাথে বিলীন হওয়ার জন্য আমিও আমার নশ্বর দেহ ত্যাগ করতাম। তোমার পার্থিব শরীরকে অগ্নি আত্মসাৎ করার পূর্বে আমি আত্মসাৎ করতাম। অহল্যা তুমিই ছিলে আমার তপস্যা এবং বিঘ্ন। তোমাকে পাওয়ার জন্য তপস্যা এবং হারাবার আতঙ্কে বিঘ্ন। তোমার হতভাগ্য স্বামী গৌতমের অন্তর্দাহ তুমি বিন্দুমাত্র অনুভব করলে না।

আমার বিচিত্র মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। প্রেম যেখানে যত প্রগাঢ় সেখানে তত শঙ্কা ও সন্দেহ। তাকেই তুমি শাস্ত্রীয় স্বামীত্বের অহংকার আখ্যা দিয়েছিলে। রূপলোভী দানবদের কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করাই ছিল আমার সাধনা। সম্ভবত সে বিষয়ে একাগ্রতা ছিল না। একই সাথে আমি স্বর্গলিপ্সুও ছিলাম। ইন্দ্রদেবের প্রতি ঈর্ষায় হোক কিংবা উচ্চাকাঙ্খা হেতু আমি স্বর্গলাভের আশায় ইন্দ্রদেবকেও আহ্বান জানতাম আমার আশ্রমে। এর পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। তোমাকে আমার বাঁ পাশে বসিয়ে ইন্দ্রকে বলতে চাইতাম— "আমি অহল্যার স্বামী, অহল্যা আমার... তুমি অহল্যার অযোগ্য, তাই তুমি আমার চেয়ে হীন।" তখন কি আমি জানতাম আমার এই আত্মপরায়ণতা অবশেষে ইন্দ্রের অহল্যা-বিজয়ের পথ প্রস্তুত করছে বলে। আমার স্বর্গলিপ্সা সম্ভবত মহাকাঙ্খা ছিল— মহতাকাঙ্খা ছিল না। মহতাকাঙ্খা হলে আমার এই দুর্দশা এবং পরাজয় হত না। ব্রহ্মার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি তোমাকে লাভ করেছিলাম। তুমিই ছিলে আমার জিতেন্দ্রিয়তার পুরস্কার। তোমাকে লাভ করে আমি প্রথমে ভাবস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ ইন্দ্রের রূপের সাথে তোমার সৌন্দর্যের তুলনা করে আমিও ভেবেছিলাম বাহ্যরূপের দৃষ্টিতে তুমি ইন্দ্রযোগ্যা। স্বর্গগঙ্গা হয়ে তুমি মর্তে প্রবাহিত হবে কি করে? সমাবর্তনের পর তোমাকে বিদায় জানাবার সময় অশেষ কষ্ট পেয়েছি আমি। কিন্তু আশাবাদী হয়ে ভেবেছিলাম, অন্তরের সৌন্দর্যে ইন্দ্র আমার চেয়ে বলীয়ান নয়। পিতামহ একথা জানেন। তুমি নিশ্চয় আমার হবে। আমার ভাবনা যখন সত্য হল তখন আনন্দিত হওয়ার সাথে আমি শঙ্কিত চিন্তিতও হলাম। আমার বয়স ও রূপকে কি তুমি সাদরে গ্রহণ করতে পারবে? তোমার মতো রূপসীকে সুখ সম্ভোগে আমি কি স্বামীমগ্না করাতে পারব? বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের রূপ ও বয়স গৌণ বলে বৈদিক ইতিহাসে উল্লেখ আছে। পুরুষের যশ-কীর্তি, জ্ঞান ও সামাজিক সম্মানই মুখ্য। পুরুষের সামাজিক স্থিতি ও সম্মান তার ধন ঐশ্বর্যের বহু ঊর্ধ্বে। আমি মনকে বোঝাই— বৈদিক বিবাহ যে কোনও স্ত্রীকে স্বামীমগ্না করাতে যথেষ্ট। বিবাহের সফলতার জন্য স্বামীর তরফে কোনও প্রচেষ্টা যে অনাবশ্যক তখন সেকথা আমার পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না। সম্ভবত

সেই জন্য আমাদের বিবাহের সফলতার জন্য আমার পক্ষে কোনও প্রচেষ্টা ছিলনা। আমি জ্ঞানগর্ভ ছিলাম, কিন্তু স্বামী হিসাবে দাম্পত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল পুঁথিগত। আমি জিতেন্দ্রিয়, তাই তোমার আদর্শ স্বামী হতে পারব বলে দৃঢ় ধারণা ছিল। তখন আমি ভেবেছিলাম, আদর্শ পতির অর্থ আদর্শ ব্যক্তি। কিন্তু আদর্শ পতি হওয়ার জন্য আদর্শ ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত আরও অনেক গুণের অধিকারী হতে হবে সেটা আমরা জানা ছিল না। তুমি আমার জন্য সহজলব্ধ ছিল না। তোমাকে লাভ করার জন্য গুরু ব্রহ্মার দ্বারা বারম্বার আমাকে বহু পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়েছে তারপর আমি তোমাকে পেয়েছি। আমার বয়স ও রূপের সাথে তোমার সামঞ্জস্য না হওয়ায় যখন মন সন্দিগ্ধ ও শঙ্কাগ্রস্ত হত, তখন বহু প্রবীণ ঋষির নবীনা পত্নী লাভের কথা মনে পড়ত, এবং নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। তোমার সৌন্দর্যের প্রখরতায় ম্লান হয়ে যাওয়া মাত্র রূপবান ইন্দ্রদেব আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হতেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমার চেতনায় চিত্রিত হতেন অত্রিপত্নী দেবী অনুসূয়া। অবচেতনে আমি কি কামনা করতাম যে ইন্দ্রদেব তোমার প্রণয়প্রার্থী হোক আর তুমি তাকে অজ্ঞান শিশুতে পরিণত কর! তার ফলে ইন্দ্রপদ শূন্য হবে এবং আমার তপস্যার বলে আমি সেই পদ প্রাপ্ত হব। তা না হলে ইন্দ্রের মনোভাব জানা সত্ত্বেও বারবার তাকে আশ্রমে আহ্বান করতাম কেন? সোমসংগ্রহ এবং অতিথি সৎকারের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত করতাম কেন?

প্রখর রৌদ্রে পৃথিবী যখন ধ্বংসমুখী, চতুর্দিকে অনাবৃষ্টির হাহাকার তখন আমি তোমাকে নিয়ে বসন্ত রচনা করছিলাম ইন্দ্রের অসীম দানের ওপর ভরসা করে। আমি কি জানতাম না যে তিনটি সন্তানের জননী হলেও সেটা ছিল তোমার প্রতিধ্বনির বয়স। যে কোনও ধ্বনির প্রত্যুত্তর দেওয়ার আকাঙ্খিত বেলা—যে কোনও স্পর্শের প্রতিস্পর্শ দেওয়ার উদগ্র সময় তোমার। সব কিছু জেনেও আমি ভেবেছিলাম, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আর্যনারীর দেহ মন চেতনা সব কিছুই শুধুমাত্র একটি ধ্বনির প্রতিধ্বনি দেয়, একটি স্পর্শের প্রতিস্পর্শ দেয়—সেটি হল স্বামীর ধ্বনি, স্বামীর স্পর্শ। আমি একথাও জানতাম, প্রেম হল ভাবের সম্রাট। এখানে দেহভোগ গৌণ। যখন অন্তরের প্রতিটি স্পন্দনে প্রেম বিরাজ করে তখনই একজন প্রেমের উপলব্ধি পায়। তাই প্রেমরাজ্যে আমি কোনও দিন দেহকে স্থান দিইনি। হয়তো সেটাই আমার ভুল। দেহই আত্মা এবং অন্তরের আধার। দেহকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলাম কি করে? কিন্তু ইন্দ্রের দেহসর্বস্ব ব্যক্তিত্বকে আমি ঘৃণা করতাম। তোমার দেহ সৌন্দর্যের অহংকার আমাকে ক্ষুব্ধ করত। তাই অন্য সকলের মতো তোমার রূপের প্রশংসা আমার জিভ উচ্চারণ করবে না বলে আমি প্রথম থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তার অর্থ এই নয় যে আমার চোখ সৌন্দর্যগ্রাহী ছিল না। কিন্তু তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ আমার চেতনা সৌন্দর্যের স্রষ্টাকেই বারবার প্রণাম জানাত।

পার্থিব অপার্থিব যে কোনও সৌন্দর্যের প্রশস্তিকে আমি বিশ্বস্রষ্টার স্তুতি মনে করে প্রতিদিন প্রণব ওঁকারে তাই প্রকাশ করতাম। তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমাকে প্রশংসা করব

কেন? তুমি'ত তোমার সৌন্দর্যের সৃষ্টিকারিণী নও। যা মানুষের সৃষ্টি নয়, তার জন্য মানুষের অভিমান কেন? দেহ সৌন্দর্যের জন্য দেহধারী মানুষকে যদি প্রশংসা করা হয় তাহলে তার অন্তঃসৌন্দর্য বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়।

আমার ভয় হত, সমগ্র জগত যেভাবে তোমার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তা একদিন না একদিন তোমার সহজাত অন্তঃসৌন্দর্যকে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত করবে। ইন্দ্রের অবস্থা একরকম তাই। দেহ সৌন্দর্য কামভাব উদ্রেক করে, কিন্তু অন্তঃসৌন্দর্য রামভাবের ফল্গু প্রবাহিত করে অন্তরে বাহিরে সর্বত্র।

তোমাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তোমার রূপের অভিমান তোমার দ্বারা সৃষ্ট নয়। তোমার পিতা, আমার গুরু বেদগর্ভ ব্রহ্মা, যিনি তোমার সৌন্দর্যের স্রষ্টা, তাঁরই দ্বারা তোমার রূপাভিমানের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই তুমি ছিলে দর্শনীয় বস্তু। দেবতাগণ ব্রহ্মার দর্শনে এলে তোমাকে দর্শন করাটাও ছিল অন্যতম অভিলাষ। সেজন্য গুরু ব্রহ্মা গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর মধ্যে তোমার স্রষ্ঠা হিসাবে অভিমান ছিল। শেষে সৌন্দর্য তত্ত্বের ওপর এক তাত্ত্বিক আলোচনা করার ছলে তোমাকে ইন্দ্রলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার সৌন্দর্যের চর্চার জন্য এই পৃথিবী হয়তো উপযুক্ত স্থান নয়। এর ফলে তোমার অজ্ঞাতেই তোমার মনে রূপের অহংকার জন্মেছে এবং ইন্দ্র তথা ইন্দ্রলোকের জন্য অবচেতনে শঙ্খধ্বনি হয়ে থাকবে। এতে অবশ্য তোমার কি দোষ? সেদিন স্বর্গলোকে তোমার মূর্চ্ছিত রূপশোভা আমাকে আতঙ্কিত করেছিল। সেটা যেন তোমার স্খলন ও পতনের অশুভ সংকেত ছিল।

ওগো প্রিয়া! ভূমিতে দৃঢ়ভাবে পা রেখে চললে মানুষের পতন হয় না, ভূমি থেকে পা তুলে নিয়ে স্বর্গে রাখলে যে পতন হয়, তার থেকে আর রক্ষা নেই। আমার আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। তোমার স্বর্গাকাঙ্খাই তোমার অজ্ঞাতে ইন্দ্রাকাঙ্খায় পরিণত হয়ে অবশেষে ইন্দ্রিয়াকাঙ্খায় পরিণত হল। সচরাচর তাই হয়। কামুকেরা প্রথমে নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে। নারীর মন বিচিত্র। নিজের সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র প্রশংসা শুনলেও সে উল্লাসিত, রোমাঞ্চিতা হয়ে যায়। এমন কি দানবের মুখেও রূপের প্রশংসা শুনলে নারী বিগলিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র যুবতী নয় বয়স্ক নারীগণও এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়।

পুরুষ নারীর এই দুর্বলতাটা জানে। তাই কামুক পুরুষ নারীকে বশ করে সৌন্দর্যসুধাকে দেহসুরায় পরিণত করে আকণ্ঠ পান করার পর পরিত্যক্ত সুরাপাত্রের মতো পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে যায়। হায়! ভোগবাদী ইন্দ্রদেব তোমার সাথে সেইরকম ব্যবহার করল না কি? কোথায় গেল তার প্রেম? তোমাকে অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য সে যদি আমাকে হত্যা করত তাহলে বরং আমি শান্তি পেতাম এবং বুঝতাম আমাকে হত্যা করার শক্তি এবং বীরত্ব ইন্দ্রের আছে। কিন্তু ঋষি হত্যার ভয়ে সে বিরত হয়। আমার উপস্থিতিমাত্রেই তার লম্পটের মতো পলায়নই তার কামুকতার প্রমাণ।

ইন্দ্রের কাছে এখন তুমি উচ্ছিষ্ট, নিঃশেষিত পরিত্যক্ত পান পাত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। তোমাকে ইন্দ্রবিমুখ করার জন্য আমি পরনিন্দা করছি না। ইন্দ্রের প্রেমকে পরীক্ষা করার সুযোগ ও স্বাধীনতা আজ তোমার আছে। আমার কথা কুৎসা মনে হলে তুমি ইন্দ্রের প্রেমকে পরীক্ষা করতে পার। আমার স্বামীত্বের ওপর ইন্দ্র যে বজ্রপ্রহার করেছে তার যন্ত্রণায় আমি মৃতপ্রায় সেকথা তোমাকে বোঝাবার শক্তি আমার নেই। শত্রুর কাছে জ্ঞান, বিদ্যা, ধন, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দৃষ্টিতে পরাজিত হলে স্বাভিমানী পুরুষ নিশ্চয় পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করে। কিন্তু নিজের পত্নী যদি শত্রুভোগ্যা হয় এবং শত্রুদ্বারা পরিত্যক্ত ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়, তার ফলে স্বামীর যে লাঞ্ছনা হয়, তা মৃত্যুর চেয়ে শতগুণ ভয়ঙ্কর। তোমার এই স্খলনে আমি অধম পুরুষ হিসাবে গণ্য হয়েছি। নিজের স্ত্রী যখন পরপুরুষগামী হয়, তখন স্বামীর পুরুষত্বর ওপর সন্দেহর ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে কালিমা আর দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইন্দ্র তোমাকে বলাৎকার করেনি, তুমি স্বয়ং ইন্দ্রের কামনাযজ্ঞে বলি হয়েছ বলে তুমি নিজের মুখে সর্বসমক্ষে একথা স্বীকার করার পর ত্রিভুবন আমার স্বামীত্বকে ধিক্কার দিয়েছে।

আমার শত্রুরা অট্টহাসি হাসছে। আমার বন্ধু ও শুভেচ্ছুগণ লজ্জা গ্লানিতে ম্রিয়মান। আমাকে বন্ধু হিসাবে স্বীকার করতে তারা লজ্জাবোধ করে। পর পুরুষ ভোগ্যা স্বামীর স্ত্রীকে কে-বা সমাদর করবে? তাই তোমার চেয়ে আজ আমার লজ্জা বেশি। গুরু ব্রহ্মার আস্থা এবং বিশ্বাস আমি হারিয়েছি। আমি তাঁর অপরূপা কন্যার উপযুক্ত স্বামী হতে পারলাম না। আমার এক ছেলে মাতৃভূমি ত্যাগ করে ইন্দ্রের শরণাপন্ন, আর এক ছেলে নিরুদ্দিষ্ট, স্ত্রী পরপুরুষভোগ্যা, আশ্রম রসাতলে, ছাত্ররা লক্ষহীন, তপস্বীরা যোগভ্রষ্ট, তপোবন অরক্ষিত, আমি নিজে বিপর্যস্ত আর তুমি শাপগ্রস্তা, কলঙ্কিনী হয়েছ আমার অকর্মণ্যতার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আমি তোমার মতো বিশ্বমোহিনীর স্বামী হওয়ার যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন নিজেকে কখনও করিনি। আমার মতো অনেক হতভাগ্য স্বামী আছেন—সুন্দরী স্ত্রী লাভের আশায় নিজের যোগ্যতা বিচার করেন না। তারা ভাবেন, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে সব স্ত্রী পতিব্রতা হতে বাধ্য। কিন্তু সারাজীবন সন্দেহে দগ্ধ হবে, নিজের ক্ষমতা প্রতিপাদনের জন্য স্ত্রীকে কঠোর অনুশাসনে বন্দী করবে। অথচ নিজের দাম্পত্য জীবনে অন্য পুরুষের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারবে না। স্ত্রীর অবিশ্বস্ততাকে মুখ বুজে সহ্য করতে থাকে নিজের মধ্যে আগুন জ্বলে, বাইরে তার তাপ পৌঁছায় না, পাছে অক্ষম স্বামীত্ব লোক জানাজানি হয়, এই ধরনের পুরুষ উপহাসের পাত্র নয়, ক্ষমার পাত্র নয়, শুধুমাত্র দয়ার পাত্র। আমিও তাদের মধ্যে একজন। শুধু দয়া নয়, আমি ঘৃণার পাত্র।

অহল্যা, তোমার মধ্যে আর একটা দোষ ছিল আর্য অনার্য সমস্যা। তোমার বদ্ধমূল ধারণা—আর্যরা উৎপীড়ক—অনার্যরা উৎপীড়িত। সব দোষ আর্যদের—অনার্যরা নির্দোষ। এটা ছিল তোমার এক তরফা বিচার। বাল্যকাল থেকে অনার্য সখি সহচরীদের কাছে তুমি শুধু তাদের কথাই শুনেছ। তাই তাদের প্রতি তুমি সহানুভুতি-শীল। কিন্তু সম্বেদনার অর্থ এই নয়

যে তাদের দোষ দুর্বলতার প্রতি চোখ না দেওয়া। একসময় অনার্যরা আর্যদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল, একথা সত্যি কিন্তু পরবর্তীকালে তাদেরই কল্যাণের জন্য ভোগবাদী জীবনকে পরমার্থের দিকে পরিবর্তিত করার প্রয়াস করেছিলেন আর্যগণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ কি স্বার্থপর? কিন্তু আর্যদের সমস্ত সৎকর্মকেই অনার্য বিরোধী বলে মনে করাটাই ছিল তাদের অজ্ঞানতা। তাদের অজ্ঞান-অন্ধকার মুক্ত করে বেদের আলোকে উদ্ভাসিত করাই ছিল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। অথচ তারা বিনা কারণে হিংসার আশ্রয় নিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করত যে অনার্য দমন ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তুমি নিরপেক্ষ ছিলে না। অনার্যদের সমস্ত হিংস্রতাকে 'ক্রান্তি' আখ্যা দিয়ে তুমি আর্যদের দোষী বলতে। এটাও ছিল তোমার অজ্ঞানতা। এই কারণে তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। ভাই ভাই'র মধ্যে পূর্বপুরুষের শত্রুতা কি পরবর্তী কালে দূর হয় না? যে একবার শত্রু হয় সে কি মিত্র হতে পারে না? একথা মুনি ঋষিরা কতবার বলেছেন কিন্তু অনার্যরা সে কথা বোঝেনি। শত্রুর বন্ধু হওয়ায় তারা বিশ্বাস করে না। শত্রু মহাশত্রু হওয়াতেই তারা বিশ্বাসী। প্রকারান্তরে তাদের অজ্ঞানতা ও অবিচারকে তুমি উৎসাহ দিচ্ছিলে। সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কি ভাবে সহযোগিতা করতাম? সেটাকে আমার অনার্যবিরোধী মনোভাব মনে করে অন্তরে বাহিরে তুমি গৌতম বিরোধী হয়ে উঠেছিল। আজ একান্তে ভাবলে সেটা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে।

আজ আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারি না। আমার কাছে ছাত্ররা কেন আসবে? যে নিজের স্ত্রী পুত্রদের সঠিক পথ দেখাতে পারে না সে ছাত্রদের কি শিক্ষা দেবে? ভাগ্য ভালো, শরৎভানু এখন ইন্দ্রলোকে। তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমাদের নিরীহ, সর্বসহিষ্ণু পুত্র চিরকারী নিরুদ্দিষ্ট। তার সাথে এ জীবনে সাক্ষাৎ হবে না। শতানন্দ জনকঋষির আশ্রমে। আমি তার কাছে যেতে পারছি না। তার শাণিত দৃষ্টি যদি আমাকে প্রশ্ন করে—"আমার স্নেহময়ী জননীর এই কুৎসিৎ পরিণতি কেন হল? কে দায়ি? সব কি মায়ের দোষ?" কি উত্তর দিতাম বেদজ্ঞ, বুদ্ধিমান পুত্রকে? তাই হিমবন্ত পর্বতের এই নির্জন স্থানে এসেছি। ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে তোমার চিন্তায়—দুঃখে, গ্লানিতে।

ঈশ্বর আমাকে কি না দিয়েছিলেন। সামান্য অসাবধনতায় সব হাতছাড়া হয়ে গেল। আমার যশ, খ্যাতি সব আজ ধূলিসাৎ, সারা জীবনের তপস্যা পণ্ড। ইন্দ্রের মতো যে পুরুষ ভ্রষ্ট তার কিসের লজ্জা? কিন্তু যে তারই দ্বারা ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামী লজ্জা তারই।

ইন্দ্র পুনরায় ত্রিলোক পালক। সে যে বহু বরনারীর কাম্য পুরুষ সেটাই আজ ঘোষিত হয়েছে। সে মনে করে তার পুরুষত্ব গৌরবান্বিত হয়েছে। পুরুষের কামুকতাকে জগত পৌরুষ আখ্যা দেয়। জিতেন্দ্রিয়তাকে পুরুষত্বের অভাব বলা হয়। সেইরকম জগতে আমার মতো পুরুষ নরাধম হিসাবে গণ্য হতে বাধ্য।

একদিন তোমাকে লাভ করে আমার পৌরুষ গৌরবান্বিত হয়েছিল। সম্ভবত সেই অভাবিত প্রাপ্তি আমাকে অহংকারী করেছিল। সেই অহঙ্কার কি তোমার আমার মধ্যে প্রাচীর

হয়ে দাঁড়াল? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেনি? আমি কি পাথর? আমি কি সম্পূর্ণ কামনা-বাসনা রহিত? যখন তুমি আমার শিষ্যা ছিলে, গুরু হিসাবে কামনারহিত হয়ে তোমাকে শিক্ষাদান করা ছিল আমার ধর্ম। এই ধর্ম রক্ষা করা যে কত দুরূহ ছিল. সে আমি ব্যতীত কেউ জানে না। তোমার কোরকিত কৈশোর উন্মোচিত হতে দেখে আমার চেতনা কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠত। মনে হত গুরু শিষ্যের সম্পর্কের শিকল ছিন্ন করব—বিনষ্ট করব আচার্য ধর্ম। ত্রিভুবনের সমস্ত পাপ মাথা পেতে নেব বিনিময়ে তোমাকে একটু স্পর্শ করব। পরমুহূর্তেই বিবেকের চাবুকে রক্তাক্ত হত আমার চেতনা। সেইসময় তোমার ছোট ছোট ভুলগুলির প্রতি কঠোর কটাক্ষ করে আমি সেই দুরূহ মুহূর্তকে অতিক্রম করতাম। তারপর হঠযোগের মাধ্যমে নিজেকে শাস্তি দিতাম। কখনও ভাবতাম নিজেকে আগুনে দগ্ধ করব আবার নিজেকে বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করতাম বা বিষধর সর্প দিয়ে নিজেকে দংশন করাবার কথা ভাবতাম। আমি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন। তারপর কঠোব তপস্যায় বসে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতাম। ইন্দ্রদেব এবং অন্য সবাই ভাবত, ইন্দ্রপদ লাভের জন্য আমার এই কঠোর তপস্যা। বোধহয় তুমিও তাই ভেবেছিলে।

কিন্তু আমার সৌভাগ্য, মন ও বিবেকের সংঘর্ষে সর্বদা বিবেকই জয়ী হত। আমার কাছে থেকে তুমি যৌবনের পাঁপড়ি মেললে—তোমার অনুপম সৌন্দর্যের বিকাশপর্বের সাক্ষী হয়ে আমি শুধু নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করতাম, আর রক্তাক্ত পরীক্ষা দিতাম। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আমি প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। অহল্যা, পরীক্ষাই আমাকে পাথর করেছিল, আমি যদি পাথর না হতাম, তাহলে কি তোমাকে পেতাম? শেষপর্যন্ত ইন্দ্রদেবই তোমাকে প্রাপ্ত হবেন বলে আমাব মনে শঙ্কা জাগত, কারণ তুমি তো চন্দ্রমা, আমি মর্তবাসী।

কিন্তু যেদিন মধুপর্কের নিয়মে তুমি আমার হয়ে গেলে, মনে হল আমার সিদ্ধিলাভ হল। যেন তুমি-ই ছিলে দেব-দানবের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তারপরে আর প্রাপ্তির অবশেষ বা অপ্রাপ্তির আফশোষ থাকবে না বলে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে পাওয়ার পর মুহূর্ত থেকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় আমি দগ্ধ হতে থাকলাম। প্রাপ্তির অর্থ হাতের মুঠোয় থাকা জিনিষ নয় বা কাম্যবস্তু লাভ-ই শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি নয় বলে আমি উপলব্ধি করলাম। অহল্যা, প্রকৃতপক্ষে কি আমি তোমাকে পেয়েছিলাম? দোষ তোমার হোক বা আমার, তোমার শরীর আমার কাছে থাকার সময়ে তোমার মন ও অভীপ্সা যে আমাকে ছেড়ে ইন্দ্রলোকে বিচরণ করত, একথা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে। আমার হাতে তর্পণের জল ঢেলে দেওয়ার সময় সেখানে যে তুমি ইন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখছিলে, সেটা আমার অজানা নয়।

আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আর এক বাধা ছিল আমাদের পূর্ব সম্পর্ক। তোমার গুরু ব্যতীত নিজেকে তোমার স্বামী হিসাবে আমি সাব্যস্ত করতে পারলাম না। আমার জ্ঞান এবং পূর্বের জিতেন্দ্রিয়তার সাধনা তোমার প্রগলভ প্রেমিক হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ। ইন্দ্রদেব এবং অন্যান্য পুরুষদের মতো আমিও তোমার রূপের প্রশংসা করতে পারতাম। তাহলে

আমার আর ইন্দ্রের মধ্যে কি তফাৎ থাকত বলো? তাছাড়া আমার মনে হয় পরপুরুষই পরস্ত্রীর রূপের প্রশংসা করে। স্বামী যে দেহ এবং সৌন্দর্যের একমাত্র অধিকারী, সে তার প্রশংসা করবে কেন? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী কি স্ত্রীর দেহের অধিকারী?

প্রকৃতপক্ষে মিলনের মুহূর্তে কি দেহ সমর্পিত হয়? এসব আমি এখন উপলব্ধি করছি, কিন্তু তখন ভেবেছিলাম, আমি ইন্দ্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি অহল্যার অধিকারী। আমাদের দাম্পত্যের আর এক বিঘ্ন ছিল আমাদের বয়সের পার্থক্য। তুমি আমার কাছে যে রকম প্রেমিকসুলভ আচরণ আশা করেছিলে—বয়াসধিক্যের জন্য সেটা আমরা পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু আমার প্রগল্ভতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করত আমার সৌন্দর্যহীনতা। আমি তোমার সৌন্দর্যের স্তুতিগান করলে তুমি হয়তো মনে করতে আমার হীনমন্যতা আমাকে প্রশস্তিমুখর করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রূপবান ইন্দ্রের মুখে প্রশংসা শুনে তুমি যত উৎফুল্ল হতে আমার প্রশংসায় তুমি তত খুশী হতে না। সব কিছু মিলে মিশে আমাকে কঠোর গম্ভীর এবং সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল, যা তোমাকে আমার থেকে বহুদূরে নিয়ে গেল। তখন আমার ধারণা— প্রেমের অর্থ হল দুর্বলতা এবং সুখের অর্থ স্বার্থপরতা। আমি কি জানতাম, আমার শিষ্যা, ব্রহ্মাপুত্রী অহল্যা আমার জ্ঞান ও জিতেন্দ্রিয়তাকে পদাঘাত করে চলে যাবে?

এখন মনে হচ্ছে, আমি কি জেনে শুনে এই বিপর্যয় ডেকে এনেছি? বাল্যকাল থেকেই আমি পার্থিব সুখের অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। তাই কোনও কিছুর প্রতি আমি অধিক আসক্ত হতাম না। যাহা অনিত্য তার প্রতি আসক্ত হলে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার প্রতি আমি এত আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটছিল। তাই তোমার থেকে মুক্তি ব্যতীত আমার অন্য গতি ছিল না। কিন্তু সেই মুক্তি যে পতনের দরজা দিয়ে আসবে তা আমি কল্পনাও করিনি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পতন ও পুনরুত্থানের স্বপ্ন ও অভীপ্সা আছে। পতন নিজে আসে না। প্রতিটি পতন পূর্বকল্পিত। এই মহাপতন কি আমাদের দু'জনের পূর্বকল্পিত অভীপ্সার ফল। তখন আমার এক পা স্বর্গে, এক পা নরকে। মর্তের বাস্তবতার জন্য আর পা কোথায়? উপলব্ধিই আজ আমাকে বাস্তবের প্রতি সচেতন করেছে। তোমার পতন আমার কাছে অভাবিত। তোমার স্খলন আমাকে আত্মসমীক্ষার অবসর দিয়েছে।

ইন্দ্রদেব এবং আমি কেউই দোষমুক্ত ছিলাম না। সহপাঠী হলেও আমাদের মধ্যে সম্ভাবনার স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তোমাকে নিয়ে আমাদের বিয়ের পূর্বেই। দুটি হিংস্র পাখি অহঃরহ আমাদের হৃদয়ে দংশন করত। ইন্দ্রদেবের হৃদয়ে কাম এবং আমার হৃদয়ে কামবিরোধী ক্রোধ। কামজর্জরিত ইন্দ্রদেবের কোনও লজ্জা বা সংকোচ ছিল না আমার হৃদয়ের ক্রোধ আমাকে শুষ্ক নীরস এবং হৃদয়হীন করে তুলেছিল। সমস্ত ক্রোধী ব্যক্তির মতো আমি তোমার প্রতি, পুত্রদের প্রতি এমনকি আত্মীয় স্বজনের প্রতিও নির্দয় ছিলাম। শুধু কামই পাপ, আর ক্রোধ পাপ নয়, এই ভ্রান্ত ধারণায় জ্ঞানী হয়েও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমি এই দুর্দশা ভোগ করছি।

আমাকে দুঃখ দেওয়াটা ইন্দ্রদেবের বিলাস। প্রয়োজন থাক বা না থাক আমার অনিষ্ট ও অপমানে তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন জেনেও বারম্বার তাঁকে আশ্রমে আহ্বান করতাম আমার 'সৌভাগ্য' দেখিয়ে তাঁকে অধিক ঈর্ষান্বিত করার জন্য। ঈর্ষাপরায়ণকে ঈর্ষার হবি অর্পণ করে আমি নিজের ভাগ্যে নিজেই দুঃখ লিখেছিলাম। কিন্তু পাপীর পাপচিন্তাকে যদি ধৈর্যসহকারে সহ্য করে সম্ভাবনায় পরিণত করতাম, তাহলে বোধহয় এই পরিণতি হত না।

অহল্যা! প্রাপ্তির অহংকার এবং প্রাপ্তি থেকে অপ্রাপ্তির আশঙ্কাজনিত ক্রোধে আমি দূষিত ছিলাম। ইন্দ্র চেয়েছিলেন—আমার অহংকার খর্ব করতে। কিন্তু তার ফলে আমার মমত্ব অধিক তীব্র হয়েছিল। আজ বুঝতে পারছি, যদি আমার 'অহম'কে দমন না করে আমার আত্মাকে সবাইর মধ্যে অনুভব করতাম তাহলে আমার এই শোক আনন্দে পরিণত হত। ইন্দ্রকে ইন্দ্রিয় মনে না করে আত্মস্বরূপ মনে করতে পারলে সে আমার মিত্র হতে পারত। যদি সমুদ্রের উপকূলও সমুদ্রে পরিণত হয়, তাহলে উপকূলের অবকাশ কোথায় তরঙ্গের আঘাত সহ্য করবার। আমার হৃদয় আকাশ প্রসারিত হয়ে ইন্দ্রাকাশ তথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এ পরিণত হয়ে থাকলে আজ ইন্দ্রের জন্য আকাশ কোথায় থাকত? তুমি যখন বিশ্বে ব্যপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমার দুঃখ আর ব্যক্তিগত থাকবে না। একথা জেনেও তোমাকে প্রাপ্ত হওয়ার 'অহং'কে ব্যক্তিসর্বস্ব করে ফেললাম কেন? আমার তখন যে জ্ঞান ছিল তা সম্ভবত ঋতজ্ঞান ছিল না। আমি আত্মবিস্মৃতির পাপেও অভিযুক্ত। তোমাকে লাভ করে আমি অনৃত ও অজ্ঞান দোষে দোষী হলাম। সেই অজ্ঞানতা এনে দিল আত্মবিস্মৃতি। তোমাকে হারিয়ে আমি আত্মজ্ঞান ফিরে পেয়েছি এবং ঋতকে উপলব্ধি করেছি। হয়তো এটাই আমাকে সৎকর্মের পথ দেখাবে। অহল্যা, আজ আমি অশ্রদ্ধার জয়গান করছি। অশ্রদ্ধা যদি অনৃতের প্রতি প্রযোজ্য তাহলে সেটাও ধর্মের একটি অংশ। আমার অশ্রদ্ধা অনৃতের প্রতি উদ্দীষ্ট না হয়ে ইন্দ্রের প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল বলেই আজ আমার এই পতন ও সন্তাপ। তুমি নিশ্চয় ভাবছ নিজেকে দোষমুক্ত করার জন্য আমি আবার সেই নীরস দর্শন তোমার কাছে উপস্থাপন করছি। এখন সবাই বলছে সোমসংগ্রহ এবং অতিথেয়তার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করে আমি ভুল করেছি। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সোমপানীয় প্রস্তুতিতে তোমার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ইন্দ্রদেবের জন্য সোমপানীয় প্রস্তুত করতে তুমি রাজি ছিলে না—সেটা ছিল আমার সন্দিগ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

তোমার কথা অনুযায়ী মধুক্ষরা ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করতে পারত, কিন্তু ইন্দ্রদেব আমার প্রতি বিমুখ হতেন এবং বৃষ্টিদানে কুণ্ঠিত হতেন। প্রজারা জলকষ্ট থেকে অব্যাহতি পেত না, পৃথিবী ভস্মস্তূপে পরিণত হত। মুনি ঋষিগণ আশ্রম ছেড়ে চলে যেতেন। মাধুর্য আমার আশ্রমের অধ্যক্ষপদ লাভ করত। আর্য অনার্যের অনাস্থাভাব আমাকে পৃথিবীর কাছে ছোট করে দিত। তাই নিজের স্বার্থ তথা জগতের স্বার্থের জন্য তোমার ওপর ইন্দ্রতুষ্টির দায়িত্ব অর্পণ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তা বলে তুমি...। যাইহোক সে বিষয়ে আলোচনা করে আর কি লাভ?

তুমি বলতে পার—সেদিন ভোর হওয়ার আগেই আমার স্নান করতে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তাছাড়া তোমাকে তালাবন্ধ করে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমি জানতাম—সোমযজ্ঞের সময় তোমার দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ইন্দ্র তার কুৎসিৎ বাসনাকে কিঞ্চিত তৃপ্তি করছিলেন। ইন্দ্রদেবের দৃষ্টি ও উপস্থিতি আমার পক্ষে অসহ্য ছিল। তাই যথাশীঘ্র প্রাতঃ হোম সমাপন করে অতিথিকে বিদায় জাননোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি যখন স্নানে যাই তখন তুমি গভীব নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের চোখে ঘুম ছিল না। আমি দেখলাম তিনি তোমার প্রস্তুত করা সোমরস পান করছেন। অত্যধিক সোমপান করে ইন্দ্রদেব উন্মত্ত এবং অমিত শক্তিশালী হওয়ার দৃশ্য আমি দেখেছি। তখন আমার মনে ঈর্ষা ও সন্দেহের বিষ। ভয় হল, আমার অনুপস্থিতিতে কুটিরে প্রবেশ করে ইন্দ্র যদি তোমাকে বলাৎকার করে। অবশ্য সেই সামান্য তালাটি ভেঙ্গে দেওয়া ইন্দ্রের পক্ষে নিতান্তই সামান্য কাজ। ইন্দ্র এমনকি তুমি চাইলেও সেই শিকল উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাহলে নির্বোধের মতো আমি তালা দিলাম কেন? তোমার বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করার জন্য আমার মন একটা সুযোগ খুঁজছিল। সেইজন্য ভোর হওয়ার আগেই আমি চলে গেলাম এবং স্নান না করে ফিরে এলাম। এইসব আমার ইচ্ছাকৃত ছিল বলে হয়তো তুমিও বুঝতে পেরেছ। তোমার ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা এবং ইন্দ্রের কামুকতা উভয়ই আমার কাছে ছিল সুস্পষ্ট। আমি বোধহয় চেয়েছিলাম—তুমি পাপ করো। পাপের গহ্বরে না পড়লে তোমার উত্থান সম্ভব নয় বলে আমার অন্তর্দৃষ্টি বুঝেছিল। মন যখন পাপাশ্রয়ী, তখন 'পাপ' ব্যতীত আর কেউ তার মধ্যে পুণ্যের অন্বেষা জাগাতে পারবে না। তোমাকে তালাবন্ধ করে আমি জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে ইন্দ্রের চরিত্রের ওপর আমার অবস্থা নেই। যে কোনও অঘটন ঘটতে পারে। আমি যে কোনও সময় নদী থেকে ফিরে আসতে পারি। ইন্দ্রকে সতর্ক করে দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তোমাকে পাওয়ার জন্য কামুক ইন্দ্রদেব কোনও বিষয়েই নজর দিলেন না। তোমাকে তালাবদ্ধ করে আমার চরিত্রের কুৎসাই সার হল।

তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য তুমি একা দায়ি নও। দায়ি আমি, ইন্দ্রদেব, পিতামহ ব্রহ্মা এবং এই সমাজ। কিন্তু তোমাকে দণ্ড না দেওয়াটা কি আমার 'প্রেম' এবং ক্ষমাশীলতার প্রমাণ বলে গণ্য হত? তোমাকে আমি যে অভিশাপ দিয়েছি তা কোনওকালে কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে দেয়নি। জগত আমাকে নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়েছে। তুমিও আমাকে পাষাণ হৃদয় ভেবেছ, হয়তো ভেবেছ, অভিশাপ না দিয়ে আমি তোমাক ক্ষমা করতে পারতাম। ক্ষমা কি তোমাকে সত্যের উপলব্ধি করাতে পারত? পাপের উপলব্ধিই পুণ্য অনুভবের সূচনা করে। তাই দোষীকে দণ্ড দেওয়া ব্যক্তি দোষী এবং সমাজের জন্য হিতকর। যে দোষীকে দণ্ড দেয়, সে দয়াশীল এবং পথ প্রদর্শক। তাই তোমার আমাকে নির্দয় ভাবা উচিত নয়। সময় হলে তুমি বুঝতে পারবে আজকের এই অভিশাপ তোমাকে দিব্য অনুভূতি দেওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল। আমার বিবেক এবং বিচারবুদ্ধি তোমাকে এই অভিশাপ দেওয়ার

জন্য প্রেরিত করেছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমি এরকম দণ্ডবিধান করিনি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে ক্ষমা লাভ করলে ক্ষমার অবমাননা হয়। যাতে তোমার কল্যাণ হয় আমি সেই ব্যবস্থা করেছি। এখন আমাকে তোমার শত্রু মনে হচ্ছে কিন্তু পরে বুঝতে পারবে সৎ, বিবেকবান স্বামীর চেয়ে বড় হিতৈষী নারীর পক্ষে আর কেউ নেই।

ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে ভস্ম করতে পারতাম। এমনকি ইন্দ্রকেও স্বর্গচ্যুত করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা' করিনি। কারণ আমি তোমার বা ইন্দ্রের শত্রু নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বার্থ জড়িত হলেও সে সম্পর্কে যে পবিত্রতা আছে, তা অন্য পুরুষের সাথে গোপন প্রণয়ে নেই। অবশ্য গোপন প্রণয়ে রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। যে পুরুষ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নিজের কামবাসনা চরিতার্থ করে সে কি কখনও নারীর বন্ধু হতে পারে? ইন্দ্রদেব তোমাকে শচীদেবীর আসন দিতে পারবে? না—সচারচর তা হয় না। নিজের স্ত্রীকে সতীত্বের সিংহাসনে বসিয়ে পরস্ত্রীকে অসতী করাটা ইন্দ্রদেবের মতো কিছু অভীষ্টাদাতা সুপুরুষের প্রবৃত্তি। নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে তাঁরা গর্বিত। শচীদেবীর সতীত্বের পুণ্যে বহু সঙ্কট থেকে ইন্দ্রদেবের উদ্ধার পাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। শচীদেবী পরপুরুষের প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করলে ইন্দ্রদেব সেটা সহ্য করবেন? অথচ বহুনারী ভোগকে ইন্দ্রদেব পৌরুষ আখ্যা দেন। এটাই পুরুষের প্রবৃত্তি এবং মনোবৃত্তি।

প্রিয়তমা! শুধু তুমি নয়, আমিও আজ বন্ধুহীন। হিমবন্ত পাহাড়ের নির্জনতার মধ্যে আত্মসমীক্ষা করছি। কোথায় গেল আমার যশ-কীর্তি, আশ্রম, তপোবন, শিষ্য-শিষ্যা, মুনি ঋষি আমার, পরিবার—আমার সন্তানসন্ততি—এবং আমার প্রিয়তমা অহল্যা? আমার দোষের তুলনায় এ শাস্তি বেশি নয় কি?

যতদিন তোমার পাপখণ্ডন শাপমোচন না হচ্ছে, ততদিন এই নিঃসঙ্গ জীবন থেকে আমার মুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে আমি কাকে অভিশাপ দিয়েছি, তোমাকে না নিজেকে? আজ সারা পৃথিবী তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল, কারণ তুমি শাপ ভোগ করেছ। আমার জন্য শুধু ভর্ৎসনা, কারণ আমি অভিশাপদাতা নিষ্ঠুর পুরুষ, তাই তোমার চেয়ে আমার অবস্থা অধিক শোচনীয়।

যখন তোমার প্রতি আমার অভিশাপ উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হচ্ছিল। আমি জানি তুমি ব্রহ্মার স্নেহলালিতা আত্মমুগ্ধা সুকুমারী কন্যা। এই অভিশাপ তোমার পাপের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে, তোমার মৃত্যুর কারণ হতে পোরে। এই অভিশাপ তোমাকে নরক যন্ত্রণা দিতে পারে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করতে পারো। হিংস্র জন্তু তোমার অপরূপ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করতে পোরে। তোমার কলঙ্কিত তনুবল্লরী দাসদানবদের কামনার আধার হতে পারে। এসব জেনেও আমি তোমাকে সেই ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিলাম এবং নিজের হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে নিজেই পান করলাম। মানুষের দুর্ভাগ্য যে, তার উচ্চারিত বাক্য সবাই শুনতে পায়, কিন্তু তার হৃদয়ের

ভাষা কেউ শুনতে পায় না। আমি স্বীকার করছি, নিয়ম-শৃঙ্খলায় আমি অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু আমি পাষণ্ড বর্বর নয়। তাই অগ্নিসাক্ষী রেখে গৃহের সম্রাজ্ঞী হিসাবে বরণ করে আনা প্রিয়তমা পত্নী ও আমার সন্তানের জননীকে এইরকম ভয়াবহ অভিশাপ দিয়ে আমি স্থির থাকতাম কি করে? তুমি নারী—অশ্রুপাত করায় তোমার কোনও বাধা নেই। তাই অশ্রুবর্ষণ করে তুমি যখন তোমার হৃদয়ের ভার লাঘব করছিলে আমার চোখ দুটি তখন পাথরে পরিণত হয়েছিল। পুরুষের দুর্ভাগ্য যে অশ্রুবর্ষণ করায় সে কৃপণ, তাতে তার অহং আহত হয়। তাই দুঃখ অনুশোচনায় বুক ফেটে গেলেও চোখ ভেজে না। আমি তো আত্মসংযমী মহর্ষি গৌতম। অভিশাপ দেওয়া ছাড়া হাহাকার করার অবকাশ আমার ছিল না। তুমি যদি একাগ্রচিত্তে কান পাততে, তাহলে শুনতে পেতে হতভাগ্য পরাজিত স্বামীটি পত্নী বিরহে কিভাবে 'অহল্যা', 'অহল্যা' বিলাপ করছিল।

পাপ করা যেমন সহজ নয়, অভিশাপ দেওয়াও কঠিন। যে শাপগ্রস্ত, সে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। —যে শাপ দেয়, সেও কম দুঃখ ভোগ করে না। পাপ না করেও নিজেকে পাপী মনে করে আত্মধিক্কারে দগ্ধ হতে থাকে শাপগ্রস্তের শাপমোচন না হওয়া পর্যন্ত। ক্রোধী নিষ্ঠুর না হয়েও যে সেই উপাধিতে ভূষিত হয়। তার ভাগ্য পাহাড়ের মতো। পাহাড়কে রুক্ষ, কঠোর পাষাণ বলা হয়, অথচ ক্ষুদ্র কোমল অঙ্কুরটি পাহাড় ভেদ করে আকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে কিভাবে? পাহাড় এইজন্য কঠোর কারণ সে ঝরণার দুর্বার গতিকে বুক পেতে নেয় এবং তার গতিকে করে সাবলীল।

তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ ছিল ইন্দ্রের, আর তোমাকে পেয়ে হারাবার দুঃখ আমার। বলো, কার দুঃখ বেশি? ইন্দ্র দেহবাদী, তার অভিষ্ট সিদ্ধি হয়েছে, তার আর কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু আমি কি পেলাম? ত্রিলোকসুন্দরী ব্রহ্মাপুত্রীর পতি হওয়ার অহংকারই শুধু চূর্ণ হয়নি। আমার সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। অহল্যা, তুমি কি ভেবেছ—স্বামী, সংসার, সন্তানের স্বপ্ন শুধু নারীই দেখে? স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে পুরুষের কোনও স্বপ্ন নেই? আছে—কিন্তু পুরুষ নীরব সাধক। পুরুষের মন এমন উপাদানে তৈরি যে সে তার বাৎসল্যকেও সন্তানের সামনে প্রকাশ করে না। নারীর বাৎসল্য কলকলনাদিনী ঝরণা হলে পুরুষের বাৎসল্য গভীর হ্রদ। তাই সুখ দুঃখ প্রেম বাৎসল্য কোনও কিছুতেই সে প্রবাহিত হতে পারে না। প্রবাহিত হওয়ার ভাগ্য পুরুষের নেই।

তোমার শরীর গড়েছিলেন তোমার পিতা। কিন্তু তোমার চেতনা গড়েছিলাম আমি—তোমার গুরু হিসাবে। তাই তোমার বিবেক ও চেতনার বিপর্যয় শুধু তোমার পরাজয় নয়, আমারও পরাজয়। আমার নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। আর একটু সহজ সাধারণ মানুষ হলে এই বিপর্যয় এড়ানো যেত বোধহয়। অসাধারণ হওয়ার দুঃখ জানা সত্ত্বেও আমি কেন অসাধারণ হওয়ার কঠোর ব্রত গ্রহণ করলাম! আমরা দু'জন সাধারণভাবে জীবন কাটালে অন্যান্য সুখী দম্পতির মতো আমরাও সুখের সংসার গড়তে পারতাম। কিন্তু সেই সুখ'ত

নিত্যানন্দ নয় এই ধারণা আমাকে সাধারণ স্বামী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। এবং আমার সমস্ত সংকল্প বিনষ্ট করে।

প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে বড় বন্ধু ও অনুশোচনার চেয়ে বড় শত্রু নেই। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করার সময়ে আমি অনুশোচনায় ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পিছনে ফেলে আসা জীবনের ভুল ত্রুটি আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার সংশোধন আমার ক্ষমতার বাইরে। কারণ মানুষ পিছন ফিরে তাকালেও সময় ফিরে তাকায় না। একসময় যেটা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে থাকে, সময় চলে গেলে আর তার প্রতিকার থাকে না। নিষ্ফল অনুশোচনায় তেজোদীপ্ত জ্ঞানবান মানুষও মৃৎবৎ হয়ে যায়। মানুষের জীবনে এটা একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতি। এই অবস্থা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কম বেশি আসে। কিন্তু যে অধিক আত্মজ্ঞান সচেতন ও সব কিছু তার আয়াত্তাধীন বলে ভাবে, তার জীবনে আত্মবিষাদের এই সংকটময় পরিস্থিতি বারম্বার আসে এবং নিষ্ফল অনুশোচনার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে সেই যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়ে অধিক। আজ আমি তিল তিল করে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছি।

তোমার শাপমোচনের অপেক্ষা করছি। কিন্তু তুমি যদি গৌতমপত্নীর গৌরব অগ্রাহ্য করে অন্য পথ বেছে নাও তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই। যাতে তোমার আনন্দ, সেটাই আমার কাম্য। আমি তোমাকে সুখ দিতে পারিনি, ইন্দ্রদেব তোমাকে সুখ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যদি ইন্দ্রদেব তোমাকে শচীপদে অধিষ্ঠিত করেন, তাহলে আমি আপত্তি করব না। তোমার চোখে ইন্দ্রদেব যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হন, তাহলে তাঁর শ্রেষ্ঠ নারীকে লাভ করা যুক্তিযুক্ত নয় কি? এখন তুমি মুক্ত। কোনও বাধা বন্ধন নেই। তালাবন্ধ ঘরে আমার অনুশাসনের মধ্যে তুমি আর আবদ্ধ নয়। ইন্দ্রদেব কি এ সুযোগ হাতছাড়া করবে? তোমার মোহ কি এত তাড়াতাড়ি কেটে যাবে? বিনা নিমন্ত্রণে তিনি মর্তে অবতরণ করবেন এবং তোমাকে শচীপদে বরণ করবেন। আর্যপুরুষ হিসাবে ইন্দ্রদেবের দ্বিতীয় শচী গ্রহণ করার সামাজিক অধিকার আছে। তুমি কি ভাবছ, যে আমি তোমাকে আর গ্রহণ করব না বলে উপযাচক হয়ে ইন্দ্রকে দিয়ে দিচ্ছি? তাহলে তো আমি তোমাকে কোপানলে ভস্ম করে দিতে পারতাম। তোমার পতন আমাকে যত দুঃখ দেয়নি, ইন্দ্রদেব তোমাকে যে অপমান করেছেন সেটাই আমাকে বেশি দুঃখ দিয়েছে। যদি ইন্দ্রদেব তোমাকে হরণ করে দ্বিতীয় শচীপদে অধিষ্ঠিত করতেন তাহলে আমি ক্ষুব্ধ হতাম ঠিকই, কিন্তু অপমানে ম্রিয়মান হতাম না। তুমি ইন্দ্রযোগ্যা না হয়ে ইন্দ্র ভোগ্যা হয়ে গেলে। সেটাই আমার পৌরুষে পদাঘাত করেছে।

ইন্দ্রদেব এবং আমি উভয়েই পরস্পরের অহং নিয়ে সংঘর্ষ করছিলাম এবং দুজনেই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করে বলতাম—আমি সত্যের জন্য লড়াই করছি। আমরা দুজনেই মনে করতাম পরমেশ্বর আমার পক্ষে আছেন। কিন্তু পরমাত্মা সত্য-মিথ্যা জানেন। সত্যরক্ষার জন্য যে ব্যক্তি চরম বলিদান করতে পারে প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর তার পক্ষ অবলম্বন করেন।

জনকল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে আমি আমার প্রিয়তমা পত্নীকে বলি দিয়েছি। আমি বোধহয় হবিষ্মান হতে পারিনি। ভোগের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করলেও ত্যাগের হোমঘৃতে অবগাহন করে নিজ স্বার্থকে সম্পূর্ণ হবি করতে পারিনি। সেই কারণেই আজ আমার সমস্ত জ্ঞান, দর্শন, সাধনা অসিদ্ধ হয়ে গেছে।

এতবড় গুরুকুল আশ্রম আজ জনশূন্য। আমি নিজে আশ্রম ত্যাগ করেছি। পৃথিবীতে নিজের কোনও অবস্থান নেই। অন্যকে কর্দমাক্ত করতে গেলে প্রথমে নিজের হাত কর্দমাক্ত হওয়ার মতো ইন্দ্রদেবকে ঈর্ষান্বিত ও বিফল মনোরথ করতে গিয়ে আমার এই বিফলতা ও বিপর্যয়। আদর্শ পতি-ই আদর্শ পত্নী আশা করে। সম্ভবত বহু কারণে আমি আদর্শ পতি ছিলাম না।

যজ্ঞের অপর নাম অধ্বর—তাই যজ্ঞ হল অহিংস। সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ এবং ব্রহ্মচর্য হল যজ্ঞের লক্ষণ। কিন্তু যজ্ঞকালে বলিদান এবং অনার্য দমনের মতো হিংসাত্মক কাজও হচ্ছিল। তুমি কোমল হৃদয়া হওয়ায় উভয় প্রকার হিংসার বিরোধিতা করতে, আমি তখন তোমার কথা গ্রাহ্য করিনি। ঘৃণা বা হিংসার দ্বারা নয়, বোধহয় ভালোবাসার দ্বারাই অনার্যদের যজ্ঞাভিমুখী ও অহিংসক করা যেত। অসহায় অবস্থায় আমি যখন তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তখন আমার হিংস্র জন্তুদের ভয় ছিল না, ভয় ছিল বেদবিরোধী দাসদের। ভেবেছিলাম দাসগোষ্ঠী তোমার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে আর্যঋষিদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু আজ অনার্যদের আচরণে আমি মুগ্ধ। আমার অভিশাপকে সম্মান জানিয়ে তারা আশ্রমের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু আশ্রমের বাইরে তারা সদা জাগ্রত প্রহরী। হিংস্র জন্তু এবং দুরাত্মাদের কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তুমি শাপমুক্ত না হবে ততদিন তারা বেদবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী কোনও কাজ করবে না বলে মুনি ঋষিদের জানিয়েছে। আশ্চর্যের কথা সবচেয়ে হিংস্র তক্ষক, কর্কোটক, কুলিক ও প্রদাহ প্রভৃতি দাসেরাও আজ অহিংসার পূজারি। অনাবৃষ্টি ও অনাহার থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং পৃথিবীকে সষ্যশ্যামলা করার উদ্দেশ্যে তুমি ইন্দ্রদেবের কামাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছ এটাই তাদের বিশ্বাস। তাই তারা আজ অহিংস এবং কৃতজ্ঞ।

বর্তমান সমাজে দুটি ধারা প্রচলিত। পুরুষ প্রধান বৈদিক ধারা এবং নারীপ্রধান অবৈদিক ধারা। অবৈদিক দাস সংস্কৃতিতে নারী হল সৃষ্টির মূল। নারী মানবের জন্মদাত্রী, পৃথিবী, অন্ন তথা জীবনের জন্মদাত্রী। নারী এবং পৃথিবী অভিন্ন। ফলপ্রসূ পৃথিবীর মতো সন্তানপ্রসূ নারীই হল সর্বংসহা, ক্ষমাশীলা এবং কল্যাণময়ী। তাই পৃথিবী ও নারীর ওপর যত অত্যাচার হয়। তা সত্ত্বেও পৃথিবী হল নারীর শ্রেষ্ঠ সাধনভূমি। স্বর্গরাজ্যে দেবপত্নী ব্যতীত অন্য সকল নারী হল অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা এবং উপভোগ্যা। এই কারণে দাসেরা স্বর্গবিমুখ এবং দেববিমুখ। নিজ বিশ্বাসে অটল দাসেরা তোমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়ার জন্য হিংসা থেকে দূরে আছে। অহল্যা, বিপদ ও বিঘ্ন তাঁদের উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছে। বিপদ ও বিঘ্ন-ই আজ তোমাকে পুনরায় অনুভবের অকপট, নিরহংকার, নিঃশর্ত মুহূর্তগুলি এনে দিয়েছে।

তাই জীবনে শুধু যশ ও সফলতা কাম্য নয়, ইহা অহংকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। বিপদ, অভিশাপ এবং দুঃখই আত্মজ্ঞান তথা আত্মজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে। তোমাকে অভিশাপ দিয়ে আমি দুঃখিত, কিন্তু অনুতপ্ত নয়। আজ তোমার জন্য আমি উচ্চারণ করছি—"নমঃ সুতে নিরীর্তে...।" হে নিরীর্তে—হে বিপদ, হে বিঘ্ন তোমাকে প্রণাম। আমরা প্রিয়তমা পত্নীর জন্য আমি তোমাকে আহ্বান করছি। তোমার কর্কশ হাতে আমি আমার অহল্যাকে অর্পণ করছি। অহল্যার কর্মফল অহল্যা ভোগ করবে। হে দুঃখ তুমি মহান! কারণ তোমার মাধ্যমেই পাপের উপলব্ধি এবং পাপমুক্তি হয়। তোমার বজ্রপ্রহারে অহল্যার হল্য মোহবন্ধন চূর্ণ হোক্। সন্তাপের যজ্ঞকুণ্ডে অহল্যাকে বারম্বার পরীক্ষা করো। তার কৃতকর্মে যদি বিন্দুমাত্র পাপ থাকে তাহলে তাহা প্রকট করো। হে সঙ্কট, হে অভিশাপ! তুমি মুহুর্মুহু অহল্যাকে দগ্ধ করো। অনুতাপের অগ্নিকুণ্ডে ভোগময়ী অহল্যা ভাবময়ী অহল্যায় পরিণত হোক। হে নিরীর্তে—আমার অহল্যাকে সোমাঙ্গিনী কর, পাপমুক্ত করো এবং আমার অভিশাপ সফল করো...।'

তোমার জন্য দুঃখ ও সঙ্কটকে আহ্বান করার সময় আজ দেবী অনুসূয়ার অপূর্ব কাহিনী মনে পড়ছে। তুমি বোধহয় সেই উপাখ্যান জান না। আজ তোমাকে সেই কাহিনী শোনানো উচিত মনে করছি। তুমি মহর্ষি অত্রির পত্নী সতী অনুসূয়ার মতো কেন হলে না? তিনিও তোমার মতো সুন্দরী ছিলেন।তাঁর রূপে অপ্সরাগণও ম্লান হয়ে যেতেন। দেবতারা অনুসূয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। অনুসূয়ার সৌন্দর্য ও সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে দেবীরা নিষ্প্রভ হওয়ার সাথে সাথে ঈর্ষান্বিতও হতেন। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, শিবজায়া উমা এবং অন্যান্য দেবীদের কাছে অনুসূয়ার সতীত্বের মহিমা অসহ্য মনে হচ্ছিল। তাঁরা নিজ নিজ স্বামীকে অনুরোধ করলেন অনুসূয়ার সতীত্ব হরণের জন্য। যদি অনুসূয়া এই দেবতাদের অপার্থিব সৌন্দর্যে কামাসক্ত না হয় তাহলে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে অত্রিমুনির ছদ্মবেশ ধারণ করে একের পর এক তাঁকে ভোগ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। এর ফলে অনুসূয়ার সতীত্ব কলঙ্কিত হবে এবং দেবীদের ইচ্ছাপূরণ হবে। সম্ভবত ত্রিদেব এইরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তা না হলে তাঁদের মতো দেবতারা স্ত্রীদের কুপরামর্শে সাধ্বী মুনি পত্নীর দেহভিক্ষা করতে সম্মত হতেন।

সেইসময় দশবছর ব্যাপী অনাবৃষ্টিতে পীড়িত পৃথিবীমাতা ত্রাহি, ত্রাহি ডাক ছেড়েছেন। কোমলহৃদয়া অনুসূয়া জলশূন্য পৃথিবীতে গঙ্গা প্রবাহিত করা জন্য কঠোর তপস্যায় রত। দেবতারা স্থির করলেন—অত্রিমুনির ছদ্মবেশে না গিয়ে স্ব-রূপেই সতীর সম্মুখে উপস্থিত হবেন ও কামভিক্ষা করবেন। তারা জানতেন দেবী অনুসূয়া তপস্যার বলে ছদ্মবেশধারী আসল ব্যক্তিকে চিনতে পারবেন। তাই আর ছদ্মবেশ কেন? অতএব তাঁরা স্ব-স্ব রূপে অনুসূয়ার সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং কামবিহ্বল হয়ে তাঁর রূপের প্রশংসা শুরু করলেন। কিন্তু পরপুরুষের কণ্ঠনিঃসৃত সৌন্দর্যস্তুতি তাঁর ওপর কোনও প্রভাব সৃষ্টি করে না। তিনি নিজের তপস্যায় অবিচল। বিলম্ব অসহ্য বোধ হওয়ায় দেবতাগণ নিঃসঙ্কোচে নিজেদের

উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। উপরন্তু প্রলোভনও দেখালেন যে তাঁদের কামবাসনা চরিতার্থ করলে তাঁদের করুণায় স্বর্গ-গঙ্গা পৃথিবীতে প্রবাহিত এবং পৃথিবী পুনরায় শস্যশ্যামলা হবে। এই ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। অত্রিমুনি আশ্রমে অনুপস্থিত থাকায় অনুসূয়ার দেহদানের কথা তিনি জানতে পারবেন না—ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ব্যহত হবে না। সর্বোপরি পৃথিবীতে গঙ্গা প্রবাহিত হলে অনুসূয়ার খ্যাতি ত্রিভুবনে প্রচারিত হবে।

প্রলোভনের কি প্রচণ্ড শক্তি! সতী অনুসূয়ার তপস্যাভঙ্গ হল। দেবতাদের অভিসন্ধি ও অভিযানের ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে। দেবতাদের দেহদানের ফলে যে গঙ্গাজল পৃথিবী প্লাবিত করবে সেই জল কি গঙ্গাজল? কামানল থেকে জাত গঙ্গাধারা কি পবিত্র, বিশ্বকল্যাণকর হতে পারে। সৎ উদ্দেশ্য কি অসৎপথে সফল হতে পারে?

ব্রহ্মবাদিনী অনুসূয়া মধুবিদ্যার অধিকারিণী ছিলেন। বিলাসব্যাসন, কামনা বাসনা, ভোগলালসার ঊর্ধ্বে থাকা মধুবিদ্যার অধিকারিণী দেবী অনুসূয়ার কাছে দেবতা এবং তাদের বাণী মধুময় মনে হল।

দেবতাদের প্রতি তিনি প্রেমময়ী হলেন, কিন্তু সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য এই তিন প্রকার প্রেমের মধ্যে বাৎসল্য প্রেমকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাই জননীর হৃদয় নিয়ে বাৎসল্য প্রেমের দৃষ্টিতে দেবতাদের দিকে তাকানো মাত্রই দেবতাগণ তিনটি অবোধ শিশুতে পরিণত হলেন। যে স্বামীরা স্ত্রীদের প্ররোচনায় পতিব্রতা নারীর সতীত্ব হরণ করতে সম্মত হয়েছিলেন তাদের শিশুর মতো অবোধ, সরল ভেবে তিনি তাদের আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করলেন, স্তন্যপান করালেন। দেবতারা পূর্বজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে মর্তে থেকে গেলেন। দেবী অনুসূয়ার বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠায় স্বর্গগঙ্গা মর্তে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবী সষ্যশ্যামলা হল। অনুসূয়া স্বয়ং পৃথিবী মাতায় পরিণত হলেন। সেই মধুময় পৃথিবীর কোল ছেড়ে দেবতাগণ স্বর্গে ফিরে যেতে চাইলেন না। অবশেষে অনুসূয়ার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা তিন দেবী মর্তে অবতরণ করে নিজ নিজ স্বামীকে অনুসূয়ার কাছে ভিক্ষা চাইলেন। অনুসূয়া দেবীদের প্রতি রুষ্ট হলেন না। দেবীদেরও তাঁর অবোধ সন্তান মনে হল। ক্ষমা পরায়ণা অনুসূয়া দেবতাদের পূর্বাবস্থা এবং পূর্বজ্ঞান ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে অসূয়ারহিতা অনুসূয়ার জয় হল।

আজ অনুসূয়া বৃদ্ধা, যৌবন অতিক্রান্তা কিন্তু তাঁর হৃদয়ে বাৎসল্য প্রেমের অফুরন্ত ধারা প্রবাহমান। আজ অনুসূয়ার রূপ আমি সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। অহল্যা। নারীর যৌবনের মতো তার রূপও ক্ষণস্থায়ী। তাই দেহজ প্রেম ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বাৎসল্য চিরকালীন। মাতৃত্ব এমন এক সৌন্দর্য যা যৌবন, জরা এবং মৃত্যুতেও উজ্জ্বল। সৌন্দর্য কি তা' বৃদ্ধা অনুসূয়াকে দেখলে অনুভব করা যায় তা হল মাতৃত্বের ঔজ্জ্বল্য। দেবতাদের আশীর্বাদ করে বিদায় দেওয়ার সময় অনুসূয়া যে কথা বলেছিলেন সেটি এখনও আমার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। আজ তোমাকে না শুনিয়ে থাকতে পারছি না। তিনি বলেছিলেন—"বৎসগণ! ভোগ না করা ত্যাগ নয়। ভোগ করে ভোগ থেকে ঊর্ধ্বে গতি করাই হল ত্যাগ। ভোগে জড়িত না হলে একদিন ভোগ থেকে

সম্পূর্ণ ত্যাগ ও অবশেষে ভাবজীবন অবশ্যম্ভাবী। সংসার রসময়। সংসারের বিবিধ রস পান করা পাপ নয়। কিন্তু সংসারের এই রস ও সৌন্দর্যকে মর্যাদা সহকারে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভোগ করলে ভোগের মর্যাদা রক্ষা হয়। ভোগ ভোগ না হয়ে ভাবে পরিণত হয়।"

তুমি ইন্দ্রদেবকে অবোধ শিশুতে পরিণত করলে না কেন? ইন্দ্র তোমাকে সম্ভোগ চাইলেন, অনুসূয়ার মত সম্ভোগের পরিবর্তে তুমি ইন্দ্রকে বাৎসল্য দিতে পারলে না? তুমি নিজেও কি সম্ভোগ চেয়েছিলে না? এ বিষয়ে আর কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়ে ভালো করেছ। কারণ আর সব কৈফিয়ৎ আত্মপ্রবঞ্চনা, সম্ভোগ-ই মুখ্য।

নারী তার দেহ নিয়ে কি না করতে পারে? শিষ্ট কে দুষ্ট করতে পারে, দুষ্টকে ধ্বংস করতে পারে। জিতেন্দ্রিয়কে করতে পারে কামাসক্ত, কামাসক্তকে করতে পারে নিরাসক্ত যোগী। নারীই পুরুষকে দেয় জন্ম, জীবন, সম্ভোগ, নরক ও মোক্ষ। নারী-ই রক্ষা করে—সংহার করে। তুমি কেন ওরকম করতে পারলে না? শুধু দেহ নিয়েই বেসুরো হয়েছ, কিন্তু জান না— নারী দেহের উত্তরণ আছে, পুরুষ দেহের নয়। নারীর দেহে যে বৈচিত্র এবং বৈভব আছে তা পুরুষের নেই। তুমি দেহসর্বস্ব ছিলে কিন্তু দেহতত্ত্ব বুঝতে পারনি। তাই দুর্লভ দেহকে অর্ঘ দিয়েছ ভেবে পণ্য করেছ।

অহল্যা, একে উপদেশ ভাববে না। আমি আজ যোগভ্রষ্ট। তোমাকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার কোথায়? আমি শুধু তোমার মঙ্গলকামনা করি। যা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর তাই হোক্। আমি আবার বলছি; প্রকৃতপক্ষে যদি সখ্যভাব নিয়ে তুমি ইন্দ্রকে প্রেমদান করে থাকো, তাহলে তাঁর দান গ্রহণ করো। শচীপদে অধিষ্ঠিতা হয়ে যদি তুমি জগতের দুঃখ দূর করতে পারো, তাহলে তুমিও অনুসূয়ার মতো অনন্ত সৌন্দর্যময়ী হতে পারবে। প্রিয়তমা, ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করো। সেই রামার্পিত রমণীয় মুহূর্ত আসছে তোমার অভিশাপকে পবিত্র ও সার্থক করার জন্য। ইতি—

তোমার অভিশপ্ত গৌতম।

"প্রিয়তমা" সম্বোধনে এত সম্মোহন! গৌতম! প্রীতির এই সামগান আগে শোনালে না কেন? শুধু একবার তোমার এই সম্ভাষণে অহল্যা পবিত্র গঙ্গা হয়ে তোমার পায়ের তলায় প্রবাহিত হত, পাথরে পরিণত হওয়ার অবকাশ থাকত না। আমি রক্ষা পেতাম এতবড় পাপ থেকে, তুমি রক্ষা পেতে অভিশাপ দেওয়ার থেকে। আজ সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুভারম্ভের সুযোগ কোথায়? কিন্তু প্রেম যে এত নির্ভয় করে, তা আজ জানলাম। জড়দেহে প্রাণপ্রাচুর্য ভরে দেওয়ার শক্তি প্রেম ব্যতীত আর কার আছে?

ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে দুঃখ দিয়েছ, কিন্তু আমিও যে তোমার দুঃখের কারণ সেটা জানতাম না। আমার রূপ তোমাকে দুঃখ দিত বলে জানতাম না। হে সন্তাপ! তুমিই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছ, আবার তুমিই পরস্পরকে উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছ। তোমাকে প্রণাম।

মরুৎগণ বলে গেলেন—ইন্দ্রদেব আসছেন। স্বর্গের প্রাচুর্যের মধ্যে অহল্যাকে স্থান দেওয়ার জন্য। গৌতমপত্নীকে শচীদেবীর পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য। গৌতমের প্রেমে সম্মোহিত আমার হৃদয়ে আবার এ কি দ্বন্দ্ব! বিচিত্র নারীর মন! আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে বারম্বার আসছেন ইন্দ্রদেব। আমি কি উপেক্ষা করতে পারব ইন্দ্রদেবকে?

গৌতমকে ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রের হয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা কোনওদিন ছিল না আমার। পৃথিবী ছেড়ে ইন্দ্রলোকে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আজ পৃথিবীতে আমার কি প্রয়োজন? অহল্যার পৃথিবী'ত আজ পরিত্যক্ত দগ্ধ বনভূমি। সেখানে খাদ্য নেই, প্রসাধন নেই, বসন্ত নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যত নেই। শত প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও এই অভিশাপ মোচন হওয়া অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আমি কি অনুসূয়া হতে পারব? আমার সে পুণ্যবল কোথায়? আজ গৌতম আমার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁকে গুরু কিংবা মহর্ষির মতো দেখাচ্ছে না, পত্নীবিরহে কাতর সাধারণ স্বামীর মতো দেখাচ্ছে।

গৌতমের অন্তরে আমার জন্য যে এত প্রেম ছিল তা আগে জানলে আমিও অনুসূয়ার মতো ইন্দ্রদেবকে অজ্ঞান শিশুতে পরিণত করে তার কামবাসনাকে বাৎসল্য ধারায় প্রবাহিত করতাম। পতিপ্রেমের মধুরতা যখন উপলব্ধি করছি তখন একটা যুগ পার হয়ে গেছে। এই জন্মে আর ফিরে আসবে না আমার সেই অকলুষ যৌবন, মলয়স্নিগ্ধ বসন্ত, প্রেমবিহ্বল বধু অহল্যার স্বপ্নের মধুরাত। ফিরবে না গুরুকুলের আচার্য মহর্ষি গৌতমের ধর্মপত্নী অহল্যার কীর্তিময় আশ্রমজীবন। একটি মাত্র ঘটনা সমগ্র জীবনের সাধনাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। একদিন ছিল যখন গৌতম আশ্রমের গৌরবে ইন্দ্রলোক নিষ্প্রভ হয়ে যেত। দেবতারাও গৌতমের দর্শন করে এবং তাঁর কাছ থেকে সৎ জ্ঞান লাভ করে ধন্য হতেন। তখন আমি গর্ব অনুভব করতাম। আজ গৌতম আশ্রম পাপের দগ্ধভূমিতে পরিণত হয়েছে। গৌতম কাউকে মুখ দেখাতে পারেন না। অহল্যার নামোচ্চারণও নিষিদ্ধ। ইন্দ্রদেবের কাম এবং গৌতমের ক্রোধ আমাকে পাপের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। পাপ থেকে পুণ্যের পথে কে আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে? —গৌতম না ইন্দ্রদেব? আজ কারও ওপর আমার ভরসা নেই। কারণ উভয়ের সাথে সম্পর্ক বোধহয় কামনা-বাসনা স্বার্থ ও অহঙ্কার জড়িত ছিল।

আমার পাপমোচন না হওয়া পর্যন্ত গৌতম আমার দ্বারে আসবেন না। আমার পাপকে উপেক্ষা করে ইন্দ্রদেব আসছেন। আমি গৌতমের জন্য অপেক্ষা করব না ইন্দ্রদেবকে আমার ভাগ্য বলে মেনে নেব? কে বরণীয়—গৌতম না ইন্দ্রদেব? মর্ত না স্বর্গ? রাম না কাম?

গৌতম যদি একবারও প্রেমের রমণীয় স্পর্শ দিতেন তাহলে আমি সম্পূর্ণভাবে গৌতমের হয়ে যেতাম। ইন্দ্রদেব যদি কামনার স্পর্শ না দিতেন তাহলে আমি ইন্দ্রদেবের বাসনায় বিচলিত হতাম না। নারী স্পর্শ নয়, প্রতিস্পর্শ। কিন্তু স্পর্শ যেখানে পুরুষের পৌরুষ সেখানে সমাজের চোখে প্রতিস্পর্শ হল নারীর দুর্বলতা। আমার দেহভোগ ব্যতীত ইন্দ্রদেব কি বরদান করতে পারতেন না। সামান্যতম সাহায্যের বিনিময়ে পুরুষ চায় নারীর দেহ।

ইন্দ্রদেব মহান দাতা হলেও এই দৃষ্টিতে একজন সাধারণ পুরুষ ও দরিদ্র। কিন্তু সব স্পর্শের প্রতিস্পর্শ নারী দেয় না। কারও স্পর্শ পাথর করে দেয় আবার কারও স্পর্শে ঝরণা প্রবাহিত হয়। গৌতমের স্পর্শ আমাকে পাথর করে দিয়েছিল বলেই ইন্দ্রদেবের স্পর্শ আমাকে বিগলিত করে দেয়।

সেই ইন্দ্রদেব আসছেন। আমি নিজেকে প্রস্তুত করলাম। কিন্তু সেদিনের মতো ইন্দ্রদেব পৃথিবীতে নেমে এলেন না। মেঘবাহনে থেকে মরুৎগণের হাতে বার্তা পাঠালেন।

গৌতমের অভিশাপে গৌতম আশ্রম আজ এক নিষিদ্ধভূমি। নির্জনতা নয় নিঃসঙ্গতাই আমার শাস্তি। ইন্দ্রদেবও গৌতমের অভিশাপকে সম্মান দেন। তাই অন্তরীক্ষ থেকে তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করবেন। তা'ছাড়া যজ্ঞ হবি গ্রহণ করার জন্য ইন্দ্রদেব মর্ত্যে অবতরণ করেন। তাই অহল্যার দগ্ধভূমিতে ইন্দ্রদেব আসবেন কেন? যেখানে যজ্ঞ বিনষ্ট যজমান যোগভ্রষ্ট সেখানে বিনা নিমন্ত্রণে পদার্পণ করলে তাঁরই অসম্মান।

মরুৎগণ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। তাঁরা ইন্দ্রের সহচর হলেও ইন্দ্রদেব তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তাই তারা গৌতম এবং ইন্দ্রদেব উভয়ের বার্তা বহন করেন। ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে কি বার্তা এনেছেন? জীবন না মৃত্যু? শাপ না মোক্ষ? পাপ না পুণ্য?

আমি ইন্দ্রদেবকে দেখতে পারছি না। কিন্তু মেঘের ওপার থেকে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"রূপ সাম্রাজ্যের রানি অহল্যা, তোমাকে স্বর্গরাজ্যে আহ্বান জানাচ্ছি।

মরণশীল মর্তলোক তোমার রূপ সৌন্দর্যের কি মূল্য দেবে? মর্তলোকে যৌবন ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুর অপেক্ষায় জীবন সদা সন্ত্রস্ত। স্বর্গের অনুকম্পাই মর্তের সুখ সম্পদ।

মর্তে হিংসা, ঈর্ষা এবং জাতি বিদ্বেষ। রাজা প্রজার বিভেদ। মর্তভূমি অহল্যার উপযুক্ত নয়। অহল্যা মর্তভূমির জন্য ছিল এক পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় মর্তভূমি উত্তীর্ণ হতে পারে নি। মর্তভূমি অহল্যাকে পূর্ণতা দিতে পারেনি।

মর্তের মানব গৌতম অহল্যার স্বামী হলেও অহল্যার প্রেমাস্পদ নয়। একমাত্র ইন্দ্রই অহল্যার প্রেমাস্পদ। তুমি যে শুধু স্বর্গযোগ্যা নয়, ইন্দ্রযোগ্যাও একথা প্রমাণ করেছে তোমার অভিশাপ। ইন্দ্রের আশীর্বাদ গৌতমের অভিশাপকে অসিদ্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে দেবাঙ্গনা হতে হবে। স্বর্গে অভিশাপ নেই। যে দেবতা বা অপ্সরা অভিশপ্ত হন তাদের মর্তে অবতরণ করতে হয়। তুমি মর্তে থাকা পর্যন্ত গৌতমের অভিশাপ থেকে তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি স্বর্গে এলে অভিশাপের কবলে তোমাকে তিলে তিলে হত্যা করতে পারবে না গৌতম। তোমার সন্তানেরা ইতস্তত, তোমার স্বামী গৃহত্যাগী, তুমি পরিত্যক্তা, তোমার আশ্রম দগ্ধভূমিতে পরিণত। সমাজের চোখে তুমি আজ অসতী, কলঙ্কিনী। মর্তে তোমার আর কিসের আকর্ষণ? এস অহল্যা, তোমার প্রেমদগ্ধ ইন্দ্রদেব রথ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে...।

"বাসব! তোমার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু মর্তের পরাজয় নেই। মর্ত আমার জন্মভূমি।

জন্মভূমিকে আমি ভালোবাসি। জন্মভূমির কাছে স্বর্গসুখ তুচ্ছ। আমি স্বর্গমুগ্ধা, কিন্তু স্বর্গলুব্ধা নয়।" —"মর্তে কামনার তৃপ্তি নেই। সব অপূর্ণ, —এমন কি প্রত্যেকটি জীবনও অপূর্ণ। জীবনের আশা আকাঙ্খা অপূর্ণ রেখে সবাইকে ফিরে যেতে হয়... ।"

—"অপূর্ণতায় পূর্ণ-ই জীবনের স্বাদ। স্বর্গে যদি চিরতৃপ্তি, তাহলে তুমি অতৃপ্ত কেন দেবরাজ? স্বর্গরাজ্য যদি হিংসা দ্বেষ বিহীন, তাহলে মর্তমানব গৌতমের প্রতি তুমি ঈর্ষাপরায়ণ কেন? স্বর্গরাজ্যেও রাজা প্রজার বিভেদ আছে। স্বর্গবাসী দেবতা, অপ্সরাগণও দানবের উৎপীড়নে সদা সন্ত্রস্ত। দেবতাগণ মর্তের যজ্ঞহবির ওপর নির্ভরশীল। তাই আমার কাছে স্বর্গ মর্তের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।"

"প্রভেদ হল মৃত্যু এবং অমৃতের, যৌবন এবং জরার। স্বর্গে অমৃত আছে—অনন্ত যৌবন আছে। অমৃত পান করে তোমার মত সুন্দরীর অনন্ত যৌবন লাভ করাই কাম্য। স্বর্গরাজ্যে যৌবন এবং সৌন্দর্য সুরক্ষিত। মর্তে সবকিছু অস্থির অনিশ্চিত... ।"

—"কিন্তু স্বর্গরাজ্যে'ত ইন্দ্রপদও সুরক্ষিত নয়। এমনকি ইন্দ্রও স্থিরচিত্ত নয়... ।"

—"ইন্দ্র অস্থির শুধুমাত্র অহল্যার জন্য। ক্ষণিকের মিলনে কি কামনার তৃপ্তি সম্ভব? অহল্যাই ইন্দ্রের স্বর্গ, অহল্যার প্রেমই ইন্দ্রেব জন্য অমৃতস্বরূপ। অহল্যা ব্যতীত স্বর্গরাজ্য শ্রীহীন মনে হচ্ছে, অহল্যা যেখানে, সেখানেই আমার স্বর্গ।"

—"কামনার চরিতার্থে কামনার তৃপ্তি হয় না বরং কামনা প্রখর হয়। হে বাসব! অহল্যাকে দোষ দিও না। অহল্যা তার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। মর্তে নেমে এসে অহল্যার অভীষ্টসিদ্ধির নামে অহল্যাকে বলি দিতে কে বলেছিল? যদি অহল্যাকে লাভ করলে ইন্দ্রদেব স্থিরচিত্তে ত্রিলোক পালন করতে পারবে, অহল্যার প্রতি প্রেম সত্য এবং শাশ্বত, তাহলে, স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে মর্তে নেমে এসো বাসব। তোমার অপার্থিব প্রেমকে প্রমাণ করো। ইন্দ্রপদ শূন্য থাকবে না। বহু জ্ঞানীগুণী তাপস, বীর ইন্দ্রপদের জন্য তপস্যারত। যেখানে অহল্যা, সেখানেই যদি স্বর্গ হয়, তাহলে মর্তভূমিকে স্বর্গে পরিণত করো। বাসব, অহল্যার জন্য তুমি ইন্দ্রপদ ঐশ্বর্য, অমৃত এবং পারিজাত ত্যাগ করতে পারবে না?

—"সরলা নারী! স্বর্গের ঐশ্বর্য ইন্দ্রপদের ক্ষমতা ও অমৃতের স্বাদ তুমি কি করে জানবে? বাল্যকাল অরণ্যে অতিবাহিত করলে কৈশোর ও যৌবন ঋষি আশ্রমে। তাই ইন্দ্রের বৈভব তোমার জানা নেই। ইন্দ্রপদ লাভ কত জন্মের তপস্যার ফল। জীবনে যত কিছু আশা আকাঙ্খা, সবার ওপর ইন্দ্রপদ। স্বর্গলাভ থেকে তুমি নিজেকে বঞ্চিত করছ কেন? শুধুমাত্র অহল্যার মতো বরনারীর এইরকম ভাগ্য হয়ে থাকে। ইন্দ্রপদ ব্যতীত ইন্দ্রের কি কোনও গুরুত্ব আছে? ক্ষমতার স্বাদ যে পেয়েছে, সে জানে ক্ষমতা কি? —তুমি কি করে বুঝবে? স্বর্গে যৌবন সুরক্ষিত হতে পারে কিন্তু ইন্দ্রপদ সুরক্ষিত নয়। কেউ কি স্ব-ইচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারে? তুমি ক্ষমতা ভোগ করোনি, তাই ত্যাগের কথা বলছ? একবার স্বর্গরাজ্যে সুখ ভোগ করার পর অভিশপ্ত না হলে কেউ কি মর্তে ফিরে আসে? আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, স্বর্গরাজ্যে তোমার স্থান নির্দিষ্ট, সেই স্থান আর কেউ অধিকার করতে পারবে না।

—"দেবরাজ! তোমার প্রেম দেহভোগের বাসনা থেকে জাত কাম ব্যতীত অন্য কিছু নয়। দেহভোগকে প্রেম আখ্যা দিয়ে প্রেমের অসম্মান করোনা। স্বর্গের মোহ আমার নেই। স্বর্গ ও স্বার্থ এবং ক্ষমতালিপ্সা রহিত নয়। স্বর্গ ও অতৃপ্ত। স্বর্গের ইন্দ্রপদ সুরক্ষিত নয়। ক্ষমতা হারাবার আশঙ্কায় সবাই উদবিগ্ন। তুমি তার প্রমাণ। স্বর্গে আমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল আমার পুত্র শরৎভানু। কিন্তু সে স্বর্গের বাসিন্দা নয়। মর্তের মানুষ বলে স্বর্গ তাকে উচিত সম্মান ও ন্যায্য অধিকার দেয়নি। একদিন না একদিন সে তার মা তথা মাতৃভূমির কোলে ফিরে আসবে। প্রেমকে অমর করার জন্য তুমি ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য ত্যাগ করো। তুমি বীর, বাহুবলে মর্তভূমিতে ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারবে।

আমার ইন্দ্রমোহ ভঙ্গ হয়েছিল—ইন্দ্রপদের কাছে অহল্যা তুচ্ছ। ইন্দ্র অহল্যার জন্য মর্তে অবতরণ করবেন না, অহল্যাকে স্বর্গে উপস্থিত হতে হবে। স্বর্গরাজ্যে অহল্যার স্থান কোথায়? অহল্যা দেবী নয় মানবী, নিজের ইচ্ছায় নয়, গৌতমের কথার সত্যতা পরীক্ষা করা এবং ইন্দ্রের অভিপ্রায় জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম—"হে ইন্দ্রদেব, অহল্যা তো তুচ্ছ মানবী, অহল্যাকে শচীপদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে কি? শুনেছি স্বর্গরাজ্যে শুধুমাত্র শচীপদই নির্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত।"

মেঘ ভেদ করে শোনা গেল ইন্দ্রদেবের অট্টহাসি—"এ কি ধৃষ্টতা! শচীপদ তোমাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কে দিল? ইন্দ্রদেবের বিবাহিতা পত্নীই শচীপদে অধিষ্ঠিতা হন। সতীত্ব এবং পবিত্রতাই শচীপদের বৈশিষ্ঠ। তুমি গৌতম পত্নী। আমার জন্য তুমি পরকীয়া। শচীপদ তোমাকে দেব কি করে? তুমি স্বর্গরাজ্যের অপ্সরা হবে। অনন্ত যৌবন লাভ করে তুমি অপ্সরাদের অগ্রগণ্যা হবে। তুমি হবে আমার প্রিয় দেবনর্তকী। এটা কি কম কথা? তুমি এই দান গ্রহণ করো অহল্যা।"

চরম অপমানের জ্বালা আমার অন্তরে। শচীদেবী সতী আর আমি অসতী। আমার পবিত্রতা এবং একপতিব্রত ভঙ্গ হয়েছে। তাই শচীপদের অযোগ্যা। আমার সতীত্বে কে কালিমা লেপন করেছে? এটাই পুরুষের ঔদ্ধত্য। পরনারীর সতীত্ব নষ্ট করে তাকেই বলবে—"তুমি অসতী।" পরনারীকে ভোগ করে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য উপহার দেয়। পত্নী হিসাবে স্বীকার না করে উপপত্নী করে রেখে পৌরুষ প্রতিপাদন করে। অহল্যা হবে স্বর্গনর্তকী—অর্থাৎ স্বর্গবেশ্যা, দেবভোগ্যা নারী। তাই তার যৌবন ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পুরুষের মনোরঞ্জনকারিণী নারীর রূপ যৌবন-ই হল একমাত্র সম্পদ। সেই সম্পদ আমাকে দান করে ইন্দ্রদেব বদান্যতা দেখাচ্ছেন। অসাধারণ নয়, জাগতিক সুখলোভী নিতান্ত সাধারণ মানুষ ইন্দ্রদেব। ইন্দ্রদেবকে আমার চেনা হয়ে গেছে। সত্যি কি আমি শচীপদ গ্রহণ করতাম? আমি জানতাম ইন্দ্রদেব শচীদেবীকে পরিত্যাগ করবেন না। কারণ ইন্দ্রদেবের এই নারী লোলুপতা একমাত্র শচীদেবীই বরদাস্ত করেন। অন্য কোনও নারী এটা সহ্য করত না। ইন্দ্রপদ শচীদেবীর জন্য অনেকাংশে সুরক্ষিত।

শচীদেবীর পুণ্যে ইন্দ্রদেব অতীতে হৃত ইন্দ্রপদ পুনর্বার লাভ করেন। শচীদেবীই ইন্দ্রদেবের মনোবল। অবশ্য একথা সত্য যে ইন্দ্রদেবের পত্নীপ্রেম অতুলনীয়। তাছাড়া শচীদেবীকে ত্যাগ করলে ইন্দ্রপদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এটাই স্বর্গরাজ্যের নিয়ম। এইসব জানা সত্ত্বেও তাঁর মন জানার জন্য আমি পুনরায় বললাম—"শচীদেবী অনন্ত যৌবনা এবং অনিন্দ্যসুন্দরী তাঁকে অপ্সরাদের নেত্রীপদ প্রদান করে আমাকে একদিনের জন্য শচীপদ প্রদান করতে পারবেন? আমি শচীপদে অধিষ্ঠিত হলে গৌতম কখনও আমার ইন্দ্রানুরক্তিতে ব্যাঘাত ঘটাবে না। 'ইন্দ্রনারী'কে ভোগ করে ইন্দ্রকে বিচলিত করার মতো হীনকর্ম গৌতমের মতো একনিষ্ঠ যোগী করেন না। অহল্যার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করতে পারে, ইন্দ্র ব্যতীত কোনও পুরুষ ত্রিলোকে জন্মগ্রহণ করেননি। তাই একবার আমাকে শচীপদে বরণ করলে, আমি হয়তো আমার জন্মভূমির মোহ ত্যাগ করতে পারতাম। অপ্সরা হিসাবে শচীদেবী তোমার প্রিয়নর্তকী হয়ে থাকবে এবং শুধুমাত্র তোমার মনোরঞ্জন করবে...।"

অকস্মাৎ বজ্রপাত হয় এবং বিদ্যুতের অট্টহাস্য শোনা যায়। ইন্দ্রদেব পৃথিবীর বুকে বজ্রাঘাত করলেন। পৃথিবী কেঁপে ওঠে। সেই কম্পনে কিছু অর্ধদগ্ধ বৃক্ষ ধরাশায়ী হল। কার এই কোপ? ইন্দ্রদেবের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হল—"তুমি নারী, উপরন্তু শাপগ্রস্তা, পতি পরিত্যক্তা, তাই তোমাকে বধ করা অন্যায়। না হলে দেখতে ক্রোধ শুধু ঋষি গৌতমের একচেটিয়া অধিকার নয়, ইন্দ্রেরও ক্রোধ আছে। ইন্দ্রের কোপে পৃথিবী দগ্ধ হয়। অহল্যা, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি শচীদেবীর নাম উচ্চারণ করবে না। শচীদেবী রাজরাজেশ্বরী পতিব্রতা।

সৌভাগ্যবতী ইন্দ্রপত্নী। শচীদেবী স্বর্গনর্তকী হয়ে দেবতাদের মনোরঞ্জন করবেন একথা বলার সাহস হল কি করে তোমার? তুমি গৌতমপত্নী তাই তুমি যুক্তি দেখাতে পার যে—গৌতমপত্নীকে ইন্দ্রদেব অপ্সরাপদ অর্পণ করছেন কোন সাহসে?

ইন্দ্রপত্নী বা দেবপত্নীর স্বর্গ নর্তকী হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই, কিন্তু কখনও কখনও দেবনর্তকী বা অপ্সরাদের মর্তে অবতরণ করে ঋষিপত্নী বা রাজরানি হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। বিশ্বামিত্র মেনকা, পুরুরবা উর্বশীর উপাখ্যান তুমি নিশ্চয় জান। সেই দৃষ্টিতে তোমার স্বর্গনর্তকী হওয়ার কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু শচীদেবীর স্বর্গনর্তকী হওয়ার কথা বলা অত্যন্ত গর্হিত ও অসম্মানসূচক। অহল্যা, তুমি ব্রহ্মাপুত্রী, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। যাইহোক, তুমি স্বর্গের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করো না। একটা কথা মনে রেখ, তোমার অনন্ত যৌবন রক্ষা করার ক্ষমতা শুধুমাত্র স্বর্গরাজ্যেরই আছে। রূপ ও যৌবন ব্যতীত অহল্যার কি মূল্য?

রূপহীনা অহল্যা গৌতম কিংবা ইন্দ্র কারও কাম্য নয়। অহল্যা জরাগ্রস্ত হলে ইন্দ্র দূরে সরে যাবে। স্বর্গরাজ্যে জরা ব্যাধির স্থান নেই।

অহল্যা, তোমাকে পেয়ে আবার হারালে ইন্দ্রের অতৃপ্ত জ্বালা কে মেটাবে?

—"দেবরাজ। পাওযার অর্থ কি দেহপ্রাপ্তি? যে প্রেম রূপের আকর্ষণ থেকে জাত, তা

দেহগত জৈবিক ক্ষুধা ব্যতীত অন্যকিছু নয়। পার্থিব কামনা থেকে যে প্রেমের জন্ম দেহসম্ভোগের পরই সেই প্রেমের মৃত্যু হয়। সেখানে প্রেমিকা পরিণত হয় মনোরঞ্জনকারী নারীতে। অপ্সরাকে দেবনর্তকী বললেও সে স্বর্গবেশ্যা হিসাবে পরিগণিত। ইন্দ্রদেবের কাছে নারী তথা অহল্যার স্থিতি জানতে পারলাম। এইটুকু উপলব্ধির জন্য এতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ভাবতে পারিনি। আমার এই ত্যাগ যেন ব্যর্থ না হয়, সেই সাধনাই করব। এইরকম উপলব্ধির জন্য অহল্যা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।" ইন্দ্রদেবের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না—সম্ভবত তিনি নিরাশ হলেন। তিনি ভাবতে পারেননি যে তাঁর দেবসভায় কোনওদিন অহল্যার নুপুর নিক্কন ধ্বনিত হবে না। তিনি ভেবেছিলেন—নন্দনকানন পারিজাত, চিরযৌবন ও অমরত্বের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারবে না অহল্যা। রূপবান ইন্দ্রদেবের কামনার আহ্বানকে প্রত্যাখান করতে পারবে না।

ইন্দ্রদেব ব্যথিত হলেন ভেবে কেন কে জানে শঙ্কিত হলাম। আমার স্বভিমানের জন্য পৃথিবী যদি ইন্দ্রকোপের সম্মুখীন হয়, তাহলে আমি কি করব?

মেঘ অপসৃত হল—ইন্দ্রদেব ব্যোমযানে অন্তরীক্ষে প্রকট হলেন, কিন্তু পৃথিবীতে অবতরণ করলেন না। তিনি জানেন—অহল্যা আর নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করবে না।

কয়েক ফোঁটা জল তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ল। ইন্দ্র অনুকম্পা। রাজা দানব হলেও তার অনুকম্পার ওপর নির্ভর করতে হয়। ইন্দ্র করুণাকে পৃথিবী অগ্রাহ্য করবে কি করে? বিরাগ সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতায় মন আপ্লুত হল। আমি ইন্দ্রদেবের দিকে চোখ তুলে তাকাই না। জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে এই পুরুষটির কাছে আমি যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম, সেকথা ভাবমাত্রই ক্ষোভ, গ্লানি ও লজ্জায় আমি ম্রিয়মান হয়ে বসে থাকি।

ব্যাথাতুর কণ্ঠে ইন্দ্রদেব বলেন—"অহল্যা, শেষবারের মতো তোমাকে প্রাণভরে দেখতে চাই। তোমার এই রূপ যৌবন স্বর্গরাজ্যে অম্লান থাকত। সেটা তুমি পায়ে ঠেলে দিলে। আজ থেকে শুরু হবে তোমার শাপগ্রস্ত শরীরের পাতাঝরার ঋতু। —অবক্ষয়, জরা, সৌন্দর্যহীনতা। তারপর আমি আর তোমার দিকে তাকাতে পারব না। নিজের ধৈর্যের ওপর আমার আস্থা নেই। যে অহল্যা সমগ্র জীবনকে গ্রাস করেছে, যে অহল্যা আমাকে পারজয়ের গ্লানি দিয়েছে, যে অহল্যা আমার স্বপ্নের রানি। যে অহল্যাকে স্পর্শ করে আমার ইন্দ্রত্ব ধন্য হয়েছে। আমার পুরুষত্ব স্পর্শের উপলব্ধি পেয়েছে। যে অহল্যাকে পেয়ে হারাবার ব্যাথায় আমি আজ বিষাদগ্রস্ত। যে অহল্যা আমার সনাতন তৃষ্ণা, সে আমাকে শুধু কামতৃপ্তি দেয়নি, প্রেমের অপার্থিব, উপলব্ধিও দিয়েছে। যে অহল্যার সাথে ক্ষণিকের দেহসঙ্গম আমার সমগ্র জীবনকে রোমাঞ্চিত করেছে, যে অহল্যার বিরহ আমার অনন্ত ভবিষ্যতকে নমনীয় করেছে, যে অহল্যা আমাকে বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র শুনিয়েছে, সেই মানবী দেবীকে শেষবারের মতো চোখ ভরে মন ভরে দেখে নিই। এই শেষ দেখা। যদি কখনও তুমি শাপমুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে স্বর্গে আসতে চাও, স্বর্গের পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত রইল। ইন্দ্র তোমার জন্য সারাজীবন

অপেক্ষা করবে। আর একবার আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—স্বর্গই তোমার উপযুক্ত স্থান। এসো অহল্যা, তোমার রূপ যৌবনকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বর্গ তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে। অমৃত ও অমরত্ব তোমার জন্য অপেক্ষা করছে...।"

ইন্দ্রদেবের প্রেমপূর্ণ বিদায় বাণীতে নারী হৃদয় বিগলিত হতে হতে সহসা হিমশীতল হয়ে যায়—হৃদয়ের মধুকোষের প্রত্যেকটি রন্ধ্র অবরুদ্ধ হয়ে যায়—ইন্দ্রদেবের অন্তিমবাক্যে নিজের রূপ যৌবনের ওপর ঘৃণা জন্মায়। যে রূপ যৌবনকে একদিন আমার সৌভাগ্য মনে হত, এখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে সেটাই আমার দুঃখের কারণ। তা বলে কি রূপ যৌবনের কোনও স্থান নেই এই পৃথিবীতে? আছে—কিন্তু রূপের অহঙ্কার ও যৌবনের মদবিহ্বলতার স্থান কোথাও নেই—না পৃথিবীতে না স্বর্গে? আমার রূপের গর্ব ধূলিসাৎ হয়েছে রূপের অহঙ্কার ও যৌবনের মোহভঙ্গের সাথে সাথে আমার ইন্দ্রমোহ এবং স্বর্গমোহও ভঙ্গ হল। মনে হল, পৃথিবী একমাত্র মোহমায়া নয়, স্বর্গও মোহ-মোক্ষ ও অহঙ্কার। হে প্রভু, আমাকে মোহমুক্ত করো, অহঙ্কার শূন্য করো, নির্লিপ্ত করো...।"

প্রার্থনা শেষ করে অন্তরীক্ষের দিকে তাকালম, ইন্দ্রদেব অপসৃত হয়েছেন—আমার দৃষ্টিপথে শুধু মেঘ আর মেঘ—চারদিকে ঘোর অভিশাপ ঘিরে আসছে তা সত্ত্বেও বিকট পাপ আমাকে ত্যাগ করছে না...।"

হে দুষ্টা পাতকী, যৌবনকালে তোমার বশীভূত হয়ে আমি অভিশাপ ভোগ করছি। এবার আমি যৌবনকে ত্যাগপত্র দিতে বদ্ধপরিকর। তাই তোমাকে আমার অধীনস্ত হতে হবে। হে আমার প্রিয় পাপ, তোমার দুষ্কর্ম আমাকে সৎকর্মের জন্য প্রেরিত করছে। তোমার সংস্পর্শে এসে আমি যে যাতনা সহ্য করেছি তাতে আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। তোমার বেত্রাঘাতে আমার শরীরে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাবে আমি কুটিল পথ ত্যাগ করে সরল পথের যাত্রী হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করছি।

তোমার প্ররোচনায় ভোগের কষাঘাত সহ্য করে আমি ভাবজগতে প্রবেশ করছি। তোমার অন্তরঙ্গ আঘাতে পতনের গভীর গহ্বরে পড়ে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে আজ তারই প্রভাবে আমি মলয় পর্বতের শিখরে উঠে পুণ্যের চন্দনে অবগাহন করার মনস্থ করেছি। হে মায়াবিনী পাপ, তোমার সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে আমি আমার অন্তরঙ্গদের থেকে এমনকি অন্তরঙ্গ স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম বলে আজ তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তপস্যা করছি, তুমি বাধা সৃষ্টি করো না। আমি তোমাকে চিনেছি, কিন্তু স্বকে চিনতে পারিনি। আমি জানি কামনার মতো তোমারও বিনাশ নেই। তোমার বিনাশ হলে মানুষের মনের কলুষ কালিমা ও মোহকে পশ্চাত্তাপের অশ্রুজলে কে ধুয়ে দেবে? তাই হে পাপ। তুমি নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে তোমার দুষ্কর্ম থেকে জাত সৎকর্ম দেখার জন্য প্রস্তুত থাক।"

মোক্ষ

হে আমার ইপ্সিত মোক্ষ!

অভিশপ্তার অকপট প্রণতি গ্রহণ করো। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষের কুঠারাঘাতে আমার অন্তরের কলুষ নির্গত হচ্ছে। নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য আমি তোমার শরণাগত।

যখন পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তখন নূতন দ্বীপ সৃষ্টি হওয়ার মতো শাপ ও মোক্ষ, যৌবন ও জরা, কাম ও রামের দ্বন্দ্ব থেকে আমার চেতনায় নবীন দিকের জন্ম হয়েছে। আমার অন্তরের ভিতর থেকে কে যেন বলছে শ্রদ্ধা ও সদিচ্ছা থেকে মানুষ পরম উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়। ঘৃণা প্রতিহিংসা ও হতাশা থেকে উপলব্ধি হয় না। যদিও হয় তা মোক্ষ নয়। হতাশা নয় নূতন আশা ও সদিচ্ছা আমাকে মোক্ষপথে চালিত করছে।

সে মোক্ষের স্বরূপ কি? অমরত্ব—স্বর্গলাভ? অনন্ত যৌবন না আজ আর সে সকলের কোনও আকর্ষণ নেই। স্বর্গের স্বরূপ ও যৌবনের পরাভব আমাকে মৌন করে দিয়েছে। আমার জীবনের অন্তিম ইচ্ছা হল জড়ত্ব মুক্তি, দেহবন্ধন থেকে মুক্তি। অন্তঃকরণের চরম ত্যাগ-ই আমার তপস্যা। অন্তর্যজ্ঞই আজ আমার অভীষ্ট। আমার জন্য যৌবন আজ আর ভোগ নয়—বৈরাগ্য।

অভিশাপগ্রস্তা, লাঞ্ছিতা, সমাজ পরিত্যক্তা বলে আমি সমাজবিমুখ এমনকি আনন্দবিমুখও নয়। সুখ ও আনন্দের সূক্ষ্ম পার্থক্য আমার কাছে আজ স্পষ্ট। তাই সুখ নয় আনন্দের আরাধনাই আজ আমার ব্রত।

সম্পূর্ণ আনন্দময় পরিস্থিতিতে কি করে পৌঁছাব? কে সেই পুরুষোত্তম যে দিব্য স্পর্শের মাধ্যমে আমাকে প্রতিস্পর্শে পরিণত করবে?

অভিশাপ আমাকে এমন হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, নিজের সৌন্দর্যও আমাকে তাড়া করছে। আজ ইন্দ্রও আমার অভীষ্টদাতা নয়, গৌতম স্বামী হয়েও শাপদাতা। তাই একমাত্র পরমাত্মাই ভরসা।

কিন্তু পরমাত্মার করুণালাভ করার একাগ্রতা কিভাবে অর্জন করব? পরমাত্মাকে স্মরণ করামাত্রই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে অগ্নিকণার মতো আমার দেহ থেকে পৃথক এক আলোকিত সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গের সত্তা আমি অনুভব করি আমার অন্তরে। চোখ বন্ধ করে অন্তরে তাকালে

বিশ্বাসই হয় না যে আমার ভিতরের সেই তেজস্বী সত্তাটিও আমি। কে আমাকে আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দেবে? যোগচ্যুত গৌতম? মতিভ্রষ্ট ইন্দ্র।

আমি ইচ্ছা করলে এই পৃথিবীকে দু'ভাগ করে সীতার মতো অগ্নির আশ্রয় নিতে পারতাম। আমি যখন আমার আত্মলিপি লিখছি, তখন সীতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। অভিমানে অসময়ে মুক্ত হয়ে গেছে জগতের বন্ধন থেকে। আমি সীতার মতো অভিমানিনী নয়। তাই আমি আত্মবিসর্জন দিইনি। আমার অখণ্ড পৃথিবীকে দু'ভাগ করতে পারিনি। অভিশপ্তা হয়ে মরতে চাইনি। আমি চাইলে প্রলয় করে দিতাম, আমার সামান্য ঈঙ্গিতে অনার্যেরা আর্যাবর্তে রক্তের স্রোত বইয়ে দিত, ইচ্ছা করলে গৌতমকে উন্মাদ এবং ইন্দ্রকে ক্লীব করে দিতে পারতাম। আমি ইচ্ছা করলে সাধুসন্ত এবং সমাজের দণ্ডধারী হিসাবে পরিচিত রাজা, মুনিঋষি সবাইর মুখোশ খুলে দিতে পারতাম।

জ্ঞান হওয়ার দিন থেকে কত বিপদ যে আমি অতিক্রম করেছি, তার হিসাব দিয়ে নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রমাণ করতে পারতাম। গৌতম তো জানেন না, এমনকি পিতা কিংবা ভাই নারদও জানেন না। প্রথাও জানত না, আমার শরীর যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আমি কত প্রলোভন এড়িয়ে গেছি। পুরুষের নিঃশ্বাস থেকে নারী জানতে পারে তার মন এবং অভিপ্রায়। পুরুষের চাউনিতে নারী পড়তে পারে তার অবচেতনার বুভুক্ষা। কিন্তু এর হিসাবে কাউকে দেওয়া যায় না, এমন কি স্বামীকেও।

যদি গৌতমকে এই হিসাব দিতাম, তাহলে গৌতম উন্মাদ হয়ে যেতেন। কৈশোরের বহু পূর্ব থেকে আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ পুরুষের কামদৃষ্টিতে জর্জরিত হয়েছে। একা আমি নয়—রূপসী নারীমাত্রেই এই নিয়তি। তার মধ্যেই বাঁচতে হয়—প্রতিদিন তপস্যায় অগ্নিস্নান করে সংযমের সোপানে উত্তরণের শিখরে উঠতে হয়। আবার কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে দুষ্ট মোহের প্ররোচনায় সমস্ত সংযম পণ্ড হয়ে যায়। পূর্বের সমস্ত সংযম ও নিষ্ঠার হিসাব দাখিল করলেও সেই একটা পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।

আজ আমি পাপ থেকে রক্ষা পেতে চাই না—চাই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। সোনার মতো অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু অশ্রুপাত করে নয়—হাসতে হাসতে শাপমোচনের অগ্নিময় পথে আমি এগিয়ে যেতে চাই। রক্ত নয়, মানুষের হৃদয়ে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত করে তাতে অবগাহন করে শুদ্ধ পবিত্র হতে চাই। কে আমাকে পথ দেখাবে?

নিস্তব্ধতার মধ্যে ব্রহ্মস্বর ধ্বনিত হল—"হাসতে হাসতে শাপমুক্ত হওয়ার উপায় আছে অহল্যা।"

কত সহস্রবার এই মন্ত্র তোর কানে দিয়েছি। তখন তুই মন্ত্রমুগ্ধা নয় ইন্দ্রিয়মুগ্ধা ছিলি। তুই ছিলি দেহসর্বস্ব নারী। তাই সে মন্ত্রের অর্থ তুই উপলব্ধি করতে পারিসনি। অভিশাপ আজ তোকে মন্ত্রময়ী করেছে। আজ মন্ত্র তোর কাছে অর্থবহ। এটুকু মনে রাখ, বহু নারী কামী

কোনও পুরুষ কখনও নারীর বন্ধু বা হিতৈষী হতে পারে না। ইন্দ্র তোর হিতৈষী নয়, এটা বুঝতে না পারার জন্য তুই সঠিক পথের সন্ধান পাসনি, যেদিন তোর কামাশ্রিত অন্তঃকরণ রামাশ্রিত হবে, সেদিন তুই মোক্ষপথের সন্ধান পাবি।

তুই হয়তো ভাবছিস, কে এই রাম? উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হলে রাম তোর অন্তরে আবির্ভূত হবেন। সমস্ত জগত তোর রমণীয় মনে হবে। কাউকে তোর শত্রু মনে হবে না। ঘটিত পাপের জন্য হীনমন্যতা ত্যাগ করে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। নিজের আলোকিত দিকটি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর নিজের প্রতি আস্থাশীল হলে ধীরে ধীরে তপস্যা ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবি। সেটাই তোর দীক্ষাগ্রহণের লগ্ন। কিন্তু শুধুমাত্র দীক্ষিতা হলে মোক্ষ সম্ভব নয়। যদি নিজের দীক্ষাপূত শক্তি অন্যের মঙ্গলের জন্য উদ্দিষ্ট না হয়, তাহলে সে দীক্ষা দীক্ষা নয়। সে তপস্যা ব্যর্থ। মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধুমাত্র যজমান, দেবতা, সমিধ ও হবি দ্বারা যেমন যজ্ঞ সফল হয় না, সেইরকম শ্রদ্ধা ও দীক্ষার সাথে পরোপকারের ভাবনা যুক্ত না হলে সিদ্ধিলাভ ও মোক্ষ সম্ভব নয়। তোর অন্তরে যখন এই মহাসংযোগের মহালগ্ন উপস্থিত হবে তখন রামের অবির্ভাব হবে। তখন তোর দৃষ্টিতে পৃথিবী অন্তরীক্ষ, স্বর্গ নরক দেবতা দানব মানব সবই রমণীয় হয়ে উঠবে। তুই পরিণত হবি অন্নদাত্রী, জলদাত্রী, স্তন্যদাত্রী জননীতে। তুই হয়ে যাবি দেবী অনসূয়া। সকলের মধ্যে দেখতে পাবি তোর সন্তানদের। তোর ঘর সংসার-আত্মীয়স্বজন ও স্বামীকে ফিরে পাবি। তখন স্বর্গ, মর্ত-পাতাল তোর অধীন হবে। সমাজের অন্যায় অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে যাবি। কল্যাণময়ী জলদকে কেউ কি পাহাড়ে বেঁধে রাখতে পারে? অহল্যা! এই কথা শুধু তোর ক্ষেত্রে নয়, গৌতমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক সুগুণ সত্ত্বেও গৌতমের অন্তরে রমণীয়ভাবের বংশী ধ্বনিত হয়নি। তাহলে গৌতম আশ্রমে এতবড় অঘটন ঘটত না। শুধুমাত্র কামদমনে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। রামভাবে অবগাহন করে, মৈত্রী বন্ধনে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-কে সমন্বিত করতে না পারায় গৌতম যজ্ঞভ্রষ্ট ও অভীষ্টচ্যুত হয়েছেন। আজ গৌতমও অভিশাপগ্রস্ত। এতদিন গৌতমের লক্ষ্য ছিল মস্তিকের উৎকর্ষসাধন। আজ সে অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী। অন্তঃকরণের এই গভীর স্তর আবিষ্কার করার একমাত্র পন্থা হল নিষ্কাম ভক্তিযোগ। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তর্কের মাধ্যমে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেয়ে অন্তর্চেতনার দ্বারা সমস্যার মহত্তর সমাধান সম্ভব বলে একদিন গৌতম উপলব্ধি করবে। চেতনার কেন্দ্র মস্তিষ্ক নয়, অন্তঃকরণ। মস্তিষ্ক তো শুধুমাত্র পরিধি। রামের দর্শনের জন্য আজ গৌতম তপস্যারত। কিন্তু তোর রামদর্শন না হলে গৌতমের সেই সৌভাগ্য লাভ হবে না। তোকে অভিশাপ দেওয়ায় সন্তপ্ত গৌতমের এ হল আত্ম অভিশাপ। তোর অন্তরের কলুষ নির্গত হওয়ার পর রামদর্শনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত উপস্থিত হবে। তোর তপস্যা সফল হবে। রামভাব-ই তোকে রামদর্শন করাবে।

"হে বিপদ! হে অভিশাপ—তোর লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলে উঠুক, সেই অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে আমার অহল্যার আত্মার কলুষ নির্গত হয়ে যাক। শুদ্ধ সুবর্ণ হয়ে অহল্যা জগতকে সৌন্দর্যের সারতত্ত্বে বিভূষিত করুক। অহল্যা এবং গৌতমের নিরাভিমান রমণীয় মিলন অনুষ্ঠিত হোক।"

পিতার এই আশ্বাসবাণী আমার অভিশাপকে মধুময় করে। আমাকে পতন থেকে উত্থানের আহ্বান জানায়। ভেবেছিলাম—আমার এই স্খলনের জন্য গৌতমের অভিশাপের চেয়েও পিতার অভিশাপ আরও ভয়ঙ্কর হবে। কিন্তু পিতৃ হৃদয়ের উদারতা ও সদিচ্ছা আমাকে জগতের প্রতি উদার ও শুভেচ্ছু করে তোলে। আজ পর্যন্ত পিতার স্নেহ আমি অনুভব করতে পারিনি। আজ বিপদের মধ্যে তাঁর স্নেহ অতুলনীয় মনে হচ্ছে। বিপর্যয়ে পিতা ব্যতীত আর কে আশ্বাস দিত। অন্ধকারের মধ্যে কে আলোর রাস্তা দেখাত? রূপের অহমিকা ত্যাগ করে আমি আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হচ্ছিল না। অভিশাপের কালরাত্রিতে নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর জাগতিক ও মহাজাগতিক ঘটনা আমার চতুর্দিকে ঘটতে থাকে। ইন্দ্রের সতর্কবাণী প্রতিমুহূর্তে আমাকে আসন্ন জরা ও মৃত্যুর ভয়ে ম্রিয়মান করে তোলে। আমার ক্ষুদ্র কামনা বাসনা তিল তিল করে আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় জর্জরিত করে। আমার জীবন ও যৌবন এই মুহূর্তে আমাকে স্বর্গ ও অমরত্বের প্রতি প্রলুব্ধ করে আবার পরমুহূর্তে আমার অনুতপ্ত হৃদয় আমাকে সমাধিস্থ হতে আহ্বান জানায়। কোথাও পক্ষীদম্পতির চঞ্চু চুম্বন, কোথাও হরিণ-হরিণীর কামক্রীড়া আবার কোথাও ভ্রমরের মধুপান আমার ধ্যানভঙ্গ করে। ভোগময়ী প্রকৃতির কামকলার চাতুরীতে আমি বিচলিত এবং যোগভ্রষ্ট হচ্ছিলাম। মৃত্যুকে জয় করার জন্য ব্রহ্মচর্যে মনোনিবেশ করামাত্রই দূরিত কাম বারম্বার আমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। একটা মহান সংকল্পের পথে শতসহস্র বিঘ্ন কি জগতের নিষ্ঠুর সত্য! আমার মধ্যে ইন্দ্র এবং গৌতম, স্বর্গ ও মর্ত, মৃত্যু এবং অমরত্ব, যৌবন ও জরা, ভোগ ও মোক্ষ, কামভাব ও রামভাবের সংঘাত শুধু আমাকে নয়, আমার চতুর্দিক এমন আন্দোলিত করে যেন এক ভয়ঙ্কর ভূকম্পন, অনুভূত হয়। আমার দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার সমগ্র আর্যাবর্ত, সপ্তসিন্ধু ভূখণ্ড ও সরস্বতীর অবশিষ্ঠ সংস্কৃতি দোদুল্যমান হওয়ার সাথে বিশাল সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছিল। এতসব সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছিল পরমাত্মা ও প্রকৃতি আমার দুর্দিনে আমার সাথে আছে। আর চিন্তা কি? আমার পার্থিব চোখ অবশ্য পরমাত্মার দর্শন পায়নি, কিন্তু প্রকৃতির লীলা দর্শন করে ধীরে ধীরে পরমাত্মার উপলব্ধি পাব বলে মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগে। যদি পরমাত্মা এখানে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে অহল্যার দগ্ধভূমতে পত্রহীন বৃক্ষশাখায় কি করে নবপত্র মুকুলিত হত। মৃতপ্রায় বনলতিকার অঙ্গে কে রোমাঞ্চ জাগাত! আমার ভিতরেও পরমাত্মার শক্তি আছে যা আমাকে সমস্ত বিপর্যয়ের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারবে। এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি পুনরায়

ধ্যানস্থ হলাম। অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড আমার কাছে স্পষ্ট হল। আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য দর্শন করলাম। নন্দনকাননের পারিজাত স্পর্শ করলাম। কিন্তু আমার পার্থিব পৃথিবীর দগ্ধবনে পত্রহীন বৃক্ষে নবকিশলয় যদি আমি প্রত্যক্ষ না করতে পারি তাহলে মহাজাগতিক দৃশ্যের মূল্য কি? আমি শ্বাসরোধ করে অন্তর্মুখী হলাম। কিন্তু অন্তর যদি প্রেমশূন্য হয়, তাহলে সেই অন্তর দর্শনের মূল্য কি?

আমার এই প্রিয় পৃথিবীতে যখন দুঃখ শোকের হাহাকার আমি কোন অভাবিত আনন্দের পথে ধাবমান? এই জগতে আমার সামান্য সেবা ও স্নেহের আবশ্যকতা থাকলেও আমি কোন মহাজগতে উত্থিত হতে চাই যেখানে দুঃখ শোক হাহাকার নেই এমনকি আমারও আবশ্যকতা নেই।

আজ আমি যে অপার্থিব আনন্দের সন্ধান পেয়েছি, তা আমার জন্য অর্থহীন—যদি অন্যের দুঃখ যন্ত্রণা আমি অনুভব করতে না পারি। কে যেন আমাকে বলে—প্রিয় হতে প্রেম বড়। তাই ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের প্রেম আমার কাছে বড়। গৌতমের চেয়ে গৌতমের প্রতি বিশ্বাস আমার কাছে বড়। সন্তানের চেয়ে বাৎসল্য বড়, সম্ভোগ অপেক্ষা বিয়োগ বড়। আত্মসুখ থেকে আত্মবিয়োগ আমার কাছে কাম্য।

আমার কাছে সর্ব সম্পর্ক আজ সম্পর্করহিত। ইন্দ্র, গৌতম পিতা বন্ধু সন্তান, সখী, সহচরী সকলের সাথে লৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। স্নেহহীনতা সত্ত্বেও নির্মোহ নির্লিপ্ততা আমাকে স্নেহময়ী করেছে। আশ্চর্য, বিচলন সত্ত্বেও প্রেমের এই নিমীলনে বিচলন নেই। সম্পর্কহীনতার জড়তা সত্ত্বেও দিব্যপ্রেম জড় নয়। এই দিব্য নিষ্কাম প্রেম হল অমৃত। সত্য দর্শনই প্রেমের শ্রেষ্ঠরূপ। প্রেমের স্বভাব হল পরমভাব। এই ভাবে যে সৌন্দর্য নিহিত তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য। দগ্ধভূমিতে কোমল দূর্বাদল দেখে আমার হৃদয়ে প্রেমভাবের উদয় হয়। এই প্রেমে উন্মত্ততা নেই। সদ্‌ভাবনায় জগতকে আলিঙ্গনের আশায় আমার প্রেম আজ চিরস্পন্দনময়। প্রেমের এই রূপ আমার ভাবভূমিকে করেছে মনোজ্ঞ। এই ভাবাশ্রিত প্রেম এত বিশাল, সেখানে পাষাণে জীবন, জীবনে সৌন্দর্য, সৌন্দর্যে, সম্পূর্ণ সমর্পণের নিত্যলীলা রচিত হচ্ছে। এই উপলব্ধি সৌন্দর্য অনুভবের যাত্রাপথে অন্তর্জগতের ভাব বৈচিত্রের উচ্চ শিখরে আমাকে পথ দেখিয়েছে।

গৌতম! সৌন্দর্য সাধনায় ছন্দোবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য অহল্যা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। হে ইন্দ্র! দেহের পূর্ণতা ও তুচ্ছতার উপলব্ধির জন্য অহল্যা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আজ আমি খণ্ডিতা অহল্যা নয়। আমি কিছুই হারাইনি। যদি আমার বন্ধু পরিজন আমাকে ত্যাগ করতেন তাহলে এই প্রলয়ের মধ্যে অমি বেঁচে থাকতাম কি করে? এই দগ্ধভূমির চতুর্দিকে প্রহরারত অনার্যগণ আমার অন্তরে অহরহ কলরব সৃষ্টিকারী আমার সন্তান ও বন্ধুপরিজন। আমাকে খাদ্য পানীয় ছায়া দানকারী এই প্রকৃতি কি আমার কেউ নয়? আজ

আমার কোনও শত্রু আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি পূর্ণের পূর্ণ অংশ। আমি অদিতি, অখণ্ডনীয়া। কে বলেছে বোধদায়িনী সরস্বতী মারা গেছে? আজ মনে হচ্ছে সে মরেনি। সে পার্থিব শরীর থেকে মুক্ত হয়েছে। মরুভূমির হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গু হয়ে অনন্তকাল প্রবাহিত হবে। একদিন মানুষের মোক্ষের জন্য গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর ত্রিবেণি সঙ্গম হবে। অকস্মাৎ বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠা সরস্বতীর মৃত্যু ভাবনা এবং অমরত্বের কল্পনা আমার মৃত্যুভয়কে দূর করে দেয়। আমার অন্তঃকরণ উদ্বেল করে কার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কার পবিত্র পদস্পর্শে দগ্ধবনভূমির সীমায় মহাপ্রকৃতির শ্যামল বিস্তার। শুষ্ক সরসীতে কোথা থেকে এল অমৃতের প্লাবন। কার নির্দেশে কমলকলি পাপড়ি মেলেছে? আমার চতুর্দিকের নিদাঘ ঋতুতে কে বসন্ত রচনা করল? আমার হৃদয় প্রস্ফুটিত হচ্ছে কোন দিব্য আকাঙ্ক্ষায়!

প্রেমের নিমীলনে থেকে লক্ষ্য করছিলাম ভ্রমরের মধুমোহ। আবার মৌমাছির মধু সঞ্চয় নজরে পড়ে। মধুমতী ফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কাকে বরণ করবে? ভ্রমরকে না মৌমাছিকে?

ভ্রমরের মধুমোহ আমাকে উল্লসিতা করে। মৌমাছির মধুসঞ্চয় আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে ভ্রমর হল মহাভোগী ইন্দ্র এবং মৌমাছি হল মহাযোগী ঋষি দংগধ অথর্বণ। মধুবিদ্যা লাভ করে সে জগতকে মধুময় করে তোলায় ব্রতী। সে মধুপান করছে না—মধুধ্যান হচ্ছে। বিন্দু বিন্দু মধুসংগ্রহ করে মধুকোষ রচনা করছে এবং তার চতুর্দিকে পরিক্রমা করে মধুচক্র সৃষ্টি করছে, নিজের জন্য নয় জগতের জন্য। সেটাই তার সমগ্র জীবনের সাধনা। মধুর স্বাদ পেয়েও যে মধুপান না করে অপরকে বিতরণ করে তার চেয়ে বড় যোগী আর কে আছে?

কিন্তু এই মধুপায়ী ভ্রমরকে দেখ, ফুল থেকে ফুলে উড়ে গিয়ে আকণ্ঠ মধুপান করছে। তবুও তৃষ্ণার শেষ নেই—একবিন্দু মধু কাউকে দেয় না। স্বার্থপর, কামুক লম্পট ভ্রমরের খেয়াল নেই যে সন্ধ্যা আসন্ন পদ্ম ক্লান্ত এবং বীতস্পৃহ। মৃত্যুরূপী কাম উপস্থিত। মুহূর্তের মধ্যে মধুমোহের মৃত্যু গহ্বরে মধুপের জীবনাবসান হল। মুদ্রিত পদ্মফুল নির্বিকার। ধিক কাম-ধিক্ তোর খল-লীলা।

কে যেন আমাকে বলে—গৌতম মৌমাছি আর ইন্দ্রদেব ভ্রমর। মোহগ্রস্তা অহল্যার দেহ ভোগ করে ইন্দ্রদেব তাকে আজ স্বর্গ বারাঙ্গনার পদে বরণ করতে চাইছেন। অহল্যার দেহের অধিকারী হয়েও গৌতমের সাধনা ছিল অহল্যার আত্মার সৌন্দর্য বিকশিত করে তাকে দেহময়তা থেকে মুক্তি দেওয়া। ইন্দ্র মধুপায়ী, গৌতম মধুগ্রাহী। কে কাম্য?

পদ্ম হল ভোগময়ী প্রবৃত্তি, যে ভোগীকেও ভোগ করে। পদ্মমধু হল সনাতন অমৃত, যা ভোগকে ভাবে পরিণত করে। এই উপলব্ধি কে দিল আমাকে?

ভোগমৃত্যুর এই দৃশ্যটি আমার কাছে ছিল উদ্বোধনের মুহূর্ত। ভোগময়ী প্রবৃত্তি অহোরাত্র মানুষকে বাসনায় বিপর্য্যস্ত করে। কিন্তু আমি উপলব্ধি করেছি, মরণশীল হলেও মানুষ ভোগ-বর্জন করে ব্রহ্মদর্শনের অমৃতলাভ করতে পারে, আমি ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিতা কেন?

অন্তরাগের চারুচুম্বনে হৃদয়ের ভাবসমুদ্রে মঞ্জুল তরঙ্গ উঠেছে। কামবর্জিত হৃদয় নিষ্কাম প্রেমধারায় মুহুর্মুহু সোমস্নাত হচ্ছে। রাতের অন্ধকার আর আমাকে অন্ধ করে না। আর আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নয়। প্রভুর মহত্ত্ব এবং নিজের তুচ্ছতা আমি সবসময় অনুভব করছি। আমার মনের অভিমান দূর হয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দিব্যভাবনায় অবনমিত করে আমি পশুত্ব থেকে মুক্তি চাইছি।

হে ইন্দ্র, স্বর্গের মৃত্যুহীন অমরত্ব নয়, মর্তের মরণশীল অমরত্বই আজ আমার কাম্য। তাই আর অমরত্বের প্রলোভন কেন? অকপট চিত্তে পাপ প্রকট করায় আজ আমার কুণ্ঠা নেই।

হে প্রভু, কাম হল বিষ-সমুদ্র। তার বিকট বিষাক্ত গভীরতা নিরূপণের শক্তি আমার ছিল না। সমুদ্রের ভয়াবহতা জেনেও রত্নমালায় লুব্ধ হওয়ার মতো আমার অবদমিত কামবাসনা ছদ্মরূপ ধারণ করে গৌতমের বৃষ্টিযজ্ঞে হবি হয়েছি বলাটা ছিল প্রতারণা। তার ফলে শুধু গৌতমকেই নয় নিজের অন্তরাত্মাকেও প্রতারিত করেছি। ইন্দ্র সমর্পণের পিছনে আমি কত যুক্তি না উপস্থাপন করেছি নিজের স্বপক্ষে আর গৌতমের বিপক্ষে। কিন্তু কাম এমনই কালিমা যে তার ছদ্মরূপ গোপন থাকে না; বরং অধিকমাত্রায় প্রকট হয়ে ছদ্মবেশীকে লাঞ্ছিত করে। ইন্দ্রের আজ সেই অবস্থা, আমরা অবস্থা ততোধিক।

ভ্রমরের মৃত্যু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে, কামনা প্রতিহত করার শক্তি আমার মধ্যে ছিল কিন্তু ইন্দ্রের কপট প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমার ভিতরের অতৃপ্ত কামনা অনায়াসে সমর্পিত হয়ে যায় ভ্রান্তি দেবতার চরণে, ইন্দ্রমোহ-ই ছিল আমার 'মহামোহ।' এই মহামোহের অন্ধকার আমার ইহকাল পরকাল জন্ম-জন্মান্তর আচ্ছন্ন করার পূর্বে মহামোহকে মহত্ত্বের প্রতি মোহে পরিণত করার শক্তি আমাকে কে দেবে? সম্প্রীতির সুরম্য সঞ্জীবনীতে আমার জরা মৃত্যুকে রসা. করে আমার অন্তর বাহির রমণীয় করবে কে?

রাত্রি আসন্ন, যৌবন অস্তমিত, সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের পদধ্বনি। ইন্দ্রিয় শিথিল। জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতিতে কত দেরি? জীবন ও যৌবনের অনুভূতিতে আমি অভিজ্ঞা। অন্তর্যজ্ঞের পূর্ণাহুতির জন্য আমি প্রস্তুত।

আমার শরীরে আজ রূপের চমক নেই, যৌবনের উন্মত্ততা নেই। নিভে যাওয়া সলতের মতো আমার নির্বাপিত যৌবন স্বাহার সুগন্ধে সুগন্ধিত। আজ আমার একটাই প্রার্থনা—"হে রাম, হে পরমসত্তা আমাকে দেহময়তা থেকে মুক্ত করো?"

আজ আমার অন্তরে বন্ধন ছিন্ন করার যে অভীপ্সা উষার আকাশে উদয় হচ্ছে তা তোমার নির্দেশ ব্যতীত কি করে সম্ভব হত?

কে যেন মধুর স্বরে আমার অন্তরকে মন্ত্রিত করছে—"শুধু তোমারই জন্য দীপ্তিময়ী উষা আকাশে কিরণের বস্ত্র প্রসারিত করেছে... শুধু তোমার জন্য অমৃতদুগ্ধা ধেনু দোহন করছে... তোমার জন্য জলবিন্দু কিরণস্নাত নদীর মতো প্রবাহিত হচ্ছে...।"

অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। কোটি কোটি বছরের প্রাচীন সূর্য প্রাচ্যের আকাশে অরুণিমা লেপন করে জন্মলাভ করেছে। অপূর্ব প্রেমধারায় আমার হৃদয় সোমস্নাত হচ্ছে।

হে প্রভু! অগ্নিহোত্রের জন্য আমার সমিধ নেই। চন্দন, শাল, পিয়াশাল আম কুল, বেল, ডুমুর, খয়ের বাসক ইত্যাদি নয়প্রকার সমিধ উপযোগী বৃক্ষ আমার কাছে অলভ্য। আমি যদি অহল্যা না হয়ে বনস্পতি হতাম তাহলে সমিধ হওয়ার সৌভাগ্য হত। মানুষ হওয়ার জন্য আমি সমিধের নিষ্ঠা হারিয়েছি। তা সত্ত্বেও অন্তর্যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য তুমিই'ত আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ। হে দয়াশীল, ক্ষমাশীল প্রভু! আমার ইন্দ্রিয়রূপী সমিধের ওপর প্রেম ও শ্রদ্ধার যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো। হে প্রিয়তম রাম! হে প্রিয়তম রাম! আমার কাম দমন করো। আমার ন্যূনতা ও বিঘ্ন দূর করো।

"প্রিয়তম! তুমি এসো। আমি অনাদিকাল থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। অনন্তকাল তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারব। তুমি সুগন্ধে পরিণত হয়ে ভেসে এস। মেঘকণা হয়ে ঝরে পড়। তুমি মন্ত্রধ্বনি হয়ে আমার পাপবাসনাকে ভস্ম করো। তুমি পরমস্পর্শ হয়ে আমাকে প্রতিস্পর্শ করো। তুমি ধ্বনি হয়ে আমাকে প্রতিধ্বনি করো।"

হে প্রিয়তম! রমণীয় রাম তুমি এস। শুধু তোমার নাম সার্থক করে নয়, আমার নামকে সার্থক করে তুমি এসো। তোমার আগমন ব্যতীত কোনও কিছু সার্থক নয়, কেউ অহল্যা নয়—একথা তোমার জানা। "হে রাম! হে প্রেমের চারুচন্দ্র, তুমি এসো। আমার হৃদয় আকাশকে রমণীয় রাগে রঞ্জিত করে উদিত হও। পৃথিবী উর্বরা। তবুও পৃথিবী নিরন্ন বুভুক্ষিতা। রাজা ঐশ্বর্যভারে ভারাক্রান্ত, প্রজা দারিদ্রতা ও নিঃস্বতায় নিপীড়িত। আর্য-জ্ঞানভারে অহংকারী, অনার্য অজ্ঞতায় দাসত্ব প্রাপ্ত। হে রমণীয় রাম! রাজা প্রজা নর বানর দেব দানব সকলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তুমি এসো।"

বাল্যকাল থেকে আমি দেখছি সমিধের নির্ভিক আত্মত্যাগ। যজ্ঞের উদ্যোক্তা যজ্ঞের ফল আশা করেন কিন্তু সমিধ ইচ্ছা রহিত। পরোপকারের জন্য নিজে জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়াই সমিধের নিয়তি। প্রভু! আমাকে নিস্পৃহ নিষ্কাম সমিধ করে দাও। সমিধ হওয়া কত তপস্যার ফল। আমার তপস্যার কি শেষ নেই? স্বাহা সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে কিন্তু ভস্মীভূত সমাপ্ত হয়ে যাওয়াতেই সমিধের সিদ্ধি। সমাপ্ত কি শেষ? সৃষ্টির নির্মাতা সকল বস্তুর কর্তা। তাই কোনও পদার্থ ত্যজ্য নয়। এমনকি অভিশাপদগ্ধ ভস্মও ত্যজ্য নয়। এই ভস্মই আমার সম্বল। অতি ভোগে ইন্দ্র চঞ্চলচিত্ত, অতি ক্রোধে গৌতম অস্থির। সমিধের নিস্পৃহতা গুনগুন করে কত কিছু বলছে। আমার শাপগ্রস্তা শরীর শিহরিত হচ্ছে ভস্মের ত্যাগে। প্রভু! বরং আমাকে ভস্ম

করে দাও কিন্তু ত্যজ্য করো না। প্রভু, আজ আমি দেহময়তা থেকে মুক্তি চাইছি। হে দেহকুঞ্জের ভোগীগণ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি ভোগ দেবতাগণ! ভোগ মোক্ষের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। সোমভাবনায় অবগাহন করে লোকপ্রেমযজ্ঞে আমি তোমাদের সমিধ করে দেব। আমার এই দেহ ছিদ্রযুক্ত মৃন্ময় পাত্র তা ক্ষণভঙ্গুর ও রোগাশ্রিত। ভোগলালসার ছিদ্রপথে আধ্যাত্ম অমৃতরস বহির্গত হয়েছে। তাই তপাগ্নিতে দগ্ধ করে আমি আমার শরীরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করছি। এই দেহের তিনটি অবস্থা—বাল্য-তারুণ্য ও বার্ধক্য। এই তিনটি পর্যায় আমার অন্তর্যজ্ঞের সমিধ। আমি আমার বাল্যাবস্থা অর্পণ করছি মেঘলোককে—পৃথিবী বর্ষাস্নাত হোক। আমি আমার যৌবন অর্পণ করছি ভূলোককে, পৃথিবী অন্নপূর্ণা হোক। আমি আমার চেতনা, পরিপক্ক জরা সমর্পণ করছি স্বর্গলোককে, পৃথিবী অধ্যাত্ম ভাবনায় সোমাঙ্গিনী হোক্। আমার দৃষ্টিশক্তি সূর্যকে তেজোদীপ্ত করুক, প্রাণশক্তি বায়ুকে সুগন্ধিত করুক। পঞ্চভুতের এই দেহময় জীবনের পৃথিবী অংশ ক্ষিতিতে মিশে যাক, জল অংশ জলকে মধুর এবং প্রাণদায়িনী করুক, ঔষধির অংশ ঔষধিতে মিশে মৃত্যুকে অমরত্ব দান করুক।

আমি জানি না রাম কে, অথচ আমি প্রতি মুহূর্তে রামকে আহ্বান করছি। আমার প্রার্থনা ক্রমশ আমাকে প্রকৃতির অংশ করে তুলেছে, আমি ভূমিলগ্না হয়ে পড়ে আছি। আমি যখন নিষ্কাম হয়ে গেলাম, প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলাম। অনুভব করলাম অধ্যাত্মই হল নিষ্কপট প্রেম। ঈশ্বরকে আমি প্রেমিকরূপে খুঁজতে লাগলাম। প্রেমিক ইন্দ্র এবং স্বামী গৌতমের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেছিলাম। সেই প্রেমে অনেক প্রত্যাশা ছিল। প্রত্যাশা প্রথমে সাপের মতো সুন্দর মনে হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই ছোবল মারে এবং অশেষ যন্ত্রণা দেয়। আমি রামকে যত খুঁজি, আমার হৃদয় রামভাবে ততই উদ্বেলিত হতে থাকে। সমস্ত জগত আমার কাছে সরল কোমল নিষ্পাপ শিশুর মতো মনে হয়। রাম নিশ্চয় দেবোপম পুরুষ! যে রামের দর্শনে এই বীভৎস পাপ, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অভিশাপ মুক্ত হবে বলে গৌতম বলেছেন, ব্রহ্মা বলেছেন, সেই রাম তো আর সাধারণ মানুষ হতে পারেন না।

তিনি কি পরমাত্মার মতো দিব্য! পরমাত্মার কারও প্রতি বিদ্বেষ থাকে না। পরমাত্মা শিশুর মতো সমভাবাপন্ন। শিশু অজ্ঞান ও দুর্বল—তাই নিষ্পাপ ও ক্ষমাশীল। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান তাই তিনি নিষ্পাপ ও ক্ষমাশীল—পিতার মুখে সহস্রবার একথা শুনেছি। ফুলের হৃদয়ে শিশিরকণা, পদ্মের বক্ষে কেশর, বৃক্ষশাখায় ফল, পৃথিবীর বক্ষে শৈলরাজি, আকাশে চন্দ্র-সূর্য আমার কাছে মাতৃক্রোড়ে শিশুর মতো মনে হয়। রমণীয় রামকে না দেখে না জেনেও সরল, কোমল, পবিত্রতম পরমাত্মা হিসাবে তাঁর দর্শনের জন্য প্রার্থনা করি। সেই প্রার্থনা প্রেমের মনোজ্ঞ মন্ত্রে আমার শাপ-তাপ-দগ্ধা মনোভূমিকে মন্ত্রিত করে। পূর্বের পাপবোধ এবং ক্ষুদ্র কামনা বাসনা আমার অন্তর থেকে অপসৃত হওয়ার মতো মনে

হয়। আমার হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে যায়। দগ্ধ বনভূমির সীমা অতিক্রম করে সপ্তলোকে দৃষ্টি প্রসারিত করা মাত্রই সবকিছু দিব্য এবং মঙ্গলময় দেখায়।

নিজের সন্তানের প্রতি মোহবশত আমি বহু কষ্ট পেয়েছি। আজ সমস্ত জগতকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে আমি অসীম আনন্দ লাভ করেছি। রামচিন্তায় আমার মধ্যে মোহ ও কামনাশের লগ্ন উপস্থিত। মহামোহ মহৎ মোহে পরিণত হওয়ায় এত কষ্ট আবার এত আনন্দ!

আমার যৌবন আমাকে প্রেয়সী করেছিল। কামনাযুক্ত সেই প্রেম কলুষিত ছিল বলে আজ আমি জগতের সামনে শতকণ্ঠে স্বীকার করছি। ইন্দ্রের দিকে আমি যে সখ্যতার হাত বাড়িয়েছিলামি, তা কামনাযুক্ত ছিল না। তাই পেলাম অভিশাপ ও কলঙ্ক। স্ত্রী হিসাবে আমি আমার প্রেমকে দাস্যভাবে প্রকট করেছিলাম বিজ্ঞ স্বামীর কাছে। তাই নিজের 'স্ব'-কে চিনতে পারলাম না। সেটা আমার ঈশ্বরদত্ত শক্তি সামর্থকে নষ্ট করে দিল। দাস্যভাবেও দাও দাও প্রতাশা ছিল।

গৌতম দেহসুখ দেননি, ইন্দ্র দেহসুখ দিলে না কিন্তু কেউই আমার হলেন না। কারও কাছেই আনন্দ উপলব্ধি হল না। গৌতম ছিলেন আমার চরম ভ্রান্তি আর ইন্দ্রদেব ছিলেন আমার চরম মোহ। আজ তপঃস্নিগ্ধ জরাজীর্ণ বক্ষ থেকে প্রত্যাশা রহিত প্রেম নিঃসৃত হয়ে ভ্রান্তি ও মোহ দূর হয়ে গেছে। আজ আমার কাছে গৌতম ও ইন্দ্র স্পষ্ট। আমি নিজে নিজের কাছে স্পষ্ট।

হে ইন্দ্রদেব! তোমার সহস্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় আর একবার আমাকে দূর থেকে দেখো। কঠোর তপস্যায় আজ আমার শরীর কঙ্কালসার যৌবন অন্তর্হিত—সৌন্দর্য লুপ্ত। কিন্তু যৌবন ত্যাগ করে প্রেমের নিত্যরূপে নব নব যৌবন লাভ করছি। আমার সৌন্দর্য আমার শ্রী নয়, আমার বিচার ও ভাব-ই আজ আমার শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমি মৃত্যুকে জয় করেছি। তুমি যদি আজ প্রেমিকরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হও, তাহলে দেবী অনসূয়ার মতো তোমাকে আমার শিশু সন্তানে পরিণত করার ক্ষমতা জাগ্রত হয়েছে বলে বুঝতে পারতে। আমি স্বর্গলোক প্রাপ্ত না হয়েও মোক্ষলাভ করছি। হে কাম বিদায়, বিদায় ইন্দ্র।

হে রমণীয় রাম! কবে উপস্থিত হবে তোমার আগমনের ব্রাহ্মমুহূর্ত।

রামদর্শনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি যাত্রা শুরু করেছি। ক্রমশ নিষ্ঠার সাথে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম। প্রত্যাহার ধ্যান ও ধারণার সোপান আমি অতিক্রম করছি। আমি নিশ্চয় প্রিয় রামকে দর্শন করব।

উঃ অপেক্ষার একটি মুহূর্ত যেন কত যুগ!

ভাই নারদ অন্তরীক্ষ পথে উড়ে যেতে যেতে বলে গেলেন—এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুরু

আমার আবশ্যক— আমি 'স্বয়ংসিদ্ধা' এই অহংকার নির্মূলের জন্য এবং একজন এই সকলের কর্তা, এই অনুভবের জন্য। তাহলে কি আমি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইনি? আমরা দেহাভিমান ধূলিসাৎ হয়নি। আমি ইন্দ্রের আহ্বানকে উপেক্ষা করেছি বলে কি অহংকারের শিকার হয়েছি? উঃ মানুষের মন মানুষের সাথে কত লুকোচুরি খেলে। নিজের মনই ভ্রম সৃষ্টি করে। আমার এই বিনয় আত্মত্যাগ স্বীকারোক্তি, সমর্পণভাব সবই কি অহঙ্কারের ছদ্মরূপ? বোধহয় সেইজন্যই আমি সিদ্ধির দ্বারদেশে অপেক্ষা করছি। সেইজন্যই আমার কালরাত্রি প্রভাত হচ্ছে না। আমি পিতা ব্রহ্মাকে গুরু মানিনি। আচার্য গৌতমকে আমার আত্মার গুরু হিসাবে স্বীকার করিনি বলে আমার অহংকার যাচ্ছে না। কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য আমি কাকে গুরু মানব? গৈরিক বসন পরিহিত ভণ্ড প্রতারক ছদ্মবেশী গুরুর অভাব নেই। কে আমাকে প্রকৃত গুরুর সন্ধান দেবে?

রমাগমনের আশা সূর্যের মতো উদিত হতে হতে পুনর্বার নিরাশার অন্ধকার ঢেকে যায় মনোভূমিতে। গৌতম! তোমার প্রেম ও সন্দেহর কশাঘাত থেকে তোমার অভিশাপের তীব্রতা বেশি। অভিশাপ কি মোহপ্রেমের অন্য আর এক রূপ?

কত কাল কেটে গেল, কত ঋতু পরিবর্তন হল। কিন্তু অহল্যার সেই একটা ঋতু, বিষাদ ঋতু। আনন্দের দ্বারদেশে বিষণ্নতা সিদ্ধির প্রবেশপত্র চাইছে। সিদ্ধিদাতা রাম আর কত দূরে!

তাপদগ্ধা বনভূমিতে যে সহকার বৃক্ষটি আমরা অভীষ্টের মতো অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং প্রতি বসন্তে মঞ্জরিত হয়ে তপোবনের সম্রাটের মতো ফলসম্ভারে সমৃদ্ধশালী ছিল, সে কোথায়? আমার দৃষ্টিপথ থেকে কোথায় অন্তর্হিত হল? একদিন দেখেছিলাম একটি দুর্বল তমাল লতা সহকার বৃক্ষটিকে আশ্রয় করে আকাশে মাথা তোলার চেষ্টা করছিল। সহকারের সস্নেহ আশ্বাসে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পল্লবিতা হয়ে উঠে গেছে উপরে, সহকারকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে। সহকারের সহিষ্ণুতা তুলনাহীন। এখন সহকার আপাদমস্তক তমালময়। একটা পাতাও দেখা যায় না। এই বসন্তে সহকার হয়ত-বা মঞ্জরিত হয়ে থাকবে, কিন্তু তমাল পুষ্পের প্রাচুর্যে বকুল সঙ্কুচিত—আজ আকাশ পৃথিবী তমালবর্ণ। তমালের এই বিস্তার, আর সহকারের আত্মবিলুপ্তি—প্রেম শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যের সমন্বিত প্রতীক রামের আগমনের সন্দেশ দিচ্ছে কি? সহকারের এই জ্ঞানদীপ্ত নিস্পৃহতা আমাকে সসীম স্পৃহার দ্বারদেশ থেকে অসীম স্পৃহার অনন্ত আকাশে উত্থিত করছে। মোহরূপী ক্ষারে ক্ষারিত হয়ে আমি কি রমণীয় রামকে খুঁজিনি, খুঁজেছিলাম আমার সন্তানদের, আমার ভেঙ্গে যাওয়া সংসার আর পার্থিব সুখ? সহকার আমার সামনে দধীচির মতো নিঃস্বার্থপর আত্মত্যাগী হিসাবে উপস্থিত। আমার মোহ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। সহকার আমার গুরু। হে বৃক্ষদেব আমাকে গ্রহণ করো। সসীম স্পৃহার আবদ্ধ পুষ্করিণী থেকে আমাকে উদ্ধার করে অসীম স্পৃহার মহাসাগরে নিক্ষেপ করো। হে বৃক্ষাত্মা আমাকে মোহান্ধকার থেকে নিষ্কৃতি দাও।

প্রবৃত্তিকে পদাঘাত করে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্রের মধ্যে রামকে অন্বেষণ করি।

অন্ধকারের গহ্বর থেকে উঠে আসছে পূর্ণচন্দ্র। আমি দেখেছি রুক্ষ পাহাড়ে উদয়াস্ত ঘর্ষিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে জ্যোৎস্নায় পরিণত হয় চন্দ্রমা। নিজেকে সম্পূর্ণ জ্যোৎস্নায় পরিণত না করা পর্যন্ত সে ক্ষয় হতে থাকে। সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তির পরেই চন্দ্রের নবজন্ম হয়। নিজেকে চন্দ্রিকা বিগলিত করাই চন্দ্রের লক্ষ্য। পাহাড়ের ঘর্ষণকে সে কি ভ্রূক্ষেপ করে? যদি করত, তাহলে অন্ধকার নাশ করত কে? হে রাম, তোমার প্রতীক্ষায় যদি আমি শুষ্ককাষ্ঠে পরিণত হই, তাহলে আমাকে চন্দনকাষ্ঠে পরিণত করো, যাতে তোমার শ্যাম কলেবর চর্চিত করতে পারি। বিষাদের কষ্টিপাথরে ঘর্ষিত হয়ে আমি ক্ষয় হয়ে যেতে চাই, শুধু চন্দনের সুগন্ধে জগতকে স্নিগ্ধ করতে চাই।

রুক্ষ পাথরে নিজেকে ঘর্ষণের মাধ্যমে তিল তিল করে ক্ষয় করাতেই চন্দনকাঠের জীবনের সার্থকতা। কিন্তু আধ্যাত্ম লক্ষ্য নিয়ে নিজেকে ক্ষয় করে চন্দনকাঠ রুক্ষ পাথরকেশুধু সুরভিত করে না, পাথরকেও কোমল করে ক্ষয়প্রাপ্ত করায়। চন্দনের সাথে মিশে পাথরও চন্দন হয়ে যায়। অহংকারী পাথর চন্দনের মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে শুধুমাত্র চন্দনের মহত্ত্বই ফুটে ওঠে। চন্দনের মহতাকাঙ্খায় জন্যই পাথরের এই আত্মবিলুপ্তি। হে রাম! আজ তোমার পরীক্ষার ঘর্ষণে বিলুপ্ত হয়ে আমার অভিশাপকেও মোক্ষে পরিণত করে দিতে চাই। তমালবর্ণ রাত্রির কপোলকে তারকায় চন্দনচর্চিত করে চন্দ্রমা নিজেকে ক্ষয় করে প্রভাতের অপেক্ষা করছে, যদিও সে জানে প্রভাতই তার পরাজয় ঘোষণা করবে।

হে রাম! আমি তোমার কাছে পরাজিতা হতে চাই।

সহকার আমার গুরু, চন্দ্রমা আমার গুরু, চন্দন আমার গুরু, এই বিশাল পৃথিবী আমার গুরু।

পূর্বজন্মের পাপকে তপে পরিণত করে অনন্ত ভবিষ্যতের বীজ স্থাপন করলাম রম্য ভাবভূমিতে।

শত্রু মিত্র সকলের জন্য আমার হৃদয় করুণা প্রেম ও শ্রদ্ধায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। ত্যাগময়ী প্রকৃতির দ্বারা দীক্ষিতা হলাম। সর্বত্র রমণীয় রামের পদকমলের চিত্র অঙ্কন করলাম। লজ্জা ও গ্লানি ত্যাগ করে ভাবরাজ্যে মনোনিবেশ করলাম। আমার ইচ্ছা হলেই কি আমি রামকে আমার মোক্ষের জন্য উপস্থিত করাতে পারব? সে শক্তি আমার কোথায়? অহঙ্কার শূন্য নির্লিপ্ত হৃদয়ে উপযুক্ত মুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকি।

দগ্ধভূমিতে পা রাখলে যদি তার কষ্ট হয়, তাই অরণ্যপথে আমি আমার দেহসত্তাকে উজাড় করে দিলাম। যৌবনের সুরভি সিঞ্চন করলাম পথে পথে। তাঁর পাদস্পর্শে আমার দেহ যদি মাটিতে মিশে যায়, তাহলে মাটি উর্বরা হবে। আমার ঘন কেশরাশিতে সূর্যকে আড়াল করে আমি ছায়া হয়ে মিশে গেলাম তমাল লতার সাথে, যদি সেই ছায়ায় তিনি ক্ষণিক

বিশ্রাম করেন। বৃক্ষশাখার মুকুলে ফুলের স্নায়ুতে আমার শ্বাস প্রশ্বাস উজাড় করে দিলাম যদি তাঁর মনোরম কপালে ঘর্মবিন্দু ফুটে ওঠে। বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে ঝরে পড়লাম উত্তপ্ত ধরায়, যদি তিনি শীতলতা খোঁজেন। আমার দেহমনের সমস্ত তেজকে উষ্ণতা করে বিতরণ করলাম শীতল উপত্যকায় যদি তিনি খোঁজেন উষ্ণ আলিঙ্গন। আমি আর আমি হয়ে থাকলাম না। আমার দেহ কোথায়? কোথায় আমার রূপ যৌবন? শুধু জগতের কাছে নয়— আমি আমার নিজের কাছেও অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

যখন পার্থিব জগত অদৃশ্য হয়ে গেল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যখন নিষ্ক্রিয়, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ স্তব্ধ। সেইসময় ভক্তির আলোকিত পথে তিনি জ্যোতিষ্কের মত উদিত হলেন। আমি প্রার্থনা করতে থাকি—'প্রিয়তম রাম, তুমি এস—অনন্তকাল তোমার প্রতীক্ষা করার শক্তি অহল্যার আছে। তুমি বসন্ত হয়ে নেমে এস নিরস মনের শাখা প্রশাখায়। আমার সম্মুখে কত বৃক্ষ ঋতুর পর ঋতু অপেক্ষা করে থাকে একবার পুষ্পবতী হওয়ার জন্য, তোমারই ইচ্ছা ঋতুতে। বছরে একটি ঋতুর জন্য সমগ্র সাধনা। একদিনের জন্যও তাদের ধৈর্যহারা হতে দেখিনি। তারা কি অপূর্ণ? যদি নয়, তাহলে জীবনে একবার রামদর্শনের জন্য আমি কি প্রতীক্ষা করতে পারব না? মুহূর্তের রামস্পর্শ আমার সমস্ত অপূর্ণতাকে কি নিঃশেষ করবে না?

অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। কোটি কোটি বছরের প্রাচীন সূর্য আকাশে গৈরিক বৈরাগ্য লেপন করে উদিত হচ্ছে। আমার চক্ষুর চক্ষুকে প্রকটিত সূর্য আগমন করছেন কি? যুগব্যপী প্রতীক্ষার শেষে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমার প্রার্থনারত করতলে নেমে আসছে এক নির্মোহ প্রভাত, আর আমার জড়তা ও হীনমন্যতাকে লুপ্ত করে দিচ্ছে। শুষ্ককাষ্ঠে হোমাগ্নি জ্বলে উঠছে, বৃক্ষসকল পুষ্পশোভিত হয়ে উঠেছে। সবই তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। স্বয়ং সমর্পিত পুষ্পরাজি লতায় ছন্দোবদ্ধ হয়ে পুষ্পমালায় পরিণত হয়েছে। মরুৎগণ ফুলের চামর দোলাচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যে। অনু পরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। ত্রিলোকের চিরকাঙ্খিত তমালবর্ণ নবারুণোদ্ভাসিত, গৈরিকবসন পরিহিত শ্রীরাম স্মিতহাস্যে তমাল ছায়ায় উপস্থিত। আমার ইচ্ছা রহিত অমৃত মুহূর্তে সহসা উপস্থিত হয়েছেন কে এই নিষ্কলঙ্ক পুরুষোত্তম! অন্তরের পবিত্রতা ও জাগরুকতার জন্য তিনি নর হয়েও নারায়ণের মতো মনে হয়। সিদ্ধির মঞ্জুল পথে যাত্রা শুরু করায় কিশোর হলেও তাঁকে প্রবীণ মনে হচ্ছে। তিনি প্রেমময় হলেও কামরহিত হওয়ায় যৌবনেও মহাকালের মতো নির্লিপ্ত দেখায়। অন্তঃকরণের সম্বেদনায় তাঁর কাছে আপন, পর, আর্য অনার্য দেবদানব নর-বানরের পার্থক্য না থাকায় তাঁকে বয়সাতীত, কালাতীত পরমাত্মার মত মনে হয়।

চোখের ছানি অন্তর্হিত হচ্ছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অহল্যার দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর শ্যামঘন শরীর আকাশের মতো, ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি যেন মধুপ মেঘলা। ঘন কুঞ্চিত কেশ সংযুক্ত হলেও

তাঁর উন্মুক্ত ললাট মেঘমুক্ত দিক্‌বলয়ের মতো। তাঁর নীলোৎপল চক্ষুযুগলের দৃষ্টি ভাবসমুদ্রে সূর্যোদয়ের মতো। তাঁর ভ্রূযুগল নীল ভুজঙ্গের মতো লীলায়িত। তাঁর সুগঠিত উন্নত নাসা দৃঢ় মঞ্জুল বিবেকের মতো। ফুলের কুঁড়ির মতো অধর প্রিয়তমর ভাসবাসার মতো। তাঁর স্মিতহাসি দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রোদয়ের মতো। পদ্মকোরকের মতো সুন্দর চিবুক। তমাল পুষ্পসম মসৃণ গণ্ডদেশ। কর্ণযুগল কোমল পদ্মপত্রের মতো। গ্রীবা অনন্ত অভীপ্সার মতো। প্রশস্ত বক্ষদেশ যেন হিমবন্তের উদার বিস্তার। দীর্ঘবাহু নির্লিপ্ত আলিঙ্গনের মতো। করতল পূর্বরাগের উষ্ণতা সম। অঙ্গুলির মধুর মুদ্রা যেন সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি। তাঁর দৃঢ় কটিদেশ বরাভয়ের মতো। চরণ কমল মোক্ষানন্দের মতো। তাঁর সুদীর্ঘ শরীর যুগান্তের তপস্যার মতো। শরীরের দিব্যকান্তি প্রতীক্ষার অন্তের মতো। তাঁর রূপ বর্ণনা করার মতো কোন কবির বা শব্দ আছে। তাঁর বন্দনার জন্য কোন তাপসের বা ভাষা আছে। তাই মূঢ় অহং, তাঁর রূপ বর্ণনা থেকে তুই ক্ষান্ত হ।

রামের দর্শনমাত্রই আমি আমার অন্তঃকরণ দেখতে পেলাম। যুগযুগান্তরের নিদ্রা ও জড়তার মোহপাশ থেকে জাগ্রত করে কে যেন আমাকে বলে—"অন্তঃকরণই মানুষের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ। অন্তরের গভীরে শুধু ভাগ্য নয়, ভাগ্যবিধাতাও বিদ্যমান। তাঁকে আবিষ্কার করার একমাত্র পন্থা হল প্রেম। জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ ঐশ্বর্য ও খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু অন্তঃকরণের প্রেমভাব ব্যতীত মানুষ মানুষের থেকে পৃথক হয়ে পাথরে পরিণত হয়। রামের সৌন্দর্য অবলোকন করে আমার রূপাভিমানের অবশিষ্ঠঅপসৃত হল। এবার বুঝলাম সৌন্দর্য দেহগত নয়। সৌন্দর্য অনু পরমাণুতে ব্যপ্ত। সৌন্দর্য বন্ধন নয়, মুক্তি। সৌন্দর্য মোহ নয়, মোক্ষ। আমার সবকিছু রামময়, ভাবময়, রমণীয় হয়ে উঠেছে।

দুটি তেজোদীপ্ত কিশোরকান্তি তরুণ আসছেন, তাঁদের মাঝখানে এক প্রবীণ তাপস। কনিষ্ঠ কিশোরের মুখমণ্ডল কদম্বপুষ্পের কেশরের মতো পীতবর্ণ, স্বর্ণাভ অঙ্গ, উজ্জ্বল চক্ষু। তাঁকে বিবেকের মতো স্থির, গম্ভীর এবং নিঃস্বার্থ দেখাচ্ছে।

এঁরা কারা? শতানন্দ চিরকারী গৌতম? জ্ঞান, গরিমার অহঙ্কার ত্যাগ করে মিথিলা নগর থেকে আমার শতানন্দ কি ছুটে আসছে তার মায়ের কোলে? অভিমান আর গ্লানি ত্যাগ করে আমার চিরকারী কি ফিরে আসছে তার দুঃখিনী মায়ের কাছে? না, এঁরা কারও কেউ নয়, আবার সকলের অন্তরতম, প্রিয়তম। কখন কি রূপ দেখছি বুঝতে পারছি না। যেমন ভাবছি, তেমনই দেখছি—নীল তমাবর্ণ জলদ গম্ভীর বৈরাগ্য স্বরূপ নির্লিপ্ত জ্যেষ্ঠ কিশোরটির দিকে তাকিয়ে ভাবলাম—"যেহেতু তোমার কাছে পরাজিত হওয়ায় আমার অহঙ্কার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না, যেহেতু তোমার চলার পথে যৌবন উজাড় করে দিয়ে আমার আত্মরতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য দর্শন করেও আমরা মনে পার্থিব কামনা জাগ্রত হচ্ছে না—তোমাকে অধিকার করার পরিবর্তে নিজে অধিকৃতা হওয়ার ইচ্ছা জন্মাচ্ছে। তোমার

কাছে নিজেকে খর্ব হতে দেখে মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে হঙ্কারশূন্য বিশালতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাই নিশ্চয় তুমি সেই চিরপ্রতীক্ষিত রাম।

তাঁরা নিকটতর হলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সঙ্গে নিয়ে আসার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাকে জানিয়ে দিতে চান—সকলের মধ্যে পাপ আছে, মোক্ষ আছে। পতন থেকে উত্থানের দুর্বার শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। পাপ যত বিশাল হোক না কেন তপস্যা তার চেয়েও বিশাল হতে পারে। প্রত্যেক পাপেব মুক্তির পথ আছে।

দু'হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করব? চন্দনের মতো বিগলিত হয়ে মিশে যাব কি তার শ্রী অঙ্গে?

ওরে স্পর্শ! তুই নিমেষেব জন্য স্পর্শরহিত হয়ে যা, বিগলিত হওয়ায় আমার দুঃখ নেই, কিন্তু তার দিব্যস্পর্শ অনু পরমাণুতে উপলব্ধি করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

তাঁকে দেখতে দেখতে অদৃশ্য শক্তি বলে এক অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি জাগ্রত হয় আমার মধ্যে। শুধু আমার ভবিষ্যত নয়, এই অকপট কিশোর সদৃশ রাম এবং সমগ্র জগতের ভবিষ্যত আমি প্রত্যক্ষ করি। সেই দৃশ্যে আমি উল্লাসিত পুনবায় ব্যাথিতও। রামের সৎগুণই তাকে অশেষ দুঃখ দেবে বলে আমার মন আমাকে বলে। রাম পৃথিবীমাতার অদ্বিতীয় সন্তান। চন্দ্র তার স্নিগ্ধতা ত্যাগ করতে পারে, সূর্য তার উত্তাপ ত্যাগ করতে পারে, হিমবন্ত পর্বত তার শীতলতা ত্যাগ করতে পারে, সমুদ্র তার রত্ন ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আমার আদরেব চিরকারীর মতো পিতার নিষ্ঠুর আদেশ উপেক্ষা করতে না পেবে একদিন গৃহত্যাগী, রাজ্যত্যাগী হয়ে রাম অশেষ দুঃখ ভোগ করঁবেন। ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের শেষে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হবে। সব যুগেই ইন্দ্র, গৌতম এবং অহল্যা থাকবে। কলিকালের মানুষ ভূমির জন্য সীমা বিবাদে লিপ্ত হয়ে মানবিকতা হারাবে। ইন্দ্রগণ কামলালসার বশবর্তী হয়ে অহল্যাদের ভ্রষ্টা করায় ব্রতী হবেন। রূপসী নারীরা অপ্সরা হয়ে ইন্দ্রসভায় মনোরঞ্জনে ব্রতী হবে। অর্থলিপ্সা ও রাজ্যলিপ্সা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে হিংসা এবং রক্তপাত সমগ্র পৃথিবীতে বিকট রূপ ধারণ করবে। তাই রামের সমগ্র জীবন হবে ভবিষ্যতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সে স্ত্রী হারাবে অথচ স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না। একনিষ্ঠ পত্নী প্রেমের জন্য তিনি স্ত্রীকে হৃদয়ে বয়ে বেড়াবেন। রাজধর্ম ও দাম্পত্যের মধ্যে যখন সংঘর্ষ দেখা দেবে তখন রাম সীতাঞ্জলি দিয়ে পত্নীকে রাজধর্মের জন্য উৎসর্গ করবেন। দাম্পত্যধর্ম ব্যক্তিগত স্বার্থভিত্তিক এবং রাজধর্ম জনস্বার্থভিত্তিক হওয়ায় তিনি রাজধর্মকেই প্রাধান্য দেবেন এবং সেইজন্য ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখভোগ করবেন। আত্মযজ্ঞের দ্বারা লোকের নৈতিক জীবন সুদৃঢ় করবেন। এবং দক্ষতার সাহায্যে পাশবিক শক্তির বিনাশ করবেন। গৃহস্থাশ্রমে তিনি অতুলনীয় স্বামী দাম্পত্যে অনুপম প্রেমিক এবং রাজধর্মে অবিস্মরণীয় রাজা হবেন। সংযমের প্রতিমূর্ত্তি রাম কামের প্রতীক রাবণকে ধ্বংস করবেন। রামের জয়, কামের মৃত্যু জগতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। রাজ্যলিপ্সার উর্ধ্বে থেকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করবেন এবং যোগ্যপাত্রে

রাজ্যাভিষেক করে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবেন। অপরের রাজ্য জয়ের জন্য নয়, স্বাভিমান রক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন।

রাম সাধারণ মানুষ নয়, তিনি পুরুষোত্তম। নিজের জীবনকালের মধ্যে তিনি নর, বানর, রাক্ষস, নিষাদ, দেবতা সকলের সাথে একাত্ম হয়ে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। একদিন সমগ্র আর্যাবর্তকে তিনি সদ্‌ভাবনা ও মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করবেন। রাম এমনই রমণীয় যে শত্রুও তাঁর হাতে নিধন হওয়ার কামনা করবে। জগতবাসী কামনা করবে—"মিত্র হলে রামের মতো শত্রু হলেও রামের মতো।" কারণ এই রাম শত্রু হিসাবে পুণ্যক্ষয় করবেন না পাপউদ্ধার করবেন না। তাই এই রাম শুধুমাত্র অবিস্মরণীয় বন্ধু নয়। অতুলনীয় শত্রুও। এই রাম পরাক্রমী ও অলৌকিক বাহুবলের অধিকারী, তা সত্ত্বেও মানব প্রেমের ভাব তরঙ্গে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত।

ইন্দ্রদেবও পরাক্রমী, কিন্তু রামের মতো, সাত্ত্বিক, মনোজ্ঞ না হয়ে ক্রুর ও অহংকারী হলেন কেন? বর্তমান রাম বিদেহ রাজকন্যা সীতার স্বয়ম্বরে অংশগ্রহণ করার জন্য যাত্রা শুরু করেছেন। শুভকাজে যাওয়ার সময় অহল্যার পাপদগ্ধ তপোবনে কেন তাঁকে নিয়ে এলেন বিশ্বামিত্র? অহল্যার উদ্ধারের জন্য? পাপের সুগন্ধ কি অভিজ্ঞ বিশ্বামিত্রকে অহল্যার অভিশাপের বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছে? পাপবোধ ও আত্মগ্লানিতে অহল্যা জড়বৎ পড়েই থাকত। শুভসময়ে অশুভপথে কেন পা দিলেন রাম?

আমার মনোভাব বিশ্বামিত্রের কাছে গোপন রইল না। তাঁর অন্তরের বাণী আমি শুনতে পেলাম—"অহল্যা! তুমি জনকনন্দিনী সীতার সতীত্বের সাধনভূমি। ঋষি গৌতম রামের দুর্লভ স্বামীত্বের প্রেমের সাধনভূমি। তোমাদের দু'জনের জীবন ও দাম্পত্য রাম-সীতার জন্য হবে এক অধ্যয়ন। রাম এবং গৌতমের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ও সীতার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য অছে—তোমাদের দু'জনেরই জন্ম রহস্যময়। তোমরা উভয়েই দুই মহাত্মার পালিতা কন্যা। তোমরা অলৌকিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র বহুবার ব্রহ্মার নিকট তোমাকে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ঠিক সেইরকম লঙ্কাপতি রাবণও সীতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মিথিলানরেশ জনকের কাছে সীতার পাণিপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্রহ্মচর্যের পরাকাষ্ঠার জন্য গৌতম তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন, বৈরাগ্যস্বরূপ রাম অলৌকিক শক্তিবলে সীতা প্রাপ্ত হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অভীষ্টদাতা সেজে কামাসক্ত ইন্দ্র তোমার পবিত্র দাম্পত্যকে ভ্রষ্ট করেছে। লঙ্কাপতি রাবণ গৈরিকধারী ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে রামের মধুর দাম্পত্যকে বিরহের দগ্ধভূমিতে পরিণত করবে। রাবণ ও ইন্দ্রের মতো রূপবান তদুপরি ইন্দ্রের চেয়ে অধিক ক্ষমতো সম্পন্ন ও ঐশ্বর্যশালী। ইন্দ্রকে পদানত করার স্পর্দ্ধা রাখে সে। ভ্রম কিংবা মোহবশত সীতা যদি তোমার মতো নিজেকে রাবণের কাছে সমর্পণ করে তাহলে পৃথিবীতে পাশবিকতা·

ও কামের বিজয় হবে। দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতার ওপর আর কারও আস্থা থাকবে না। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে পরপুরুষের ভূমিকা হবে মুখ্য এবং দাম্পত্য হবে অভিশপ্ত। সেই পাপ থেকে রাম সীতাসহ সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আমি রামকে শুষ্ক নীরস গৌতমের দৃষ্টান্ত এবং সীতাকে তোমার মোহ ও ভ্রান্তির দৃষ্টান্তের দ্বারা ভবিষ্যতের সফল দাম্পত্যের জন্য সতর্ক করে দিতে চাই। রামকে জানিয়ে দিতে চাই—আদর্শ পতি হল সেই যে পত্নীর প্রেমাস্পদ হওয়ার গুণে গুণান্বিত। সীতাকে জানিয়ে দিতে চাই দাম্পত্য জীবনেও সংযমের প্রয়োজন আছে। বিয়ের পরই দীর্ঘ বারো বছর স্বামীর কাছে থেকেও সীতাকে সংযম রক্ষা করতে হবে বলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তা'হলে কি সীতা বহু নারীসঙ্গলোভী রাবণের কাছে... থাক্ সেই কালকথা মুখে না আসুক। সীতাকে স্বামী-মুগ্ধা করা রামের কর্তব্য। দাম্পত্য জীবনে প্রেমকে গৌণ করলে ঋষি গৌতমের মতো অভিশপ্ত হতে হবে। সীতার প্রতি, রামের প্রেম যদি প্রগাঢ় না হয়, তাহলে রাবণের ঐশ্বর্যপুরীতে বন্দিনী থেকে সে রাবণের সহস্র প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়ার শক্তি পাবে কোথায় থেকে? বিবাহের শক্তি প্রেম। প্রেমকে বন্ধন ভেবে জ্ঞানের অহংকারে ঋষি গৌতম তোমাকে হারিয়েছেন। সীতার জীবনে তার পুনরাবৃত্তি না হোক্। সেটুকু শিক্ষা রাম লাভ করুক—এটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাই আসার পথে আমি রামের কাছে তোমার পাপের বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

রাম যে অসাধারণ স্বামী হবেন সে কথা তাঁর কর কপাল, বিবেক ব্যক্তিত্ব ও আচার ব্যবহারে স্পষ্ট। রঘুবংশে বহুপত্নী গ্রহণের প্রথা থাকলেও রাম একপত্নী ব্রত গ্রহণ করবেন। এই প্রেমিক পতির পত্নী প্রেমের মাপকাঠি হবে পত্নী বিরহ। গৌতম যদি রামের মতো প্রেমিক হতেন তাহলে অহল্যাও সীতার মতো প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারতেন—একথা জগতবাসী একদিন বুঝতে পারবে। রামের মতো পুরুষের পত্নী স্বপ্নেও কোনও পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। রাম ও সীতার ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন নয়, বিবাহ হল এক ব্রত যা দু'জনেই নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এবং কোনওভাবে যেন ব্রতভঙ্গ না হয়, তার সাধনা করবে। কামপূরণ নয় কামদমন বিবাহের লক্ষ্য। নির্জন তপোবনে মৃতকল্প শাপগ্রস্তা অহল্যাকে না দেখলে বিবাহের জটিল মনস্তত্ত্ব রাম হয়তো অনুভব করতে পারতেন না। রামের কাছে সীতাও অহল্যার কাহিনী শুনবেন। রাবণের প্রলোভনকে পদাঘাত করে সতীত্বের ঔজ্জ্বল্য প্রকট করার জন্য সীতার কাছে অহল্যার অভিশাপই হবে সতর্কবাণী। রামও বুঝতে পারবে যে স্ত্রীর সতীত্ব শুধু তার নির্মল চরিত্রের পরিচয় দেয় না, স্বামীর অনাবিল প্রেমেরও প্রমাণ দেয়। শুধু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, অপরের জীবনের অভিজ্ঞতাও সফল জীবনের সোপান হতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি না দিলে মানুষ অভিজ্ঞ হয় না। রাম লক্ষ্মণের কাছে আমি গৌতম ও অহল্যার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছি। রাম-সীতার পরিণয় পথে অহল্যাই হবে ফুলশয্যা, প্রেরণাদায়িনী সরস্বতী।"

রামের আগমনের গূঢ় রহস্য জেনে আমি উল্লসিতা হলাম। সীতার জন্য আমার জীবন হোক সতর্কবাণী। আমার শাপগ্রস্ত জীবন যদি সীতার মধুর দাম্পত্যের সহায়ক হয় তাহলে আমি আমার অভিশাপের জন্য আনন্দিতা ও গর্বিতা। আমি অভিশাপদাতা গৌতমের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশ্বামিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পৃথিবীমাতার অদ্বিতীয় সন্তান রামচন্দ্রের দর্শনলাভ এবং আমার জীবন থেকে তাঁর আদর্শ দাম্পত্যের প্রেরণা পাওয়া শুধুমাত্র গৌতমের অভিশাপের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমার অভিশাপ আজ আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য আমার এই বলিদান, সুশৃঙ্খল, সংযত, আনন্দময় গার্হস্থ্য জীবনের প্রেরণা হোক্।

আমি রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি, আজ আমি অন্য এক অহল্যা। আমার নিম্নতর প্রাণসত্তায় কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা হীন প্রবৃত্তিগুলি এখন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে দিব্য আলোকের ঔজ্জ্বল্যে। আমার বিকৃত অহং সর্বস্ব, সুখলোভী কামনা, বাসনা, ভ্রান্তি ও নীতিহীন প্রলোভন, ঋতসত্য, উলঙ্ঘনকারী 'আমি' এখন মৃত। আমার নিন্দনীয় ছলনাপূর্ণ ক্ষুদ্র পার্থিব চেতনার আত্মআস্ফালন পরাস্ত। এখন আমার পুরাতন সত্তাটির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। এখনও পর্যন্ত বিবেকের দর্শন পেয়েছিলাম না, বৈরাগ্যের স্বরূপ জানতাম না। সৎজ্ঞানের মহিমা বুঝিনি, তাই আমার ব্রত দীক্ষা তপস্যা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল।

ব্রহ্মস্বরূপ বিবেক ও সৎজ্ঞানসম্পন্ন রামের দর্শনে বাস্তবিক আজ আমি অহল্যা, যে সত্য, ঋত, দীক্ষা, তপস্যা ব্রহ্ম ও যজ্ঞে পরিপুষ্ট।

এ, আমি কি দেখছি! ব্রহ্মস্বরূপ রাম আমার চরণস্পর্শ করছেন। আমার ভস্মাচ্ছাদিত শরীরের ধূলো মুছে দিচ্ছেন নিজের উদার গৈরিক বসনে।

স্পর্শ! তোর কত রূপ—কত আবেদন! জীবনে বহু স্পর্শ পেয়েছি আমি—আবার স্পর্শরহিত হলাম কি করে? তাহলে কি স্পর্শের আসলরূপ আমার কাছে গোপন ছিল? যে সমস্ত স্পর্শ পেয়েছিলাম, সেগুলি শুধুমাত্র স্পর্শের ছলনা!

স্পর্শ তুই কখনও কপট, আবার কখনও বিশ্বস্ত।

জননীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিতা আমি অহল্যা, কিন্তু জন্মভূমির স্পর্শ কত উদার, নিঃস্বার্থ—সেই আমার জননী। আমি পিতার স্পর্শ পেয়েছি—নিঃস্বার্থ হলেও কঠোর—সেটা ছিল অনুশাসনের স্পর্শ। পেয়েছি স্বামী গৌতমের স্পর্শ প্রেমহীন, শীতল সন্দেহর স্পর্শ। সেখানে প্রতিস্পর্শের প্রতীক্ষা ছিল না। পেয়েছি আমার সন্তানদের অনাবিল উদার স্পর্শ—তা ছিল ক্ষুদ্র পরিধির বন্ধনের মধ্যে আঁকড়ে ধরার স্পর্শ। সেই বন্ধন আবার মুক্তির দিকেও প্রেরিত করছিল—উদ্বুদ্ধ করেছিল সত্যকামকে আপন করে নেওয়ার স্পর্শে। পেয়েছিলাম দেবরাজ ইন্দ্রের স্পর্শ। সেই স্পর্শ ছিল স্বার্থজড়িত, কামনাতাড়িত। সেই স্পর্শ ছিল এক ভ্রান্তি।

স্পর্শ! তুই পাগল করতেও পারিস আবার পাথরও করতে পারিস। ইন্দ্রের স্পর্শ আমাকে

পাগল করে দিয়েছিল—গৌতমের স্পর্শ আমাকে পাথর করেছিল আমি বাৎসল্যের স্পর্শ পেলাম, কামনার স্পর্শ পেলাম, অনুশাসনের স্পর্শ পেলাম, প্রেমের স্পর্শ তো পেলাম না। সেই জন্যই কি আজ আমি অপ্রয়োজনীয় জড় পাথর! স্পর্শ তুই প্রতারক, আবার বিশ্বস্তও। তুই কত কঠীন আবার কত উদার তুই কত শক্তিমান—আবার কত দুর্বল—কত নির্ভীক আবার কত ভীরু!

স্পর্শ! তুই মিথ্যা আবার সত্যও। এই স্থূল দেহ, সংবেদনশীল মন; উদার আত্মা—সবাইকে ছোঁওয়ার ক্ষমতোা তোর আছে। দেহ থেকে, মন থেকে আত্মাকে ভেদ করার দিব্যশক্তি থাকা সত্ত্বেও তুই শুধু দেহ ছুঁয়েই ক্ষান্ত থাকিস কেন? স্পর্শ! তুই বিষ ও অমৃত—পাপ ও মোক্ষ ভোগ ও মৃত্যু। তাহলে তুই অমৃতের স্পর্শ দেওয়ায় কুণ্ঠিত কেন? পূর্ণতা দেওয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তুই প্রতিটি রূপে আমাকে শুধু অপূর্ণতাই উপহার দিয়েছিস কেন?

স্পর্শ! মূঢ় অহল্যাকে ক্ষমা করো। শুধু তোকে দোষ দিয়ে কি লাভ? দোষ প্রতিস্পর্শেরও। আগুনকে নেভানর প্রতিস্পর্শ যদি আমার না থাকে তাহলে দোষ কি আগুনের? জ্বলা ও জ্বালানো'ত আগুনের ধর্ম। ইন্দ্র যদি আমাকে প্রজ্বলিত করলেন, তাহলে দোষ শুধু তাঁর একার নয়, আমারও, গৌতম যদি আমাকে পাথর করে থাকেন, তাহলে দোষ শুধু তাঁর একার নয়, আমারও।

স্পর্শ! আজ আমাকে কি দুর্লভ উপলব্ধি তুই দিয়েছিস! রামের স্পর্শে আজ পাষাণ বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঊষর বনভূমিকে উর্বর করে, আর বৃষ্টি কি প্রয়োজন? ইন্দ্রের জন্য অপেক্ষা কেন? এতদিন যে স্পর্শের প্রতীক্ষায় অহল্যা মুখ বুজে পড়েছিল, সেই প্রেমের স্পর্শে অহল্যার প্রতিটি স্থূল দেহকোষ বিগলিত হয়ে হৃদয় উন্মোচিত হচ্ছে—আত্মার মধুকোষ থেকে উছলে পড়ছে রামমধু—প্রেমমধু। দেওয়া-নেওয়া দেহসর্বস্ব জীবনের অবসান ঘটিয়ে আমি বিদেহে পরিণত হচ্ছি। তিনি ব্যতীত অন্য কারও প্রতিস্পর্শ নয় আমি। বায়ুভক্ষণ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে জড়বৎ পড়ে থাকা পরিত্যক্তা অহল্যা পরম প্রিয়'র স্পর্শে গতিহীন শরীরের সীমা অতিক্রম করে অভিনব যৌবন লাভ করেছি। রাগ, দ্বেষ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছি প্রেমের অমরত্বে, ঘৃণিত সন্দেহর গহ্বর থেকে বিশ্বাসের অনন্ত আকাশে। রামের স্পর্শে আমি উন্মোচিত হলাম, সব জড়তা দূর হয়ে গেল। দু'বাহু প্রসারিত করে রাম লক্ষ্মণ দু'ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম তাপিত বুকে। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল, অভিশাপের শৃঙ্খল খুলে গেল। চতুর্দিকে দিব্যালোকের বন্যা। জলদগম্ভীর রাম মৃদু মৃদু হাসছেন, তাঁর হাসি নীল আকাশে চন্দ্রের মতো উদয় হচ্ছে। তিনি কিছু না বললেও আমার উর্ধ্বচেতনায় অমৃতের স্বর শোনা যাচ্ছে। আমার শরীরের ধূলো রামের শরীর থেকে মুছে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই তিনি আমার তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ হাতটি ধরে বললেন—"থাক্

দেবী! এই ধূলো আমার কঠোর অনুশাসিত যাত্রাপথের পাথেয়। আর্যাবর্তের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই তপোস্নিগ্ধ রেণু ছড়িয়ে আমি পৃথিবীকে পবিত্র করব। এ শুধু অহল্যার পার্থিব পদধূলি নয় এ হল অহল্যার চৈতন্যচর্চিত হৃদয় রেণু।"

আমার শীর্ণ জরাগ্রস্থ শরীরে নববসন্তের রোমাঞ্চ। আমি আর শক্তিহীনা অবলা নয়। আমার দেহবোধ অন্তর্হিত আত্মা জাগ্রত। তাই আজ আমি অনন্তযৌবনা। রামের দৃষ্টির মধ্যে আমি দেখছি অনন্ত ঐশ্বর্য, সেখানে ইন্দ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। পরম আত্মবিশ্বাসে বললাম—"হে ধীমান, এই স্মৃতি জন্মজন্মান্তরে অমলিন থাকবে। আপনার যাত্রা শুভ হোক্।" আমার কণ্ঠরোধ হল, যিনি শুভঙ্কর হওয়ার ব্রতগ্রহণ করেছেন, তাঁকে আমি কি শুভেচ্ছা জানাব?

রামের মধুর স্বর আমার কানে সুধাবর্ষণ করছে—"যৌবন ও জরা অতিক্রম করে আজ থেকে তোমার চলার পথে প্রীতির ফুল ফুটুক—তোমার নিঃশ্বাসে ধুনো, অগুরু, চন্দনের সুবাসে সুবাসিত হোক আকাশ, পৃথিবী—সেই সুগন্ধ ভেদ করুক চেতনার অভ্যন্তরে, তোমরা স্পর্শে ব্যর্থ মনোরথ মানুষের বুক থেকে বিষাদের জড়তা দূর হয়ে যাক। তোমার শুভ দৃষ্টিপাতে পাষাণ বিগলিত হয়ে নদী হয়ে থাক্, হিংসা, দ্বেষ ভেদভাব দুর হোক তোমার আলিঙ্গনের স্নিগ্ধতায়, তোমার প্রেরণায় জীবনহোক জিজ্ঞাসা, মৃত্যু হোক অমর। পুণ্যের শঙ্খধ্বনি দুন্দুভিত হোক তোমার সম্বোধনে।

তোমার তপস্যায় ফেলে আসা পথের সমস্ত আবর্জনা, কর্দমাক্ত পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। হে বরনারী অহল্যা! তোমার প্রায়শ্চিত্ত তোমার পাপ গ্রাস করে, পৃথিবীর পাপ, ইন্দ্রের পাপ তথা গৌতমের আদর্শের অহঙ্কারকে গ্রাস করে পুণ্যের বিজয়ধ্বজা উড়িয়েছে। তুমি ছিলে তোমার বন্ধন, আবার তুমিই তোমার মুক্তি। পুণ্য ও মুক্তির এই মাহেন্দ্র মুহূর্তর জন্য শুধু ইন্দ্র ও গৌতম নয় রামও অপেক্ষা করেছিল।"

—"হে রাম, আপনার স্পর্শ ব্যতীত অহল্যা অহল্যা নয়।"

—"দেবী! অহল্যার স্পর্শ ব্যতীত রাম "রাম" নয়। অহল্যা হল রামের প্রেমের উপলব্ধি, অহল্যা রামের জীবনের বিদগ্ধ অনুভূতি। জগতকে অকপট, নিষ্কাম ভালোবাসার রমণীয় মন্ত্র অহল্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্চারিত হয়ে রামের যাত্রাপথকে করছে মন্ত্রপূত।"

"হে রাম! আপনার স্পর্শের গভীরতা এবং বিশ্বস্ততায় আজ আমি উন্মোচিতা হচ্ছি। তাই আপনার কাছে পাপ স্বীকার করায় আমার চেতনা রক্তাক্ত হচ্ছে না। গৌতম এবং ইন্দ্র আমার পাপের কর্তা নয়, আমার পাপের কর্ত্রী স্বয়ং আমি। দেহের নির্লজ্জ ক্ষুধায় আমি আমার শরীর ও আত্মাকে কলুষিত করেছিলাম। ভেবেছিলাম, দেহই আমার মূল অভাব—কিন্তু দেহভোগে সেই অভাব দুর হল না বা লালসার মৃত্যু হল না। দেহের ক্ষুধাকে প্রেম আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনায় আমি কিছুকাল বেঁচে ছিলাম সত্যি, কিন্তু দেখলাম সেই ছলনার জীবনে মন মরে যাচ্ছে তবু ক্ষুধা তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি কোথায়? আজ আপনার দর্শনে আমার সব ক্ষুধা প্রশমিতো—দেহের, মনের, আত্মার। আপনি এই মহান তৃপ্তির দাতা।

হে রাম! আমার আকাশব্যপী পাপে শুধু আমি নয়, সমস্ত জগত কলঙ্কিত। সেইজন্য এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। চতুর্দিকে নিরন্নের হাহাকার। হে রাম, অহল্যা তার পাপে নিমজ্জিত হোক, কিন্তু জগতের ললাট থেকে কালিমা অপসারণ করে করুণার বারিধারা বর্ষণ করো। অহল্যার সমাধির ওপর জন্ম নিক্ প্রীতির পঙ্কজ। সেটাই আপনার চরণকমলে অর্ঘ ও অহল্যার মোক্ষ। অন্য মোক্ষে লোভ নেই।"

"দেবী! পাপবোধ ত্যাগ করে ওঠো। সংসারে অনেক পাপী আছেন—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত বিরল। প্রায়শ্চিত্তের অশ্রুজলে মুহুর্মুহু স্নান করে তুমি বহু পূর্বেই পবিত্র হয়েছ। তোমার আত্ম-অনুভব তোমাকে মোক্ষদান করেছে। তুমি পাপমুক্তা নারী। তাই হীনমন্যতা ত্যাগ করে নবরাগে রঞ্জিত করো নিজেকে এবং জগতকে।"

"হে রাম, তোমাকে অহল্যার অদেয় কিছু নেই। কিন্তু অহল্যার কাছে কি এমন অপার্থিব সম্পদ আছে যে তোমাকে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে? আছে শুধু অহল্যার হৃদয়ের অকপট প্রেম। সেই প্রেমের পরিভাষা আপনার জানা। সেটুকু যদি গ্রহণ করেন, তাহলে অহল্যা কৃতার্থ হবে।"

"দেবী! তোমার অপার্থিব প্রেম আমি গ্রহণ করছি, সেইজন্য আমি আজ শুধু রাম নয়—আমি রমণীয় পথে যাত্রারম্ভ করছি। যুগ যুগ ধরে তোমার পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত থাকবে এবং আমাকে পুণ্যের প্রেরণা দেবে।"

হে রাম—তুমি আদর্শ পুত্র হও—প্রেমিক স্বামী হও—নিঃস্বার্থ ভ্রাতা এবং বিচারশীল পিতা হও—শুভেচ্ছু বন্ধু এবং কারুণিক শত্রু হও। দুঃখ তোমার থেকে দূরে থাক, তুমি সুখী হও।"

—"দেবী, দুঃখ না থাকলে সুখের উপলব্ধি কোথায়? সংঘর্ষ না করে শুভঙ্কর কে?" তোমার দুঃখই তোমাকে আনন্দের উপলব্ধি দিয়েছে। তাই আমার দুঃখের জন্য কাতর কেন? তোমার শুভেচ্ছায় আমি দুঃখ ও সংঘর্ষময় জীবন বরণ করছি। তোমার সহায়তায় দুঃখকে অতিক্রম করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা লাভ করেছি।"

"হে রাম! তুমি দুঃখকাতর নয়—তাই পার্থিব সুখের প্রতিদানে তুমি আনন্দ লাভ করবে। তুমি সংঘর্ষকাতর নয়—তাই বিলাসের প্রতিদানে তুমি বিজয়লাভ করবে। হে রাম, তোমার দাম্পত্য সুখের হোক। তুমি যেন কখনও তোমার পত্নীর থেকে বিচ্ছিন্ন না হও। বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখ অনুভব করেছি আমি এবং গৌতম।

"বিরহ হল প্রেমের মাপকাঠি। বিরহ ছাড়া প্রেমের উপলব্ধি হয় না, বিরহ ব্যতীত মিলনের মহোৎসব কোথায়? পার্থিব দূরত্ব—লৌকিক বিরহ কি অপার্থিব মিলনকে পরাহত করতে পারে? দুটি দেহ দূরে থাকলেও আত্মা যদি অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে বিরহই মিলনকে করে মহান। হে প্রেমের দেবী তোমার বিরহই আজ তোমাকে প্রেমের উপলব্ধি দিয়েছে।

তোমার বিশ্বস্ত স্বামী গৌতমের একপত্নীব্রত সফল করে মহামিলনের মুহূর্তকে ডেকে এনেছে তোমার তপোনিষ্ঠ বিরহ। তাই তোমাকে দর্শন করে রাম আজ বিরহকাতর নয়। রামের যাত্রাপথে যদি দুঃখ আসে, সংঘর্ষ আসে, বিরহ আসে, পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মূল্যবান সুযোগ আসে, তাহলে তোমার স্মৃতিই আমাকে শক্তিমান করবে—আমার কানে কানে বলবে—"অপার্থিবের উপলব্ধির জন্য পার্থিবের বলিদান কাম্য।"

"হে রাম! অনুভূতি না থেকেও তুমি অনুভবী। অভিজ্ঞতা না থেকেও তুমি অভিজ্ঞ। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করেও তুমি বিশাল বিশ্বের গৃহস্থ। বয়সে নবীন হয়েও তুমি বিচারে প্রবীণ। ব্রহ্মচারী হয়েও ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম তোমার উপলব্ধি। পৃথিবীর সন্তান হয়েও তোমার কীর্তি অপার্থিব। মানুষ হয়েও তুমি অলৌকিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তুমি মর্যাদাবান হওয়ায় অহল্যার মর্যাদা রক্ষা করেছ। রামের স্পর্শে শুধু অহল্যা ধন্য হয়নি, ধন্য হয়েছে পৃথিবীমাতা। তোমাকে প্রণাম।"

এ কি করছেন রাম? করজোড়ে কাকে প্রণাম করছেন? নম্রমধুর কণ্ঠে বলছেন—"দেবী অহল্যা, ধন্য তোমার তপস্যা। রাম তোমাকে প্রণাম করছে।"

অমৃত বর্ষণ হচ্ছে আমার চেতনায়। "সিদ্ধি" করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আরও প্রশস্তি শোনার জন্য? তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করি—"দূর হয়ে যা আমার সম্মুখ থেকে। যে রামদর্শন করেছে সে কি সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে? রামের সম্মুখে তোকে আজ কত খর্ব দেখাচ্ছে।" সিদ্ধির অবমাননা রাম কি করে সহ্য করবেন? নম্রকণ্ঠে বলেন—"তোমার পবিত্র অহল্যারূপ দর্শন করে অমি ধন্য হয়েছি, তুমি বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেছ অপরাধের তুলনায় শাস্তি অধিক, শাস্তির তুলনায় তপস্যা কঠোর—তপস্যার তুলনায় মোক্ষ তুচ্ছ। তবুও মোক্ষ তোমার সম্মুখে জোড়হস্তে উপস্থিত। তাকে গ্রহণ কর।

—"তোমার দর্শনে আমরা মধ্যে যে মহাভাব জাগ্রত হয়েছে সেটাই অহল্যার মোক্ষ" — ভাবময় কণ্ঠে বলি।

—"পৃথিবীতে জন্ম নিলে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়। তা তুমি অনুভব করেছ। এই পৃথিবী তোমার যোগ্য নয়। তুমি ব্রহ্মালোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারো।" রামের কথা শেষ হতে না হতেই দেখি পিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র নিজ নিজ রথ থেকে অবতরণ করছেন। সর্বলোক থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে। জরাগ্রস্ত গৌতমও উপস্থিত। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রামদর্শন করছেন। মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করছেন অহল্যার সিদ্ধি—শাপমুক্তি।

দগ্ধভূমি পল্লবিত। পরিত্যক্ত আশ্রমে আনন্দের কোলাহল। রুদ্রাক্ষ, ঋচা, তক্ষক, কর্কোটক প্রভৃতি নির্ভয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে রামকে প্রণাম করছে। সবাই আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে। আমি কোন লোককে ধন্য করব তা শুনতে সবাই আগ্রহী।

বললাম—"হে রমণীয় রাম, আমি অহল্যা পৃথিবী। পৃথিবী কত না কষ্ট ভোগ করেছে।

রক্তক্ষরণ না করে কেউ কখনও জননী হয়েছে? কোন ফলন্ত গাছ ঢিলের আঘাত না সয়েছে? ঝড় বাতাসের সম্মুখীণ না হয়েছে? ঝড়ের ভয়ে মাটি কি বৃক্ষকে ত্যাগ করে? ত্যাগ করলে ছিন্নমূল বৃক্ষ না আকাশের না মাটির। বৃক্ষ আমার গুরু। ঝড়ের আঘাতে ধরাশায়ী বৃক্ষও মাটিকে আঁকড়ে ধরে ফল ফুল বিতরণ করে সমগ্র জগতকে। মাটিকে ত্যাগ করে আমি কি করে স্বর্গলিপ্সু হব? সংঘর্ষ-বিহীন মোক্ষ আমি চাই না। এই সংঘর্ষময় সংসারে থেকে অশান্তির মধ্যে শান্তি, মিথ্যার মধ্যে সত্য, ভোগের মধ্যে ভাব, বিঘ্নের মধ্যে সফলতার সন্ধানই আমার মোক্ষ। আমি মর্তমানবী। সাধনাশূন্য সংঘর্ষবিহীন স্বর্গলোক আমাকে তপস্যার সুযোগ দেবে না। সেখানে জীবনের মূল্য কি? দুঃখ জর্জরিত পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গলোকে সুখভোগ করা মোক্ষ নয়। এই মর্তলোকই আমার কর্মভূমি। সাধনাভূমি।"

রাম পুনরায় করযোড়ে বললেন—"দেবী, তোমার অন্তর্যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্বকে সুগন্ধিত করার জন্য তুমি পবিত্র হবিতে পরিণত হয়েছ। তোমার আত্মা জাগ্রত হয়েছে। বিশ্বচেতনায় মিলিত হয়ে তুমি বিশাল হয়েছ। সহস্র মৃত্যুর মধ্যে তুমি অমরত্ব ঘোষণা করেছ। দেহসর্বস্বতার বিনাশ করে তুমি চিরযৌবন লাভ করেছ। মহামোহ থেকে মুক্তিলাভ করে তুমি মোক্ষানন্দ লাভ করেছ। তুমি আজ মোহশৃঙ্খল মুক্ত। সকল দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত। তোমার মধ্যেই মোক্ষ বিরাজমান তাই তোমাকে আর কে মোক্ষদান করবে? তুমি নিজে তোমার কর্মভূমি ও পথ বেছে নাও।"

ব্রহ্মলোক থেকে ব্রহ্মার বেদপূর্ত হস্ত, বিষ্ণুলোক থেকে বিষ্ণুর বরাভয়কারী হস্ত শিবলোক থেকে শিবের মঙ্গলময় হস্ত এবং ইন্দ্রলোক থেকে ইন্দ্রের দানকারী কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হস্ত প্রসারিত হচ্ছে আমার দিকে। চতুর্দিকে দুন্দুভিত হচ্ছে—এসো-এসো- রথ প্রস্তুত। ধন্য কর দেবভূমি... দেবী, প্রণাম গ্রহণ কর...।

প্রার্থনারত হাত তুলে ভিক্ষা চাইলাম, প্রভু! ব্রহ্মলোক থেকে আধ্যাত্মিক চেতনা, বিষ্ণুলোক থেকে একাগ্রতা, শিবলোক থেকে শুভসংকল্প এবং ইন্দ্রলোক থেকে আত্মৈশ্চর্য দাও আমার এই দুঃখ জর্জরিত পৃথিবীর জন্য। নিরন্ন, বুভুক্ষু বিপন্ন পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করো সদিচ্ছা বর্ষণে... এইটুকু আমার প্রার্থনা।" 'তথাস্তু', 'তথাস্তু' ধ্বনিতে তপোবন মুখরিত। কিন্তু, তারপরেও সকলের প্রসারিত হস্ত আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। কাকে বরণ করব?

এটাই জগতের নীতি। যখন শাপগ্রস্তা হয়ে পড়েছিলাম তখন সব দ্বার ছিল রুদ্ধ। প্রলয়কালে কেউ আশ্রয় দেয়নি, কেউ আমার, দুঃখের অংশীদার হয়নি। অহল্যার কলঙ্ক প্রচারিত হয়েছিল সর্বলোকে। আজ এই সম্বর্দ্ধনার আড়ম্বর অহল্যার জন্য নয়, অহল্যার সিদ্ধির জন্য। সিদ্ধির এক মুহূর্ত পূর্বেও এঁরা কোথায় ছিলেন? আমি জানি অহল্যা শাপমুক্ত হয়েছে রামের উদার চেতনায়। কিন্তু অহল্যা কি কলঙ্কমুক্তা? ইন্দ্র অহল্যা বৃত্তান্ত কি জনমানস থেকে অপসৃত হবে? মাথার মণির মতো আমার কলঙ্কও চিরকাল জ্বলজ্বল করবে।

অহল্যার মহানতা নয়, রামের মহানতাই প্রতিপাদিত হচ্ছে আজ। মহানুভব রামের করুণালাভ করায় আজ আমি পূজ্যা। তাই আমার তপস্যাভূমি ছেড়ে কেন যাব? আমার তপস্যা শেষ হয়নি...।

করজোড়ে সবাইকে প্রণাম জানালাম মিনতি করলাম—"স্বর্গাকাঙ্খাও এক প্রলোভন। অহল্যাকে আর প্রলোভিত করবেন না। —অহল্যার অন্তরে অসীম স্পৃহা জেগেছে—তাই সে নির্লিপ্তা।"

দেবতাগণ অবতরণ করছেন আশ্রম প্রাঙ্গণে। এই মহাভাবই অমৃত। আর কোন অমৃতের প্রলোভন! তমালপুষ্প মনে করে রামের মনোরম কপালে বসে মৌমাছি মধু আহরণ করছে, আহা, রামের নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে। মৌমাছির আস্পর্দ্ধা দেখে তাকে অভিশাপ দিতে গিয়েও ক্ষান্ত হলাম। রাম মৃদু মৃদু হাসছেন, মৌমাছি যদি রামমধু সংগ্রহ করে তাহলে তা জগতকে বিতরণ করার জন্য, তাই রাম সেই যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করছেন। নিষ্কাম কর্মযোগী মৌমাছিকে আমি স্বার্থপরের মতো অভিশাপ দিচ্ছি কেন? বৈরাগ্য ও পরোপকারীতার জন্য তাঁকে পরমাত্মা মনে হলেও মর্ত-ই রামের কর্মভূমি। তাহলে অহল্যার স্বর্গাকাঙ্খা কেন? মর্তধাম-ই অহল্যার কর্মভূমি। যেখানে রাম—সেখানে অহল্যা।

হে অমলিন কলঙ্ক, তুই আমার সাথে জড়িত থাকলে আমি রাম এবং তপস্যা বিস্মৃত হব না। তাই কলঙ্কের জন্য আমার আর কোনও গ্লানি নেই।

তা সত্ত্বেও স্বর্গলোক থেকে অহল্যার আবাহনী অবিরাম। কিন্তু গৌতম নীরব কেন? মুগ্ধ নেত্রে অপলক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। নববধূ থাকাকালীন একদিনও এইরকম প্রেমবিহ্বল দৃষ্টি দেখিনি, দিবারাত্রি তার প্রতীক্ষা করে নিরাশ হয়েছি। আজ জরাগ্রস্ত অহল্যার কি সৌন্দর্য আছে যে গৌতম মুগ্ধ!

এসো, এসো, দেবী! ...রথ প্রস্তুত! ধন্য করো আমাদের—আহ্বানের সীমা নেই, কিন্তু গৌতমের বিদায় মুদ্রা কেন? হাতজোড় করে তিনি আমাকে প্রণাম করেছেন? একদিন যে ছিল শিষ্যা, যার স্খলন হয়েছে, যে তাঁর দ্বারা অভিশপ্তা... যে বিবাহের অপমান করেছে, তাকে স্বামী প্রণাম জানাচ্ছেন? অস্পষ্ট ভাষায় বলছেন—"দেবী, প্রণাম, তোমার তপস্যা আমাকে রামদর্শনের মূল্যবান সুযোগ দিয়েছে। তোমার অপার্থিব সৌন্দর্য আজ রামদর্শনের মতো মুগ্ধকর। যৌবনে তোমার রূপের জয়গান করিনি, রূপের জয়গান সৌন্দর্যের অবমাননা করে, কিন্তু আজ তোমার অপার্থিব সৌন্দর্যের জয়গান করায় ঋষি গৌতমের কুণ্ঠা নেই। সর্বলোকের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত। আজ তুমি গৌতমের অনুশাসন থেকে মুক্ত। এজন্মে এটাই আমাদের পার্থিব সাক্ষাৎ। বিদায় দেবী।"

আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম—"বিদায় কেন? অহল্যার সিদ্ধিভূমি তো গৌতমের জন্য নিষিদ্ধ নয়? গৌতম কি অহল্যা আশ্রমে অহল্যার স্বামী হয়ে থাকতে পারবেন না? সর্বলোকমান্যা

নারীর কি পত্নীত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিতা হওয়া নিয়তি? আমার যশ ও খ্যাতি কি গৌতমকে বিব্রত করছে? আমার পাপ আমাকে গৌতমের থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমার সিদ্ধি আমাকে গৌতমের থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। পাপের মতো সিদ্ধিও নারীর ক্ষেত্রে কত কঠোর।

আমি আর অভিমানিনী, চপলা, অহল্যা নয়। আমার শরীর নারী আত্মা তো মুক্ত। আমি শরীর সর্বস্ব অহল্যা নয়, তাই নারীসুলভ বৃথা অভিমানের মূল্য কি?

স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—"আপনি অহল্যাকে এই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, আপনার অভিশাপই আমার আশীর্বাদ। তবুও অহল্যার কলঙ্কমোচন হয়নি? সেইজন্য কি এই উপেক্ষা? গৌতমের কাতরস্বর আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। বলেন—"তুমি কখনও উপেক্ষার পাত্রী ছিলে না, উপেক্ষা করলে তোমাকে এতবড় অভিশাপ দিয়ে নিজে শাপগ্রস্ত হতাম না। আজ সর্বত্র তোমার "সিদ্ধি" দুন্দুভিত হচ্ছে। আমার তপঃসিদ্ধি এখনও ঘোষিত হয়নি। তাই অহল্যা আশ্রমে গৌতমের স্থান কোথায়?"

আমার কঠোর ক্রোধী তর্কবাগীশ বয়স্ক স্বামী গৌতমেব মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করেছিল এই কোমল কিশোরটি! প্রেমাভিমানের একি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য? মধুর উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত? কে করবে সিদ্ধির ঘোষণা?"

"ক্রোধী, কঠোর গৌতম কি স্বামী হিসাবে অহল্যার কাছে গ্রহণীয়? তোমাকে অভিশাপ দিয়ে গৌতমও অহল্যাভ্রষ্ট হয়েছিল। পুনরায় অহল্যাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য গৌতমের প্রীতিযোগ সিদ্ধি লাভ করেছে কিনা সেটা একমাত্র অহল্যাই ঘোষণা করতে পারবে। স্বামী হিসাবে গৌতম গ্রহণীয় কিনা এই প্রশ্নটি কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করলে সম্ভবত আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করতাম। যে স্বামী আমার দুর্গতির কারণ—অভিশাপদাতা এবং আমার প্রতি নিস্পৃহ, তাকে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা থাকলে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হত। কিন্তু রামদর্শনের পর আমার মনে কারও প্রতি কোনও আক্রোশ নেই। যা ঘটেছে তার থেকে নিজেকে বাদ দিয়ে অপরকে দোষী করব কি করে? আমার সিদ্ধির জন্যও আমার মনে অহঙ্কার জাগ্রত হচ্ছে না। প্রায়শ্চিত্ত অহঙ্কারযুক্ত হলে মন পাপমুক্ত হবে কি করে?

আমার অনুমোদনের অপেক্ষায় নতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন গৌতম। আমার জরা অন্তর্হিত, আত্মা স্পন্দিত। বললাম—"অহল্যার সিদ্ধি গৌতমকৃত। তাই অহল্যার সিদ্ধি গৌতমেরই অপেক্ষা করছে।" এইসময় ভাই নারদ আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রতিবন্ধকের মতো দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"সিদ্ধিভূমিতে ঋষির কি কাজ? রামার্পিতা অহল্যার গৌতমে কি প্রয়োজন? আর্যাবর্তের হাজার হাজার মুনি ঋষি সিদ্ধপুরুষ নিষ্কাম সাধনা করলেও এত হাহাকার, বুভুক্ষা বৃষ্টিহীনতা কেন? আমার অনুভব বলে—নিষ্কাম সাধনা নিষ্কর্ম সাধনা হওয়ায় পৃথিবীতে এত বুভুক্ষা ও অনাহার। ঋষিগণ অন্যের পরিশ্রম লব্ধ অর্থ ও অন্নভিক্ষা

করে আশ্রম জীবনযাপন করায় সম্ভবত পৃথিবীর বহুভাগ ভূমি অকর্ষিত ও শস্যহীন হয়ে পড়েছে। গৃহস্থ জীবনের পরে ঋষিগণ গৃহত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যজ্ঞকার্য করেন ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে। গৃহস্থ জীবনের পর পঁচিশ বছর এইরকম নিষ্কর্মযোগে কেটে যায়। এখন গৌতমের বাণপ্রস্থের সময় উপস্থিত। এখন তিনি গ্রাম, নগর, অরণ্য ভ্রমণ করে নিষ্কাম কর্মযোগের বাণী প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গরুর পাল নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াবেন এবং চাষ না হওয়া জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করে অন্যত্র চলে যাবেন। একস্থানে একাধিক ফসল খাবেন না। তিনি চলে যাওয়ার পর অন্য সবাই সেই ভূমিতে শয্য উৎপাদন করে সমৃদ্ধ হবে। রাজর্ষি জনকের কাছ থেকে তিনি এই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সকল মুনিঋষিকে এই মন্ত্রে দীক্ষত করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তিনি আর অহল্যার বন্ধনে পড়বেন না। জনক রাজর্ষি হয়েও ভূমি কর্ষণ করেন এবং এর ফলে তিনি সীতার মতো কন্যারত্ন লাভ করেছেন। অহল্যার সিদ্ধিভূমিতে অহল্যা সর্বময়ী কর্ত্রী হোক। এ বিষয়ে দুঃখ না করে ঋষি গৌতম বরং গর্ব অনুভব করবেন। এখন গৌতমের সাধনা পথে অহল্যা অন্তরায় না হোক।

আমার শীর্ণ, জরাগ্রস্ত হাতটি বিনা দ্বিধায় গৌতমের দিকে প্রসারিত করে বললাম—"প্রিয়! পরম অন্বেষণের পথে আমার সাথি হন, বাণপ্রস্থ জীবনযাপন করা কি নারীর পক্ষে সম্ভব নয়? আপনি ভূমি কর্ষণ করলে আমি স্বেদ ঢেলে ভূমিকে করব কোমল। বৃক্ষ রোপণ করলে আমি সম্বেদনা দিয়ে বৃক্ষকে করব পুষ্পবতী। আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানে আমি সমিধ হব। নারী ব্যতীত পুরুষ যেমন অপূর্ণ তেমনই পুরুষ ব্যতীত নারী অপূর্ণা। নারী পুরুষের মিলনে এই সৃষ্টি অমৃতময়। এই মিলন দেহগত নয়—এটা অহল্যার উপলব্ধি। গৌতমের সিদ্ধিপথে অহল্যা বিঘ্ন নয়—প্রেরণা। অহল্যার সাধনপথে গৌতমও বিঘ্ন নয়। দু'জনের প্রীতিতে এই পৃথিবী হবে প্রেমময়।" তা সত্ত্বেও গৌতমে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সহসা রাম প্রশ্ন করেন—"গৌতম কি অহল্যার অগ্নিপরীক্ষা চান?

—"অগ্নি পরীক্ষা!" ভাই, নারদ অস্ফুট আর্তনাদ করেন। রামের মুখনিঃসৃত 'অগ্নিপরীক্ষা' শব্দে বিশ্বামিত্র গৌতম এবং আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বিমর্ষ দেখায়, অজ্ঞাত আশঙ্কায় ম্রিয়মান হয়ে যান ভাই নারদ। সদাহাস্যময়, কৌতুক প্রিয় ভাই নারদের এইরকম চিন্তাগ্রস্ত মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি। আমার অভিশাপেও তিনি এত দুঃখিত হননি। অভিশাপদাতা গৌতমের মুখেও ব্যথার আভাস। পশু-পাখি, বনস্পতিও নির্বাক। মানুষের অগ্নিপরীক্ষার অর্থ তার জীবন্ত শরীরকে লেলিহান শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা। এটা অগ্নিপরীক্ষা না জীবন্ত দাহ।

দিব্যদ্রষ্টা বিশ্বামিত্র গম্ভীরস্বরে বলেন—"এ কি শব্দ উচ্চারণ করলে রাম? এ শুধু অহল্যার ওপর প্রশ্নচিহ্ন নয়, এ সমগ্র নারীজাতির ওপর প্রশ্নচিহ্ন। তোমার মতো বিচারশীল,

বিবেকবান, দিব্যপুরুষের মুখনিঃসৃত এই শব্দ ভবিষ্যতের নারী সমাজের প্রতি ঘোর বিপদ সৃষ্টি করবে।

নারীর অগ্নিপরীক্ষার অধিকার পুরুষকে দিল কে? তোমার এই একটা কথা ভবিষ্যতের নারীজাতিকে দগ্ধ করবে। এটা আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। অহল্যার সিদ্ধিতে কি কারও কোনও সন্দেহ আছে? তুমি আজ ব্রহ্মচারী, কাল তুমি হবে স্বামী গৃহস্থ। কথায় কথায়...

বিশ্বামিত্রের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাম বললেন—"আমার পত্নী যেই হোক, অহল্যার জন্য যে বিচার, সমগ্র নারীজাতির জন্য সেই বিচার। সেখানে রাজা-প্রজা, আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ নেই। ন্যায় এবং দণ্ডবিধি সকলের ক্ষেত্রে সমান। এ কথা সত্যি যে আমার দিব্যানুভব এবং আপনার দিব্যদৃষ্টি কিংবা দেবতাদের দিব্যবিচারে অহল্যার পবিত্রতা সুস্পষ্ট। সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ লোকের বিচারে সম্ভবত অহল্যার কলঙ্ক ও পাপ নিশ্চিহ্ন নয়। অহল্যার অপমানের জন্য নয়, তাঁর সিদ্ধিকে জগৎবাসীর কাছে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্যই অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছি। দেবী অহল্যা যেন আমাকে ভুল না বোঝেন।"

দৃঢ়স্বরে বিশ্বামিত্র বললেন—"একজন বিবেকবান, জ্ঞানদীপ্ত রাজার বিচার গ্রহণীয় না সহস্র অজ্ঞান, সংকীর্ণমনা লোকের বিচাব গ্রহণীয়...? নির্দোষ বলে জেনেও সাধারণ লোকের খুশীর জন্য একজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করাটা কি ধরনের ন্যায়?"

"রাজতন্ত্রের বিচারে প্রথম কথাটি গ্রহণীয়, কিন্তু গণতন্ত্রের বিচারে দ্বিতীয় কথাটি গ্রহণীয় হতে পারে, যদিও তা নিষ্ঠুর এবং দুঃখদায়ক। প্রজানুরঞ্জন রাজার ধর্ম... রাজধর্ম পালন করার জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দিতে হয়। তাঁই রাজা মাত্রেই দুঃখী। সেইজন্য রাজসিংহাসনের প্রতি আমার লোভ নেই...।"

—"ও! এ কি কাল-কথা মুখে অনলে দাশরথী, তুমি যে অযোধ্যার রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র—অযোধ্যার ভাবী সম্রাট, অযোধ্যাবাসীর আশা ভরসা। রাজসিংহাসনকে তুচ্ছ মনে করলে সেই গুরুদায়িত্ব বহন করবে কে? অযোধ্যানরেশ বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। কর্তব্যের প্রতি উদাসীন কেন? —গুরুসুলভ কণ্ঠে বলেন বিশ্বামিত্র।

মৃদু হেসে রামচন্দ্র বললেন—"আমি জানি, আমার পিতা রাজা হলেও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমি জ্যেষ্ঠপুত্র বলে বাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার আমার নয়। আমার পিতা সভাসদ এবং রাজ্যবাসীর মতোমতোকে সম্মান দেন, তাঁরা যাকে রাজা হওয়ার উপযুক্ত মনে করবেন পিতা তাকেই সিংহাসনে অভিষেক করবেন। তাই জ্যেষ্ঠপুত্র বলে আমি কি করে ধরে নেব যে আমিই অযোধ্যার ভাবী রাজা। আমার ভাইরা কেউ অযোগ্য নয়। কে জানে নিয়তির কি বিধান?

—"নিয়তি তো তোমার কণ্ঠে" শ্লেষভরা কণ্ঠে ভাই নারদ বলেন। ভাই নারদের বিরক্তি ও বিশ্বামিত্রের ক্রোধে মৃদু মৃদু হাসছেন রামচন্দ্র।

আমি কিন্তু আকাশ পাতাল ভাবছি। আমি শাপমুক্তা কি না তার প্রমাণ হল "অগ্নিপরীক্ষা"। গৌতম সন্দেহমুক্ত কি না তার প্রমাণ কে দেবে? পুরুষের জন্য অগ্নিপরীক্ষার বিধান নেই। অগ্নি যেন নারীর অন্য নাম। এখনও আমি গৌতমের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছি, গৌতম কিন্তু পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে কি গৌতমও আমার অগ্নিপরীক্ষা চান? যদি তাই হয়—তাহলে আমি আগুনের লেলিহান শিখায় প্রাণত্যাগ করব না—গৌতমকেই ত্যাগ করব। আমাকে বর্জন করার এই প্রহসন কেন? গৌতম্ সরাসরি বলছেন না কেন যে আমার "সিদ্ধি" আমাকে কলঙ্কমুক্ত করেনি, তাই আমি গ্রহণীয়া নয়।

কেউ আমাকে জোর করে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীণ করাতে পারবে না। আমি আর পূর্বের অহল্যা নয়। তপস্যার ফলে আমার আত্মশক্তি জাগ্রত হয়েছে। আমার চরিত্রের মাপকাঠি হল আমার বিবেক। রামচন্দ্র এ কি বিষম পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন? ঠিক আছে—প্রথমে গৌতম অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে আমার প্রতি তাঁর সন্দেহমুক্ত নির্মল প্রেমের প্রমাণ দিন। তারপর মহর্ষি বিশ্বামিত্রকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। স্বর্গবেশ্যা মেনকাকে ত্যাগ করে বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা তো বাকি আছে।

পাগলের মতো আমি এসব কি ভাবছি? আমার অগ্নিপরীক্ষার সমস্ত আয়োজন করেছেন ভাই নারদ। সবাই মূক হয়ে আমরা দাহপর্ব দেখার জন্য দণ্ডায়মান। সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। আমি জানি আমার পার্থিব শরীর অগ্নির চেয়ে শক্তিময়ী নয়। আমার দেহ দহনীয়। আমার আত্মাহুতিতে ইন্দ্রদেব যদি আমার অকপট আত্মদানেব কথা মনে রেখে বৃষ্টিদান করে অগ্নি নির্বাপিত করে তাহলে আমার সুন্দর শরীরে দগ্ধচিহ্ন থাকলেও রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবী তো অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে। কত নিরীহ প্রাণীর প্রাণরক্ষা হবে। কিন্তু তারপরে গৌতমের সন্দিগ্ধ বলয়ের মধ্যে পুনরায় ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সারা জীবন একা একা কেটে গেল গৌতমের কৃপণতায়। বাকি জীবন কেটে যাবে নিঃসঙ্গতার নিস্তব্ধ নিশার মতো। সেজন্য আর অহলার ভয় নেই। মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ার দুঃখ যে একা সহ্য করেছে, আজ একটা শাখা ভেঙ্গে পড়ার আঘাতে ভয় পাবে কেন?

শুকনো কাঠ একত্রিত করে ভাই নারদ অগ্নিসংযোগ করতে চলেছেন। অন্য সবাই মূক হয়ে গেলে দুঃখ নেই—মহর্ষি বিশ্বামিত্র কি প্রতিবাদ করবেন না—এখানে অন্য কারও না হয় পাপ থেকে উত্থিত হওয়ায় অনুভূতি নেই কিন্তু বিশ্বামিত্রের তো আছে।

লেলিহান শিখা বিস্তার করে আগুন জ্বলছে। গৌতমের দিকে প্রসারিত হাত ফিরিয়ে নিয়ে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম জানিয়ে বললাম—"মহর্ষি আপনি আমার পথ প্রদর্শক। আপনিই আমাকে পাপ থেকে উত্থিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। আপনি পাপ, তাপ, তপস্যা মোক্ষ সব কিছুতেই অগ্রণী। আজ আপনি প্রথমে অগ্নিতে প্রবেশ করুন, বিনা দ্বিধায় অহল্যা আপনাকে অনুসরণ করবে। আমাদের দু'জনের আত্মাহুতিতে জগত পাপ, তাপ এবং শাপমুক্ত হোক...।"

নারীর এই দুঃসাহসিক আহ্বানে জগত স্তব্ধ হয়ে গেল। "সিদ্ধির এতবড় স্পর্দ্ধা! মহর্ষির আবার অগ্নিপরীক্ষা! ভাবলাম, এবার বোধহয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপ দেওয়ার পালা। কিন্তু আমাকে হতবাক্ করে বিশ্বামিত্র বললেন—"ধন্য তুমি নারী! ধন্য তোমার তপস্যা ও সিদ্ধি। তোমার আত্মবিশ্বাসই আজ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্নিপরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছে কিন্তু আমার সিদ্ধি তো দেবতাদের স্বীকৃতি প্রাপ্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ জয় করে আমি রাজর্ষি থেকে মহর্ষি হয়েছি। অগ্নিপরীক্ষার কি প্রয়োজন? ভেবেছিলাম অন্তিমলগ্নে বিশ্বামিত্রের সমর্থন পাব। কিন্তু বিশ্বামিত্র মহর্ষি হলেও পুরুষ, অহল্যা নারী। অহল্যার সাথে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করবেন কি করে?

বাঃ সমাজ! ধন্য তোর বিচার। কিন্তু আমি কি নির্বিবাদে মেনে নেব এই অন্যায় বিচার?

তাপদগ্ধা পৃথিবী জ্বলছে। আমার নিঃশ্বাসে আগুন, হৃদয়ে আগুন, চোখে আগুন। প্রচণ্ড অভিমানে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। "আমি যজ্ঞময়ী অহল্যা, এই অগ্নিপরীক্ষা আমি স্বীকার করি না।" —উদাত্ত কণ্ঠে একথা বলতে যেতেই আমার কণ্ঠরোধ হল গৌতমের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে। —"নির্বাপিত করো অগ্নি—অগ্নিপরীক্ষা থেকে বিরত হও। অগ্নির আবিষ্কার হয় জগতের কল্যাণের জন্য। অহল্যা শব নয় শিবা। তাকে দাহ করার এই প্রহসন কেন? অগ্নিকে সাক্ষী রেখে সম্পন্ন হয় পবিত্র বিবাহ। অগ্নিসাক্ষী পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস জাগ্রত করে। অগ্নিসাক্ষী মিলনের অবসর সৃষ্টি করে। কিন্তু অগ্নি পরীক্ষা সৃষ্টি করে দুটি হৃদয়ে সন্দেহ ও দূরত্ব। হে রাম! তুমি বিবেকবান, তুমি অহল্যার পদধূলি গ্রহণ করেছ। আমি জানি, এই পরীক্ষা অহল্যার জন্য নয়, আমার জন্যই উদ্দিষ্ট ছিল। আমার মুখ থেকে অহল্যার সিদ্ধি ঘোষিত না হওয়ায়, এবং অহল্যার প্রসারিত হাত আমি গ্রহণ না করায় তুমি অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছ। যে প্রতি মুহূর্তে পশ্চাতাপে দগ্ধ হচ্ছে, তাকে পুনরায় দগ্ধ করার নিষ্করুণ প্রযাস কেন? যে পর্বতের শিখর থেকে গহ্বরে পড়ে আবার আকাশ স্পর্শ করেছে, তাকে কোন পর্বত থেকে ফেলে তার 'সিদ্ধি'র পরাকাষ্ঠা দেখবে? নৈরাশ্যের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে যে আশার দিগন্ত রচনা করেছে, তাকে আর কোন সমুদ্রে ডুবিয়ে তার পবিত্রতা পরীক্ষা করবে? প্রায়শ্চিত্তের বৃশ্চিক দংশনে যার প্রতিটি ভাবকোষ রক্তাক্ত হয়েছে, তাকে কোন প্রায়শ্চিত্তের কষ্টিপাথরে যাচাই করবে?

হে মর্যাদা পুরষোত্তম রাম! তোমার বিচার যাকে মোক্ষ দান করেছে, তার আবার অগ্নিপরীক্ষা কেন? অহল্যার নিষ্ঠা ও উত্তরণ সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এইটুকু ঘোষণার জন্য আজ এই অগ্নিপরীক্ষা। হে রাম! ভবিষ্যতে এই কথা যেন আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত না হয়—এইটুকুই প্রার্থনা।"

গম্ভীর এবং উদাসভাবে রাম বললেন—"আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, অগ্নিপরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছে মহর্ষি গৌতম। কিন্তু ভবিষ্যতের ওপর কার নিয়ন্ত্রণ আছে। জ্ঞান বুদ্ধি,

ঐশ্বর্য ক্ষমতো থাকা সত্ত্বেও বহু বিষয় মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তাহাই ভাগ্য। কর্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম, সেই পথে সুখ দুঃখ যা আসবে তাকে বরণ করা ছাড়া মানুষের অন্য গতি নেই। কিন্তু ভাগ্যের কাছে মাথা নত করা পৌরুষ নয়। তোমার জীবন থেকে এই শিক্ষালাভ করেছি।"

বিশ্বামিত্র ও গৌতমকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় চাইলেন। এবার মিথিলা রাজ্যে তাঁদের শুভযাত্রা।

রুদ্রাক্ষ, ঋচা, তক্ষক, কর্কোটিক, আমার কন্যা গৌতমী এবং অন্যান্য অনার্যরা আনন্দ কলরব করে শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। শ্রীরাম তাদের আলিঙ্গন করেন। আমাকে দেখাচ্ছে,কেউ যেন শ্রীরামের কণ্ঠে শ্যামবর্ণ তমালপুষ্পের মালা পরিয়ে দিয়েছে! শ্রীরামের আগমন শুধুমাত্র আত্মার সিদ্ধিপর্ব ছিল না, ছিল সমন্বয়ের অধ্যায়।

মাঝে আগুন জ্বলছে। আমাদের মিলনের সাক্ষী, আমার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে স্বামীর বার্ধক্যগ্রস্ত শুষ্ক, কর্কশ যজ্ঞপূত হাত ধরলাম। দুন্দুভিত হল গৌতমের সিদ্ধি। পুলকিত হল তড়িত। রোমাঞ্চিত হল বর্ষা, কল্লোলিত হল দগ্ধ পৃথিবী। ইন্দ্রদেব ঈর্যান্বিত নয় এই মিলনে—ইন্দ্র করুণা বর্ষিত হল উষর পৃথিবীর বুকে। বর্ষাদান করে ইন্দ্র স্বয়ং সিক্ত হচ্ছিলেন করুণাধারায়। প্রেমের কি নিষ্কাম নির্লিপ্ত মহোৎসব! যৌবন "ভোগ" পর্ব ছিল। বার্ধক্য সমর্পণের পর্ব। পরমানন্দে আত্মা সিক্ত করে গৌতমের হাত ধরে অগ্রসর হলাম অনন্ত যাত্রাপথে। পিছনে রইলেন ইন্দ্র এবং তাঁর ইন্দ্রলোক সম্মুখে বিপুলা পৃথিবী।

কিছুে
অনুসরণ ৎ
হোক...।"